হিমালয়ের নেশায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — ১৩৬৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ভ্রমণ রয়েছে বাঙালীর রক্তে। প্রকৃতির উদার গম্ভীর মৌন মহিমা এবং উদার উচ্ছল প্রাণোদ্বেলতা দুয়েরই সমপরিমাণ আকর্ষণ আমাদের স্নায়ুতে নিয়ত তরঙ্গ তোলে। এরই তাড়নায় বারেবারে ঘর ছাড়া, দুর্গমের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাদের অস্থিরতা। দুর্গমের ঘেরাটোপে সংরক্ষিত রয়েছে যে সব অপার অপার্থিব বিস্ময় তাতে অবগাহন করার জন্য সঞ্চয়ের ভাঁড়ার ফতুর করে দিতেও কার্পণ্য নেই আমাদের। আর 'ঘরকুনো' (!) বাঙালীর তীব্র উন্মাদনার আরকে বলদর্পী হয়ে উঠেছে বাংলার ভ্রমণ সাহিত্য। অভিজ্ঞতার বিচিত্র রসে তা খুলে দিয়েছে আর এক উপন্যাস জগতের সিংহদুয়ারকে।

একথা ঠিক, নেশাগ্রস্ত ভ্রমণ পিপাসুরা এক স্বতন্ত্র গোষ্ঠী, শ্রেণী। এ মোদকের আদান-প্রদান, সমঝদারিত্ব এই শ্রেণীরই নিজস্ব 'কালচার'। তাই এ রস সর্বত্রগামী নয়, পাঠক মাত্রেই এর ক্ষরণ নেই, নিষিক্তও হ'ন অল্প কিছু মানুষ, তাও কিনা কালেভদ্রে। এবার কিন্তু আমরা পৃথক এক উদ্যোগের মুখোমুখি। হিমালয়ের ভয়াল অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের কিছু ঝলককে অ্যাল্‌বামে বন্দী করে ফেলার প্রয়াসী হয়েছেন সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ এবং সাহিত্যপ্রেমী তারক ভট্টাচার্য। আশা এই, পাঠক আর মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারবেন না। ভ্রমণরস থেকে সাহিত্য কিভাবে দানা বাঁধে এবং তার মিষ্টত্ব যে একটুও কম নয়, একথা অবশ্যই অনুভব করবেন পাঠক সম্প্রদায়।

প্রশ্ন হ'তে পারে কেন এই হিমালয়। হিমালয়কে ঘিরে দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভারতসংস্কৃতির বিপুলতাকেই বা কি করে বিস্মৃত হবেন। একটা বৃহৎ ভূখণ্ডের অতন্দ্র ভৌগোলিক প্রহরা থেকে জাতীয় মানসজীবনধারা কিভাবে উদ্ভূত ও বিস্তারিত হয়ে পড়লো সমগ্র ভূখণ্ডে, ক্রমে ক্রমে অধিবাসীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসকে তৈরী করে দিয়ে এক শক্তিশালী কিম্বদন্তী বা আর্কেটাইপে পরিণত হল, তার প্রেরণা ভারতবাসী হয়ে উপেক্ষা করবেন কি ভাবে। এই জীবন্ত ভাবকোষের কাছে পুরাণ-মহাকাব্যের আত্মসমর্পণ তো ধ্রুব সত্যের বিষয়। এই

পটভূমিকে পিছনে রেখে এবার সংকলিত রচনাগুলি পড়ে দেখুন। অনুভব করবেন, কেন নেশার টানে মানুষজন বৃদ্ধ প্রপিতামহের পদপ্রান্তে গিয়ে আনত হয়।

ভারতীয় জীবনশক্তির এই সঞ্জীবন ধারাকে ঐতিহ্যের ফ্রেমে বাঁধার আয়োজন অবশ্যই এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। সংকলন দেখে মনে হবে অতীত এবং বর্তমান, প্রবীণ এবং নবীনে মিলে হিমালয়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনে বসেছেন। মহাসাক্ষীর ক্রোড়ে এতগুলি মানুষের ভাব বিনিময় মিথ্যা হওয়ার নয়। এক পরম্পরার তাপ-উত্তাপে আবিষ্ট হতে হতে মহামৌনীর অচল মহিমাকে মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করা মন্দ কি! আশা রাখি, এ উদ্যম বিফলে যাবে না।

নিবেদন

বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা মহাকাশ-পরিক্রমার পরে যখন পৃথিবীতে ফিরে এলেন তখন তাকে প্রশ্ন করা হল—মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায়? তিনি উত্তর দিলেন—সুন্দর! অপূর্ব সুন্দর! সে সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হয়—পৃথিবীর কোন অংশ সবচেয়ে সুন্দর? তিনি সোচ্চারস্বরে বলে উঠলেন—হিমালয়!

কিন্তু হিমালয় শুধু সৌন্দর্যের আধার নয়—ঋষিদের কাছে সে তপোভূমি, সমস্যাজর্জরিত মানুষের কাছে সে সন্তাপহারী, নিসর্গরসিকের কাছে সে মনোগ্রাহী, অমৃতলোককামীদের কাছে সে অমর্ত্যলোকের দিশারী, পর্বতারোহী ও পদযাত্রীদের (ট্রেকারদের) কাছে রোমাঞ্চের হাতছানি আর বৈজ্ঞানিকদের কাছে অন্তহীন ঐশ্বর্যের আধার।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই দলে দলে মানুষ হিমালয়ের হাতছানিতে ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েছেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনে কেউ অভীষ্ট লাভ করেছেন কেউ করেননি, কেউ ঘরে ফিরে আসতে পেরেছেন, কেউ পারেননি। তবুও হিমালয়যাত্রীদের সংখ্যা যুগে যুগে বেড়েই গিয়েছে।

দেবতাত্মা হিমালয় ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে আছে। এই নগপতিকে অবলম্বন করে ভারতে এক বিপুল সাহিত্য-ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। মহাভারতের যুগ থেকেই হিমালয় ভারতীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত করে আসছে! পরবর্তীকালের বিভিন্ন সংস্কৃত কাব্য-নাটকে আমরা হিমালয়ের প্রভাব দেখতে পাই। হিমালয়-প্রেমিক কবি ও সাহিত্যিকগণ যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁদের রেখায় লেখায় শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিশ্বাসে সৌন্দর্যে, ও কল্পনায় হিমালয়কে সুমহান করে রেখেছেন।

অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার হিমালয় শুধু শিবালয় নয় সেই সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম ও উচ্চতম পর্বতশ্রেণী। প্রায় দুহাজার দু-শো মাইল লম্বা এই পর্বতশ্রেণীতে কুড়ি হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু প্রায় ছ-শো শৃঙ্গ রয়েছে। তাদের মধ্যে আঠাশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু তিনটি—মাউন্ট এভারেস্ট (২৯,০২৮), মাউন্ট গডউইন অস্টেন (২৮,২৫০) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬)। সাতাশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু পাঁচটি এবং ছাব্বিশ ও পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু তেরোটি ও সাঁইত্রিশটি শৃঙ্গ রয়েছে। অর্থাৎ হিমালয়ে পঁচিশ হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু শৃঙ্গের সংখ্যা আটান্নটি। সুতরাং হিমালয়ের ভয়াল-সুন্দর রূপ এবং দুর্গম উচ্চতার আকর্ষণে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ইউরোপের অভিযাত্রীরা হিমালয়ে পদযাত্রা ও পর্বতাভিযান আরম্ভ করেছিলেন। ভারতীয়রা প্রকৃতপক্ষে পর্বতারোহণ শুরু করেন শতাধিক বছর পরে। ১৯৫১ সালে গুরুদয়াল

সাহিত্যের চমক সর্বদা না থাকলেও আছে হিমালয়ের কথা। সুতরাং এঁরা হিমালয়-ভ্রমণসাহিত্যকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

আলোচ্য সংকলনে আমরা তিন প্রকারের হিমালয়-ভ্রমণ-কথাই সংকলিত করেছি। স্থানাভাবের জন্য অনেক লেখার অংশবিশেষ বাদ দিতে হয়েছে কিন্তু লেখকের মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য রেখেছি যাতে বাদ দেবার জন্য রচনাটির ছন্দ-পতন না ঘটে।

এই সংকলনে এমন কয়েকজন লেখকের লেখা আমরা সংকলিত করেছি যাঁরা খুব সুপরিচিত নন। আজকের যুগে সাহিত্য একটা 'ইন্ডাস্ট্রি'। সুতরাং লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা করে অধিকাংশ পত্রিকা ও প্রকাশক অপরিচিত লেখকদের পরিচয় সাধনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। ফলে একদিকে যেমন হিমালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে বাধা আসছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যও নতুন সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে না। তাছাড়া আগেই বলেছি হিমালয় শুধু দেবালয় বা সৌন্দর্যের আধার নয়, হিমালয় অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার। হিমালয়ের খনিজ সম্পদ, প্রাণীসম্পদ, বনজ সম্পদ, জলসম্পদ প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে আহরণ করতে পারলে ভারতের দারিদ্র্য ঘুচে যাবে। হিমালয়ে বাস করে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে না তুলতে পারলে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। হিমালয় ভারতের সব অভাব ঘুচিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। সুতরাং ঐশ্বর্য-আহরণ এবং পর্যটন-প্রসারের জন্য হিমালয়কে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। আর সাহিত্যই এই কর্তব্যপালনে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আসতে পারে। সুতরাং পত্র-পত্রিকায় এবং বাংলা প্রকাশনায় আরও বেশি হিমালয়ের উপর লেখা প্রকাশ হওয়ার প্রয়োজন।

আমরা আনন্দিত যে আমাদের প্রকাশক মৃগাঙ্কমৌলি চৌধুরী লাভ-লোকসানের কথা বিবেচনা না করে এই সংকলন-প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, আর আমরা দেবতাত্মা হিমালয়ের কাছে তাঁর সাফল্য কামনা করি।

সবশেষে বলি হিমালয়ের আরেক নাম নেশা। একবার যাঁকে এই নেশায় পেয়েছে তাঁর কাছে সোনা সুরা ও সাকীর নেশাও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। আমরা হিমালয়-পথিকরা প্রত্যেকেই এই নেশায় আক্রান্ত। আর তাই আমাদের এই সংকলনের নাম 'হিমালয়ের নেশায়'।

আমরা বিশ্বাস করি, হিমালয়ের নেশায় আক্রান্ত পাঠক-পাঠিকারা এই সংকলনের মাধ্যমে তাঁদের নেশা চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করবেন। তাই আমরা এই সংকলনে হিমালয়ের কয়েকখানি মানচিত্র ও কয়েকটি জনপ্রিয় পথের পথপঞ্জি এবং কয়েকটি শৈলাবাস ও হিমালয়ে পর্বতারোহণের কিছু বিবরণ সংযোজিত করলাম।

আর একটি কথা, ব্রিটিশ ভারতে ভৌগোলিকভাবে হিমালয়কে সাতটি ভাগ করা হয়েছিল। কারাকোরাম কাশ্মীর পাঞ্জাব গাড়োয়াল কুমায়ুন আসাম ও নেপাল হিমালয়।

কারাকোরাম পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর হিমালয়ের অংশবিশেষ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকি অংশগুলির উপর লিখিত এক বা একাধিক রচনা অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় হিমালয় ও নেপাল হিমালয়ের কথা ও কাহিনী আমরা এই সংকলনে পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিলাম।

যে-সব লেখক ও লেখিকা অথবা তাঁদের উত্তরাধিকারী লেখা দিয়ে অথবা রচনা-প্রকাশের সম্মতি দিয়ে আমাদের এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আশা করি অতীত ও বর্তমানের হিমালয়-পথিক এবং অভিযাত্রীদের এই ভ্রমণ-সংকলন একালের হিমালয়প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের সমাদর, অনুগ্রহ ও স্নেহলাভে ধন্য হয়ে উঠবে। আর তাহলেই প্রকাশক এবং সংকলক হিসাবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে।

দূরের পাহাড়গুলি ঘননীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে। আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে।

*

সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।

*

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

*

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা, অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যকুলতা।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

হিংলাজ

অবধূত

সামনেই হিংলাজ।

দু-তিন হাত চওড়া জলধারাটির অপর পারে আর একটি খাড়াপাহাড়। সেই পাহাড়ের কোলে ঠিক আমাদের সামনেই এক বিরাট গহ্বর। মুখের দিকটা অন্তত তিনতলা সমান উঁচু। ছাত ক্রমে ভিতর দিকে নেমে গেছে। নীচে কি আছে দেখা গেল না। জলের ওপারেই কয়েক ঝাড় করবী গাছের আড়াল পড়েছে।

কাউকে বলে দিতে হল না এই হিংলাজের গুহা। প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন মায়ের স্থান। সাজিয়েছেন অতি অল্প উপচারে। তর্ তর্ করে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ নির্ঝরিণী, আর কয়েক ঝাড় রক্তকরবীর গাছ। টকটকে লাল ফুল অজস্র ফুটে রয়েছে গাছে। বইছে শীতল হাওয়া। এতক্ষণে যে সরু পথটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলাম তার মধ্যে এতটুকু হাওয়া ছিল না। দু-পাশে পাহাড় তেতে ভিতরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছিল। অঘোর নদী থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে আমরা ঢুকেছিলাম পাহাড়ের মধ্যে। কাপড় শুকিয়ে কখন খরখরে হয়ে গেছে তা টেরও পাই নি। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হিংলাজের শীতল স্পর্শে দেহ মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এখানে এলে সকলের সকল জ্বালা জুড়োবেই। স্বয়ং দক্ষকন্যা পতিনিন্দার জ্বালা জুড়োবার জন্যে এখানে এসে লুকিয়েছেন। ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াবার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কোথাও আছে না কি!

তখন রূপলাল কাঁধ থেকে ছড়ি নামিয়ে সেখানে পুঁতলে। ছড়ি আর যাবে না। ছড়ির ওপারে যাওয়া নিষেধ। ছড়ি পুঁতে জলে নামল রূপলাল। তার পিছন পিছন আমরাও।

জল পায়ের গোছ পর্যন্ত উঠল। কিন্তু খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পার হতে হল। পাথরের উপর শেওলা পড়েছে। পা ফেললেই পিছলে যায়। অপর কূলে পা দিয়েই আবার রূপলাল চীৎকার করে উঠল—"জয় শ্রীহিংলাজ মহামায়ী কি—"

আবার সকলে একযোগে জয়ধ্বনি দিলে। এবার কিন্তু সেই ধ্বনি তখনই মিলিয়ে গেল না। গুম গুম করে ছুটে বেড়াতে লাগল গুহার মধ্যে। সেই জয়ধ্বনি শতগুণ হয়ে ফিরে এল আমাদের কানে। রূপলালের পিছু পিছু দু-ঝাড় রক্তকরবীর মাঝখানের সরু পথ দিয়ে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙিনায়। মুখ তুলে দেখলাম অনেক উঁচুতে লালচে পাথরের ছাত ঝুলে আছে আঙিনার উপর। সামনে কয়েক থাক সিঁড়ির মত উপর দিকে উঠে গেছে, তারপর অন্ধকার গুহা। তখন সেই আঙিনার উপর সবাই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

অবশেষে সত্যই পৌঁছলাম।

দুঃখ-কষ্ট, লোভ-লোকসান, এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত তুচ্ছ করে যার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মরুভূমির বুকে, যার বলে বলীয়ান হয়ে এই এক পক্ষ দিনরাত অহরহ যুঝেছি

মরণের সঙ্গে, যার দুর্নিবার আকর্ষণ এই অসম্ভব সম্ভব করলে, তার চরণতলে পৌঁছে এতটুকু উত্তেজনা উচ্ছ্বাস নেই মনের কোণেও। বরং একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব যেন পেয়ে বসল। হাত-পা সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ল। কাঁধের ঝুলিটা একপাশে নামিয়ে গুহার সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

অতবড় মহাতীর্থে পৌঁছে একটি অতি সাধারণ সহজ সরল ঘটনা মনে পড়ে মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললে। একবার অনেক দিন পরে বাড়ি গিয়েছি। বাড়ি যাবার জন্যে মা বারবার চিঠি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছুটি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ ছুটি পেলাম, পেয়েই রওয়ানা। স্টীমার থেকে নেমে নৌকো পেলাম না। তাতে বড় বয়েই গেল। হেঁটেই মেরে দিলাম ক্রোশ তিনেক পথ। বাড়িতে ঢুকে কাকেও দেখতে পেলাম না। মা বোধহয় তখন ঘাটে গিয়েছেন—কিংবা ওপাশের রান্নাঘরে কিছু করছেন। তা আর ডাকাডাকি করব কি, দাওয়ায় উঠে নিশ্চিন্তে শরীর এলিয়ে দিলাম। মা আসবেনই এধারে, এখনই। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। মাথার চুলের মধ্যে আঙুলের স্পর্শ পেলাম কার। মটকা মেরে পড়ে রইলাম। এ স্পর্শ অন্য কারও হতেই পারে না। এ আমার মায়ের হাতের স্পর্শ। এইটুকুর লোভেই এতটা পথ ছুটে এসেছি। ভিটকিলিমি করে চোখ বুজে পড়ে আছি, তখন কানে এল মায়ের গলার স্বর, "কখন এলি বাবা? একটা খবর দিয়ে আসতে হয়—ঘাটে নৌকো পাঠাতাম।" তবু চোখ বুজে চুপটি করে শুয়ে আছি। যতক্ষণ এভাবে থাকব, ততক্ষণ মা মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন।

আবার কানে এল, "শরীর ভাল আছে ত রে খোকা? এসেই দাওয়ার উপর শুধু মাটিতে এ ভাবে শুয়ে পড়েছিস!" চাপা উৎকণ্ঠা মার গলায়। আর থাকতে পারলাম না, তড়াক করে উঠে বসে মায়ের পা দু-খানিতে হাত বুলিয়ে কপালে মাথায় ঠেকালাম। বললাম, "ভয়ানক শরীর খারাপ হয়েছে মা, পেটের ভিতর জ্বলে যাচ্ছে। তোমার ছেলের সারা শরীরের মধ্যে ঐ একটা জায়গাতেই যা কিছু খারাপ-ভাল হয়—আর তখন খালি তোমার কথা মনে পড়ে। দাও, আগে কি খেতে দেবে দাও। নয়ত অনর্থ বাধিয়ে বসব।"

মা হেসে ফেললেন। আমার নিজস্ব সম্পদ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, যার সঙ্গে দুনিয়ার আর কারও মায়ের হাসি মেলেই না। সব ছেলের কাছেই তার মার মুখের হাসিটি হচ্ছে একান্ত নিজস্ব সম্পদ, যার সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসি মেলেই না। হেসে ফেলে মা বললেন, "তবে উঠে পড়না, হাত মুখ ধুয়ে নে। সেই ত কাল সকালে ভাত খেয়েছিলি, এতটা পথ হেঁটে এলি, ক্ষিধে পাবে না!" তবু উঠছি না, জ্বলুক পেট, তবু যতক্ষণ মার কাছে বসে থাকা যায়।

অনেক দিন পরে আজ আবার চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছি নিশ্চিন্ত হয়ে। মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে একটি প্রত্যাশায়। আজ আবার মা এসে পাশে বসে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন। আমার মার চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাব, "কখন এলি বাবা, শরীর খারাপ করে নি ত?" তখন চোখ মেলেই মায়ের মুখের হাসিটি দেখতে পাব,

যে হাসির সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসি মেলেই না, যে হাসি আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

"নিন, বিড়ি নিন একটা।"

চোখ চাইতে হল। মায়ের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "দাও।"

বিড়ি ধরানো হলে রূপলাল বললে, "একটা মহা অন্যায় করলাম। অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কি হল আবার?"

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রূপলাল বললে, "এই যে সোজা আপনাদের এনে তুললাম মায়ের স্থানে, এইটেই অন্যায় হয়ে গেছে। নিয়ম হচ্ছে, দিনের বেলা ঝরনার ওপারে থাকতে হবে। লক্ষ্য করেন নি বোধ হয়, খানিকটা আগে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে একখানা পাথরের ঘর আছে। ওখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থাকতে হবে। সেখানে রান্না-খাওয়া সেরে সন্ধ্যার পর ঝরনা পার হওয়া হচ্ছে নিয়ম। আর ভোর-রাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে যেতে হবে।"

বললাম, "তা নিয়ে গেলে না কেন আমাদের সেই জঙ্গলের মধ্যেকার ঘরে? বেশ ত, সন্ধ্যা পর্যন্ত না-হয় আমরা সেখানেই কাটিয়ে আসতাম। কি দরকার ছিল বেআইনী কাজ করবার?"

রূপলাল একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, "আরে রেখে দিন আপনার আইন-কানুন। এবারের যাত্রায় চন্দ্রকূপে সব নিয়ম আমরা বিসর্জন দিয়ে এসেছি। নিয়ম হচ্ছে, চন্দ্রকূপ বাধা দিলে আর এগোনো যাবে না। কতকগুলো লোকের ত পূজোই হল না সেখানে, বাবার হুকুমও নেওয়া হল না। তা কাউকে কি আমরা ফেলে এসেছি নাকি! ওখানে অঘোরী বাবাকে চন্দ্রকূপের ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি করা উচিত? সবাই কি যেতে পারবে নদীর ওধারে?' বাবা বললেন, 'আলবাৎ পারবে। সোজা সবাইকে নিয়ে যা মায়ের স্থানে। তুই ব্যাটা কালকের বাচ্ছা, তুই নিয়মের কি বুঝবি!' তখন সবাইকে নিয়ে অঘোর নদী পার হয়ে চলে এলাম। কিন্তু দিন থাকতেই যে মায়ের গুহায় চলে এলাম, এতে হয়ত অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।"

বললাম, "তা বেশ ত, এখন আবার চল, সবাই চলে যাই সেই পাথরের ঘরে। আবার সন্ধ্যার পর আসা যাবে।"

রূপলাল বললে, "হ্যাঁ, এখন আবার কেউ যেতে রাজী হবে নাকি সেখানে! সেখানে গিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে করতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন, অঘোরী বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন দিনের বেলা এলি এখানে, তখন আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব, বলব, কি করব, এই দলের মোহন্ত যদি জেদাজেদি করেন দিনের বেলা এখানে আসবার জন্যে, তখন আমি—ছড়িদার পাণ্ডা মানুষ—আমি কি করতে পারি।—তারপর আপনি সামলাবেন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, "বেশ, তাই হবে। অঘোরী বাবাকে আমি সামলাব। তুমি তোমার যাত্রীদের সামলাও। ঝরনার এপারে কেউ যেন থুতুও না ফেলে। যার যা দরকার হবে ওপারে গিয়ে করে আসবে।"

রূপলাল উঠে গেল সবাইকে সাবধান করতে। সুখলাল এসে বললে, "চলুন আবার ঝরনার ওপারে। ওখানে চা বানানো হয়ে গেছে।"

"এখানেও চা বয়ে এনেছ নাকি তুমি?"

সুখলাল প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, "শুধু চা কেন, মায়ীজি কিশমিশ খেজুর আখরোট সব এনেছেন চিরঞ্জীলালের ঘাড়ে চাপিয়ে। সবাই ওপারে চলে গেছে, সেখানে জল খেয়ে তবে আবার আসবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি একটি প্রাণীও নেই। শুধু ঝুলিগুলি পড়ে আছে। সুখলালের হাত ধরে শেওলা-পড়া পাথরের উপর সাবধানে পা ফেলে আবার সেই তিন হাত জল পার হলাম।

এ পারের একটা পরিষ্কার জায়গায় কুন্তী চা চড়িয়েছে ছোট ডেকচিটায়। তার পাশে ভৈরবী আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছেন। আর সবাই চারিদিকে ঘিরে বসেছে। বড় কল্কেয় আগুন দেওয়া হয়েছে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব সবাইএর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে—যেন ছুটির দিনে চড়ুইভাতি করতে এসেছে সবাই। পোপটভাই সাদর অভ্যর্থনা করলেন—"আসুন আসুন, বসে পড়ুন এধারে।" বললাম, "তবে যে শুনেছিলাম আমরা আজ উপোস করে থাকব?" শুয়ে শুয়েই ভৈরবী উত্তর দিলেন—"কেন? উপোস করে মরতে যাব কেন গুস্টিসুদ্ধ সবাই মায়ের স্থানে এসে? আজ ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করবার দিন। কিচ্ছু নেই সঙ্গে, তা আর কি করা যাবে। যা আছে তাই এক এক মুঠো খেয়ে জল খাওয়া যাক। সেই ভোর-রাতে দর্শন, ততক্ষণ না খেয়ে শুকিয়ে থেকে কি লাভ।"

উপোস করে থাকলে কি লাভ হয় তা আমিও জানি না; উপোস-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ডাক্তারদের, যাঁরা পঞ্জিকা ছাপান তাঁদের, আর দেশের সরকারী কর্তাদের। প্রথম দল বলেন, উপোস করলে রোগ সারে। দ্বিতীয় দল বিধান দেন, উপোসে পাপ কমে। আর তৃতীয় দল আইন বানান, কম খাও, উপোস কর, মুখ বুজে উপোস করে মর, পেট ভরে খেতে চাওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তা আমি ঐ তিনদলের কোনও দলে স্থান পাব না। কাজেই মাথা চুলকোতে লাগলাম।

শ্রীমতী কুন্তীদেবী একাই একশ। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। এ'কে আরও দুটো খেজুর, ওকে কিশমিশ একমুঠো বেশি, আবার কাউকে বা শুধু মিষ্টি ধমক দিয়ে সন্তুষ্ট করছে। শুয়ে শুয়েই ভৈরবী সাবধান করে দিলেন, "সব দিয়ে ফেলিস নি, সুখলালের জন্য কিছু যেন থাকে। রাতে আবার ওকে খাওয়াতে হবে।"

চায়ের গেলাস হাতে করে বসে বসে দেখছি আর ভাবছি, ফিরে গিয়ে কোথাও আশ্রম ফাঁদলে এ মেয়ে বেশ চালাতে পারবে। শুধু এ মেয়ে নয়, পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরাই এই একটিমাত্র কাজ সহজে সুশৃঙ্খলে অবলীলাক্রমে সমাধা করতে পারে, আর তা করে তৃপ্তিও

পায়। যদি বলি গৃহের মধ্যে গৃহিণীপনা করাতেই নারীজীবনের চরম সার্থকতা, তাহলে আমারও যেমন বাড়াবাড়ি করা হবে, তেমনি অবিলম্বে লগুড় হাতে তেড়ে আসবেন আর একদল, যাঁরা কায়মনোবাক্যে কামনা করেন যে ভবিষ্যৎ হাওড়া পুলের মাথাটা যখন জোড়া হবে, তখন সেখানে উঠে ঝুলতে ঝুলতে হাতুড়ি ঠোকা কর্মটি দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী ভ্রাতাদের বদলে বেণী-ঝোলানো মেয়েরাই করবে। তা করুক, আর তাতে যদি মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে বিটকেল খেয়োখেয়িটা ঠাণ্ডা হয় ত হোক। তবু সবিনয়ে নিবেদন করব যে, যতদিন না সারা দুনিয়ার সবাই হোটেলে খেতে আর সরাইখানায় শুতে শুরু করছে, ততদিন গৃহ থাকবেই। তখন গৃহ বাঁধলেই প্রয়োজন হবে গৃহিণীর। ওর একটিকে ছেড়ে অপরটির কোন সার্থকতা নেই।

দেশময় বড় বড় হোটেল আর প্রসূতিভবন বানাতে পারলে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচব এ কথা আমিও মানি। ঘর-থেকে-মুক্তি-পাওয়া মেয়েরা কামান বন্দুক এরোপ্লেন চালিয়ে কত বড় বড় বীরত্ব দেখাচ্ছেন সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমারও সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখনকার গার্গী-মৈত্রেয়ী আর এখানকার অনারেবল মিনিস্টার শ্রীমতী লক্ষহীরা সুব্রহ্মণ্য আয়ার এম ডি, ডি টি এম, ডি এসসি, পি এইচডি—এঁদের সকলের কাছেই আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথাও ভুলতে পারি না, যাঁরা কোটি কোটি গৃহের মধ্যে মা বোন স্ত্রী কন্যা রূপে নীরবে নিঃশব্দে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন শুধু এতবড় মনুষ্য-সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এঁরা ঘরে বন্ধ রয়েছেন এই দুঃখে কত ঘটি চোখের জল যে এ পর্যন্ত পড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত ঘটি পড়বে তার ইয়ত্তা নেই। তবু ভেবে পাই না এঁরা সবাই যেদিন ঘর ছেড়ে পথে নেমে দাঁড়াবেন, সেদিন ঘরের প্রাণ থাকবে কেমন করে! মা বোন স্ত্রী কন্যা এঁদের কাছে যা আমরা চাই আর পাই তা তখন পাওয়া যাবে কোথায়? এতবড় প্রয়োজনের দাবি সেদিন মিটাব কি দিয়ে? হাওড়া পুলের মাথায় দাড়ির বদলে বেণীকে হাতুড়ি ঠুকতে দেখেই কি তখন আমরা ঘরের অভাব ভুলতে পারব?

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম অমাদের এই পুণ্যকামী দলটিতে একটি কুন্তী বহিনের অভাব সত্যিই ছিল। ভাগ্যক্রমে কুন্তী এসে জুটেছিল আমাদের সঙ্গে। তা না হলে এই মায়ের স্থানে এসে আজ আমরা গোমড়া মুখ করে কলকে হাতে নিয়ে আত্মচিন্তায় ডুবে থাকতাম, কিংবা কখন রাতটা শেষ হবে আর মায়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এ স্থান থেকে বিদায় নেব সেই চিন্তায় ছটফট করতাম। তাতে তীর্থস্থানের মর্যাদা হয়ত ষোল আনাই রক্ষা পেত, কিন্তু এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছে কতটুকু শান্তি আর আনন্দ লাভ করতাম আমরা, তা কে বলতে পারে। ওই যে ওই মেয়েটিকে ঘিরে বসে ছেলেমানুষের মত "কুন্তী বহিন, আমায় আরও দুটো খেজুর দাও, আমায় আরও দুটো আখরোট দাও" বলে হৈ-চৈ করছে সকলে, ও না এলে এ সমস্ত ত কিছুই হত না এখানে। বিজ্ঞ লোকে বলবেন—'যদি ওই সমস্তই চাও, তবে অত কষ্ট করে অত বড় মহাতীর্থে কেন গেলে বাপু? লেকের ধারে গেলেই ত পারতে।' তাঁদের চেয়ে বিজ্ঞ যাঁরা, যাঁরা বলেন 'নারী নরকের দ্বার', তাঁরা নাক সিটকে

বলে উঠবেন, 'ছি ছি ছি, ওখানে গিয়েও ওই সব হ্যাংলামো গেল না?' এঁদের কথা মাথা নীচু করে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এই যে আজ এতগুলি সন্তানের হাসি চীৎকার আনন্দ উল্লাসে মায়ের স্থানটি গমগম করছে, জগৎ-জননীর কাছেও কি এর কোনও মূল্য নেই? মা কি সত্যই এ কামনা করেন যে, তাঁর প্রতিটি ছেলে-মেয়ে অযথা জ্ঞানার্জন করে গোমড়ামুখো কাঠগোঁয়ার হয়ে উঠুক, হয়ে জননীর জাতকে হয় ঘৃণা করতে শিখুক, নয় বিলাসের উপকরণ বলে মনে করুক? আমরা আজ আনন্দময়ী মায়ের স্থানে এসেও যদি একবার প্রাণ খুলে না হাসতাম, শুধু 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ইত্যাদি বড় বড় তত্ত্ব আলোচনায় চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করে সময়টুকু কাটিয়ে দিতাম, তাহলে কি সত্যই জননী খুশী হতেন?

মা যে কিসে খুশী হন আর কিসে হন না এ এক সমস্যা বটে। সেই রাত্রেই হিংলাজের আঙিনায় শুয়ে বোধ হয় এ মহাসমস্যার একটা সহজ সমাধানও পেয়েছিলাম।

চাদর মুড়ি দিয়ে সকলেই শুয়ে পড়েছে মার আঙিনায়। শেষরাতের দিকে অঘোরী বাবা যখন আসবেন তখন উঠে স্নান করে নতুন কাপড় পরে ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ের গুহায় ঢুকতে হবে। নিশ্চিন্ত হয়ে সকলে শুয়ে-বসে আছি। রূপলাল আর সুখলাল ওধারে মায়ের জন্যে ভোগ রাঁধছে। আমার পাশে বসে পোপটভাই আর ভৈরবী বকবক করছেন। সবই কানে আসছে। প্যাটেল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে কুন্তী কি আপনার সঙ্গেই থাকবে মা? ওকে নিয়ে গিয়ে কোথায় দেবেন আপনারা?"

ভৈরবী বললেন, "ওমা, আমার কাছে থাকবে না তা বাছা যাবে কোথায়?"

একটু চুপ করে থেকে পোপটভাই বললেন, "কিন্তু আপনি জানেন ত, মেয়েটার জাত গেছে। স্বভাবচরিত্রও ভাল নয়। সেই ছোকরা থিরুমল ওর—"

ভৈরবী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—"জানি, সবই জানি বাবা। কিন্তু সে সমস্ত হাঙ্গামা তো আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই ঘটে গেছে ওর জীবনে। তার হিসেব নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? সে হিসেব মায়েরা রাখে না। তা রাখলে কুন্তী এল কি করে এখানে? জগৎ-জননী সতী মায়ের এই স্থান। সেই মা ত ওর উপর দয়া করলেন। তাঁর দয়ায় ও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল এখানে। এর পরেও কি ওর কোনও পাপ থাকতে পারে নাকি? আর, জাতের কথা বলছ বাবা—মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের কিছুতেই জাত যায় না। মায়ের কাছে সন্তানের আবার ভিন্ন জাত আছে নাকি! মায়ের কাছে ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত। আর ছেলের কাছে মায়েরা হচ্ছে মায়ের জাত। তা কুন্তী ত আমায় মা বলেছে। ওর জাত গেলে আমারও যে জাত থাকে না।"

পোপটভাইএর আরও প্রশ্ন ছিল, "কিন্তু ওর কি কিছু হবে মা? দেখবেন আবার ও কারও সঙ্গে কিছু ঘটিয়ে আপনার অপমান করবে।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন ভৈরবী। বললেন, "আমার আবার অপমান করবে কি ও-বেটী? কারও সঙ্গে আবার যদি কিছু ঘটায় তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? ও নিজেই আবার জ্বলে পুড়ে মরবে। যতদিন হেসে খেলে মেয়ের মত আনন্দ করে থাকবে আমার

কাছে, ততদিন আমি ওকে বুক দিয়ে আগলে রাখব। যেদিন ও আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবে সেদিনও আমি বাধা দেব না। ছেলেমেয়েরা কি চিরকাল মাকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারে বাবা? তা কখনও সম্ভব নয়। না হয় একটু ঘা খেয়েছে, তা বলে ওতেই ওর চিরকালের জন্যে সংসারের উপর ঘেন্না হয়ে গেছে? এতটা আমি আশা করব কেন—পাঁচজনের পাঁচ রকম দেখে ও যদি তখন নিজের ভালমন্দ বুঝে আবার কারও সঙ্গে পা বাড়ায়, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? যে ক-দিন ও আমার কাছে থেকে নিজে শান্তি পাবে, ততদিন আমিও শান্তি পাব ওকে নিয়ে। তারপর ও কোথাও ভালভাবে শান্তিতে আছে এইটুকু জানতে পারলেই আমার শান্তি।"

আরও অনেক কথাবার্তা হল ভৈরবীর সঙ্গে পোপটলালের। কিন্তু আর আমার কানে কিছু ঢুকল না। আমি তখন চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে মাকেই বার-বার বলতে লাগলাম, "তাই কর মা, তাই কর। আমরা যেন কেউ কাকেও ছোট বা বড় না দেখি। ওই বরিশেলে অজমূর্খ ভৈরবীর মুখ দিয়ে যা তুমি আজ আমায় শোনালে, জগৎজোড়া তোমার সব কটি ছেলেমেয়ে যেন ওইটুকুই মেনে চলে। মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাত আর ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত। ছেলেমেয়ে যতদিন মাকে নিয়ে ভুলে থাকে ততদিন মায়ের শান্তি। আবার যখন মাকে ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে ছেলেমেয়ে শান্তিতে থাকে তখনও মায়ের শান্তি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ছেলেমেয়ের জাত গেলে মায়েরও যে জাত যায়। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, এই সব বিদঘুটে সমস্যার এর চেয়ে সহজ সরল সমাধান আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে!

ঘোর অন্ধকার।

রাত্রির শেষ প্রহর। ঝরনার জল ঘটি করে মাথায় ঢেলে স্নান করে নতুন কাপড় পরে অনেকগুলো ধাপ উঠে আমরা গুহার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। গুহার একেবারে শেষ সীমায় মা হিংলাজের বেদী। অনেক উঁচুতে ছাত। একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে বেদীর উপর। তাতে ছাদের নীচে আর বেদীর চারপাশে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। প্রদীপের আলোয় দেখা যাচ্ছে লাল সালুতে মোড়া বেদী। মেওয়া মিছরি নারকেল সাজানো হয়েছে বেদীর উপর। মাঝখানে বসানো হয়েছে ঘি আটা চিনি আর মেওয়া দিয়ে বানানো মস্ত বড় লোটটা। অনেকগুলো রক্তকরবী ফুল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে চার পাশে। গুলমহম্মদের ধূপ-বাতিগুলোও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোমবাতিগুলোও বসানো হয়েছে বেদীর চতুর্দিকে, এখনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয় নি। রূপলাল আর সুখলাল তখনও কি করছে বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে।

আমরা বেদীর সামনে জোড়হাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। বার বার নজর করে দেখবার চেষ্টা করছি কি আছে বেদীর ওধারে। আরও কতদূর যাওয়া যায় ঐ অন্ধকারের মধ্যে? বেদীর পিছনের ঐ অন্ধকারের মধ্যেই কি জ্যোতির্দর্শন হবে? চোখের পলক পড়ছে না, রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছি—কখন জ্যোতির্দর্শন হবে।

অনেকক্ষণ ঐ ভাবে কাটাল। হঠাৎ কানে গেল, "বাচ্চা, এখন সময় হয়েছে।"

শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কে বললে ও কথা? কিসের সময় হয়েছে? কি হবে এবার?

বেদীর উপর থেকে রূপলাল প্রদীপটা তুলে নিল। প্রদীপ হাতে আমাদের সামনে দিয়ে বাঁ দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। এবার কানে এল রূপলালের গলার স্বর—

"প্রথমে আসুন স্বামীজী মহারাজ। আপনি এই দলের মোহন্ত। আপনাকেই সর্বপ্রথম যেতে হবে মায়ের গুহার মধ্যে।"

এগিয়ে গেলাম রূপলালের কাছে। ভৈরবীও এসে পাশে দাঁড়ালেন।

হাতের প্রদীপটা রূপলাল নীচু করে ধরলে। তখন চোখে পড়ল প্রদীপের পিছনে দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট গহ্বর।

সেই গহ্বরের মুখে প্রদীপ ধরে রূপলাল বললে—"এই হচ্ছে মা হিংলাজের গুহা। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে এই গুহার মধ্যে। এই গুহার এধারে একটা মুখ, আর একটা মুখ বেদীর ওপাশে। এই গুহার উপরেই বেদী, মায়ের আসন। কোনও ভয় নেই, সাবধানে আস্তে আস্তে যাবেন। মাথায় যেন পাথরের ঘা না লাগে। যান, ঢুকুন এবার।"

প্রদীপটা আরও একটু নামিয়ে ধরলে রূপলাল।

সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে একবার চাইলাম। পিছন ফিরে একবার ভৈরবীর মুখের দিকেও চাইলাম। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। প্রদীপ শিখাটার দিকে চেয়ে রইলাম। আবার কানে এল রূপলালের গলা—

"যান, চলে যান এবার। মাকে দর্শন করে আসুন।"

'মাকে দর্শন করে আসুন' কথাটা শুনে সর্বশরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের মুখখানি সেই আধ হাত চওড়া লাল পাড় শাড়ির ঘোমটা, কপালে ডগডগে সিন্দুরের ফোঁটা, একমুখ পানদোক্তা সুদ্ধ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, আমার মায়ের সেই চোখের দৃষ্টি! আমার দিকে চেয়ে মা হাসছেন।

বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে গুহার মুখে। এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

বোধহয় পাঁচ মিনিটও নয়। হঠাৎ বেরিয়ে এলাম বেদীর এপাশে। প্রদীপ হাতে রূপলাল এধারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমায় সে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালে। লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। কানে এল—"যা কিছু দেখতে পেয়েছিস গুহার মধ্যে, জীবনে কখনো তা প্রকাশ করিস নি কারও কাছে। সাবধান ব্যাটা, মায়ের এ আদেশ ভুলবি না।"

আবার চমকে উঠলাম। কে বললে এ কথা? এবার কিন্তু ভুল হল না। অন্ধকারের মধ্যে নজর করে দেখতে পেলাম আমার দু-হাত দূরেই বেদীর পাশে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অঘোরী বাবা মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কালো আলখাল্লায় তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা। সাদা চুলদাড়ির জন্যে তাঁকে চেনা গেল।

রূপলাল বললে, "এবার স্পর্শ করুন মায়ের বেদী। আপনার মালা দুগাছা মায়ের বেদীর উপর দিন।"

দু-হাতে মায়ের বেদী স্পর্শ করলাম। মালা আমার নেই। সন্ন্যাসীর কিছুই থাকতে নেই যে। বেদীর উপর মাথা ঠেকিয়ে পিছিয়ে এলাম।

প্রদীপ হাতে আবার ওপাশে চলে গেল রূপলাল। এবার ভৈরবীর পালা। পাঁচ মিনিট পরে ভৈরবীও বেরিয়ে এলেন এ পাশের মুখ দিয়ে। দু-ছড়া মালা রাখলেন বেদীর উপর। তার একছড়া তুলে নিয়ে রূপলাল ভৈরবীর হাতে দিলে। বললে, "গলায় দিন মালা। এ মালা যতদিন গলায় থাকবে ততদিন মা হিংলাজের দয়ায় কোনও বিপদ-আপদ হবে না। মায়ের দয়ায় সমস্ত আশা পূর্ণ হবে।"

মালা গলায় দিয়ে কি জানি কেন ভৈরবী আমার পায়ে একটা প্রণাম করলেন।

রূপলালের গলা শোনা গেল, "কুন্তী বহিন, এস এবার।" তারপর একে একে সকলের নাম ডাকা হতে লাগল। দাঁড়িয়ে আছি প্রদীপশিখার দিকে চেয়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। প্রদীপশিখাটা আমার মধ্যে জ্বলতে আরম্ভ করল। আরও কিছুক্ষণ পরে আমি নিজেই সেই শিখার সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম। এখন আর কিছুই নেই, শুধু সেই শিখাটি। স্থির অচঞ্চল এক আঙুল উঁচু সেই শিখা। ক্রমে সেই শিখার তেজ বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে তার উজ্জ্বলতা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, যে তার দিকে চেয়েই থাকা যায় না। টপ করে চোখ বুজে ফেললাম। এবং এ জীবনের সবেচেয়ে মারাত্মক ভুল করা হল সেই চোখ বুজে ফেলা। তৎক্ষণাৎ আমি আর প্রদীপশিখা আলাদা হয়ে গেলাম। সব শেষ হয়ে গেল। আবার যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে এলাম।

ছড়িওয়ালা রূপলাল তখন বলছে, "এবার যান আপনারা, নিজের নিজের ঝোলা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ান বাইরে গিয়ে। কোনও জিনিস যেন পড়ে না থাকে। সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। হিংলাজের মোহন্ত মহারাজ এবার আপনাদের এই তীর্থের সর্বশেষ দর্শন যেটি সেটি করাবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হিংলাজের দিকে পিছন ফিরে ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে যাবেন। সাবধান, কেউ ভুলেও মায়ের স্থানের দিকে আর ফিরে চাইবেন না—"

আর একবার শেষবারের মত হিংলাজের বেদীর দিকে চাইলাম। কিছুই নেই আর সেখানে। শুধু লাল সালুর উপর রক্তকরবী ফুলগুলি ছড়ানো রয়েছে। প্রদীপটিও নেই, তার বদলে বেদীর চতুর্দিকে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলি মোমবাতি। মোমবাতির আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখা গেল সব কিছু। বেদীর উপর ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে, ত্রিশূলের পিছনেই পাথর। ঐ পাথর আর পাথর আর পাথর,—এবড়ো-খেবড়ো পাথরে চাঙ্গড়, কর্দয বীভৎস। একেবারে উঠে গেছে ছাত পর্যন্ত। মোমবাতির আলোয় সবই স্পষ্ট দেখা গেল। আর কোনও রকমে ভুল ধারণা করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আর কিছুই আশা করবার নেই এখানে। এবার জ্বলজ্যান্ত সত্যের জগতে ফিরে এলাম। মা হিংলাজের গুহার উপর ঐ বেদী। মা হিংলাজের গুহা কিন্তু চিরঅন্ধকারময়। সেই অন্ধকার জগতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেদীর উপর কপাল ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর ধাপগুলোর উপর দিয়ে নেমে এলাম আঙিনায় এবং ফেলে রেখে যাওয়া ঝোলাঝুলি আবার কাঁধে তুলে নিলাম।

"এবার সকলে চোখ তুলে চেয়ে দেখ এই পাহাড়ের চূড়ায়," বললেন অঘোরী বাবা। বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ধাপগুলোর মাথায় গুহার সামনে। মালাসুদ্ধ হাতটি উঠিয়ে আবার বললেন তিনি, "ঐ উপর দিকে চেয়ে দেখ। কি দেখছ?"

আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের মাথায়। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখছি একখানা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরখানা বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে।

"দেখছ সকলে—ভাল করে চেয়ে দেখ ঐ পাথরের গায়ে কি আঁকা আছে। ওখানে পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে চন্দ্র আর সূর্য! ভগবান রামচন্দ্র এঁকে দিয়ে গেছেন নিজ হাতে। তিনি যে এখানে এসেছিলেন তার চিহ্ন রেখে গেছেন পাহাড়ের গায়ে চন্দ্র-সূর্য এঁকে দিয়ে। ভেবে দেখ, কি করে ঐ অসম্ভব সম্ভব হল—কি করে ঐ অত উঁচুতে পাথর কেটে চন্দ্রসূর্য আঁকলেন তিনি। এ কি অন্য কারও দ্বারা সম্ভব? ঐ অসম্ভব কাজ একমাত্র ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এই পৃথিবীতে যতকাল চন্দ্রসূর্য থাকবে ততকাল এই হিংলাজ পাহাড়ের চূড়ায় আঁকা ঐ চন্দ্রসূর্যও থাকবে। আর মানুষ এখানে এসে চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে যে, এক সময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও এই তীর্থ দর্শন করতে এসেছিলেন। রাক্ষস রাবণ ছিল ব্রাহ্মণসন্তান। রাবণ বধ করে রামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। সেই পাপ থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এখানে জ্যোতির্দর্শন করে।"

অঘোরী বাবা থামলেন। আমরা আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইলাম পাহাড়ের কপালের উপর। হাঁ, আছেই ত! গোল দুটো কি যেন আঁকা রয়েছে সেখানে। আলো এসে পড়েছে তার উপর। লাল হয়ে উঠেছে সেখানটা। ভগবান রামচন্দ্রের আঁকা চন্দ্রসূর্যের গা থেকে ছটা বেরুচ্ছে। সত্যিই ভেবে পাওয়া যায় না ওখানে পৌঁছলেনই বা কি করে, আর পাহাড়ের গায়ে ছেনি দিয়ে হাতুড়ি ঠুকে ও-কাজ করলেনই বা কিসের উপর দাঁড়িয়ে। সবই সম্ভব। ভগবানের দ্বারা সবই সম্ভব। ছুঁচের গর্তে হাতী চালানো যখন সম্ভব, তখন কি না সম্ভব তাঁর দ্বারা। শুধু মানুষের বুদ্ধিবিবেচনাগুলোকে একটু ভোঁতা করে নেওয়া চাই। তা' হলেই হল। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

অঘোরী বাবা বলতে লাগলেন আর সকলে সমস্বরে আওড়াতে লাগল এক লম্বা ফিরিস্তি—আমি অমুকের ছেলে অমুকের নাতি—আমি হাব নদীর ধারে সন্ন্যাস নিয়ে তবে হিংলাজ দর্শনে যাত্রা করেছি। সে সন্ন্যাস আমি এখনও রক্ষা করছি। আমি গুরুশিষ্যের স্থানে জল দিয়েছি, চন্দ্রকূপে গিয়ে বাবার আদেশ নিয়েছি। আরও কত কি করেছি সে সব বলে শেষ করে তারপর হিংলাজের গুহায় ঢুকে মাকে দর্শন করেছি। সুতরাং আমার যাবতীয় জ্ঞাত আর অজ্ঞাত পাপ, সেই পাপেদের আর এক প্রস্থ লম্বা ফর্দ বলে তারপর বলতে হবে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের কথা—সেই সমস্ত পাপ বিলকুল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল মাতৃ দর্শনের ফলে।

অঘোরী বাবা মালাসুদ্ধ ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, "তোমাদের জয় হোক। যাও, এবার বাড়ি ফিরে যাও।"

তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা পিছন ফিরলাম। রক্তকরবীর ঝাড়ের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে ছোট ঝরনাটি পা টিপে টিপে সাবধানে পার হলাম।

মনটা ভয়ানক ভার হয়ে উঠল। কেন? এ 'কেন' র উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সব 'কেন'র উত্তর খুঁজে পেলে দুনিয়ার সব কিছুর মূল্যও কমে এই এতটুকু হয়ে যেত।

হিংলাজ দর্শন করলে আকাশগঙ্গাও দর্শন করতে হয়। ঝরনার এ পারে এসে আবার আমরা কাঁধের ঝুলি নামালাম। রূপলাল কপালে সিন্দুর দিয়ে হাতে হিংলাজের প্রসাদ দিলে সকলের—মেওয়া মিছরি নারকেল লোটের টুকরো। এবার চল সকলে আকাশগঙ্গায়। এই পাহাড় ভেঙে উঠতে হবে। এই পাহাড়ের মাথায় আকাশগঙ্গা। সেই আকাশগঙ্গার জলই নেমে আসছে ঝরনা দিয়ে। আকাশগঙ্গাও মহাতীর্থ। আকাশগঙ্গার ধারে আছে একরকমের গাছ, যার ডাল নিয়ে আসতে হবে। সে জিনিস চক্ষুরোগের মহামূল্যবান ওষুধ; আকাশগঙ্গার জল দিয়ে সেই ডাল ঘষে চোখে অঞ্জন দিলে কানাও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

তা পাক। কানাদের দৃষ্টিশক্তি ফেরাবার জন্যে আবার এখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এই পাহাড়ের মাথায় চড়বার শক্তিসামর্থ্য নেই ভৈরবীর। আকাশগঙ্গার জল নেবার মত কিছু নেইও আমাদের সঙ্গে। খামকা আর কষ্ট না করে ভৈরবী এখানে বসেই একটু বিশ্রাম করবেন, যতক্ষণ না আমরা আকাশগঙ্গা থেকে ফিরে আসি।

রূপলাল বললে, "আমরা তো আর এধার দিয়ে ফিরব না। আকাশগঙ্গা থেকে আর একটা পথ আছে অঘোর নদী পর্যন্ত। সেই পথেই আমরা নেমে যাব।"

কুন্তী বললে, "ঠিক হ্যায়। আমরাও একটু আরাম করে নিয়ে চলে যাচ্ছি নদীতে। আমরা নদী পর্যন্ত যেতে পারব, এ পথ ত সোজা চলে গেছে নদীতে। কোনও কষ্ট হবে না আমাদের।"

সুতরাং আমিও বললাম, "তবে সেই ভাল। যাও তোমরা আকাশগঙ্গায়। আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।"

রূপলাল বললে, "উঁহু—অপেক্ষা করবেন কেন আমাদের জন্যে? আপনারা যেখানে নদী পার হবেন আমরা ত সেখানে পার হব না, তার অনেক উপরে নদী পার হব। আপনারা নদী পার হয়ে অঘোরী বাবার স্থানে চলে আসবেন। আপনারা যেখানে পার হবেন নদী, সেখান থেকে নদীর উপর দিকে খানিকটা গেলেই অঘোরী বাবার স্থান। অঘোরী বাবার স্থানে আমরা আপনাদের জন্যে বসে থাকব।"

তখন ভৈরবী বারবার সাবধান করলেন, সুখলাল যেন কোথাও আছাড় টাছাড় না খায়। রূপলাল, পোপটভাই আমাদের সাবধান করলেন, সাবধানে যেন আমরা যাই, নদীটা যেন সাবধানে পার হই, আর বেশি দেরি যেন না করি।

ওরা আর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও একটু উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে মায়ের প্রসাদ খাওয়া যাবে।

আবার সেই যক্ষপুরীর ভিতর ঘুরতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এবার আর তত ভয়ঙ্কর মনে হল না দু-পাশের পাহাড়ের দৃশ্য। পথও চট করে ফুরিয়ে গেল। সামনেই অঘোর নদী। এ ঠিক সেই জায়গা যেখানে আমরা আসবার সময় নদী পার হয়েছিলাম।

এবার একটা মতলব ঠাওরানো হল যাতে কুন্তীকে আর নাকানি-চোবানি খেয়ে জল গিলতে না হয়। কুন্তী আমাদের মাঝখানে দুজনের কাঁধ ধরে ঝুলে থাকবে—সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে আমরা নদী পার হয়ে যাব। তাই হল, সুশৃঙ্খলে নদী পার হওয়া গেল। শুধু নদীর মাঝখানে আমাদের দুজনের কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে কুন্তী বারকতক চিল-চেঁচালে।

নদীর এ-পারে উঠেও জল খাওয়া হল না। নদীর জলও খুব ঘোলা। ঠিক হল অঘোরী বাবার আশ্রমে পৌছে জল খাওয়া হবে, অঘোরী বাবার আশ্রমে নিশ্চয়ই পরিষ্কার জল মিলবে। তখন চলতে আরম্ভ করলাম নদীর উজান দিকে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সূর্য পোয়াটাক পথ এগিয়ে এসেছেন।

চলছি ত চলছিই। বার বার ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি। কই, কোথাও কিছু নেই! বালির পাড় ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে আমরা সেই উঁচু পাড়ের উপর উঠলাম। নদীর জল অনেক নীচে রয়ে গেল।

সেই উঁচু বালির পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে নজর করে দেখলাম। কই, কোথাও কিছুই দেখা যায় না যে! অঘোরী বাবার আশ্রম কি তাহলে পিছনে ফেলে এলাম? হঠাৎ ভৈরবী চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঐ যে ঐ—ঐ দেখা যাচ্ছে কালো মত!" নজর করে দেখলাম—ঠিকই, একটা বালির টিলার পাশ দিয়ে কালো মত কি উঁচু হয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই অঘোরী বাবার আশ্রমের চাল। চললাম সেই দিকে এগিয়ে। তখন নদীর জলও চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগলাম, সেই কালো মত যা দেখেছিলাম তার দিকে। একবার একটা বালির টিলার মাথায় উঠি আবার নেমে যাই। আবার সামনের টিলাটার মাথায় উঠি।

বার বার মনে হতে লাগল, ঐ ত দেখা যাচ্ছে অঘোরী বাবার আশ্রমের ছাত, সামনের ঐ বালির টিলাটা পার হলেই হয়। শেষে এক সময় খেয়াল হল —তাইত, নদীর কাছ থেকে এতদূরে কি অঘোরী বাবার আশ্রম? ঐ বুড়ো মানুষ, এতদূর থেকে নদীতে যান! এতদূর থেকে মা-হিংলাজের স্থানে যাওয়া আসা করেন! এ কখনই সম্ভব নয়, আমরা অনর্থক ভুল জায়গায় ঘুরে মরছি।

কথাটা বললাম ওদের। ভৈরবীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল, কুন্তীর চোখে ফুটে উঠল ত্রাস। এই প্রথম বার কুন্তী বললে, "জল খাব।"

মাথার উপরে চেয়ে দেখলাম সূর্যদেব অনেকটা পথ পার হয়েছেন। ভৈরবী তাঁর শুকনো ঠোঁট একবার জিব দিয়ে চাটলেন। বললেন—"সেই ভাল, চলুন নদীর ধারেই ফিরে যাই। নিশ্চয়ই আমরা ফেলে চলে এসেছি অঘোরী বাবার আশ্রম। নদীর ধারে গিয়ে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।"

ফিরে চললাম আবার। আবার সেই একবার একটা বালির ঢেউএর মাথায় চড়া আবার নামা, আবার চড়া। ফিরছি ত ফিরছিই। যতবার উঠছি একটা ঢেউএর মাথায় ততবার নজর করে দেখছি নদী দেখা যায় কি না। না, দেখা যাচ্ছে না নদী। কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা

যাবে ঐ সামনের ঢেউটার মাথায় চড়লে। মনে জোর এনে আবার পা চালাচ্ছি। আবার প্রাণপণে উঠছি সামনের টিলাটার মাথায়। কপালের উপর হাত রেখে রোদটাকে আড়াল করে দেখছি—কই, কোথায় নদী? শুধু ধূ ধূ করছে বালি আর বালি। আদিগন্ত খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ খেয়াল হল হিংলাজ পাহাড়ের কথা। নদীর এ-পাড় থেকে ত-ও পাড়ের পাহাড়টাকে দেখতে পাওয়া যায়। ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে কোনও দিকে কোথাও পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই ভৈরবীর মুখের দিকে একবার চাইলাম, কুন্তীর মুখের দিকেও। ওরা রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে আমার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে। কিন্তু কি বলব আমি, বলবার আছে কি! কোনও কথা যোগাল না মুখে। একটা ঢোঁক গিলতে গেলাম। ঢোঁক গিলব কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। চোখেও ঝাপসা দেখছি, পায়ের তলা পুড়ে যাচ্ছে। আবার একবার ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কুন্তী কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে। ভৈরবী চোখ বুজে ফেলেছেন। যা হয়েছে তা আর মুখ ফুটে বলতে হল না। তিনজনেই তিনজনের বুকের ভিতর কি হচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। দ্বিতীয় বার কুন্তী উচ্চারণ করলে, "জল খাব।"

চোখ চেয়ে ভৈরবী বললেন, "জল কোথায়?" বলে রক্তবর্ণ চোখে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সজোরে নিজের মাথায় একটা ঝাঁকানি দিলাম। চোখের দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হল। দু-হাতে ওদের দুজনের হাত ধরে টান দিলাম। "চল—এগিয়ে চল আমার সঙ্গে। সামনেই নদী, নদীর ধারে না গেলে জল পাবে কোথায়?"

কুন্তীর চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। সে তৃতীয়বার উচ্চারণ করলে, "জল খাব।"

চললাম আবার ওদের দুজনকে টেনে নিয়ে।

যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি তা নিজেও জানি না। কেন যাচ্ছি তাও জানি না। তবু যাচ্ছি, কারণ না গিয়ে করবই বা কি? যতক্ষণ শক্তিতে কুলোয়, যাব। যেতে যেতে একসময় নিশ্চয়ই বালি শেষ হয়ে যাবে। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় এর শেষ আছে। সেইখান পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তিনজনেই মুখ বুজে যাচ্ছি, ওরা হাত ছাড়বার জন্যে জোর করছে না। মাঝে মাঝে শুধু ওদের হাতের টান দিতে হচ্ছে। যখন টান দিচ্ছি তখন ওরা চোখ খুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। দেখে আবার চোখ বন্ধ করে হাঁটছে! কোনও আপত্তি নেই। আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে—কিন্তু আমি এদের কোথায় টেনে নিয়ে চলেছি!

ওদের হাত ছেড়ে দিলাম। ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর্থবার কুন্তী বললে, "জল খাব।" কিন্তু এবার আর চোখ চেয়ে বললে না। কি রকম যেন জড়িয়ে গেল তার কথা।

ভৈরবী চোখ চাইলেন! চতুর্দিকে নজর করে কি দেখতে লাগলেন। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজে ফেললেন।

একটা ঢোঁক গেলবার চেষ্টা করলাম। নোনতা বিস্বাদ লাগল গলার মধ্যে। তবু গলার ভিতরটা একটু ভিজল। তখন বললাম ভৈরবীকে—"কি, হয়েছে কি আমাদের যে, এরই

মধ্যে আমরা জল জল করে এলিয়ে পড়েছি! শিবরাত্রির উপোস করে চব্বিশ ঘণ্টা জল না খেয়ে কাটাই। মহাষ্টমীর দিন কোনও কোনও বার ভোর হয়ে যায় জল খেতে। আর কাল অর্ধেক রাতে জল খেয়েছি, এখনও অর্ধেক দিন পার হল না, এর মধ্যে জল জল করে মরে যাচ্ছি? কেন, হয়েছে কি আমাদের?"

বাংলা কথা কুন্তী বুঝলে না। তবে কাজ হল। তার চোখের ঘোর কেটে গেল। ভৈরবীও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন—"তবে কোথাও একটু বসা যাক না। মিছিমিছি ঘুরে মরছি কেন রোদের মধ্যে? রোদ কমলে আবার তখন হাঁটা যাবে।"

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে?"

বললাম, "কিছুই হয় নি। এই রোদের মধ্যে অনর্থক ঘুরে ঘুরে আরও তেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে। চল কোথাও একটু বসি। রোদ পড়ুক, তখন খুঁজে দেখা যাবে কোথায় নদী।"

কুন্তী আর কিছু বললে না। তখন চললাম আবার তিনজনে, যদি কোথাও একটু ছায়া পাওয়া যায় এই আশায়।

কোথায় ছায়া? একটি গাছপালা কোথাও নেই। তবু চলেছি। মনে হচ্ছে আর খানিকটা এগোলেই হঠাৎ চোখে পড়বে নদী; তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে জল, নদীর নাম অঘোর। আবার একবার নজর করে দেখলাম, কোনও দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে না ত? পাহাড় দেখা গেলেই নদী পাওয়া যাবে। নদী বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোল দিয়ে। কোথায় পাহাড়, শুধু বালি আর রোদ, রোদ আর বালি। মাথার উপর মার্তণ্ডদেব কিছুতেই নড়লেন না।

তবুও চলেছি। অন্তিম চেষ্টায় দাঁতে দাঁত দিয়ে চলেছি। আবার ওদের দুজনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। একবার বসে পড়লে যদি আর উঠতে না পারি। যতক্ষণ চলব ততক্ষণ একটা না একটা কিছু ঘটবার আশা আছে, কোথাও না কোথাও পৌঁছবই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বসে পড়া মানে একেবারে সব শেষ। আর কিছুই আশা করবার থাকবে না। বসে পড়লে আস্তে আস্তে যেখানে গিয়ে পৌঁছব সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

একটা টিলা থেকে নামলাম। সামনেই আর একটা টিলা। জায়গাটা গর্তের মত। ছায়া আছে, ভৈরবী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানে বসে পড়লেন।

"নাঃ, আর এক পাও যাব না। অনর্থক ঘুরে মরবার কোনও মানে নেই। যতক্ষণ সূর্যাস্ত না হচ্ছে এখানেই পড়ে থাকব।"

কুন্তীর হাত ছেড়ে দিলাম। সেও বসে পড়ল। তখন ওদের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে আমিও বসে পড়লাম ওদের পাশে।...*

ছোট কৈলাসের পথে

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পাথরের দুর্গের ঘুম ভেঙ্গে ছিল তার পরের দিন সকালে। খোলা আকাশের নীচে দুর্গের পাথুরে অভ্যন্তরে ঘুমোতে পারিনি কাল সারা রাত। রাতভর চলেছিল দুর্গের বর্হিমহলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তুষার সম্প্রপাত। তুষার ধসের পর্ব সারা রাতই চলে এই সব অঞ্চলে। কেননা রাতে হিমাঙ্কের পারা নেমে যায় মাইনাস ডিগ্রিতে। পাথরের দুর্গের সিংহদ্বারে বরফের ওপর জমে বরফের স্তর। জমা স্তর ধসে ধসে পড়ে টনের পর টন, জমা বরফের ঢাল ধরে ধরে। বিকট আওয়াজ হয় বুক কাঁপান। দিগন্তের গায় প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার বুকে শব্দের স্পন্দন বৃত্তের সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

শিশিরে ভিজে গেছে জব জবে হয়ে ত্রিপলখানা। বাইরে বার হ'য়ে আসি কোনও মতে। অসম্ভব হিমেল হাওয়ার দাপট। চোখ, মুখ, কান, নাক ঠাণ্ডায় আগেই ফেটেছিল ফুটিফাটা হ'য়ে। এবার জ্বালা শুরু হয়েছে।

সকালের আলো এখনও ফোটেনি ভাল করে। পাতলা অন্ধকারের সূক্ষ্ম জাল এখনও পাতা ঘেরাটোপের মতো চারদিকে। কলকাতার রাস্তায় ট্রামবাস এতক্ষণে বার হ'য়ে গেছে। আমরা আছি সেখান থেকে ৮° মতো পশ্চিমে। জলিংকংয়ের অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ যথাক্রমে, ৩০°-২৬ উত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ৮০°-৪০ পূর্ব পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ।

মন্দির প্রান্ত ছেড়ে নেমে এলাম হ্রদের কিনারায়। সকালের জলধি বিস্তার। চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! বিস্তীর্ণ জলরাশির সবটুকু চেহারা চোখে পড়ে না। জলের ওপর এখনও রয়েছে কুয়াশার সূক্ষ্ম রূপোলি পর্দা। এখনও গুটিয়ে তোলা হয়নি। সামনের জলরাশির স্নিগ্ধ স্বচ্ছতায় চোখ দু'টো স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। সকালের মৃদু হিমেল হাওয়ায় তৈরী হচ্ছিল একরাশ ছোট ছোট ঢেউয়ের কুঁড়ি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভেসে যাওয়া একছড়া গাঁথা ফুলের মালা।

হ্রদের দু'পাশে দুর্গের দেওয়ালের মতো টানা পাঁচিল। গেরুয়া রঙের পাথর। ইহারই উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে উঠে গেছে তুষার চুম্বি রজতগিরিনিভ ঃ কৈলাস। তারই নিবিড় তুষার জটাজাল বিগলিত তুষার ঝরণা গলে গলে এসে মিশেছে হ্রদের গভীরে। পশ্চিমের পাহাড় মালা থেকে নেমে আসা বিগলিত ঝরণার সেই একই রূপ। হ্রদের কলেবর বাড়িয়ে তুলেছে। আবার উদ্বৃত্ত জল বার হয়ে যাচ্ছে হ্রদের আর এক মুখ ধরে। কুটি গঙ্গার জন্ম হয়েছে এই ভাবে ওখানে। হ্রদ যেন নদীর মাতৃ জঠর!

সামিয়ানার তলায় ফিরে আসি। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা আস্তানায় আজ আর কিন্তু নেই প্রতিদিনের সেই পথে বার হওয়ার তাগিদ, তাড়া হুড়ো। রতন সিংয়ের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। চায়ের জলগরমের টগবগানি আর ধ্যান সিংয়ের আঠা মাখার ছটফটানি।

আজ ওদেরও ছুটি। মুক্তির বুক ভরা তৃপ্তির নিশ্বাস। আগল ভাঙ্গা খাঁচা আজ শূন্য। পোর্টারেরা সকাল থেকেই দেখছি উধাও। হ্রদের চারপাশে ছোটাছুটি করছে।

বিদ্যুৎকে দেখছি চা তৈরীর উদ্যোগ পর্বে। স্বপন জারিকেন ভর্তি করে জল আনে ঝরণা থেকে। রুটি তৈরীর পাট আজ আর নেই। চা, চানাচুর দিয়েই ব্রেকফাস্ট। ড্রাই ফুডের ভাঁড়ারে টান যে এসে গেছে বেশ বুঝতে পারছিলাম।

সরোবর পরিক্রমা শুরু হ'ল। কমলদা ইতিপূর্বে পথে বেরিয়ে পড়েছেন। অসিতদাও। আজ আর পথ দেখানোর নির্দেশনামা নেই কিছু। যে যার মতো চলতে পারে, 'গো এস ইউ লাইক।'

পার্বতী সরোবরকে ডানদিকে রেখে তার বাঁ ধারের ঢাল ধরে চলতে শুরু করি। হ্রদের কিনারা ধরে মস্ত টানা পাঁচিলের মতো 'রিজের' একটানা দৌড়। এবড়ো খেবড়ো গেরুয়া রঙের বিরাট বিরাট বোল্ডার নিয়ে পাঁচিল বা রিজ। তার মাথা ধরেই চলেছি। বাঁ দিকে কৈলাসের তুষরাভরণ অঙ্গ। স্ফটিক স্বচ্ছ রূপ। সকালের সোনার রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। নীচে ডানদিকে অতল স্পর্শী পার্বতী বা জলিংকং সরোবর। সকালের অরুণ আলোর শোভন বসনে শোভিতা অপরূপা মায়ের মতো স্নেহ বিগলিতা রূপ! চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

৬ বর্গ কিলোমিটার পরিমাপের পরিসর নিয়ে সরোবরের আয়তন। দৈর্ঘে তিন কি.মি. আর প্রস্থে দু'কি.মি. এর মতো হবে আকার ও আয়তনে। তিব্বতে মানস সরোবরের পরিমাপের তুলনায় অনেক ছোট। এ যেন তার মিনি রূপ! স্বচ্ছ পান্না সবুজ জলের ছায়াবৃত্ত চোখ দু'টিকে সবুজাভ করে তুলেছিল।

পাথরের গা ধরে এগিয়ে চলেছি। রিজের মাথার অসংলগ্ন পাথরে পা ফেলছি কখনো সখনো। এভাবে চলা বেশ কষ্টকর। কেননা এখানে তো পথ বলে কিছু তৈরী হয়নি। যে যার মতো এগিয়ে চলা আর কী? সরোবরকে পরিক্রমা করা।

দু'হাতে পাথরের গা ধরে ধরে রিজের মাথা ছেড়ে নেমে পড়েছি অনেকটা সরোবরের জলের কিনারায়। অসম্ভব অসমান, অমসৃণ বোল্ডারের জড়াজড়ি। ঘেঁষাঘেঁষি স্তূপের পর স্তূপ। তারই মাথা টপকে টপকে নীচে নেমে আসা।

জলের কিনারায় নরম বালির স্তর। তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলি। হ্রদের ভেঙ্গে পড়া ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ আছড়ে পড়ছিল পাঁচিলের পাথরের গায় সব সময়। হলুদ-সাদা থোকা থোকা ফেনার পাহাড় জমে উঠছিল হ্রদের কিনারে কিনারে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল ঢেউয়ের দোলায় দোলায়। টলটলে জল কাঁচের মতো। জলের তলার বালি, নুড়ি, পাথর, কাঁকরও ওপর থেকে দেখা যায় স্পষ্ট। একটা একটা করে গোনাও যায়। নীচে নেমে জলের রঙ চোখে পড়ে। মনে হল, সবুজ রঙের গোলা যেন মেশান হয়েছে জলে। পান্না সবুজ আভা চোখে।

জলের কিনারা ধরে এগিয়ে চলি। পা বসে যায় বালিতে। পা টেনে টেনে তুলি। নরম সোনা-হলুদ মিহি বালি। কচি ফিকে সবুজ ঘাসের জমান পলেস্তারা। চাপ চাপ সরোবরের ধারে ধারে। পা দিলে পা ডুবে যায়। তুলোর মতো নরম অনুভূতি পায়ে

পায়ে। কেমন একটা মৃদু মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাই নাকে অনেকক্ষণ ধরে। বুঝতে পারিনা কিসের গন্ধ! নানা জাতের গুল্মের ছড়াছড়ি। মনে হয় এদেরই দেহজাত গন্ধ। ফুলের ফুলশয্যা যেন পাতা হয়েছে হ্রদের কিনারা ধরে। লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কমলা— যেন সব রঙ গুলে একসঙ্গে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে সব জায়গায়।

দু'চারজন পাহাড়ি রমণীকে চোখে পড়ল। স্থানীয় ওরা। সঙ্গে দুটি বাচ্চা মেয়ে। ওরা গুল্ম সংগ্রহ করছে, কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটলি তৈরী করে। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'কী করছো তোমরা এখানে'? একগাল হেসে বললো ঃ 'জড়ি বুটি চুনকে লেতা হ্যায়। শহরমে বিকেগা'।

দেখতে চাইলে পুঁটলি খুলে দেখায়। কত গাছ পালা গুল্ম সংগ্রহ করেছে সব, কত গাছের মূল, শেকড়, কন্দ। একটা মূল হাতে নিয়ে বলে উঠি ঃ 'এ টাতে কী দাওয়াই হবে?' খিল খিল করে রমণী হেসে বলল, 'দাওয়াই নেহি বনেগা সাব। ইসসে আগরবাতিকা মশল্লা বানায়া যাতা হ্যায়।' বলেই মূলটা আমার হাত থেকে নিয়ে দু'খানা করে ভেঙ্গে আমার নাকের কাছে নিয়ে এসে ধরল। সেই একই মিষ্টি মৃদু গন্ধ যা একটু আগেই এখানে চলতে চলতে পাচ্ছিলাম। সেই গন্ধই পেলাম মূলে। ধূপের মশলা হবে এ থেকে। মনে পড়ে গেল এমনই এক ধূপের মশলার গাছ পেয়েছিলাম গাড়োয়ালে রূপকুন্ড পেরিয়ে হোমকুন্ডে। আবার পেয়েছিলাম সেখান থেকে ফেরার পথে নন্দাকিনী নদীর ধারে এক পাহাড়ের গাছের গায়। জটামাংসী। ওষুধ হিসাবে এর ব্যবহার তো আছেই আয়ুর্বেদে আবার ধূপের সুগন্ধি মশলা হিসাবেও এটি একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। মনে মনে ভাবি, দুর্গম, দুস্তর, জনহীন এই রুক্ষ পাহাড়ি এলাকায় জড়ি বুটির সন্ধানে সংগ্রহে এসেছে দূর থেকে দুস্থা পাহাড়ি মহিলারা। এ তো নিছক পেটের তাগিদে!

হ্রদের বুকে ছোট ছোট ঢেউয়ের হামাগুড়ি। সকালের শির শিরে হাওয়ায় কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ভাসন্ত ছোট ছোট এক ঝাঁক জলচর পাখির দোলন তার বুকে। সাদা এক জাতের বালি হাঁস বলেই মনে হ'ল। ডানায় আড়মোড়া ভাঙ্গার কাজ। ভাসতে ভাসতে তাদের রোদ পোয়ানোও হচ্ছে বলেই মনে হ'ল। প্রকৃতির জীব-স্বাচ্ছন্দ ও সুখানুভূতির জন্য কৌশল অবলম্বন করতে ওরাও জানে। ওরাও বোঝে। পাথরের চাঙড়ের পর চাঙড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছি হ্রদের পূব দিকের তীর ধরে ধরে। শুরু করেছিলাম পশ্চিম ধার ধরেই। দু'ঘন্টা সময় লাগে অর্ধেক পরিক্রমায়। এখন শেষ হতে অনেক বাকি। এদিকের পরিক্রমণ অত কষ্টকর নয়।

রোদ উঠেছে বেশ ঝলমলিয়ে। ডান দিকে ঘাড় ফেরাতে নজরে আসে হ্রদের ওমাথায় তুষার সিংহাসনে আসীন স্ফটিক শুভ্র কৈলাসপতি। বিস্ময়ে দু'চোখ ভরে ওঠে! অভ্র-শুভ্র শিখর পুঞ্জ জটাজাল সমন্বিত। ধ্যানস্থ-সমাসীন। বিস্ময়ে, পুলকে, শঙ্কায় মন অভিভূত হয়ে যায়!

বিস্ময়ের ঘোর কাটে। মুহূর্তেই চোখে পড়ে সরোবরে ঝাঁক ঝাঁক রূপোলি মাছের চকিত পলায়ন। মাথার ওপর বিরাট দু'খানা পাখার ঝাপটানির বিকট শব্দ। মাছ শিকারী ঈগলের হঠাৎ আবির্ভাব ও চকিত প্রস্থান। মাছের ওপর প্রবল এক ছোঁ মারার আগেই

মাছের ঝাঁকের সহসা জলের তলে অন্তর্ধান। ব্যর্থতা আর হতাশা নিয়েই পক্ষীরাজকে ফিরে যেতে হয়েছিল সে যাত্রায়।

মন্দির থেকে টুং টাং ঘন্টা ধ্বনি কানে আসে। পুজো পর্বের বোধহয় সময় হয়েছে। নীচে থেকে দূরে হ্রদের মাথার ওপর পাথরের তৈরী ছোট্ট মন্দিরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন শ্বেত পদ্মের একটি কুঁড়ি। সরোবরের উত্তরে পাথরের ঢাল বেয়ে নেমেছে অসংখ্য বিগলিত তুষার ধারা। দেখলে মনে হয়, রূপোলি জরির ফিতেয় বাঁধা মেয়েদের অসংখ্য মাথার বেণী। জলধারা এসে পড়েছে হ্রদের গর্ভে। ঝুরো পাথরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে। কোনটি প্রবল ধারে। কোনটি শীর্ণাকারে। শীতে এধারা জমে যায়। জল আর থাকে না। সবই হয়ে যায় বরফ।

পরিক্রমা শেষ হ'ল। পরিক্রমণে সময় মন্দ নিল না। ঘন্টা তিনের মতো। হ্রদের গর্ভ ছেড়ে উঠে এলাম ওপরে। শোভন সিং, বাহাদুর সিংয়ের দলবল রীতি মতো রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছে মন্দিরের সামনে সমতল মতো জায়গায়। বিদ্যুতের নির্দেশ মতো আর এক রাউন্ড চা পানের সুযোগ পাওয়া গেল। গরম চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে আলাপ করি মন্দিরের সামনে পূজারীর সঙ্গে। পূজারী থাকেন নীচের এক গ্রামে। বয়স হয়েছে। তবুও রোজ দু'বেলাই এসে ঠাকুরের পুজো পাঠ, আরতি করে যান। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায়। নিয়ম মাফিক। মন্দির খুব প্রাচীন নয়। কয়েক বছর আগেই তৈরী হয়েছে। তৈরী করে দিয়েছেন কুটি গ্রামের সেই বিত্তবতী 'মহিলা উত্থান সমিতির' সহৃদয়া পরিচালিকা তিব্বতী রমণী। সাতের দশকে (১৯৭৩) মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। তার আগে সরোবরের তীরে খোলা আকাশের নীচে, দু'খানা শিলা খন্ড, কৈলাস পার্বতীর মূর্তি রূপে পূজিত হয়ে আসছিল। মন্দিরের উচ্চতা খুব বেশী নয়। আট দশ ফুটের মধ্যে হবে। মন্দিরের আঙ্গিক গঠন শৈলীর পারিপাট্য বিশেষ কিছু নেই। মোটামুটি সাদা মাটা। সামনেই লোহার গ্রীলের টানা দরজা। মাথায় দণ্ড কলস। দণ্ডে বাঁধা শ্বেত হলুদ পতাকা। হাওয়ায় পৎ পৎ করে ওড়ে। মন্দিরের অভ্যন্তরের আয়তন খুব একটা বড় নয়। আয়তকার। ষাট থেকে সত্তর বর্গফুটের মতো হবে। উত্তরের দেওয়াল ঘেঁষেই তৈরী হয়েছে পাথরের বেদি। তার ওপর হর পার্বতীর অনুপম সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্তি। নীচে নারায়ণ শিলা, গণেশ, লক্ষ্মী, গড়ুর, হনুমানজীর সিঁদুর লিপ্ত পাথরের মূর্তি স্থাপিত। ফুলপাতা, ধূপের কাঠি ইতস্ততঃ ছড়ান ছিটান রয়েছে চারিদিকে। সামান্য পূজোর তৈজস পত্র। জরির পাড় বসান লাল শালুর পোশাক আশাক। মন্দিরের একপাশে বাইরে এক গুচ্ছ পতাকা দণ্ড মাটি সংলগ্ন। ধূপ, চন্দন, ফুলের মিষ্টি সুবাসে সারা মন্দিরটি সুবাসিত। স্নিগ্ধ পবিত্রতায় মন ভরে ওঠে কেমন!

সামনে মেলার দিন আসছে শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিতে। তাই মন্দিরের কিছু অংশের সংস্কারের কাজ ও রঙচঙ করা হয়েছে নতুন করে। নীচের গ্রাম কুটি, গুঞ্জি, গার্বিয়াং ও অন্যান্য আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু তীর্থযাত্রী ও গ্রামের পুরুষ মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুব-যুবতী, শিশুরা সদলবলে আসবেন-পূজো দেবেন। মেলা বসবে মন্দিরের চত্বরে। মেলায় নানারকম পাহাড়ি পণ্যসম্ভার, কেনা বেচার দ্রব্য সামগ্রী নাকি উঠবে। মেলায় সারাদিন

নাচ হবে, গান হবে। বাজনা বাজবে। বাঁশী বাজবে। খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ, হৈ-হুল্লোড় চলবে অষ্টক্ষণ। জনমানবহীন খোলা আকাশের তলায় নীরব, নিথর পার্বত্য প্রান্তর দু'একদিনের জন্য রমরমিয়ে উঠবে। মানুষজনের কল-কোলাহল, হৈ-হল্লায় মেতে উঠবে জায়গাটা। তারপর মেলা শেষ হবে একদিন। ভাঙ্গামেলার হাট যাবে ভেঙ্গে। উৎসব শেষের স্মৃতির গন্ধটুকু লেগে থাকবে শুধু এখানে ওখানে। মেলার যাত্রীরা ফিরে আসবে একে একে যে যার মতো তাদের গ্রামে, পাড়ায়, তাদের নিত্য পরিচিত সেই গণ্ডি টুকুর মধ্যে। মেলা চত্বর খাঁ খাঁ করবে। এরপর আবার আগামী বছর আসবে। আসবে মেলার তিথি। সেই শ্রাবণী পূর্ণিমা। আবার ঢাকে পড়বে কাঠি। ফুলোট বাঁশীতে উঠবে প্যাঁ-পোঁ। আবার বসবে মেলা। আনন্দ খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠবে পাহাড়ী প্রান্তর। মানুষ জনের মনে দুলবে আবার সেদিন খুশীর দোলা।

মন্দিরে পুজো দিলাম। ধূপ জ্বাললাম। প্রাণের প্রার্থনা জানালাম। কী জানিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। হয়তো জানিয়ে ছিলাম—এযাত্রা আমাদের শুভ হোক, সফল হোক। সকলের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক।

মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। হলুদ-সোনা রোদে পুড়ে যাচ্ছিল সারা প্রান্তর। ঝকঝকিয়ে ওঠে দক্ষিণের গিরি শিখরগুলো। যেন একই সুতোয় গাঁথা এক ছড়া শিখর মালা। শিখর মণ্ডলীর সর্বোচ্চ শিখরের নাম "পার্বতী মুকুট" তুষার অলংকরণ শূন্য। রুক্ষ, নিষ্করুণ।

কৈলাস শিখর মালায় এখন তুষার প্রলেপ। রঙের ইন্দ্রধনুচ্ছটা ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ছে। রঙের বর্ণালীর ঘনঘটা। চোখ ফিরে তাকালেই চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। তুষারের পর তুষার পরত সারা অঙ্গে। রজতগিরিনিভ কান্তি যেন ধারণ করেছেন এক ছড়া শুভ্র যজ্ঞোপবীত সূত্র। দেখলেই মনে হয় কোন এক দীর্ঘ কান্তি তপস্বী দণ্ড কমণ্ডলু হাতে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রশস্ত রজত ভালদেশ শুভ্র শ্বেত চন্দনে চর্চিত। স্ফটিক অভ্র দেহে শুভ্রতার আলোকদীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সত্যিই চোখ দু'টো ভারি হয়ে ওঠে। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকি দণ্ডের পর দণ্ড। মনে হয় পৃথিবীর এই পার্থিব জীবনের যত কিছু সুখ, স্বাচ্ছন্দ, ভোগ, সম্ভোগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা লালসার উৎস মুখ যেন শুকিয়ে গেছে! কামনা, বাসনার কুটিল চিন্তার সর্পিল ফনা গুচ্ছ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে যাদুর ক্রিয়া কৌশলে! ভুলে যাই নিজেকে, নিজের সত্তাকে, নিজের অস্তিত্বকে। যেন একাকার হয়ে যাই সেই জগতে—যে জগতে চাওয়া পাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, এখানে দেনা পাওনার কোনও চাহিদা নেই।-যেখানে নেই কোনও হিসাব নিকাশের, কড়া ক্রান্তির চুল চেরা কৈফিয়ৎ।

ফিরে এসেছি ক্যাম্পে মন্থর পায়। বেলা বেশ হয়েছে। নিঃশেষ হ'য়ে আসা রেশনের অবশিষ্টাংশ চাল ডালের তৈরী খিচুড়িতে সে বেলার উদর পূর্তি। রতন সিংয়ের সেই একই ফরমূলা। মুখ পাল্টানোর কোনও নূন্যতম সুযোগও নেই। সৌভাগ্যের অবকাশ তো ছেড়েই দিলাম। তবে অলৌকিক, যাদু বা ভেল্কির ক্রিয়া করণ ও কৌশলে কিছু ঘটতে পারে কিনা বলতে পারি না। সন্দেহ আমার বদ্ধমূল ষোল আনাই।

বিকেলের শেষ। পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে জলিংকং হ্রদের তীরে এক খণ্ড পাথরের ওপর বসেছিলাম চুপচাপ। সকালের রোদে কৈলাসের মাথায় নেমে আসা উড়ো মেঘের ছায়ার ঝিলিমিলি দেখেছিলাম হ্রদের ছোটছোট ঢেউয়ের মাথায়, আবার এখন দেখছি আসন্ন অস্ত সূর্যের আলোতে সিঁদুরের ছোঁয়াচ নিস্তরঙ্গ জলের বুকে। তিব্বতে মানসের তীরে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত যদিও দেখিনি তবে আমার মনের কল্পনায় যা মনে হয়েছে, পরিধির ব্যাপ্তির তুলনায় এই জলধি সরোবর অনেক ছোট হ'লেও সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত রঙের যে জেল্লা ও জৌলুষের চিত্রপট আঁকা হয় সেখানে প্রকৃতির রঙ তুলিতে নিত্য, তা কোন অংশেই কম নয় এখানে মানসের তুলনায়।

স্বচ্ছ নীলাভ টলটলে জল। সকালে সবুজাভ চোখে ঠেকেছিল। জলের তলায় চুমকির মতো ঝিকমিক করে ছোট ছোট নুড়ি, বালি, পাথর, কাঁকর। যা মানসেও দেখা যায়। ঢেউয়ের মাথায় ছোট ছোট হংসবলাকার ঝাঁক-যেন মুঠো মুঠো শ্বেতপদ্ম। মানসের মতো সেও তো আছে এখানে দেখলাম। বিস্তৃতির তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতে পারে কিন্তু রূপের তুলনায় সে তো রূপাতীত। অপরূপের আসরে নামের তকমা খানা যদিও পিঠ ভর্ত্তি করে লেখা নেই তার বটে, তবুও তার রূপময় আসনখানি আজও অপরূপের দরবারে সুন্দর করে পাতা। পার্বতী সরোবর তাই অপরূপ—অনন্যা!

সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। দূরের আকাশে নীল সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে। ঝিকমিক করে একটির পর একটি। উদ্দাম, রুক্ষ, শীতল হাওয়ায় সরোবরের তীরে ঘাসের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়েছে। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। চুপ করে বসে থাকি তখনও আস্টে পিস্টে গরম চাদর মুড়ি দিয়ে। স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ধ্যানাসীন তপস্বী কৈলাসের তুষারাস্তীর্ণ শিখর শীর্ষে। কিছুক্ষণ আগেই সূর্যাস্ত হ'য়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশ আবীর কুমকুমের ধূলোট খেলায় মত্ত। তারই রক্তিম আভায় তখনও রঞ্জিত হয়ে আছে তুষার চুম্বিত কৈলাসের শুভ্র কপোল তল।

চোখে নামে হাজারো বিস্ময়ের ছায়া। মৌন নীরব প্রকৃতি। নিথর মূক হয়ে গেছে। দিগন্তের কোলজুড়ে অন্তহীন পর্বত মেখলা সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী দৈত্য কূলের মতো। পাহাড়ের কালো ছায়ার মালা দোলে সরোবরের জলে। কেমন যেন বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় চোখে! মনে হয় রহস্যের ইন্দ্রজাল যেন পাতা হয়েছে সারা প্রান্তর জুড়ে। রোমাঞ্চ দিয়ে মোড়া চারদিক। টান টান।

রাত নামে ধীরে। থোকা থোকা অন্ধকার জমে বসে আছে পাথরের গহ্নি অন্দরে-গহ্বরে। ওৎ পেতে। কিসের যেন শিকারের আশায়!

দূরে পাহাড়ের গায় কাদের যেন পায়ের শব্দ পাই। চমকে উঠি! সত্যিই তো পায়ের আওয়াজ। যেন ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে মনে হল। অস্ফুট কণ্ঠ ধ্বনিও সেই সঙ্গে কানে আসে। কারা আসে হিম শীতল এই অন্ধকারে রাতের বেলায়? মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র জ্বলন্ত আলোক বিন্দুও চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে টর্চের আলো। ওপর থেকে কারা যেন নীচে নেমে এল। কিন্তু এরা কারা?

সন্দেহ কেটে যায়। সব কিছুই প্রতীয়মান হয় অল্পক্ষণ পরেই। একদল যাত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। সিনলা পাসের ওদিকে থেকেই আসছে ওরা টর্চের আলোয় যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে মনে হল পাঁচ সাত জনের একটি দল কৈলাসের সিনলা হিমবাহ (৫৯৭২৬৪ মিঃ) অতিক্রম ক'রে এখান নেমে এসেছে। কৈলাস পরিক্রমা এই পথেই হয়। কৈলাসের ডানদিকে বরফ জমা পথ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে সিনলা হিমবাহে। দুর্গম, দুস্তর পথের মাথায় পা রেখে, আবার সেখান থেকে অনেকখানি পথ নীচে নেমে প্রকৃতির এক দৃষ্টি নন্দন কুসুম মালঞ্চ উপত্যকা, দরমা ভ্যালি (৩৬৪৭৪১ মিঃ) তে আসতে হয়। হিমালয়ের বুকে নয়ন লোভন যে কটি কুসুমিত উপত্যকা ভূমি আছে, দরমা ভ্যালি নাকি তাদেরই মধ্যে পড়ে। না দেখার ব্যথা মনকে নাড়া দেয়, কিন্তু না দেখার ব্যথাকে মনে মনে মেনে নিই। না মেনেই বা উপায় কী?

দরমা উপত্যকায় আছে নাকি আই.টি.বি.পি'র সুন্দর ক্যাম্পিং সাইট—বিদাং। সেখানে থাকাও যায় আবার রাত কাটানোও চলে। তবে পথ নাকি খুবই বিপজ্জনক। দিল্লীর আই. এম. এফ. ওপথে যাবার ছাড়পত্র আমাদের দিয়েছিল, কিন্তু পিথোরাগড়ের জেলা শাসক অনুমতি দেননি। তা না দিক। যাওয়া হয়ত হত, কিন্তু ওপথের কাণ্ডারী মেলেনি আমাদের। বিদ্যুৎ, অসিতদার শেষ প্রয়াসও সফল হয়নি। না হলে পরিক্রমার আবর্ত পথে আমরাও তো যেতাম দরমা উপত্যকার ফুলের বাসর ঘর ছুঁয়ে, গো, দুক্ত, সেলা গাঁয়ের মাটির গন্ধ নিতে নিতে, পঞ্চচুলীর অভ্র শিখর সুষমা চোখে নিয়ে ধৌলির কূল মাড়িয়ে মাড়িয়ে আবার সেই খেলা গ্রামে। তাওয়াঘাটের ঝুমুর ঝরনা তলায়।

মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে না যাওয়ার ব্যথায়। ব্যথা বুকে চেপে রাখি। কে বা কারা এলেন সেদিন জানতে পারিনি। জেনে ছিলাম তার পরের দিন। একজন বাঙালী সাধুও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। বাকি আর সব অবাঙালী। বাঙালী ভদ্রলোক গৈরিক বাস। হিমালয় পরিক্রমায় নাকি কাল কাটান। নাম অবিনাশ চন্দ্র মিত্র। মিরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে নয়া বাজারে আগে থাকতেন। এখন পিথোরাগড়ে। সেখানে ধরমগড় গ্রামে 'হিমদর্শন কুটির' নামে এক আশ্রম তৈরী করেছেন। সেখানেই থাকেন। আলাপ হ'ল। খুবই সাদাসিধে মানুষ। হাসি খুশীতে ভরা, সদালাপী। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ঘোরাঘুরি থেকে কী জানি কেন হিমালয়ের ওপর একটা প্রচণ্ড টান জন্মে ছিল তাঁর। সেই টানেই এই বয়েস পর্যন্ত পদচারণা করেছেন হিমালয়ের আনাচে কানাচে, পথে প্রান্তরে, প্রত্যন্তে। ফলের আশা নিয়ে কিছু করেন নি। ফল পেতেও তিনি চাননা। শুধু দু'চোখ ভরে হিমালয়ের গভীর অন্তর মণিকোঠায় তার সঞ্চিত সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্যের রূপচ্ছটা দেখার মানসই তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তাই তিনি আজও ছুটে চলেছেন হিমালয়ের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের অনুভূতির লোভে লোভে। মানস কৈলাসে তিনি গিয়েছেন কয়েকবার। শুধু বাকি ছিল এ পথে আসার। পার্বতী সরোবরের স্নেহ বিগলিত ঢল ঢল পান্না সবুজাভ রূপ আর কৈলাসপতির অভ্র মেদুর ধ্যান স্তব্ধ মহিমানিত্ব কলেবর দেখার। সে সাধটুকুও মিটিয়ে ছিলেন তিনি। এরপর চোখ দুটি বুজিয়ে আকাশের দিকে করজোড়ে মুখ তুলে রইলেন অল্পক্ষণ। মনে হল ধ্যানের অপরূপমূর্তির কল্প রূপের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলেন তিনি।

চোখ খুলতেই প্রশ্ন করেছিলাম ঃ 'অনেক তো হ'ল, এর পর কী হবে?' আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন ঃ 'এরপর কী হবে তা তিনিও জানেন না। তবে যে কটা দিন পৃথিবীতে এখনও থাকতে হবে এমন করেই কাটিয়ে দিতে চাই। এর বেশী কিছু আর চাই না। আর চাওয়ার প্রয়োজনও বা কী?' বলেই একটু হাসলেন। মনে মনে ভাবলাম ঃ সত্যি এর থেকে চাওয়া পাওয়া আর কী বা থাকতে পারে? এই তো হল অনেক।

মন্দিরের ঠিক সামনেই তাঁবু ফেলেছিল বিদ্যুৎ। আমাদের ত্রিপলের সামিয়ানার পাশেই। স্বপন, রবীন, বিদ্যুৎ ওরা তাঁবুতেই উঠেছিল। তাঁবুর নেটের জালি পর্দার মধ্যে দিয়ে আলোর রেশ এসে খানিকটা পড়েছিল মন্দিরের চাতালে। বাতির মৃদু আলো।

মন্দিরে ঠাকুরের আরতি হয়ে গেছে। বৃদ্ধ পূজারী নীচে নেমে গেছেন মন্দির বন্ধ করে। এই হাড়ভাঙ্গা শীতে দু'বেলাই তাঁকে মন্দিরে আসতে হয় পেটের তাগিদে। সামান্য কটা টাকা। সংসারের গর্ভে হারিয়ে যায়। সময় লাগেনা। দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ 'তিব্বতের কারবার বন্ধ হয়েই সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে বাবুজী। সে দিন আর বোধ হয় আসবে না।' কীই বা বলি? চুপ করেই ছিলাম।

আজ আমাদের কৈলাস বাসরে শেষ রাত্রি। যাত্রারও শেষ। আগামী কাল ফিরে যাব ফেরার পথে। যে পথে এসেছি সেই পথেই। বোধ হয় বিদ্যুৎ তাই ঘটা করে রান্না বান্না শুরু করেছে। ঘটার রান্না আর কী দিয়েই বা হবে? চাল, ডাল, আটা ছাড়া আর কীই বা আছে? কিন্তু ছিল কিছু নতুনত্ব। রতন সিং যখন এসে খবর দিল, ওদের ওখানে মাংস রান্না হচ্ছে, কানে কানে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল সংবাদের মতো। লাফিয়ে উঠেছিলাম আমরা সবাই। রান্না মাংস সত্যিই এসেছিল ক্যাম্পে অনেকখানি। আই.টি.বি.পি.-র ক্যাম্প থেকে মাংস জোগাড় করেছিল ঘোড়াওয়ালা আর রতন সিং। অনেকদিন পর মুখ বদলের ভোজ্য উপাদান জুটেছিল কপালে। কিন্তু কি হবে? মাংস দাঁতে কাটে কার সাধ্য! রবীন, স্বপন এরা দু'জনে উপাদেয় বস্তুটিকে কিছুটা কাবু করতে পেরেছিল আর আমরা বর্ষীয়ানের দল সেখানে হার মেনেছিলাম তার কাছে।

রাত অনেক হয়েছিল। আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে সবাই। মেঘের ফাটলে চাঁদের অমল স্ফটিক মুখ। আকাশের জ্যোতিস্ক পুঞ্জ উজ্জ্বল দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। পার্বতী সরোবরের মাথায় ঘন কুয়াশার চাঁদোয়া। রজতময় ধবলাধর কৈলাসের শ্রী অঙ্গে এখন শৃঙ্গারের নবীন বেশ। অপলক চোখে চেয়ে দেখি শেষ বারের মতো। নীরব নিথর কৈলাস প্রান্তর...যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। শব্দহীন, মৃত, মূকের মতন! পার্থিব চৈতন্যের যেন হয়েছে পরিসমাপ্তি। যেন পরম সমাধি!*
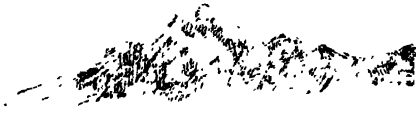
নেপাল হিমালয়ে

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরের দিন। আজ ভোরেই ঘরে সাড়া জাগে। গির্মির দিদির আজ বিশেষ সাজসজ্জা। মুখেও একটা উদ্বেগ, চাঞ্চল্য, অথচ স্নিগ্ধমধুর গাম্ভীর্যের প্রকাশ। বৃহৎ ক্রিয়াকর্মের দিনে বাড়ির গৃহিণীর চোখেমুখে যেমন ফুটে ওঠে দায়িত্বের গুরুভার, গভীর আত্মবিশ্বাস, কর্ত্রীর সহজ শান্ত প্রসন্নতা। লামা আসেন। তাঁরও আজ জমকালো ঝলমলে বেশভূষা। মাথায় চূড়াওলা টুপি। আসনে বসে পূজা শুরু করেন। সুর করে মন্ত্র পড়েন। ধূপ-দীপ জ্বালান। দীপাধার হাতে আরতির মতন বেদির সামনে বরণও করেন। পুরোহিতের মতোই বাঁ হাতে ঘণ্টাও বাজাতে থাকেন। আসনে বসেই। ঘরের একধারে একটা দামামা। কেউ গিয়ে কাঠি দিয়ে বাজান। কেউ বা একটা লম্বা শিঙা ফুঁকেন। কারও হাতে পিতলের বিশাল খঞ্জনি, একটানা ঝম্ঝম্ শব্দ তোলেন। লামা মাঝে মাঝে একটা শাঁখ দু'হাতে ধরে ফুঁ দিয়ে বাজানও। বাড়ির সকলে তো আছেনই, বাইরের লোকজনও এসেছেন কয়েকজন। সবারই সাজগোজ, আনন্দ, উন্মাদনা। গির্মির ভগিনীপতিরই কেবল বেশভূষার কোন পরিবর্তন নেই, হাবভাবেও কোন উত্তেজনা নেই। এ-যেন চারপাশে ঝোড়ো-হাওয়ায়-মাতা গাছপালা, তিনিই শুধু নিথর নিষ্পন্দ, গায়ে বাতাসই লাগে না। সকাল থেকে বেদির নিচে মেঝেতে আসন পেতে বসেন। এক মনে কি এক গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন। আরতি শেষ হয়। এবার সকলেই বেদির নিচে বসেন। লামা ঝোলা থেকে পুঁথি বার করেন। সুর করে পাঠ সুরু হয়। ভক্তিভরে সকলে শোনে। ভাবি, এ তো আমাদের সত্যনারায়ণ পূজার পাঠেরই মতন। সারা সকাল কেটে যায় এইভাবে পূজা-অনুষ্ঠানে। দুপুরও খানিক গড়িয়ে চলে। পূজাপর্বও সাঙ্গ হয়। তখন পিঠে-পুলির মতো কি সব প্রসাদ বিতরণ চলে। আমাকেও অতি স্বল্প তার কণিকামাত্র গ্রহণ করতেই হয়, মনে হয় ছাতু, মাখন, গুড় দিয়ে কোন পাক হবে। এরপর চায়ের পাট, সুরারও অঢেল পরিবেশন।

বসে বসে দেখি আর ভাবি, মাস্টার-বন্ধু এ সময়ে কাছে থাকলে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেত। দেখাই যাচ্ছে, আমাদের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে এদেরও পূজা-বিধি-আচারের সাদৃশ্য কিছু কিছু আছেই। কে কার কাছ থেকে কতোখানি নিয়েছে, অথবা একই তান্ত্রিক-ধর্ম-প্রভাবে উভয়ের বিকাশ কিনা, কে জানে? কিংবা, হয়ত দেশ-কাল-নির্বিশেষে মানুষের ভয়-ভাবনা, মতি-গতি-চিন্তাধারা খানিক একই ছাঁচের রূপ নেয়, সমভাবেই গড়ে ওঠে। এই প্রবাসে দুর্গম দূর-দেশে, ভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে বসে, এই সুস্পষ্ট যোগসূত্র মনের মধ্যে মানুষে মানুষে একাত্মতা-বোধের প্রভূত আনন্দ আনে। বঙ্গোপসাগরের-বক্ষ-থেকে-উঠে-আসা শঙ্খই কি আজ ধ্বনি তোলে হিমালয়ের গিরিশিরে? তিব্বতের চমরীপুচ্ছের চামর দুলিয়ে ব্যজন করে ভারতের মন্দিরে মন্দিরে?

এরই মধ্যে কুন্‌ডে থেকে একদিন চলি থিয়াংবোচি দেখতে।

সকালে চা খেয়ে যাত্রা শুরু। সাড়ে সাতটায়। রাত কাটাবো থিয়াংবোচিতে। পরদিন বিকেলে আবার এখানে ফেরা। থিয়াংবোচি প্রায় তেরো হাজার ফুট। ভাবি, এমন কিছুই নয়। এর চেয়ে আরও ছয় হাজার ফুটেরও উপরে রাত কেটেছে। বরফের মধ্যেও তাই, পোশাক ও শয্যা তেমন বেশি কিছু সঙ্গে রাখি না। এক রাত্রির তো ব্যাপার। খাবার ব্যবস্থাও সেই মতো চলে। গির্‌মি তো মাল বইবে না। তাই পোর্টারও একজন আসে। দেখি, 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে মুখটি বাড়ায়ে' সেই যণ্ডামার্কা গুণ্ডা আঙ দোর্‌জে। গির্‌মিকে বলি, ও কী ও বাড়ি যায় নি?—দোরজে বোধ হয় বোঝে, মুখ টিপে হাসে। গির্‌মি বলে, ঘর থেকে ঘুরে এসেছে,—পাংবোচেতে তো বাড়ি—ঐ থিয়াংবোচি ছাড়িয়েই। কতোক্ষণই বা লাগে যেতে-আসতে? শুনে ভাবি, তাই-ই তো। পথের দূরত্ব ও দুর্গমতা নির্ভর করে যে যায় তারই উপর। আমার কাছে যেটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার, ওর কাছে সেটা পাড়া-বেড়ানো।

কুন্‌ডে ছাড়িয়ে সোজা পথ। পাহাড়গুলির আবেষ্টনে বিস্তীর্ণ ময়দান। ধীরে ধীরে নিম্নমুখী পথ নেমে চলে। কুন্‌ডে গ্রাম খুম্‌লা গিরিচূড়ার আশ্রয়ে। এখানে সেই পাহাড়ের কোল বেয়ে নামা। অদূরে ঐ আমা ডাব্‌লাম-এর সূচ্যগ্র শিখর। বাহু বিস্তার করে স্থির, ধ্যানমগ্ন। আর একপাশে কাংটেগা,—সেই ঘোড়ার জিনের আকার। সকালের রোদ পড়ায় তুষারচূড়াগুলির রজতদীপ্তি। ঐ শিখরগুলির ও এ-পাশের গ্রামের মাঝখানে দুধকোশি নদীর উপত্যকার ব্যবধান।

কুন্‌ডে থেকে এগিয়ে আসতে পথের উপর ছোট ঝরনা। তারপরই মাঠের শেষে খুম্‌জুং গ্রাম। কুন্‌ডে থেকে মাত্র আধ মাইলটাক দূর। মিনিট দশও লাগে না পৌঁছুতে। কুন্‌ডের চেয়ে বড়। কুন্‌ডেতে ৪৫ ঘর লোকের বাস, এখানে ৯৩ ঘর। বাড়িগুলি দেখতে সেই একই ধরনের। অধিকাংশই দোতলা। পাথরের গাঁথনি। কাঠের কারুকার্যময় দরজা-জানলা। ঢালু ছাদ। তেমনি পাঁচিল-ঘেরা। তেমনি আলুর চাষের জমি। প্রাকৃতিক দৃশ্যও একই রকম। যেন, একই মায়ের মুখশ্রীর আদল-পাওয়া পিঠাপিঠি দুই বোন,—বয়সেই শুধু ছোট-বড়। রাস্তার বাঁদিকে গ্রাম। ডানদিকে দুটো পাহাড়ের খাঁজে একফালি লম্বা মাঠ। তারই একধারে চমৎকার একটা বাংলো। করোগেট অ্যালুমিনিয়মের তৈরি। রূপার মতো চক্‌মক্ করে। লম্বা বাড়ি। একতলা। সুমুখদিকে টানা বারান্দা। সারি সারি কাঁচ-বসানো জানলা। ঐটিই হিলারীর করে-দেওয়া খুমজুং স্কুল-ঘর। এগিয়ে দেখতে চলি। এতো সকালে স্কুল বসে নি। দরজা বন্ধ। কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে কিছু দেখা যায়। ঝকঝকে চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বই,—দেওয়ালে টাঙানো ছবি, মানচিত্র। দেখে ছোট বয়সে ফিরে গিয়ে ছাত্র হতে ইচ্ছা জাগে।

কিন্তু, এখন মন টানে থিয়াংবোচি। উৎসাহভরে সেই পথে এগিয়ে চলি। গ্রাম ছাড়বার অল্প পরেই মাঠ শেষ হয়। দুদিকের পাহাড় বাহু মেলে ঘিরে আসে। মাঝখানে পাহাড়ী ঝরনা অন্তরাল ঘটায়। কলকল শব্দে শিলাবহুল সোপানপথে নেমে চলে নিচের দিকে। জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। জলের সন্ধান ও দু'পাহাড়ের ছায়ার সুযোগ পেয়ে সবুজ গাছপালা জটলা করে ঝরনার আশপাশে ঝুঁকে পড়ে। বনের ঝোপজঙ্গল শুরু হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে পথও ত্বরিৎ গতিতে ঝরনার তালে তাল রেখে নিচে নেমে চলে দুধকোশির উপকূলে।

হুড়হুড় করে নামা। তবে, পথ সুগম। হাঁটার কষ্ট নেই। প্রাণে আনন্দই জাগে। চারিদিকের প্রাকৃতিক রূপরাশি মন মুগ্ধ করে রাখে।

সওয়া নটায় দুধকোশির তীরে পৌঁছাই। ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট লাগল। বুঝতেই পারি নি কোথা দিয়ে সময় কেটেছে।

নাম্চে থেকে সরাসরি থিয়াংবোচি যাবার পথ এইখানে এসে মেশে। অল্প গিয়েই দুধকোশি ও ইম্‌ঝাখোলার সঙ্গম। আরও সব পাহাড়ী ঝরনা নেমে আসে। জায়গার নাম ফুনগুটিংগা—Phungutinga। ১০,৮০০ ফুট্ উঁচুতে। শুনে, গির্‌মিকে বলি, তাহলে তো প্রায় দু'হাজার ফুট নেমে এলাম!

গির্‌মি হেসে দেখায়, ঐ সামনেই পাহাড়ের গা বেয়ে আবার পথ গেছে উঠে আবার প্রায়-দু-হাজার ফুট ওঠা। ঐ পাহাড়েরই মাথায় থিয়াংবোচি।

বলি, বেশ তো। তাই-ই ওঠা যাবে।

গির্‌মি জানায়, তার আগে দুপুরের খাওয়া এখানেই চুকিয়ে নেওয়া যাক।

নদীর উপর ছোট পুল। ভাঙা পুলটা মেরামত করে কাজ চালানো। ওপারে পাথরের আড়ালে জলের ধারেই রান্নার ব্যবস্থা হয়। পাশেই একটা ঝরনার বুকে জেগে-ওঠা প্রকাণ্ড একটা পাথর—ওপরটা সমতল। জল ডিঙিয়ে সেইখানে যাই। পা ছড়িয়ে বসি। জলের ছোট ছোট ঢেউগুলি সেই পাথরের চারদিক ঘিরে যেন কলহাস্যে করতালি দেয়। আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদ নেমে আসে তার তপ্তমধুর পরশ নিয়ে। পুলকভরা মনে বিশ্রাম নিই। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি নদীর কাকচক্ষু নির্মল নীল জলের দিকে।

হঠাৎ স্মরণে আসে, শের্‌পাদের এক বীভৎস বিচিত্র প্রথা। মৃতদেহের সংকার এরা করে। কিন্তু, বসন্ত রোগে মৃত্যু ঘটলে শবদেহ পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেয়—নদীগর্ভে। হিমালয়ের তুষারনিঃসৃত স্ফটিকস্বচ্ছ ঐ নদীধারা।

কেউ কি কখনো সন্দেহও করতে পারে, সেই নদীরই কোন্ উপরদেশে পাথরে হয়ত আটকে আছে বিষাক্ত গলিত শবদেহ?

শের্‌পারা অতো পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিমান, বিবেচক। তবুও এই তিব্বতীয় প্রাচীন প্রথা এখনও কেন মেনে চলে, বুঝি না।

বেলা এগারটা চল্লিশ। আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত। গির্‌মিরা বাসনপত্র মেজে গুছিয়ে বাঁধে। আমি এগিয়ে চলি। বলি, এস তোমরা। পথ তো এই একটাই?

চড়াই তো চড়াই-ই। উঠেই চলি। তবে নাক-সোজা ওঠা নয়। ডান দিকে নদী। তারই সঙ্গ ছেড়ে, পাহাড়ের অঙ্গ বেয়ে, ক্রমে ক্রমে উপরদিকে ওঠা। নদীও ক্রমশঃ নীচে দূরে সরে যায়। কদিন হয়ত কুন্‌ডের আবহাওয়ায় বাস করা ও ঘোরাফেরার ফলে এই চড়াই-পথ ধাত-সহ সহজই মনে হয়। পথের অপরূপ রমণীয়তাও মন ভুলিয়ে রাখে। দুপাশে Fir ও Birch-এর বন। পথের উপর ঠিক-দুপুরের রূপালী রোদ। তারই ওপরে গাছের ডাল-পাতার ডোরা-কাটা ছায়া। কে যেন ফুল-তোলা রেশমী চাদর বিছায় পাথর-ছড়ানো পথের গায়ে। মৃদু বাতাসে ডালপালা দোলে। মাটিতে ছায়াময় রেখাগুলি কাঁপে। দুধের

ছেলে যেন কাঁথা গায়ে মিটমিট করে দেখে। আমিও তাকাই বিস্ময়পুলকিত দৃষ্টি নিয়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে, সুমুখে পথের দিকে, যেদিকে তাকাই,—সেই শান্ত স্থির মহান্ তুষারশিখর। মনে হয়, যেন হঠাৎ-ই চলে এসেছি তাদেরই অতি নিকটে। মনে নবীন উন্মাদনা জাগে। কে যেন কাছে এসে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলে।

ভাবতে থাকি, একটু পরেই পৌছে যাব—থিয়াংবোচি! পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরি-শিখরের পাদদেশে সেই আমার কতো-কালের স্বপন-মাধুরী-মাখা স্থান।

কৈলাস-বাসিনী শিব-সীমন্তিনীর আলতা-রাঙা চরণ দুটির স্পর্শ নিয়ে, ছোট্ট আমার প্রণামটুকুই রেখে আসা,—সেই তো আমার আকাঙ্ক্ষা। সত্যই কি আজ চলি সেইখানে? দুরুদুরু বুক কাঁপে আনন্দের ভারে, যেন এসেই গেলাম এতদিনে মায়ের মন্দিরদ্বারে।

'এভারেস্ট-বিজয়-অভিযান'? নগণ্য ক্ষুদ্র-শক্তি আমার সে নয়। শুধু অসামর্থ্যের কথাই নয়, রুচিতেও আমার বাধে। যাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, হৃদয় ভরে ভালবাসি, দেবতা বলে মানি,—সেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়-গৌরব ঘোষণা,—সে যে আমার অতি ঘোর দুঃস্বপ্নেও অতীত। কেবল একটু-নিকটে-যাওয়া, নয়ন-ভরে চেয়ে দেখা, ছায়াতলে একটুখানি বসা,—এই আশাতেই বুক বেঁধে মোর আসা। সেই মুকুলিত আশা আজ ফলবতী হয়ে ওঠে।

থিয়াংবোচি,—নামটির সঙ্গে জগতের দীর্ঘদিনের পরিচয় নয়। কালের দীর্ঘতা দিয়েই সব সময়ে পরিচয়ের গভীরতার পরিমাপ চলে না। এভারেস্ট—নাম,—সেও তো হালফিলের। কিন্তু হিমালয়ের গুণগরিমা কীর্তিত হয়েছে প্রাচীন ঋষি ও মহাকবিদের মুখে। সেকালে সুপ্রসিদ্ধ শিখরের নাম শোনা যেত,—গৌরীশঙ্কর, শ্রীকৈলাস আদি। সে-নামের শিখর এখনও আছে। পরন্তু, আধুনিক কালে নিরূপিত হয়েছে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর ওগুলির কোনটিই নয়। ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যকালে হিমালয়ের পার্বত্যদেশে জরিপের মাপজোখ চলে। ১৮৪৯ সালে যে শিখরটি Peak XV—১৫ নং চূড়া চিহ্নিত হয়ে সার্ভের নথিভুক্ত হয়, কেউই তখন জানে না ভাগ্যবিধাতা তারই ললাটে জগৎ-জোড়া খ্যাতির উজ্জ্বল তিলক এঁকে রেখেছেন। এই গুপ্ত গৌরব প্রকাশিত হয় তিন বছর পরে। ১৮৫২ সাল। জরিপ-করে আনা মাপজোখের অঙ্কের হিসাবাদি করেন সার্ভের দপ্তরে বসে কর্মচারী রাধানাথ শিকদার। পুলকিত হয়ে দেখেন, শিখর ১৫ নং এর উচ্চতা—২৯,০০২ ফুট। এই-ই তো তাহলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর। প্রায় একশ' বছর পরে পুনর্গণনায় দেখা যায়, ঐ শিখরের উচ্চতা—২৯,০২৮ ফুট্। জগতের শীর্ষদেশ,—নামও তো তার একটা চাই। ১৮৫৬ সালে তাই ১৫ নং শিখরের নাম দেওয়া হয়,—মাউন্ট এভারেস্ট। সার্ জর্জ এভারেস্ট ১৮২৩ সাল থেকে ১৮৪৩ পর্যন্ত ভারতীয় জরিপ দপ্তরের সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার সর্বপ্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁরই স্মৃতিরক্ষাকল্পে। সেই নামেই এখনও এর জগতে পরিচয়। এই শিখরের উত্তর অংশ তিব্বতের অন্তর্গত। দক্ষিণ ভাগ,—নেপাল রাজ্যভুক্ত। এভারেস্টের নামকরণ যখন হয় সে সময়ে নিশ্চয়ই জানা ছিল না, তিব্বতীদের কাছে এই সু-উচ্চ চূড়া শুধু প্রসিদ্ধই নয়, তিব্বতী ভাষায় অতি মধুময় এ নামও তার

আছে—প্রাচীন কাল থেকেই। Chomolungma—চোমোলুংমা—Goddess Mother of the World—দেবী জগজ্জননী। নাম দেখে এখন সন্দেহ জাগে মনে, প্রাচীন তিব্বতীরা কি জানত, পৃথিবীর এই-ই সর্বোচ্চ শিখর?

আধুনিক কালে নেপালী ভাষাতেও এই শিখরের এক নাম দেওয়া হয়—সাগরমাথা। সসাগরা পৃথিবীর শিরোভূমি।

আকাশের কোলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভূভাগ। উর্ধ্বলোকে জগতের সীমা। পাশ্চাত্ত্য জগদ্‌বাসীর কানে সে-সংবাদ পৌঁছায়। দুঃসাহসী মানুষের প্রাণে সাড়া তোলে। কল্পনাবিলাসী স্বপ্ন দেখে। অজানাকে জানা, দুষ্প্রাপ্যকে পাওয়া, দুর্জয়কে জয় করা,—মানবদেহীর জন্মগত সাধনা। সেই অপূর্ব অপরিচিত ভয়ঙ্কর দেশ প্রবল ভাবে টানতে থাকে অসীম সাহসী মানুষের মনকে। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখাপানে যেন তারা ছুটে যায় পতঙ্গের দল। সেই সুদূর দুর্গমের রহস্যভেদের অভিযান শুরু হয়। উচ্চাভিলাষের বেদিমূলে প্রাণও হারায়। দীর্ঘ ষাট বৎসর ব্যাপী সেই স্বপ্নময় সঙ্কল্প ও জাজ্বল্যমান সাফল্যের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

যতোদূর জানা যায়, ১৮৯৩ সালে প্রথম এভারেস্ট অভিযানের প্রচেষ্টা। চার্লস ব্রুস্ ছিলেন উদ্যোক্তা। কিন্তু, যাত্রারম্ভই সম্ভব হয় না। নেপাল ও তিব্বত—দুই রাজ্যেই তখন বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ। ১৯০৭ সালে লংস্টাফ্ ও মাম্-এর সহযোগিতায় আবার ব্রুস্ যাত্রার আয়োজনের চেষ্টা করেন। সেই একই রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক বাধার সৃষ্টি করে। বিশ্বযুদ্ধ বাধে। থামেও। আবার আশার প্রদীপ জ্বলে অভিযাত্রীদের মনের কোণে। তিব্বত-সরকারের অনুমতিও মেলে এতকাল পরে। আরম্ভ হয় অভিযানের পর অভিযান। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। দুর্গম পথহীন পথে বিভীষিকাময় তুষার-রাজ্যে দুঃসাহসী মানুষ প্রাণ হারায়, তবুও অভিযানের উৎসাহ শিথিল হয় না। জগতের শীর্ষদেশ স্পর্শ করার পণ করেছে মানুষ।

এভারেস্ট-আরোহণের এ-সকল চেষ্টাই হয়, শিখরের উত্তর দিক থেকে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে। তিব্বতের মালভূমির সুদীর্ঘ চার শত মাইল অতিক্রম করে তবে পৌঁছতে হতো এভারেস্ট গিরিশ্রেণীর পাদমূলে। এর প্রায় সব অভিযানই ব্রিটিশদের আয়োজিত। তাদেরই তখন ভারতে প্রভুত্ব ও জগতে প্রতিপত্তি। তাই যেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে প্রথম পদক্ষেপ তাদেরই দাবী।

এইকালের এভারেস্ট-অভিযানের তালিকা ও ফলাফল দেখলে বিস্ময় জাগে।

১৯২১ সাল। প্রথম অভিযান। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা। সম্ভাব্য পথের সন্ধান করা,—Reconnaissance। নেতা,—চার্লস্ হাওয়ার্ড বেরি। East Rongbuk Glacier ও প্রসিদ্ধ North Col-এর (২২,৯৯০ ফুট) প্রথম আবিষ্কার। Base camp-এর পথে ডাক্তার কেলাস্ (Keilas)- এর মৃত্যু ঘটে।

১৯২২ সাল। নেতা,—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চার্লস্ ব্রুস। ২৭,৩০০ ফুট্ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। সাতজন শের্পা হিমানী-সম্প্রপাতে—avalanche-এ প্রাণ হারায়।

১৯২৪ সাল। জেনারেল ব্রুস্ এবারও নেতা মনোনীত হন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার

কারণে ই. এফ. নর্টনকে নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়। এবার ২৮,১০০ ফুট্ পর্যন্ত উঠে অভিযান শেষ হয়। দুজন পোর্টারের প্রাণনাশ ঘটে। কিন্তু আর এক কারণে এই অভিযান স্মরণীয় হয়ে থাকে। ম্যালোরি ও আর্ভিন ৬নং শেষ তাঁবু থেকে শিখর-উদ্দেশে যাত্রা করেন। চূড়ার পথে তাদের দেখাও যায়। তারপর আচম্বিতে মেঘজালে সব কিছু ঢেকে ফেলে। তাঁরাও চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হন। তাঁরা কতোদুর পৌছান, তাঁদের মৃত্যুর কারণই বা কী,—কিছুই জানা সম্ভব হয় না। জীবনের পটভূমি থেকে এভারেস্টের শিখরদেশে তাঁদের এই আকস্মিক অন্তর্ধান অভিযান-ইতিহাসে সকরুণ গৌরবোজ্জ্বল রেখা এঁকে যায়। নয় বছর পরে—১৯৩৩ সালে—এঁদেরই একজনের হাতের তুষার-কুঠার—ice-axe—প্রায় ২৭,৭০০ ফুট উচুতে দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৩৩ সালে হিউ রাট্লেজের নেতৃত্বে অভিযান। এবারও পূর্বের মতনই বিফল হয়। ২৮,১০০ ফুট্ পর্যন্তই ওঠা।

ইতিমধ্যে মানুষের অদম্য চেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলে আকাশে যাতায়াতের পথ খোলে। বিমানরথে শূন্যপথে মানুষ চলে উড়ে। ভাবতে থাকে, নাই-যদি-বা উঠতে পারি দুর্জয় ঐ গিরিচুড়ায় পায়ের চিহ্ন এঁকে, যাই না কেন, আকাশ-পথে উড়ে! বিহঙ্গের দৃষ্টি দিয়ে, উপর থেকেই দেখে আসি, কি আছে ঐ অদেখা তুষার-শিখর-দেশে।

সেই বছরই—১৯৩৩ সালে—এভারেস্টের উর্ধ্ব থেকে উড্ডীন সেই অভিযান—Houston Mount Everest Expedition। ফিরে এসে অভিযানের যে বিবরণীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তার নাম দেওয়া হয়—First over Everest (1933)। বিমানপোত থেকে তুলে-আনা এভারেস্টের আলোকচিত্রগুলি যেমনি অভিনব, তেমনি পরবর্তী অভিযাত্রীদের নিকট বহু মূল্যবানও।

১৯৩৪ সাল আসে। এক একক অসীম দুঃসাহসিক ইংরেজ—মরিস উইল্সন—সংগোপনে যাত্রা করেন দার্জিলিঙ থেকে তিব্বত-অভিমুখে। ছদ্মবেশ ধরেন তিব্বতীয়। সঙ্গে নেন তিনটি মাত্র শের্পাকে। পৌছেও যান এভারেস্টের নীচে। ৩নং তাঁবু পর্যন্ত ওঠেনও। তারপর একাই উঠতে থাকেন পাহাড়ের আরও উপরে। এই হঠকারিতার অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলে। অভিমন্যুর ব্যূহভেদের দুর্দশা ঘটে। পরের বছর সেই তাঁবুর নিকটে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর হাতে-লেখা ডায়েরি থেকে এই নিঃসঙ্গ মরণ-পণ অভিযানের এক কাহিনীও সঙ্কলিত হয়।

১৯৩৫ সালে দালাইলামার অনুমতিপত্র আসতে বিলম্ব হয়। তাই, এভারেস্ট-অঞ্চলে কেবলমাত্র reconnaissance-এর অভিযান চলে। এরিক্ সিপটন্-এর নেতৃত্বাধীনে। এই অভিযানেই সর্বপ্রথম তেনজিংকে পোর্টার দলের মধ্যে দেখা যায়।

১৯৩৬ সাল। আবার হিউ রাট্লেজকে নেতা করে যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাধার সৃষ্টি করে। পাহাড়ের উপরে বিশেষ দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

১৯৩৮ সাল। এবারের নেতা,—এইচ ডবলিউ টিলম্যান। ২৭,২০০ ফুটের কিছু উপর পর্যন্ত উঠে অভিযান ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এর পর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অভিযানও বন্ধ থাকে।

তবুও , ১৯৪২ সালে রবার্ট স্কট্ নামে এক আমেরিকান, ১৯৪৫ সালে এন্ড্রুজ নামীয় এক নিউজিল্যাণ্ডার, এবং ১৯৪৭ সালে কেনেথ্ নীল নামে এক ইংরেজ পাইলট—সকলেই প্লেনে চড়ে আকাশপথে এভারেস্টের উপরে ঘুরে আসেন।

শোনা যায়, ১৯৪২ সালে রাশিয়ান এক অভিযাত্রী দলও এভারেস্ট আরোহণের উদ্যেশে যাত্রা করেন। North Col ছাড়িয়ে প্রায় ২৭,০০০ ফুট্ উচুতে দলের সাতজনের মৃত্যু ঘটে, অভিযানও ব্যর্থ হয়।

১৯৪৭ সালে আর্ল ডেনম্যান নামে এক কেনেডিয়ান্-এর তিব্বতী বেশ ধরে, দুজন শের্পা সঙ্গী নিয়ে, তিব্বতের দিক থেকে North Col অভিমুখে একক অভিযানের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনীও প্রকাশ পায়।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। আবার নূতন অভিযানের সুযোগও আসে। ভাগ্যদেবতা এতকাল পরে যেন করুণা করে হেসে, এভারেস্ট-অভিযানের আর এক সম্পূর্ণ ভিন্নপথের দিকে ইঙ্গিত করেন। অভিযাত্রী দলের দৃষ্টি পড়ে সেই অভিমুখে।

এই সুদীর্ঘকাল নেপাল রাজ্যসীমায় বিদেশীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ক্বচিৎ কখনও দু-চারজন যাঁরা বিশেষ অনুমতি লাভ করে সেখানে কিছু ঘোরার সুযোগ পান, পর্বতারোহণের উদ্দেশ্য তাঁদের কারও ছিল না। তবুও, তখনও অজ্ঞাত-পরিচয় নেপাল রাজ্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা দু-চারখানা বই লিখে যান। যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতও স্বাধীনতা পায়। নেপাল সরকারও বিদেশীদের জন্যে রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে। এভারেস্টের দক্ষিণ দিক থেকে শিখরে উঠবার নতুন আশা অভিযাত্রীদের মনে জাগে।

১৯৫০ সালে এইচ ডবলিউ টিলম্যান আমেরিকান ক্ষুদ্র এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সেই প্রথম নেপালের মধ্য দিয়ে এভারেস্টের দিকে চলেন এবং খুম্বু অঞ্চলে পৌছান। Khumbu glacier-এর উপর দিয়ে অগ্রসরও হন। পাহাড়ের এই ধার বেয়ে শিখরে উঠবার সম্ভাব্য পথের তখনও কোন নিশানা পান না। কিন্তু এই নামচেবাজার ও থিয়াংবোচির প্রতি জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই নতুন পথের সংবাদ পেয়ে এক ডেন্ (Dane)-Klaus Becker Larsen একাই এক অভিযানে যাত্রা করেন। সঙ্গে নেন চারজন শের্পা। দার্জিলিঙ থেকে রওনা হয়ে আসেন নাম্‌চেবাজার। তারপর খুম্বু হিমবাহেও পৌছান, কিন্তু বেশিদুর যেতে না পেরে ফিরে আসেন। তবুও আশা ছাড়েন না। ভোটকোশি নদী ধরে চলেন নাংপা-লা। পাশ্ পার হয়ে বিনা অনুমতিতেই তিব্বতে প্রবেশ করেন, North Col পর্যন্তও যাওয়া হয় না। আবার দার্জিলিঙে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে— সেই ১৯৫১ সালেই—ইংলণ্ডে Alpine Club ও Royal Geographical Societyর যৌথ প্রচেষ্টায় নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট-শিখরে ওঠবার জল্পনা-কল্পনা এগিয়ে চলে। Reconnaissance অভিযানেরও আয়োজন হয়। দলনেতা হন,—এরিক্

সিপটন্। এই দলেই নিউজিল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারীকে প্রথম দেখা যায়। এই অভিযানও প্রথম এভারেস্টের দক্ষিণ দিক দিয়ে চূড়ায় উঠতে পারার সম্ভাবনার সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসে। সিপ্টনের অভিযান সম্পর্কে বিবরণ তুষাররাজ্যে এক গভীর রহস্যময় প্রাণীর অস্তিত্বের সন্ধান দেয়। সেই চাঞ্চল্যকর এখনও-অজানা-জীব ইয়েতি—Yetiর পদচিহ্ন তিনি তুষারে দেখেন, তার আলোকচিত্রও প্রকাশ করেন। Yetiর তথ্য এখনও রহস্যবৃতই থেকে গেছে। ভালুক, না হনুমান—Ape, অথবা আদিম মানুষ, কি অতিমানুষ, কিংবা অপর কোন অজ্ঞাত-জাতীয় জীব—এ রহস্যের আজও সমাধান হয় নি। এখনও কেউ স্বচক্ষে দেখেছে এমন বিশ্বস্ত লোকের সন্ধান মেলে নি। কেউ কেউ বলে, তার ভয়ঙ্কর ডাক শুনেছে গভীর রাতে। সবই লোকের-মুখে-শোনা কথা। তবুও দেখা যায় মাঝে মাঝে তুষারবুকে কাদের পদরেখা। Yeti-র রোমাঞ্চকর রহস্য ঘনীভূত করার চেষ্টা চলে। পাংবোচির মনাস্ট্রিতে সযত্নে রাখা লোম-ঢাকা এক প্রকাণ্ড মাথার খুলি—scalp–ইয়েতির বলে প্রচারিত হয়। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেন, সেটা একটা বিরাট ভালুকের। তাতে সেই scalp-ই মর্যাদা হারায়, ইয়েতির অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না।

ইয়েতির রহস্য এখনও দুর্ভেদ্য থাকলেও এভারেস্ট শিখরের সুদুর্গম গোপন অবস্থিতি এতদিনে ভাঙবার লক্ষণ দেখা দেয়।

১৯৫২ সাল। নেপাল সরকারের কাছ থেকে এ বছর সুইস্‌রা আগেভাগেই এভারেস্ট-অভিযানের অনুমতি নিয়ে রাখে। ব্রিটিশ দলের তাই নিরস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে থাকে, এতদিনের এত পরিশ্রমের, এত প্রচেষ্টার, এমন প্রাণ-মাতানো আকাঙ্খিত ফল বুঝি বা হাতের মুঠো থেকেই অপরে হরণ করে নেয়! সুইস্ অভিযাত্রী দল আসে। বছরের প্রথম দিকে নেতা থাকেন—Edouard Wyss Durant। দ্বিতীয়ার্ধে হন,—G.Chevalley। দলের শেরপাদের অধিনায়ক হয়ে চলেন,—সর্দার তেনজিং নোরগে। বিজয়লক্ষী জয়মাল্য হাতে প্রসন্নবদনে এগিয়ে আসেন। কিন্তু নিকটে এসে সহসা মুখ ফিরিয়ে চলে যান। শিখরদেশের মাত্র আটশ ফুট নিচে পৌছে অভিযান ব্যর্থ হয়। এ-অভিযানের উর্ধ্বতম সীমা—প্রায় ২৮,২০০ ফুটে তেনজিং ও Raymond Lambert পৌছান। সেই বছর শের্পা সিংমা দোর্‌জে avalanche-এ প্রাণ হারান।

পরের বছর। ১৯৫৩ সাল। স্বয়ম্ভর সভার জয়মাল্য শোভা পায় ব্রিটিশ অভিয়াত্রী দলের কণ্ঠে। দলপতি,—কর্ণেল জন হান্ট। ২৯শে মে, ১৯৫৩। হিলারী ও তেনজিং জগতের শীর্ষদেশে—এভারেস্ট গিরিশিরে—সর্বপ্রথম মানুষের পদচিহ্ন রাখেন। চোমোলুংমা—Goddess Mother of the World– দেবী জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ তেনজিং চকোলেট, বিস্কুট ও মিষ্টান্নের নৈবেদ্যও উৎসর্গ করেন।

এর পর একে একে কতো বিজয়ী দলই দেশ-দেশান্তর থেকে আসে। এভারেস্ট-শিখরে সদর্পে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালে সুইস্‌রা। ১৯৬৩ সালে আমেরিকানরা। ১৯৬৫-সালে ভারতীয় দল।

চীনদেশও দাবী করে, ১৯৬০ সালে তিব্বতের দিক থেকে তাদেরও নাকি এক অভিযান শিখরে উঠতে সমর্থ হয়।

জড়জগতে মানুষের চোখে এভারেস্ট-শৃঙ্গ বিজিত হয়, ঠিকই। কিন্তু প্রকৃতই কি হিমালয়ের গিরিচূড়ার মহান্ গৌরব কিছুমাত্রও তাতে খর্ব হয়? নির্লিপ্ত, সমাহিত, শান্ত, সুন্দর তুষারশিখর তেমনি সমভাবে ধ্যানসমাসীন থাকেন। মন্দির ভাঙে। দেবতা চিরবিরাজ করেন।

এই-সব কথাই মনে ওঠে থিয়াংবোচির পথে উঠতে।

১৯৫০ সাল থেকে প্রতি অভিযান-বিবরণীতে এই থিয়াংবোচির কথা। এভারেস্টের ঐ যেন তোরণদ্বার। সেই থিয়াংবোচিতেই আমিও আজ চলেছি!—চলেছি তো নয়। বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখি, এ কী! এসে গেছি!—এই তো পথের শেষ। ১টা ১০ মিনিট। নদীতীর থেকে মাত্র দেড় ঘন্টা চলা। পাহাড়ের সমতল মাথা। কয়েক শত হাত দূরেই থিয়াংবোচি মনাষ্ট্রি! কতো ছবি তার দেখেছি মুগ্ধ তৃষিত নয়নে। আজ ছায়াময় মিথ্যা স্বপ্ন নয়, অলীক কল্পনাও নয়। প্রকৃতির পটভূমিতে সেই মনাষ্ট্রি জীবন্ত সত্যরূপে চোখের সামনে বিরাজ করে। সেই চতুষ্কোণ দ্বিতল মঠমঞ্জিল। সেই পাথর-গাঁথা গৈরিকবরণ গৃহপ্রাচীর। কারুকার্যময় কাষ্ঠগবাক্ষ। ঢালু ছাদে চেরা-পাইন-কাঠের আচ্ছাদন। তারই উপর চারকোণা চূড়ার গড়ানে ছোট ছাউনি। ঝক্ঝক্ করে মাথার ওপরে পিতলের কলস-চূড়া মুকুটখানি। যে-পাশ থেকেই ঘুরে ঘুরে মন্দিরটিকে দেখা যায়, মনাষ্ট্রির পিছনে অদূরে ফুটে ওঠে আকাশ-জোড়া সাদা ধবধবে বরফ-শিখর। মনে হয় এত নিকটে, যেন মাথার উপরই ঝোলে। পূর্বদিকে আকাশ ফুঁড়ে মাথা তুলে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতন Ama Dablam (২২,৪৯৪ ফুট)। দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে Tamserku (২১,৭৩০ ফুট) ও তারই পাশে Kangtega (২২,৩৪০ ফুট)। দেখে ভাবি, আকাশে তো নয়, এ যেন একেবারে পাশে এসেই দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে বুঝি বা ছোঁওয়াই যায়। থিয়াংবোচির সব চেয়ে নিকটে। তাই, দেখায়ও সব চেয়ে বিরাট। দক্ষিণ-পশ্চিমে Kwangde শিখর (২০,৩০০ ফুট)। উত্তর দিকে Tawache-এর তুষার-চূড়ার বিশাল বিস্তার (২১,৪৬৫ফুট)। Tawache ও Ama Dablam-এর মধ্যবর্তী দিগন্তও তুষার-আবৃত। সেখানে দূরে Lhotse (২৭,৮৯০ ফুট) ও Nuptse এর (২৫,৮৫০ ফুট) প্রাচীরবেষ্টনীর অন্তরালে এভারেস্ট শিখরের উর্ধ্বাংশও দেখা যায়(২৯,০২৮ ফুট)। এ যেন চারিপাশে তুষারমৌলি শুভ্রবেশ দেবর্ষিদের সমাবেশ। তারই মাঝখানে নৈবেদ্য ও ফুলের ডালি মাথায় এই থিয়াংবোচির শ্যামল-কচি গিরিশিশু। মনাষ্ট্রির চূড়া,—ঐ সাজির উপর সাজানো স্বর্ণচাপা।

স্তব্ধ হয়ে দেখি। এ কী স্বপ্নলোক! নৈসর্গিক সৌন্দর্য এতো সুমহান হতে পারে,—এ যে কল্পনারও অতীত।

ভ্রাম্যমাণের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় যে ভাষাতীত-সুন্দর স্থানগুলি আমার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়,—থিয়াংবোচির পারিপার্শ্বিক দৃশ্য তারই মধ্যমণি,—নিঃসন্দেহ।

মনে পড়ে, এভারেস্টের প্রথম বিজয়ী অভিযানের নেতা John Hunt-এর মন্তব্য—Thyangboche 'provides a grandstand beyond comparison for the finest mountain scenery that I have ever seen, whether in the Himalaya or elsewhere.'

ভাবি জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মঞ্চ থেকে হিমালয়ের এই শোভা দেখবার আজ আমারও সৌভাগ্য হয়।

নিচে পথ থেকে গিরমিদের স্বর শোনা যায়। সেই হাসি, সেই গল্প। দেখতে দেখতে পথের বাঁক ঘুরে দুজনে হাজির হয়। এগিয়ে নিয়ে চলে মঠের দিকে। গ্রামের মুখে পথের উপর ডাগোবা। গ্রাম ঠিক নয়। মঠ ও মন্দির ঘিরে কাঠের ও পাথরের খানকয়েক ঘরবাড়ি। সেদিকে যাবার আগে ডানপাশে প্রকাণ্ড লম্বা ময়দান। ফুটবল খেলার বড় মাঠের মতন। একধারে মাঠ, অপর পাশে জঙ্গলের ধারে নতুন-তৈরি একটা লম্বা ঘর। তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। গির্মি বলে, ওটা স্কুলবাড়ি হচ্ছে। মিস্টার দয়াল সরকারী বড় অফিসার ছিলেন, একবার ঘুরতে যান সেই যেখানে এভারেস্ট অভিযানের মূল-শিবির—'বেস ক্যাম্প' পড়ে—বরফের ওপর,—সেইখানে। হঠাৎ সেইখানেই মারাও যান। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে ঐ ঘর তৈরি হচ্ছে।

মাঠের শেষপ্রান্তে আর একটা লম্বা রঙ্চঙে কাঠের বাড়ি—Timber hut। সেও নতুন। ঝক্ঝক্ করে। কাঁচ-বসানো দেওয়াল। রোদ পড়ে আলো ঠিকরে আসে। যেন, শীতের দেশে উষ্ণ-মধুর-পরশ-ভরা সাদর আহ্বান জানায়। গিরমির কাছে শুনি এ-ও নতুন তৈরি। মঠের অতিথিসদন। বিভিন্ন এভারেস্ট অভিযাত্রীদলের অর্থদান থেকে প্রধান লামা তৈরি করিয়েছেন। সেইদিকেই প্রথমে এগিয়ে চলি। ভাবি, এই বাড়িতেই আজ রাত কাটাব। যেমন সুন্দর দেখতে ঘরখানি, তেমনি তার অবস্থান। বাড়ির অপর দিকে পাহাড়ের ঢালু গা নেমে যায়। প্রায় হাজারখানেক ফুট নিচে ইমজাখোলার উপত্যকা। দুপাশের পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গভীর খাদ কেটে ক্ষীণকায়া নদীর ধারা সোজা নেমে আসে। ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপে রেশমী ফিতার মতো। সেই উপত্যকার শেষপ্রান্তে অদূরে বিশাল তুষারপ্রাচীর। ডানদিকে Lhotse চূড়া (২৭,৮৯০ ফুট), বাঁ দিকে Nuptse (২৫,৮৫০ফুট), তারও বাঁদিকে Cho-Oyu (২৬,৭৫০ ফুট)। লোট্সে ও নাপ্‌টসের মাঝখানে মাউন্ট এভারেস্ট শিখর (২৯,০২৮ ফুট)। এই বাড়ি থেকে কাক-ওড়া পথে মাত্র মাইল দশেক, শুনি। দাঁড়িয়ে দেখি। ঐ সেই জগতের সর্বোচ্চ শিখর। এতো কাছে! তবু মনে হয়, কতো দূর। তার কারণ নাপ্টসের স্কন্ধদেশ থেকে নেমে আসে এক দীর্ঘ প্রলম্বিত বাহু—তুষারবৃত arete। লোট্স্-এর অভিমুখে প্রসারিত হয়ে সংযুক্ত থাকে। ফলে এভারেস্টের মতো অতো উচু পাহাড়ও অনেকখানি অন্তরালে থাকে, সেই গিরিশৃঙ্গের বোধ করি হাজার দেড়েক ফুট অংশ মাত্র দেখা যায়। এ যেন ভক্তবৃন্দে-ঘিরে রাখা এক মহাপুরুষ। কাছে এসেও বেষ্টনীর বাহির থেকে একটুখানি দেখা। তবুও নয়নভরে দেখি। শিখরের মাথায় এপাশে তুষার কম। নাপ্ট্সে-লোট্স্-এর অঙ্গভরা তুষার-সজ্জা। কিন্তু মসৃণ নয়। বরফের উপর থেকে নিচে যেন ধারালো ছুরি চালিয়ে পাশাপাশি খাঁজ কেটে দেওয়া। দুই পাহাড়ের মধ্যিখানে এভারেস্টের গম্বুজ আকার শিখর,—দেখেই মনে পড়ে তিব্বতে ডিরিফুগুম্ফা থেকে দেখা শ্রীকৈলাসের সেই অপূর্ব রূপমহিমার কথা। এখানেও তেমনি সুমুখের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উন্নতশির,—কিন্তু কৈলাসের মতো ঠিক শিবলিঙ্গাকৃতি নয় অনেকটা পিরামিড্-আকার।

গির্‌মি চমক ভাঙায়। বলে, চলুন, এখন মনাষ্ট্রি দেখতে,—আবার পরে এখানে আসবেন, যতক্ষণ খুশি এভারেস্ট দেখবেন। সারাদিনই তো এখন পড়ে। সবার আগে প্রধান লামার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাও দরকার।

সেইমত যাওয়াও হয়।

মনাষ্ট্রির প্রবেশদ্বারের সুমুখে রাস্তার উল্‌টা দিকে সারি কয়টা কাঠের ঘর। তারই একটার সামনে গিয়ে গির্‌মি দাঁড়ায়। বন্ধ কাঠের দরজায় টোকা মেরে মৃদু শব্দ করে। এক লামা বেরিয়ে আসেন। কথা বলার ভাবে বোঝা যায় গির্‌মির সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয়। তিনি ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসেন আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান।

ছোট ঘর। আসবাবপত্রে ভরা। তবু সাজানো-গোছানো। তিব্বতী দামী কার্পেট বিছানো। দেওয়াল-ভরতি তিব্বতী দেবদেবীর ছবি, টঙ্কা ঝোলানো। একটা ছোট পুরু-গদিওয়ালা চৌকি। তারই উপর কার্পেট পাতা,—সেইখানে বেশ আরামে পা মুড়ে বসে এক তিব্বতী ভদ্রব্যক্তি। গায়ে মোটা পশমী দামী কোট। মাথায় কান-ঢাকা পশমী টুপি। শুধু মুখটুকু দেখা যায়। ফরসা রঙ। কিন্তু কেমন যেন ফ্যাকাসে। চৌকির পাশেই একটা লোহার আঙটা। তাতে গনগনে আগুন জ্বলে। তারই রক্তিম আভা মুখের উপর পড়ে। পাংশু বর্ণ আরও বিবর্ণ দেখায়। বসা চোখ-মুখ। দু চোখের নিচে কালো রেখা সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। পরস্পরে অভিবাদন করি। হিন্দী জানেন, ইংরেজিও বোঝেন, অল্পস্বল্প বলতেও পারেন।

থিয়াংবোচির প্রধান লামার ভাই। অসুস্থ দেহ, দেখেই বোঝা যায়। থেকে থেকে কাশছেন। হাতের পাশেই পিকদানি। শ্লেষ্মা উঠলেই ফেলছেন। নিজেই জানান, চিকিৎসার জন্যে কিছুকাল দার্জিলিঙ-এ ছিলেন। রোগের কিছু উপশম হলেও সারেনি। দেখে ভাবি, এমন রুগ্ন দেহে এতো শীতের দেশে আছেনই বা কেন? তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। তিনি ছাড়েন না। অনুরোধ করেন, বসুন, কতোদূর থেকে এসেছেন আমাদের এই দুর্গম দেশে। চা খেয়ে চলুন আপনাকে মনাষ্ট্রি দেখিয়ে নিয়ে আসি। প্রধান লামা এখন এখানে নেই।

বিব্রত বোধ করি। বলি, জানি। পথে আসতে তাঁর দর্শন পেয়েছি। আপনি কষ্ট করবেন না, বিশ্রাম নিন। গির্‌মি রয়েছে, লামাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে সব ঘুরে দেখে নেব।

তিনি মানতে চান না। বলেন, আমার অসুখের কথা ভাবছেন? ও আমার এখন নিত্যসঙ্গী। ওর জন্যে আর ভাবনা করি না—কথা বলতে বলতে কাশি আসে। শ্লেষ্মা ফেলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছেন। হাঁফাতে থাকেন।

তবু আমাকে ছাড়েন না। বলেন, উঠবেন না এখনি। আমিও যাব আপনার সঙ্গে মনাষ্ট্রিতে। ঘোরাফেরা আমি করি,—এ কাশি আমার ঘুরে বেড়ালেও হবে, শুয়ে থাকলেও থাকবে।—বলে উজ্জ্বল নয়নে তাকান। পাণ্ডুর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে ওঠে। যেন বর্ষার মেঘ-ভরা আকাশে একটু রোদের আভা দেখা দেয়। অনুকম্পায় মন আমার ভরে ওঠে।

ভাবি, কী বিচিত্র এই জগৎ! ঘরের বাইরে প্রকৃতির ঐ নয়নভুলানো শান্ত শোভা—দেহ-মন সুস্নিগ্ধ করে। আর কঁহাত দূরেই এই ঘরের মধ্যে মানুষের সেই চিরন্তন রোগভোগ,—দেহধারণের অনির্বাণ জ্বালাযন্ত্রণা। নিঃসঙ্গ রোগশয্যার পাশে ক্ষণিক সঙ্গলাভের কামনা।

স্থির হয়ে বসি। কাপে করে চা আসে। নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করি। মঠের প্রসঙ্গ তুলি। দেখি, উৎসাহ পান। সোজা হয়ে বসেন। বলেন, খুম্বুতে মঠ তৈরির ইতিহাস জানেন? বিশেষ করে এই থিয়াংবোচি মনাষ্ট্রির?—আবার কাশি দেখা দেয়।

দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বলি, আপনার বেশি কথা বলা ঠিক হবে না।

তিনি দম নিয়ে বলেন, ভাববেন না এর জন্যে। ও আমার সয়ে গেছে, কথা বলতে বলতে ও-রকম একটু হবে,—তা হোক। শুনুন মনাষ্ট্রি গড়ার ইতিহাসটা বলি। খুম্বু অঞ্চলের প্রথম মঠ প্রতিষ্ঠা হয় পাংবোচিতে। বাইরে মাঠের শেষে যে নতুন অতিথিশালার ঘর হয়েছে, সেখান থেকে এভারেস্টের দিকে তাকালে সামনে দেখবেন ইম্‌জাখোলা নদী—তারই ধারে সেই পাংবোচির গ্রামও দেখা যায়।

বলি, এইমাত্র সেখান থেকে এভারেস্ট দেখে এলাম,—ইম্‌জাখোলার পাশে বনের ধারে পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক ঘরও দেখা যাচ্ছিল বটে—

তিনি বলেন ঐ পাংবোচি। ঐখানেই এদিককার প্রথম মঠ। কয়েক'শ বছর আগে লামা সঙ্ঘ দোর্‌জে প্রতিষ্ঠা করেন। খুম্বুতে তাকে Patron Saint বলে মানা হয়। তাঁর সম্বন্ধে নানান্ রকম অলৌকিক কাহিনীর প্রচার আছে। তিনিই শের্‌পাদের গৃহদেবতা বলতে পারেন। পাংবোচির সেই মঠ-প্রতিষ্ঠার অনেক পরে এখানকার অন্যান্য গ্রামে মঠস্থাপনা হয়। তার মধ্যে এই থিয়াংবোচির মঠ এখন সুপ্রসিদ্ধ। অথচ এখানে মন্দির তোলা হয়—মাত্র ১৯২৩ সালে। তার কাহিনী বলছি।

আবার কাশেন। শ্লেষ্মা ফেলেন। দম নেন। ধীরে ধীরে আরম্ভ করেন, এর প্রতিষ্ঠা করেন গুলুলামা। কুনডে থেকে এখানে আসার সময় যে খুমজুং গ্রাম পেলেন, তিনি ছিলেন সেখানকার বাসিন্দা। ধনী শের্‌পা বংশে তাঁর জন্ম। যদিও আশৈশব তাঁর ধর্মমুখী মন, তবুও বাপ-মায়ের ইচ্ছানুসারে তাঁকে সংসারী হতে হয়। সন্তান-সন্ততিও জন্মায়। সংসারে থেকেই ধর্মানুচরণ করেন। তারপরে স্ত্রীবিয়োগ হতে পূর্ণ ধর্মজীবন অবলম্বন করলেন। চলে গেলেন তিব্বতে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের উদ্দেশে। নিজ গ্রামে—খুমজুং এ আবার যখন ফিরে এলেন তখন আচারনিষ্ঠ কঠোরব্রতী লামা। গ্রামে থাকেন না। পাহাড়ের ওপরে গুহার মধ্যে একান্তে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। ক্রমে তাঁর বিপুল খ্যাতি রটে, অনেক শিষ্যভক্তও হয়। কিছুকাল পরে তিব্বতের প্রসিদ্ধ মনাষ্ট্রি—রোংফু (Rongphu) —নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?—তিনি থেমে আবার একটু কাশেন। আমিও তাঁকে অল্প বিরাম দেবার উদ্দেশ্যে বলি, হ্যাঁ, জানি বইকি ও-নাম। তবে অনেক বইয়ে নামটা রোংবুক (Rongbuk) বলে দেখি,—হয়তো উচ্চারণটা ইংরেজিতে লিখতে গেলে ঐধরনের হয়ে যায়।

আগে যখন সব এভারেস্ট-অভিযান যেত তিব্বতের মধ্যে দিয়ে এভারেস্টের উত্তর দিক থেকে,—সেইখানে এভারেস্টের ঠিক নিচেই ঐ মনাষ্ট্রি। ওদিকের সব অভিযানই শুরু হতো সেখানকার প্রধান লামার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে। তাঁর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়েছি সেই সব অভিযান-কাহিনীতে।

একটু সুস্থ হয়ে লামার ভাই বলেন, হ্যাঁ তাঁর কথাই বলছি। সেই রোংফু গুম্ফার প্রধান লামাই গুলুলামাকে উৎসাহ দেন এই অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা করতে। গুলুলামা খুমজুং থেকে এসে এই থিয়াংবোচিতে স্থান মনোনয়ন করেন। দেখছেনই তো কী মনোরম জায়গা! দুধকোশি থেকে উঠে পাহাড়ের মাথায় এমন সমতলভূমি, চারিদিকে তুষারশিখর। ভক্তদের জানিয়ে দেন, এইখানে মঠস্থাপনা হবে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে শের্‌পারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শ্রমদান করে। অর্থেরও অভাব হয় না। দেখতে দেখতে মঠও গড়ে ওঠে। গুলুলামা তাঁর ভাইপো ও তিনজন খুমজুং-এর বাসিন্দাদের নিয়ে আশ্রম চালানো শুরু করেন। দশ বছরের মধ্যেই সাধুসংখ্যা হয় ২৫। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই মঠের ধর্মীয় জীবনধারার খ্যাতি। শের্‌পাদের এ-অঞ্চলের প্রধান ধর্মকেন্দ্র বলে স্বীকৃতিও পায়। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনা। ১৯৩৪ সালের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই মূল মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গুলুলামার তখন বয়স ৮৫ বছর। এই নিদারুণ দুর্ঘটনা সেই মহাতাপস লামার মনেও গভীর আঘাত হানে। কয়েকদিন পরেই তাঁরও দেহাবসান হয়। সেই ভগ্নস্তূপের মাঝে যেখানে মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠ ছিল, সেইখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়।*

অন্নপূর্ণার পথে

কালিদাস চক্রবর্তী

৩১শে অক্টোবর। উষালাগে নমস্তে লজে ঘুম ভাঙ্গে। গুরুজীকে স্মরণ করে বাইরে আসি।

লজে টয়লেটের ব্যবস্থা বেশ ভালই। একে একে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিই। হোটেলের রন্ধনশালায় চায়ের অর্ডার দিই। চেত ও লাল ঘরে এসে মালপত্র বেঁধে নেয়।

কোয়ার্টারমাষ্টার ঘরের ভাড়া ও চায়ের দাম মিটিয়ে দেয়। চা-পান করে যাত্রা করি। সকাল ৭-৩০ মিনিট।

বিদায় লেতে। লজের ঠিক সামনে "লেতে খোলা"। কালীগণ্ডকীর উপনদী। ঝোলাপুল পেরিয়ে ওপারে যাই।

পুল পেরিয়ে বাঁহাতি রাস্তা। রাস্তার চেহারা মোটেই ভাল নয়। কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল পথ। পথ বেশ চড়াই। গভীর জঙ্গলের পথ। মাঝে মাঝে জলের ধারা রাস্তা ভিজিয়ে পার হয়। সাবধানে ধারাগুলি অতিক্রম করি।

সকাল থেকে কালীগণ্ডকীর দেখা নেই, গভীর জঙ্গল তাকে আড়াল করে। বাঁহাতে আপন মনে অনেক নীচ দিয়ে সে বয়ে চলে।

জঙ্গল পেরিয়ে সামান্য উৎরাই পথে ছোট্ট একটি গ্রামে এসে দাঁড়াই। "কাকু-গ্রাম"। দুই একটি ঝুপড়ির বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। উৎরাই পথ, যতটা পারি এগিয়ে যাই। রাস্তা ধীরে ধীরে সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

রাস্তার দুধারেই ফসল ক্ষেত। সকাল বেলা, ২/১ জন চাষি লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নামে। পথের পাশেই ধান ক্ষেত ও ভুট্টাক্ষেত। কালীগণ্ডকীর বেলাভূমি। নিকটেই সবুজ পাহাড়।

গ্রামের নাম "ঘাসা"। সকাল ৮-৩০ মিনিট। গতকাল এখানে এসেই বিশ্রামের কথা ছিল।

গ্রামে প্রবেশ করেই বাঁ-হাতে জীবন শেষনের চায়ের দোকান ও হোটেল। দোকানের বারান্দায় টেবিল ও চেয়ার। আমরা চেয়ারে গিয়ে বসি।

সকালে প্রাতরাশ হয়নি। পেটে কিছু পড়া দরকার। কোয়ার্টারমাষ্টার ম্যাগীর অর্ডার দেয়। চা ও ম্যাগী খেয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই। পাহাড়ী পথে সবসময় কিছু খেয়ে যাত্রা করা উচিত।

ইতিমধ্যে লাল ও চেত এসে যায়। ওরাও ভাত খেয়ে নেয়। সকাল ৯টা।

ঘাসা বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের বাড়ি ঘর ও কৃষি কার্যের ব্যবস্থা দেখলেই সেটা অনুমান করা যায়। এখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা ও সমতল উপত্যকায় সবজের চাষ, সৌন্দর্যের সাথে ঘাসার আভিজাত্যও বেড়েছে অনেক গুণ। পর্যটকদের রাত্রি যাপনে হোটেল ও লজের কোন ঘাটতি নেই।

গ্রামের শেষ প্রান্তে কালীগণ্ডকী গেষ্ট-হাউস। গেষ্ট-হাউসের অঙ্গসজ্জা ও ব্যবস্থাপনা দেখে থাকতে ইচ্ছা হয়। গেষ্ট-হাউসের উল্টো দিকে খেলার মাঠ।

আহারের পর ঘাসাতে অপেক্ষা করার আর কোন যুক্তি নেই। গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের পথ। উৎরাই পথে নদীর তীরে নেমে আসি। বাঁ-হাতে কালীগণ্ডকী ডানহাতে পাহাড়। ঘাসা পিছনে পড়ে থাকে।

বেলা ১০-৩০ মিনিট। 'কাপচিপানি'। প্রকৃতির অষ্টম গর্ভের কন্যা কাপচিপানি। শ্যামলী অঙ্গে যৌবনের জোয়ার। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, বন, উপবনে ঘেরা কাপচিপানি। কাপচিপানির রূপ ও মাধুর্যে দাঁড়িয়ে পড়ি। পাহাড়ের পদপ্রান্তে গ্রামের অবস্থিতি। পায়েচলা রাস্তার পাশে হোটেল ও চায়ের দোকান। পর পর কয়েকটি ঝর্ণা কাপচিপানির দেহ সিক্ত করে। বাঁহাতে সবুজ লনে রঙিন ছাতার নীচে চেয়ার ও টেবিল, শ্বেতাঙ্গরা বসে চা-পান করে। রাস্তার ঠিক পাশেই উঁচু বাঁধানো চাতালে পোর্টাররা পিঠের বোঝা নামায়।

সামান্য এগিয়ে বাঁ-হাতে জল কল। কলের পাশে আর একটি বাঁধানো ধাপি। চেত ও লালকে দাঁড়াতে বলি। ডানহাতে কাঁচা ঘরের বারান্দায় চায়ের দোকান।

আমাদের দাঁড়াতে দেখে দোকানীর মনে আনন্দ হয়। আমরা সকলেই চা-পান করি। লাল-চা, প্রতি গ্লাস ২ টাকা। জীর্ণ দোকানে শ্বেতাঙ্গরা আসে না। আমাদের পেয়ে খুবই খুশী। দোকান থেকে থালা, চামচ, চেয়ে নিই, ছাতু মেখে পেটের খিদেটাও মিটিয়ে নিই।

আহারের পর আবার চলা শুরু। যে যার মত চলেছে। পরের গ্রাম 'রূপসী'। বেলা ১২টা। কারো দাঁড়াবার অবকাশ নেই।

সকলেই হাঁটার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। যে যতটা পারে দ্রুত পা-চালায়। উৎরাই পথ। বনময় পথে মধ্যাহ্নের তীব্রতা বিশেষ অনুভব হয় না। আনন্দে মনের দর্পণে ভেসে ওঠে—

নীলগিরি, ধৌলাগিরি,
নয় শুধু টুকুচে—
অন্নপূর্ণা, গঙ্গাপূর্ণা,
সারি সারি দাঁড়িয়ে।

মনের আনন্দে শীতের মধ্যাহ্নে পথ চলা। পথ যখন শেষ হয় না তখনই হয় বিপত্তি। থোরাং জয় ও মুক্তিনাথ দর্শনের পর হাঁটার উৎসাহ কিছুটা ভাটা পড়ে। নূতন পথ, নূতন প্রকৃতি, বিষাদের মধ্যেও উৎসাহ আনে।

দুপুর ১টা। নূতন গ্রামের চিহ্ন দেখা যায়। পাহাড়ের গা-বেয়ে পথের রেখা বেঁকে যায়। গ্রামের অনেক নীচে কালীগণ্ডকী প্রবাহিত। কালীগণ্ডকীর উভয় তীরে গ্রামের বসতি। গ্রামের নাম "দানী", কালীগণ্ডকীর বুকে জীর্ণ সেতু। পাথর সাজিয়ে সেতুর মুখ বন্ধ। উৎরাই পথে 'দানাখোলা'র তীরে নেমে আসি। 'দানাখোলা' কালীগণ্ডকীতে গিয়ে মেশে।

দানাখোলার বুকে কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে লোয়ার-দানা। সমতল পথ। পথের

দুধারে বাড়ি, মাঝে মাঝে পেয়ারা গাছ ও লেবু গাছ। বাড়ির উঠানে ধানের গোলা ও খামার-বাড়ি। গ্রামের মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি কাজ।

সামান্য এগিয়ে রাস্তার পাশে কাঠের দোতলা বাড়ি। সাইন বোর্ডে লেখা "হোটেল কাবিন" হোটেলের সামনের বারান্দায় টেবিল ও বেঞ্চ। পাশের বারান্দায় মিষ্টি রোদে এক শ্বেতাঙ্গ পর্যটক সঙ্গিণী সহ নিদ্রামগ্ন।

আমার সাথীরা সকলেই পিছিয়ে পড়েছে। আমি হোটেলের বেঞ্চ-এ গিয়ে বসি, বেলা ২-৩০ মিনিট। মিষ্টি রোদে ডাইরি খুলে বসি।

"লেতে" থেকে সারা পথটাই গ্রামের। সারা পথেই কালীগণ্ডকীর সাহচর্য মেলে। পথ বেশীটাই উৎরাই। মাঝে মাঝে বন-জঙ্গল ও ঝোলা-পুলের দোলন।

ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাস্টার এসে যায়। কোয়ার্টারমাষ্টার এসেই হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করে। সেখানে সে ন্যূডুলস্ অর্ডার দেয়। নিজের হাতেই রান্না করে। দুই মেয়ে মুন্নী ও রেখা অতিথিদের খাবার পরিবেশন করে। শ্বেতাঙ্গ অতিথি এলে তাদের কাজ বাড়ে। অনেক পদের রান্না করতে হয়। আয়ও হয় অনেক বেশী।

হোটেলের ডাইনিং হলটিও বেশ সাজানো। পরিক্রমা পথে প্রতিটি গ্রামেই এধরনের হোটেল দেখেছি। পর্যটকের অভ্যার্থনায় প্রতিটি হোটেলই স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য, পানীয় কোন কিছুরই অভাব নেই।

আহারের পর আবার যাত্রা শুরু। দানার পর থেকে উৎরাই পথ। উৎরাই পথে কালীগণ্ডকীর বালুকাবেলায় নেমে আসি।

সুবিস্তীর্ণ বালুকাময় তটভূমি। কালীগণ্ডকীর সুপ্রশস্ত সৈকতবক্ষ। বেলাভূমির এক প্রান্তে মৃদু চঞ্চলা কালীগণ্ডকী প্রবাহিত। কালীগণ্ডকী যেন কৈশোরের শেষ সীমায় উপনীত।

দূরে উচ্চ তীরভূমিতে গ্রাম দেখা যায়। জানি না কোন গ্রাম? যত নিকটে যাই গ্রামের চেহারা স্পষ্ট হয়। নদীবক্ষ থেকে পাকা বাড়ি নজরে আসে। গাছপালায় ঘেরা ঘন বসতি। বাঁ-হাতে কালীগণ্ডকীও ধীরে ধীরে চঞ্চল হয়। তার চঞ্চলতা ও উচ্ছ্বাস দেখে অবাক হই। তবে কি ঐটাই তাতোপানি?

বিকাল ৩-৩০ মিনিট। সুউচ্চ বেলাভূমি অতিক্রম করে গ্রামের সীমানায় এসে উঠি। শহরের চেহারা, লোকজন, দোকান-পাট, পথে পর্যটকের ভিড়, চারিদিকে জমজমাট— "তাতোপানি"।

যাত্রার পূর্বেই তাতোপানির নাম শুনেছি। "তাতোপানির" মূল আকর্ষণ উষ্ণ প্রস্রবণ। সানবাঁধানো কুণ্ডে স্নানের অপূর্ব ব্যবস্থা। উষ্ণ-প্রস্রবণে স্নানের আকাঙ্ক্ষায় পর্যটকরা ছুটে আসে তাতোপানিতে।

তাতোপানির বাজার, পথের দুধারে সাজানো দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা ও লজ্। পর্যটকের অভ্যার্থনার সামগ্রী থরে থরে সাজানো। মাইকে নেপালী, হিন্দি ও ইংরাজী সঙ্গীতের ঐকতান।

বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে যাই। পথের পাশে বাঁহাতে এ্যারো চিহ্ন দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের পথ নির্দেশিকা। সামান্য উপরে তাতোপানি লজ। লজের সামনে সুপ্রশস্ত সবুজ লন ও পুষ্প বাগিচা। লনে রঙিন ছাতার তলায় টেবিল ও বেঞ্চ। পর্যটকের অভ্যর্থনার আয়োজন।

তাতোপানি লজের পাশ দিয়ে সরু পথ। ঐ পথ ধরে এগিয়ে যাই। সামনেই গভীর জল স্রোত। জলস্রোতের মাঝখানে উঁচু বোল্ডার। বোল্ডারে পা দিয়ে জলস্রোত পার হই। কয়েকপা এগিয়ে চঞ্চলা কালীগণ্ডকী দৃশ্যমান।

অপূর্ব পরিবেশ। কালীগণ্ডকীর যেন যৌবনের কোঠায় প্রথম পদার্পণ তার তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের প্রথম দর্শন। একলিবাটির পর থেকে এমন প্রাণোচ্ছল রূপ একবারও দেখিনি।

সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি, বেলাভূমিতে উষ্ণ প্রস্রবণ। সানবাঁধানো গরম জলের কুণ্ড। কুণ্ডের পাশে সুসজ্জিত দুটি চায়ের দোকান। দোকানে ঠাণ্ডা ও গরম পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা। পরপারে সুউচ্চ পর্বতমালা। পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্য। পশ্চিম দিগন্তে তুষারাভরণ মানাসলু।

শ্বেতাঙ্গ পর্যটকেরা ক্লান্ত দেহখানি গরম জলে ডুবিয়ে রাখে। হাতে শীতল পানীয়। আনন্দের উল্লাসে মাঝে মাঝে পরস্পরে স্নেহ-চুম্বন করে। ভারতীয়দের নিকট সে দৃশ্য খুবই উপভোগ্য।

ভারতীয়রাও স্নানের জন্য ভিড় জমায়। পাশেই আরও দুটি উষ্ণ ধারা, সেখানেও বসে স্নান বা জামা কাপড় কাচা যায়।

চায়ের দোকানের পাশে টেন্ট পিচ করি। আজ ওরাই আমাদের প্রতিবেশী। বেলাভূমিতে আর কোন টেন্ট দেখা যায় না।

দলের সকলেই আনন্দে আত্মহারা, কেউ অপেক্ষা করতে রাজি নয়। তপ্তকুণ্ডে নামতে সকলেই উৎসুক, জামাকাপড় ছেড়ে নেমেও পড়ে।

অপরাহ্ন বেলা, পশ্চিমাকাশে দিবাকরের বিদায়ের পালা। 'মানাসলু'র বুকে অস্তায়মান রবির লুকোচুরি। শুভ্র শিখরে আবীরের আলপনা। গোধুলি বেলায় তাতোপানির কোলে প্রাণোচ্ছল পর্যটকের ভিড়, বালুকা বেলায় সানবাঁধানো তপ্তকুণ্ডে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিণীর প্রেম নিবেদন, নবযৌবনা কালীগণ্ডকীর মৃদু গর্জন, পরপারে সবুজ অরণ্যের নির্বাক দৃষ্টি বিনিময় ; এ যেন মহামিলনের মহোৎসব। প্রকৃতি আর মানুষে অভিন্ন হৃদয়, কৈলাসপতির অঙ্গনে থোরাং জয়ের বিজয়োৎসব।

এদিকে টেন্টের ভিতরটা গুছিয়ে নিই। টেন্টের সামনে পলিথিন সিট বিছিয়ে রাতের আহারের আয়োজন।

শীতের আমেজ মোটেই নেই। মনোরম আবহাওয়া, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, মোমবাতি জ্বেলে একটা পাথরে বসাই।

স্টোভ জ্বেলে কফি তৈরী করি। পথের সংগৃহীত সবজি কফি, মুলো, শালগম, বীন, টুকরো করে কেটে পলিথিন সিটে রাখি। সব মিশিয়ে প্রেসার কুকারে খিচুড়ি চাপাই।

ঠিক সেই সময় গণেশবাবু এসে দাঁড়ায়। আমার কাণ্ড দেখে গণেশবাবু একটু অবাক হন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গণেশবাবুর সাথে গল্প হয়।

গণেশবাবুর দলের অন্যরাও স্নান সেরে আমাদের অস্থায়ী আবাসন দেখতে আসে। দলের কিশোর পর্যটক সৌম্যদেব তার বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে। সৌম্যকে দেখে আনন্দ হয়। ছোট ছেলে বাবা মায়ের হাত ধরে পাহাড়ের খেলায় নেমেছে, বড় হলে ও অনেক বড় খেলোয়াড় হবে।

গণেশবাবুরা চলে যান, ওনারা তাতোপানি বাজারে হোটেলে থাকবেন। আমিও রান্না শেষ করে তপ্তকুণ্ডে যাই। চায়ের দোকানে চা খেয়ে প্রতিবেশীর সাথে আলাপ করি।

দীর্ঘ পরিক্রমার পর তপ্তকুণ্ডে স্নান করে সবাই দেহ ও মনে সতেজ হয়। স্নানের পর প্রত্যেককেই ১ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। ঐ অর্থে তপ্তকুণ্ডের পরিচ্ছন্নতা রক্ষিত হয়। চায়ের দোকানের মালিক প্রেমচাঁদ ঐ কাজের দায়িত্বে রয়েছে।

প্রতিদিন রাতে প্রেমচাঁদ তপ্তকুণ্ডের জল বের করে তলদেশ পরিষ্কার করে। এই কাজে সে তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নেয়। প্রদীপ হাতে সকলেই পরিষ্কারের কাজে লাগে।

স্নানের পর পর্যটকের দল যে যার হোটেলে চলে যায়। তপ্তকুণ্ডের এখন বিশ্রাম। উপরে নীল আকাশ, সম্মুখে ছন্দোময়ী কালীগণ্ডকী, রাতের শান্ত পরিবেশে তপ্তকুণ্ড যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

আমরাও মোমবাতির আলোয় আহার সেরে নিই। আহারের পর প্রেমচাঁদের দোকানে গরম পানীয় সেবন ও একটু গল্প, তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ।

১লা নভেম্বর। ভোর ৫টা। তাতোপানি। কালীগণ্ডকীর মৃদু গর্জনে তাঁবুর ঘরে ঘুম ভাঙ্গে। গুরুজীকে স্মরণ করে বাইরে আসি।

শিশির সিক্ত প্রকৃতি, অরুণিত মানাসলু, ধ্যানমৌন গিরিরাজ, পরপারে সবুজের সমারোহ, বালুকাবেলায় স্বচ্ছ তপ্তকুণ্ড, কালীগণ্ডকীর কলগীতি—হিমালয়ের বুকে প্রভাতী বন্দনা।

প্রাতঃকৃত্য সেরে সকলেই তৈরী হয়ে নিই। কোয়ার্টারমাস্টার প্রাতরাশের আয়োজন করে। আহার সেরে যাত্রা, বিদায় তাতোপানি। সকাল ৭টা।

লাল ও চেত মালপত্র নিয়ে যাত্রা করে। সামান্য এগিয়ে কালীগণ্ডকীর বুকে ঝুলন্ত সেতু। নদী পেরিয়ে তাতোপানি গ্রামের অপর অংশ। এপারে পরিবেশ আরও সুন্দর। সবুজ ধান ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত, সবজি বাগিচা, মাঝে মাঝে পাকাবাড়ি ও বাঁধানো রাস্তা। পাকা স্কুলবাড়ি ও সবুজ খেলার মাঠ। পাকা বাড়ির বাইরের ঘরে দোকান। পূর্বাহ্নের মিষ্টি রৌদ্রে গ্রামের পথে সকলেই দ্রুত পা চালায়।

গ্রামের পথ নদীতীরে এসে শেষ। নদীর বুকে ঝুলন্ত সেতু। প্রচণ্ড বেগবতী নদী, দুরন্ত বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে কালীগণ্ডকীতে।

নদী পার হয়ে রাস্তা দ্বিধা বিভক্ত। বাঁদিকে ঘোড়াপানি, চন্দ্রকোট হয়ে পোখরা, ডান দিকের পথ বেণী-কুশমা হয়ে পোখরা। বাঁহাতি পথে চড়াই বেশী। ডানহাতি পথ সমতল, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। এপথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

ডানহাতে কালীগণ্ডকীকে সাথে নিয়ে পথ চলা। কালীগণ্ডকীর তীর ধরে এগিয়ে চলি। ঝোপঝাড়, জঙ্গল পেরিয়ে চষা জমির আল বেয়ে পথ, পাহাড়ী পথ বলে মনেই হয় না।

গ্রাম ছাড়িয়ে উৎরাই পথে নদীর তীরে নেমে আসি। সামনে সমতল প্রান্তর। প্রান্তরে কিছু নেপালী ছেলেকে ভলিবল খেলতে দেখি, বাঁহাতে চায়ের দোকান।

দোকান ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা-বেয়ে রাস্তা। রাস্তা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামে। নামতে নামতে গভীর গিরিখাদে নেমে আসি। গভীর অরণ্যে কালীগণ্ডকী নিঃশব্দে প্রবাহিত। অরণ্যের গভীরতায় সূর্যদেব কালীগণ্ডকীর বক্ষ স্পর্শ করে না। পূর্বাহ্নে রজনীর পূর্বাভাষ। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি, প্রকৃতির গোপনতম অঙ্গনে পর্যটকের উপস্থিতি হয়তো হিমালয়ের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটায়।

এবারে ওঠার পালা। দুরন্ত চড়াই। আমি ও কোয়ার্টারমাস্টার চড়াই ভেঙ্গে একটা উঁচু চাতালে এসে দাঁড়াই, অন্ধকার থেকে আলোতে আসি।

সূর্যকিরণে উজ্জ্বল সমভূমি। এক শ্বেতাঙ্গ পর্যটক তার ক্যামেরায় প্রকৃতির নির্জন পরিবেশকে ধরে রাখতে চায়, সঙ্গে তার নেপালী সাথী।

আমরা দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিই। এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে যায়। দীর্ঘ পরিক্রমায় সে পাহাড়ে ওঠার কৌশলটা ভালভাবেই রপ্ত করেছে, সহজে চড়াই ভেঙ্গে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। গ্রামের পথ। মাঝে মাঝে ২/১টি কাঁচা বাড়ি দেখা যায়।

উৎরাই পথ ধরে আবার কালীগণ্ডকীর তীরে এসে দাঁড়াই, কালীগণ্ডকীর বুকে ঝুলন্ত সেতু। সেতু পেরিয়ে ওপারে যাই। চষা জমির আল বেয়ে পথ, উর্বর বেলাভূমিতে নানা জাতের আনাজ ও সবুজের চাষ। ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় এসে উঠি, সকাল ৮-৩০ মিনিট।

রাস্তার পাশেই রেস্তোঁরা, সাইনবোর্ডে লেখা "টিপল্যাং"।

রেস্তোঁরার সামনে সুন্দর আঙ্গিনা। আঙ্গিনায় পুষ্পোদ্যান। একদিকে বাঁধানো চাতাল, চাতালে পর্যটকের বসার ব্যবস্থা। আমরা ঐ চাতালে গিয়ে বসি। পাশেই পাকা স্কুল বাড়ি।

আজ লাল ও চেত অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। ওদের জন্য অপেক্ষা করি। চা-পান শেষ করে আবার যাত্রা শুরু।

টিপল্যাং-এর পর "বেগখোলা"। আর বিশ্রামের অবকাশ নেই। মধ্যাহ্নের পূর্বে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়া ভাল। চলার বিরতি না টেনে এগিয়ে যাই।

বেগাখোলার পর "বৈসারি"। বেলা ১-৪০ মিনিট। সকাল থেকে একটানা হেঁটেই চলেছি। সকলের পেটেই খিদে। রাস্তার পাশেই চায়ের দোকান। সামনে সানবাঁধানো ধাপি। পোর্টাররা পিঠের বোঝা নামায়। ছাতু মেখে সকলকে পরিবেশন করি।

কোয়ার্টারমাষ্টার সামনের দোকানে ম্যাগীর অর্ডার দেয়। এখানে দাম সামান্য কম। ম্যাগী প্রতি প্লেট ১০ টাকা, চা ১ টাকা, দোকানের মালিক গঙ্গাবাহাদুর নেপালী। ব্যবহার ও আপ্যায়ন মনে রাখার মত। আহার সেরে যাত্রা, ২-৩০ মিনিট।

গ্রামের পথ, পথের বৈচিত্র্যও কম নয়। কালীগণ্ডকী ভ্যালী, অফুরন্ত ফসল। উর্বর বেলাভূমিতে অনেক বসতি গড়ে উঠেছে।

দীর্ঘ পথ চলায় দেহ ও মনে কিছুটা অবসন্নতা দেখা দেয়। সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে পথ অতিক্রমের তাগিদটাই বেশী।

সাত সকালে তাতোপানি থেকে বেরিয়েছি। পথে টিপল্যাং, বেগাখোলা, বৈসারি অতিক্রম করেছি। সামনে 'গারসোর'। হাতের ম্যাপ দেখে মাঝে মাঝে মিলিয়ে নিই। শুধুই প্রশ্ন, আর কত দূর? আর কত পথ?

বিকাল ৪টে। কালীগণ্ডকীকে বাঁ-হাতে রেখে পথ ঘুরে যায় ডান-হাতে। কিছুটা গিয়ে নদীর দেখা পাই নাম "রঘুখোলা"। রঘুখোলা দুরন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। রঘুখোলার বুকে ঝুলন্ত সেতু। সেতু পেরিয়ে "গারসোর"।

গারসোরে, রঘুখোলা ও কালীগণ্ডকীর সঙ্গম। প্রাচীন শহর। দোতলা, তিনতলা প্রাচীন বাড়িগুলি অতীতের স্মৃতি বহন করে। জনবসতি ভালই। স্কুল, পোস্টঅফিস ও থানা আছে গারসোরে। নেপালী ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস। গ্রামের শেষ প্রান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম নজরে পড়ে।

শহরের শেষপ্রান্তে পাকাবাড়ির বারান্দায় চায়ের দোকান। সকলেই চা-পান করি। শহরের কৌলিন্য থাকলেও উজ্জ্বলতা নেই। পাকাবাড়িতে যারা দোকান চালায় তাদের বসন মলিন বদন শ্রীহীন।

যেসব পথে পর্যটক যাতায়াত করে, সেই সব পথের ধারের গ্রামগুলি বা শহরের অবস্থা শ্রীমণ্ডিত।

যেসব পথে শ্বেতাঙ্গ পর্যটক কম আসে, সেইসব পথের পাশের গ্রামগুলির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাই এ পথের গ্রামগুলি শ্রীযুক্ত নয়।

গারসোর থেকে বেণী ৪৫ মিনিটের পথ। সামান্য পর্যটক যারা আসে তারাও বেণীতে গিয়ে রাত কাটায়। আমরাও দেরী না করে বেণীর পথে যাত্রা করি।

সমতল পথ, গোধূলি বেলা। অস্তায়মান রবি পশ্চিমাকাশে পাটে বসে। সকলেই দ্রুত পা চালায়।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় সকলের দেহই বেশ ক্লান্ত। হোটেলের বিছানায় শরীরটা মেলে দেবার অপেক্ষায় থাকি। বিকাল ৫টা।

ঐ তো "বেণী"। কালীগণ্ডকীর তীরে বেণী। পাহাড়ে, নদীতে বেণীর অভিষেক। বেণীর সর্বাঙ্গে শহরের ছাপ। দূর থেকে পাকাবাড়ি ও হোটেল দেখা যায়। "মিয়াগদি খোলা" ও কালীগণ্ডকীর সঙ্গম হয়েছে বেণীতে।

বাঁ-হাতি পথ গিয়েছে হোটেল পাড়ায়, তীর চিহ্ন এঁকে দেখানো আছে সে পথ। সবুজ ময়দানের বুক চিরে গিয়েছে পথ। আমরাও ঐ পথ ধরে এগিয়ে যাই।

কালীগণ্ডকীর তীরে পর পর কয়েকটি হোটেল। হোটেলের ব্যবসা জম-জমাট। ডানহাতে নমস্তে লজ। তিব্বতী পরিবারের হোটেল। হোটেলের পরিপাটি ও ডাইনিং হলের চেহারা ভালই।

তিনতলায় একটি ঘর আমাদের ভাগ্যে জোটে। বিছানাপত্র ধবধবে। জানালা খুলতেই রাস্তা। রাস্তার ওপারে আর একটি হোটেলের ব্যালকনি। ব্যালকনিতে ৩/৪ জন পর্যটক, বাঙালী বলে মনে হয়।

তিব্বতী হোটেল, মাংস-ভোজীদের পক্ষে ভাল। মাংস মানেই ইয়াকের মাংস। দাম কম, পরিমাণেও বেশী।

নিরামিশাষিদের ভাগ্যে ম্যাগী ও আলু সিদ্ধ। আপাতত চা ও বিস্কুট খেয়ে বিশ্রাম।

বাঙালী দলটাও এসে যায়। ওরাও আমাদের পাশে ঘর নেয়। গণেশবাবু সকল সদস্যদের নিয়ে সামান্য দেরীতে আসে।

গণেশবাবু প্রথমেই আমাদের ঘরে এসে গল্প শুরু করেন। সকলকে নিয়ে আর একবার চা-পান করি।

বাঙালী দলের সবাই ডাইনিং হলে নৈশভোজন করে। আমরা ঘরেই আহার সেরে নিই। লাল ও চেত হোটেলেই খেয়ে নেয়। ওরা নীচেই থাকে। আজ আর কোন কাজ নয়। আহারের পর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি নিজেও জানি না।

২রা নভেম্বর, ভোর ৫টা, নমস্তে লজ, বেণী। যাত্রার জন্য সকলেই তৈরী। লালবাহাদুর ও চেতবাহাদুর মালপত্র নিয়ে নীচে গিয়ে দাঁড়ায়।

হোটেলের ডাইনিং হলে চা নিয়ে বসি, গণেশবাবুর দলও একে একে নেমে আসে। গতকাল ব্যালকনিতে যাদের দেখেছি, তারাও রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বিদেশে বাঙালী মুখ খুবই মিষ্টি। সকলের সাথেই আলাপ হয়। পরস্পরে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাত্রা শুরু।

হোটেল পাড়া পেরিয়ে কালীগণ্ডকীর উপর ঝুলন্ত সেতু। কালীগণ্ডকী এখানে উত্তাল। সেতু অতিক্রম করে যাই। কালীগণ্ডকী ডানহাতে বাঁক নেয়।

গ্রামের পথ, চারিদিকে সবুজের মেলা, শ্যামায়মান বসুন্ধরা, যেদিকে তাকাই ধান ও ভূট্টা ক্ষেত। শস্যক্ষেতের শেষ প্রান্তে বিন্যস্ত পর্বত শ্রেণী, পাহাড়ের মাথায় সুনীল চন্দ্রাতপ।

পথ সমতল। পথের উভয় পার্শ্বে ধান ক্ষেত। ধানক্ষেত ছাড়িয়ে নদী ও পাহাড়। কালীগণ্ডকীর বেলাভূমি, উর্বর ও শস্যশ্যামল। সকালের দিকটা সকলেই দ্রুত পা চালায়। একটানা ২ ঘন্টা হেঁটেছি। "ফাঁসি" গ্রাম, সকাল ৮টা।

রাস্তা থেকে সামান্য উপরে হোটেল ও রেস্তোরাঁ। পাশেই চায়ের দোকান ও মুদিখানা। দোতলা, তিনতলা পাকা বাড়ি। রেস্তোরাঁর সামনে টেবিল ও বেঞ্চ। ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বেঞ্চে গিয়ে বসি।

যাত্রার পূর্বে পেটে তেমন কিছু পড়েনি, ফাঁসিতে প্রাতরাশ সেরে নিই। আমি চা-পান করে এগিয়ে যাই, কোয়ার্টারমাষ্টার ও ক্যাপ্টেন রেস্তোরাঁর ভিতরে গিয়ে বসে।

হঠাৎ বাঙালী দলের গলা শুনতে পাই। চায়ের দোকানের সামনে ভিড় জমিয়েছে। তাপস রায়ের দল। বসিরহাটের ছেলে। মুক্তিনাথ দর্শন করে ফিরছে। গতকাল পথে দেখা, আলাপের তেমন সুযোগ হয়নি।

ফাঁসি বেশ বড় গ্রাম। শহর বল্লে ভুল হবে না। রাস্তার দুধারে পাকাবাড়ি। নেপাল সরকারের কিছু অফিসও আছে গ্রামে। বাঁ-হাতে উঁচু বাড়িতে তহশিলদারের অফিস।

সরকারী অফিস ছাড়িয়ে ডানহাতে নেপালী মহিলার হোটেল। ঝুপড়ির ঘর। ঘরে আসবাবপত্র কিছুই নেই। ঘরের মেঝেতে বসে লাল ও চেত ভাত, ডাল ও সবজি দিয়ে আহার সেরে নেয়। সবজি প্রতি প্লেট ১ টাকা। এত সস্তা সবজি এ পথে প্রথম। আমিও ১ ডিস সবজি খেয়ে নিই। নেপালী বধুর রান্না, আস্বাদ ভালই। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনরাও এগিয়ে আসে, আবার চলা শুরু।

গ্রামের রাস্তা, রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতি, পথ চলতে তেমন কষ্ট হয় না। ১ ঘণ্টা হেঁটে "খনিয়াগড়" আসি।

বেশ বড় গ্রাম। রাস্তার উপর দোকান, বাজার, সারি সারি পাকাবাড়ি ও হোটেল।

রাস্তার পাশে 'ট্রাভেলার্স গেষ্টহাউস্"। সামনে দুখানি বেঞ্চ, দোতলা বাড়ি, এক তলায় হোটেল ও দোকান, দোতলায় লজ। সামনের বেঞ্চ-এ বসে বিশ্রাম নিই। রন্ধনশালায় গরম দুধ ৪ টাকা গ্লাস। দলের সবাই এগিয়ে যায়, আমি দুধ-পান করে অন্যদের অনুসরণ করি।

খনিয়াগড় থেকে ২৫ মিনিট হেঁটে কালীগণ্ডকীর তীরে নেমে আসি। যেখানে এসে দাঁড়াই তার আশে পাশে সারি সারি অস্থায়ী হোটেল ও রেস্তোরাঁ। সম্মুখে বিরাট কর্মযজ্ঞ। কালীগণ্ডকীর বুকে বিশাল নির্মাণ কার্য চলছে।

নেপাল সরকার কালীগণ্ডকীর বুকে এক সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। চীনা ঠিকাদারি সংস্থা নির্মাণ কার্যের দায়িত্বে আছে। নির্মাণ কাজও সমাপ্তির পথে। অনেক শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার কাজে নিযুক্ত, কর্তৃপক্ষ সবাই চীনা।

খনিয়াগড়ের ওপারে পাহাড়ের মাথায় বাগলুং শহর। বর্তমানে পোখরার সাথে বাগলুং-এর কোন যোগাযোগ নেই। পোখরা থেকে কুশমা হয়ে বাগলুং-এর সাথে নূতন যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস চলছে। মাটির রাস্তা ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে। সে রাস্তায় বর্তমানে ট্রাক চলাচল করে।

নির্মাণ-কাজের সুবাদে এখানে বেশ কিছু হোটেল, রেস্তোরাঁ ও লজ গড়ে উঠেছে। শ্রমিকদের আহার্য ও অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা।

ট্রাকের আশায় পর্যটকের দল বসে থাকে। কখন ট্রাক মিলবে সেটা কেউ জানে না।

ব্রীজের কাজে পোখরা থেকে মালপত্র নিয়ে ট্রাক আসে। ঐ ট্রাক মালপত্র নামিয়ে যাত্রী বোঝাই করে পোখরা-য় ফিরে যায়। প্রতিদিনই একাধিক ট্রাক আসে খনিয়াগড়ে।

বাঙালীদল ও তাপস রায়ের দলও ট্রাকের আশায় বসে থাকে। আমরাও মালপত্র রেখে অপেক্ষা করি।

তাপস রায়ের দলের ২/১ জন পূর্ব পরিচিত। পঞ্চকেদার পরিক্রমার পথে হেলাং-এ দেখা। কল্পেশ্বর দর্শন করে হেলাং এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় বদ্রীগামী বাস থেকে এক বাঙালী দল নামে। সেই দলের একজনের সাথে দ্বিতীয়বার দেখা। পাহাড়ের বন্ধু পেয়ে খুবই আনন্দ হয়।

ইতিমধ্যে গণেশবাবুও এসে যান, ওনারা সকলেই ট্রাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমরাও বাঙালীর "দল বাঁধার অভ্যাস"কে পরিত্যাগ করতে পারি না। ট্রাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

ট্রেকিং পথে ট্রাক বা ডাম্ফারে না চড়াই ভাল, এতে শরীর ও সময় দুই-ই নষ্ট হয়।

ট্রাকে যাওয়াই যখন স্থির, তখন লাল ও চেতকে বিদায় জানানই শ্রেয়। ওদের বিদায় জানাতে খুবই কষ্ট হয়। দীর্ঘ পরিক্রমায় দুই নেপালী কিশোরের ঔদার্য, সেবা ও নিষ্ঠার কোন পরিমাপ হয় না। দুই কিশোরের মিষ্টি কচিমুখ আজও মনের কোণে উঁকি মারে।

ওদের সাথে নিয়ে মধ্যাহ্ন আহার করি, পাওনা অর্থ মিটিয়ে দিই, হাতে কিছু বক্‌সিস্ দিই। ওরা বিদায় নিয়ে পোখরার দিকে চলে যায়।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ট্রাক আসে বিকাল ৩টে। ট্রাক ভর্তি মাল। লোহা, টিন, কাঠ ইত্যাদি। অনেক সময় লাগে ঐ গাড়ি খালি হতে। গাড়ি খালি হবার পর সকলেই তাড়াহুড়া করে গাড়িতে গিয়ে উঠি।

ট্রাক-ড্রাইভার নেপালী, চাকরী করে চীনা কন্ট্রাকটারের অধীনে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পেলে গাড়ি ছাড়া যাবে না।

সকাল ১০টায় ব্রীজের নিকটে আসি, সারা দিন পুলের সামনে বসেই কেটে যায়।

কয়েকবার নির্মীয়মান সেতুর এপার ওপার করি। ওপারে পাহাড়ের গায়ে পথ, সে পথ জঙ্গলে ঢাকা, ঐ পথ গেছে বাগলুং-এ। ঐ পথে কিছু লোক চলাচল করে। ওপারেই চীনা কর্তৃপক্ষের অস্থায়ী আবাসন। প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম।

বিকাল সাড়ে ৫টা, গাড়ি ছাড়ার অনুমতি মেলে। কয়েকজন চীনা অফিসার ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে। আমরা ঠাসাঠাসি করে গাড়িতে বসেছি, অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছাড়ে সন্ধ্যা ৬টা।

সেতু এলাকা থেকে ১৫ মিনিট এসে গাড়ি দাঁড়ায়। সামনে গ্যারেজ ও অফিস। গ্যারেজ থেকে ২ জন চীনা অফিসার এসে ড্রাইভার-কে কি যেন বলে, ড্রাইভার জানায় গাড়ি আর যাবে না।

কর্তৃপক্ষ সবাই চীনা, কেউ ইংরাজী বুঝতে চায় না। আমাদের সমস্যার কথা বলে কোনই লাভ হয় না। মালপত্র নিয়ে সবাইকে গাড়ি থেকে নামতে হয়।

এদিকে আঁধার নেমে আসে। পোর্টারদের ছেড়ে দিয়েছি। নিকটে কোন হোটেল বা লজ দেখা যায় না।

মালপত্র পিঠে নিয়ে হাঁটতে শুরু করি। দলে মোট ২০ জন, সবাই বাঙালী। টর্চের আলোয় পথ দেখে চলি। মাটির রাস্তা, রাস্তার দুপাশে চষা জমি। ২০ মিনিট লড়াই করে একটি লোকালয়ের দর্শন পাই, নাম নয়াপুর। অস্থায়ী গড়ে ওঠা নেপালী বসতি। ব্রীজের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর স্বার্থে অস্থায়ী ব্যবস্থা প্রতি বাড়িতেই হোটেল ও রেস্তোরাঁ।

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দুটি বাড়ীতে রাতের আশ্রয় নিই। আমাদের সাথে তাপস রায়ের দলের ৭ জন।

গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীর ব্যবহার ও আপ্যায়ন বেশ ভাল। রাতে ভাত, ডাল ও সবজি।

পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙ্গে। হোটেলের ঘরে গরম জিলাপী ও চা খেয়ে যাত্রা। সকাল ৬টা।

সাথে কোন পোর্টার নেই, মালপত্র পিঠেই চাপাতে হয়। ট্রাকের আশায় অপেক্ষা করেই যত বিপত্তি। কুশমার আগে ট্রাক পাওয়ার কোন আশা নেই।

বেণী থেকে কুশমা ২ ঘণ্টার পথ, রাস্তা বেশ ভাল, মাটির তৈরী নূতন রাজপথ। ২/৩ খানা ট্রাক পাশাপাশি চলতে পারে। আগামী দিনে হয়তো বাসও চলে আসবে এ পথে।

পিঠে মালপত্র চাপিয়ে হাঁটতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছে। পোর্টার অথবা ট্রাক না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই। সকালের দিক যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল।

পথের উভয় পার্শ্বে বন জঙ্গল। মাঝে মাঝে ছায়া ঘেরা পথ। পথে কোন মনুষ্য প্রাণী নজরে পড়ে না।

অকস্মাৎ এক প্রৌঢ়া বাঙালী মহিলার সাথে দেখা। সকালে কুশমা থেকে বেরিয়েছেন, চলেছেন বাবা মুক্তিনাথের দর্শনে। সঙ্গে মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক, পথের সঙ্গী। জীবনসঙ্গী পাহাড়ে বেড়াতে পছন্দ করে না। তিনি বাড়িতেই আছেন। পাহাড় প্রেমী প্রতিবেশীর সাথে একাই বেরিয়েছেন। পরস্পরে শুভেচ্ছা বিনিময়। আবার যাত্রা।

পথের উভয় পার্শ্বে গভীর জঙ্গল। জঙ্গল ভেদ করে মাঝে মাঝে সূর্যকিরণ এসে রাস্তায় পড়ে। পূর্বাহ্নে সূর্যকিরণের প্রখরতা বাড়তে থাকে। পিঠে মাল নিয়ে চলতে কষ্ট হয়। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিই। এমনি ভাবে কুশমা আসি সকাল ৯টা।

কুশমা বেশ বড় গ্রাম, শহর হ'তে আর বেশী দেরী নেই। কুশমা প্রবেশের মুখে সুবিশাল রাস্তা নির্মাণের নিদর্শন। অনেক বাড়িঘর, লোকজন, দোকান-পাট দেখা যায়, দেখা যায় না কোন যানবাহন।

বাঙালী যাত্রীরা যারা আমার পূর্বে রওনা দেয়, তারাও হয়তো কোন কিছু না দেখে হতাশ হয়ে এগিয়ে গেছে।

আমরাও সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাই। কুশমা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে নব নির্মিত সড়ক পথে চলে আসি।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে কাঠ ফাটা রোদ, হাঁটতে বেশ কষ্ট। সামান্য এগিয়ে রাস্তার পাশে গাছের ছায়াতে দাঁড়াই। সামান্য দূরে স্কুল বাড়ি। পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নিই।

রাস্তার পাশে ২ জন শ্রমিক মাটি কাটে, ১ জনকে আমাদের সাথে যেতে বলি। ১০০ টাকা মজুরী শুনে রাজি হয়।

বাবা মুক্তিনাথকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরই কৃপায় অসময়ে পথের মাঝে পোর্টার জোটে।

অল্প বয়সী যুবক, নাম 'পদম নেপালী'। খুবই শান্ত স্বভাব, কথাও বলে কম। পথের মাঝে এমন পোর্টার পাওয়া, ভাগ্যের ব্যাপার।

পদম একটি রুকস্যাক তুলে নেয়। ওর রুকস্যাকে বাড়তি মালপত্র বেঁধে দিই। নিজেরা অনেকটাই হালকা হই।

পদমকে পেয়ে কষ্টের লাঘব হয়। তবুও অর্দ্ধেক মালের বোঝা থাকছেই। মাটির রাস্তা, উপরে সূর্যের তীব্রতা, প্রকৃতির রুক্ষতায় পথ চলতে অবসাদ আসে।

বেলা ১২টা "চূয়া" গ্রাম। রাস্তার পাশে সারি সারি দোকান ও হোটেল। সবই ঝুপড়ির ঘর।

মধ্যাহ্নের খরতায় ঝুপড়ির ঘরে গিয়ে বসি। মচ্ছপুচ্ছারে যেন হাতের মুঠোয়। ঝুপড়ির হোটেলে ম্যাগী ও চা-পান করে মধ্যাহ্ন আহার সারি। কোয়ার্টারমাষ্টারের জন্য বাড়তি ডিম।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা। মধ্যাহ্নের খরতাপে পথ চলতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। পরবর্তী গ্রাম 'পাতিচৌর'। সেখানে হোটেল ও লজ আছে। পথে কোন গাড়ি না পেলে ওখানেই যাত্রার বিরতি টানার সিদ্ধান্ত নিই।

পাতিচৌর-এর কিছুটা আগে রাস্তার পাশে ঝুপড়ির দোকান ও হোটেল। দোকানের মালিক আংফুরি। দোকানে বসে বিশ্রাম নিই ও চা-পান করি। বেলা ২টো।

চূয়া থেকে অনেক পথ এসেছি। সকলেরই জঠরের জ্বালা বেড়েছে, আংফুরির দোকানে চিড়ে ছাড়া খাবার মত আর কিছুই দেখতে পাই না। ভেজানো চিড়ে ২টাকা ডিস। চিড়ে খেয়ে শান্ত হই।

আংফুরির কথায় ভরসা পাই, সে বলে তার দোকানে বসেই ট্রাক মিলবে।

বেলা আড়াইটে। কয়েকটি মাল বোঝাই ট্রাক পোখরার দিক থেকে এগিয়ে আসে। দোকানের সামনে হাত তুলে ট্রাকের ড্রাইভারের সাথে কথা বলি। ড্রাইভার জানায় কুশমা থেকে ফিরে আমাদের তুলে নেবে।

ড্রাইভারের কথায় মনে সাহস পাই। আংফুরিও ভরসা দেয়। আংফুরির কথায় পোর্টার পদম নেপালীকে বসিয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। ওকে ওর চার্জ দিয়ে ছেড়ে দিই।

ইতিমধ্যে এক চীনা ইঞ্জিনীয়ার এসে দোকানে বসে। সোলডার ব্যাজেলেখা "POBAR"। চীনা কোম্পানী, রাস্তা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত।

ইঞ্জিনীয়ারের কথায় ডিনামাইট চার্জের খবর পাই। হঠাৎ কয়েকজন সরকারী লোক এসে দোকান খালি করতে বলে। আংফুরি মালপত্র সরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আমরাও মালপত্র নিয়ে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

হঠাৎ সাইরেন বেজে ওঠে, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের সংকেত। ডিনামাইটগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। অল্পক্ষণ পর বিকট শব্দে পাথর ভেঙ্গে পড়ে। নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে অনেকগুলি স্থানে এই রকম শব্দ হয় ও পাথর ভাঙ্গে। অবশেষে দ্বিতীয়বার অলক্রিয়ার সাইরেন বাজে। এর পর বুলডোজার দিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের পালা। ডিনামাইট দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার ও পাহাড় ভাঙ্গার দৃশ্য পূর্বে কখনও দেখিনি। নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়।

সকলেই আংফুরির দোকানে ফিরে আসি।

ট্রাকের আশায় পদচারণা করতে থাকি। বিকাল ৫টা, কুশমার দিকে থেকে খালি ট্রাক আসতে শুরু করে।

প্রথম গাড়িতে তিল ধারণের স্থান নেই। দ্বিতীয় গাড়ি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। আমরা দ্বিতীয় গাড়িতে উঠি।

মাটির রাস্তা, গাড়ির ঝাঁকুনি খুব বেশী। পরস্পরে ঠেলাঠেলি ঠোকাঠুকি। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গও আছে গাড়িতে। ভাড়া নেয় প্রতিজন ১৫০ টাকা। পোখরা বাস ষ্ট্যাণ্ডের সামনে গাড়ি দাঁড়ায়, রাত সাড়ে ৭টা।

বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে সুনগাভা হোটেল। হোটেলের ব্যবস্থা বেশ ভাল। ডাইনিং হল আকর্ষণীয়। হোটেলের সর্বত্র পরিচ্ছন্নতার দাবী রাখে। মালপত্র নিয়ে হোটেলের ঘরে এসে উঠি। দুই শয্যার ঘর। ১০০ টাকা দক্ষিণা।

দীর্ঘ পরিক্রমার পর পোখরায় ২ দিন বিশ্রাম। তারপর বাড়ি ফেরা।

রাজধানী কাঠমাণ্ডুর পরেই পোখরার স্থান। বাঙালীর ক্ষণেকের জন্যও সুন্দরী কলকাতাকে মনে পড়বে। তুষার শুভ্র মচ্ছপুচ্ছারে মনের মণি কোঠায় আনন্দের ঢেউ তুলবেই। পোখরার ফেউয়াতাল ও বিন্দুবাসিনী অন্যতম আকর্ষণ।

কেনাকাটার জন্য মহেন্দ্রপুল (বাজার) পর্যটকের চাহিদা মেটাতে সর্বদাই সুসজ্জিত।

ফেরার দিন বাস স্ট্যাণ্ডে লাইনে দাঁড়িয়ে অগ্রিম টিকিট নিতে হয়। কাউন্টার খোলে সকাল ৯টায়, বাস ছাড়ে বিকাল ৪টে। *

নন্দাঘুন্টি [২০,৭০০´]

(ভারতের প্রথম সফল বেসরকারী পর্বতারোহণ)

গৌরকিশোর ঘোষ

এদিকের বরফ তত নরম, ততটা ভসভসে নয়। তবুও ওরা তেমন দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছিল না। এদিকের বাধা ফাটল। এই ফাটল এড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তাই ওরা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে, কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে যেতে হচ্ছে বলে পথ হাঁটতে হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে তেমন এগুতে পারছে না। সুকুমারের মনে হল, এ যেন ছেলেবেলার সেই 'সাপ-সিঁড়ি' লুডো খেলা।

ওরা কখনও নন্দাঘুন্টি কখনও বা রন্টি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। দিলীপ আর সুকুমার ক্রমাগত নন্দাঘুন্টির দিকে চাইছে। ওদের মনে উদ্বেগ। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ওদের নজর পড়ল রন্টি গিরিশিরার দিকে। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। অবিকল যেন পুরনো আমলের একটা বাদশাহী কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে। কালো শ্লেটের মত রঙ। সারা গা ফাটা-ফাটা। ওরা কিছুক্ষণ পাহাড়টার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার চলতে শুরু করল।

কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় দেখল বরফের উপর দড়ি, পিটন ইত্যাদি বোঝা পড়ে আছে। আগের দিন যারা এসেছিল, তারাই এসব রেখে গিয়েছে। এখানে এমন ভয়ঙ্কর ফাটল যে, ওরা পরস্পর দড়ি বেঁধে নিল। শরীরটাকে হালকা করে, একে একে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের লোকটি তুষার-গাঁইতির ব্রেক তৈরী করে সদা-প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পা ফস্‌কে আগের লোকটি পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পরের লোকটি দড়ি ধরে তাকে সামাল দিতে পারে। নন্দাঘুন্টি যে কী সাংঘাতিক পাহাড়, কেন যে বাঘা-বাঘা পর্বতারোহীরা একে 'টেকনিক্যালি' সুকঠিন, দুঃসাধ্য পর্বত বলেছেন, এখন তার মর্ম ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে লাগল।

অতিশয় সতর্ক হয়ে ওরা খুবই মন্থর গতিতে সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটি অতিক্রম করল। এবারে সামনেই এক উঁচু চড়াই। এতক্ষণ ওরা নন্দাঘুন্টির 'কল'টা বেশ দেখতে পাচ্ছিল। সামনে চড়াইটা পড়ে যাওয়ায় 'কল'টা তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। চড়াইটাও ফাটলে ভরতি। কেউ যেন ফাটল দিয়ে দিয়ে নানা রকম নক্‌শা কেটে রেখেছে।

গুণদিন, টাসী আর আঙ ফুতার চড়াইয়ের মাথায় উঠে গেল। খানিক পরে দিলীপ আর সুকুমার দেখল, ওরা তিনজনে উপরে তাঁবু খাটাতে লেগেছে। আঙ শেরিং সুকুমারদের একটু আগে আগে যাচ্ছিল। সে নীচ থেকেই চেঁচিয়ে ওদের তাঁবু খাটাতে বারণ করল। আরো পিছিয়ে যেতে বলল। জবাবে ওরা কি বলল সুকুমার বুঝতে পারল না।

সুকুমার আর দিলীপ এবার চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিছু দূর ওঠার পর ওরা দেখল, ওদের সামনে বিরাট এক ফাটল। ফাটলের কিনার ধরে বরফে দড়ি খাটিয়ে

রাস্তা বানানো আছে। ওরা বুঝতে পারল, শেরপারা কাল এই পর্যন্তই আসতে পেরেছিল। দড়ি খাটিয়ে এখানে রাস্তা করেই ওরা ফিরে গিয়েছিল। বরফের উপরকার ছাপ দেখে বুঝল, এখানে মালও ফেলে রেখে গিয়েছিল। চড়াইটা বেশ খাড়া। প্রায় ১০০ ফুট উঁচু হবে। ওরা যখন উপরে উঠল, বেলা তখন আড়াইটা। প্রায় ২০০ গজ দূরে 'কল'। ওরা সেখানেই বিশ্রাম নিতে লাগল।

আজীবা, দা তেম্বা আর নরবুকে ওরা দেখতে পেল না। শুনল, ওরা আরো এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম কুঁজটা পর্যন্ত ওরা যাবে। রাস্তা তৈরী করে রেখে আসবে।

দিলীপ ছবি তুলতে লাগল। স্থির-ছবি তুলল। চলচ্ছবি তুলল ওর আট মিলিমিটারের সিনে ক্যামেরায়। এমন সময় সে দেখতে পেল, দূরে আজীবা সেই কুঁজটার উপর উঠছে।

'কল'টার পুবে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে ওদের ৩নং শিবির স্থাপন করা হল। প্রায় দশ ফুট বরফ সরিয়ে কয়েকটা বড় বড় খোঁড়ল তৈরী করা হল। সেইসব খোঁড়লের মধ্যে দুটো মাত্র তাঁবু খাটানো হল। একটা পুরনো আর্কটিক টেন্ট—দুজনের মত। আর-একটা হাই অলটিচ্যুড ডবল টেন্ট—চারজনের মত।

'কল'-এর দক্ষিণে নন্দাঘুন্টি, উত্তরে রন্টি। পূবে-পশ্চিমে লম্বা এই 'কল'টার পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। রন্টি আর নন্দাঘুন্টির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। কত নীচুতে আকাশ। দিলীপের মনে হল হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়! ১৮০০০ ফুট উপরে ওরা ৩নং শিবির স্থাপন করতে পেরেছে। আর মাত্র ২৭০০ ফুট বাকী।

আবহাওয়া এতক্ষণ সুন্দর ছিল। আকাশ নির্মেঘ। বেশ রোদ। হঠাৎ বেলা তিনটে থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাওয়ার বেগ বেড়ে উঠল। আজীবা, দা তেম্বা আর নরবু হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। দা তেম্বা, গুণদিন আর আঙ ফুতার আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করল না। অতি দ্রুত ২নং শিবিরের দিকে যাত্রা করল।

আকাশে মেঘ ছড়িয়ে পড়ল। আকাশ ক্রমশ ক্রুদ্ধ, কুটিল, ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল। হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পেল। সাংঘাতিক শীত পড়ল। অভিযাত্রীদের হাড়ে হাড়ে যেন করাত চলছে। ওরা তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ল। সুকুমারের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আর দেরি করা নয়। যদি সুযোগ পায়, কাল, হ্যাঁ, কালকেই অভিযান চালাবে চূড়ায়।

'কল'-এর উপরে কোন আশ্রয় নেই। সতত বেগে হাওয়া বইছে। ওদের সঙ্গে যে তাঁবু আছে, তা এত জীর্ণ যে, উপরে খাটাতে পারা যাবে না। হাওয়া, এই প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ সহ্য করার ক্ষমতা এই তাঁবুগুলোর নেই। অতএব ৪নং শিবির স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ছাড়া গতি নেই। দিলীপ সুকুমারকে সমর্থন করল। আঙ শেরিংও।

এতক্ষণ শুধু হাওয়াই দিচ্ছিল। এবারে শুরু হল ব্লিজার্ড। হা হা করে খ্যাপা হাওয়া ছুটে এসে তাঁবু দুটোর গায়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তুষারের ঝাপটা। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে আসতে লাগল।

সুকুমার আর দিলীপ আর্কটিক তাঁবুতে আর শেরপারা ডবল তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। ডবল তাঁবুটা তবু নতুন। ওর সহ্যক্ষমতাও বেশী। সুকুমারদের পুরনো তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুষার-কণা ঢুকে পড়ছে। ওরা প্রাণপণে গুঁজি মেরে মেরে ফাঁক বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এমন সময় ঝড়ের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় তাঁবুটা থরথর করে কেঁপে উঠল। এই বুঝি উড়ে যায়। দিলীপ আর সুকুমার রুকস্যাক, কিটব্যাগ তাঁবুর দেওয়ালে চাপা দিয়ে সে যাত্রা সামাল দিল। পরমুহূর্তেই তুষারঝড়ের আর-একটি প্রচণ্ড ধাবায় তাঁবুর গোটাকতক দড়ি পটপট ছিঁড়ে গেল। তাঁবু হেলে পড়ল। এই বুঝি উড়ে যায়। বিদ্যুৎগতিতে বিপদটা বুঝতে পেরে ওরা দুজনে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাওয়ার প্রচণ্ড গতির জন্য ওরা দাঁড়াতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাঁবুর খুঁটোয় ছেঁড়া দড়িগুলো আবার শক্ত করে বেঁধে দিল। তুষারের গুঁড়োয় ওদের গা মাথা ঢেকে গেল। ঠাণ্ডায় বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যে আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। পাঁচটার সময় টাসী খাবার তৈরী করে দিল। টিনের মাছ আর পোলাও। ওরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু কারো চোখে ঘুম এল না। ও-তাঁবুতে আঙ শেরিং সারা রাত ধরে গুন গুন করে প্রার্থনা করল। এ-তাঁবুতে সুকুমার আর দিলীপ মোমবাতি জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ গান গাইল। বীরেনদার গান—"জয় শিব শঙ্কর, জয় ত্রিপুরারি—"। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল কালকের জন্য। একটা তালিকা তৈরী করল নামের। যারা এই অভিযানে এসেছে, যাঁরা সাহায্য করেছেন, সমর্থন করেছেন, তাঁদের নাম একখানা কাগজে লিখে ফেলল। যদি চূড়ায় উঠতে পারে, সেখানে রেখে আসবে এই নামের তালিকা।

সুরানার কথা মনে পড়ল। শেষকিরণ সুরানা। এই উৎসাহী ছেলেটিকে ওরা দলে জায়গা দিতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। মনে মনে সে ওদের সঙ্গেই আছে। লেখ ওর নাম। অমিতাভ আসতে পারে নি। ওর তুষার-গাঁইতি, স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক এসেছে। লেখ ওর নাম। ওরা লিখে চলল, অশোককুমার সরকার, উমাপ্রসাদ মুখার্জি, প্রবোধকুমার সান্যাল। সুবলদা, গোষ্ঠিপতি। মণি সেন। হিলারি। লেখ লেখ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং, তেনজিং। না, কারোর সঙ্গেই কোন বিরোধ নেই আমাদের। লেখ, যার নাম মনে আসে লেখ। সেই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই প্রকম্পিত মোমের আলোয় নামের তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। এক একটি মুখ ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সবাই স্মিতহাস্যে যেন ওদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন...হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, হে নির্ভয়...

ওদের মন থেকে সব ভয়, সব আশঙ্কা তিরোহিত হল। আর কিচ্ছু ভাবছে না ওরা। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

"সাব্, চা।"

ওরা চমকে উঠল। আরে, এ যে সকাল হয়ে এসেছে।

লেখকের দিনলিপি থেকে ঃ

বেস ক্যাম্প, ২২শে অক্টোবর। সুন্দর আবহাওয়া। কালকের দুর্যোগের পর আজ এত সহজেই রোদ উঠবে ভাবি নি। সেই হিমালয়ের ঈগলটি আজ নানা কায়দার খেলা দেখাচ্ছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলুম। হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার দিয়ে সে পালিয়ে গেল। ওর এমন তালভঙ্গ হল কেন? ও বাবা, আকাশের চেহারা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাই কী ঈগলটা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল! দেখতে দেখতে দিনের আলো মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীত পড়ল। আকাশে সর্বনাশের ইঙ্গিত। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেলাম। তাঁবু মানে ত্রিপলের ছাউনি। বেলা সাড়ে-বারোটাও না। কিন্তু কী সাংঘাতিক শীত! স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি। তাও কাঁপছি। উপরে ওরা কি করছে, এখন? কিচ্ছু খবর আসছে না উপর থেকে।...

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে ঃ

অ্যাডভান্স বেস, ২২শে অক্টোবর। আক্কেল, পল্টন, গোরা সিং সকালেই ২নং শিবিরে বেরিয়ে গিয়েছে কাঠ, কেরোসিন তেল, চিনি, পিঁয়াজ নিয়ে। আমি, ডাক্তার আর নিমাই তাস পিটছি। এগারটা থেকে একটু একটু করে মেঘ জমতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়া সারার পর বরফ পড়তে শুরু করল। ভীষণ ঠাণ্ডা। তিনটে নাগাত মুষলধারে তুষারপাত আরম্ভ হল। আমরা রান্নাঘরে আগুনের পাশে আশ্রয় নিলাম।...

গোরা সিং-এর বিবরণ ঃ

১নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। ১নং শিবির পরিত্যক্ত। কেউ নেই। আমরা ভূতের বাড়ির মত এই জনশূন্য শিবিরের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। ২নং শিবিরে। ১নং-এ শুধু বরফ, আর বরফ।...

২নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। বেলা সাড়ে-এগারটা। মদন আর বিশ্ব সকাল থেকে পাঁচিলের উপর বসে আছে নন্দাঘুন্টির দিকে চোখ রেখে। ওরা বলেছিল, আজ উঠবে চূড়ায়। দেখা যাক ওদের দেখা যায় কিনা? আবহাওয়া এতক্ষণ বেশ পরিষ্কার ছিল। নন্দাঘুন্টির চূড়া ভালই দেখা যাচ্ছে। কোন পথ ধরে উঠবে ওরা?

বেলা বারোটা। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এখনও নন্দাঘুন্টির শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অভিযাত্রীরই দেখা নেই। বরফ পড়তে শুরু করল। প্রবল হাওয়া। বিশ্ব আর মদন ক্ষুণ্ন মনে শিবিরে ফিরে এল। তুষার-ঝড় চলল কিছুক্ষণ। তারপর আবার আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না। জমাট মেঘে অন্ধ হয়ে থাকল আকাশ। তুষার-ঝড় থামতেই বিশ্ব আর মদন আবার ২নং শিবিরের সেই পাঁচিলটায় উঠে বসল।

বেলা দেড়টা। নন্দাঘুন্টি পাহাড় মেঘে ঢেকে আছে। এখান থেকে কিচ্ছু দেখা যায় না। আর কতক্ষণ বসে থাকবে মদন আর বিশ্ব? শীতে ওরা জমে যাচ্ছে। উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে। ওরা কি আজ চূড়ায় অভিযান চালিয়েছে, না কি এই দুর্যোগে বের হয় নি? আর যদি বেরিয়ে থাকে?...

এতক্ষণ মেঘ নন্দাঘুন্টির গায়ে যেন জমাট বেঁধে ছিল। এখন, ওরা দেখল, মেঘ সচল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় মেঘ উঠছে, নামছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। হঠাৎ মেঘের আবরণ এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে নন্দাঘুন্টির চূড়ার নীচেকার অনেকখানি জায়গা বিশ্ব আর মদনের চোখে ভেসে উঠল। সাদা বরফ আর তার গায়ে—

আরে ও কি? ওগুলো কি? ঐ কালো কালো বিন্দুগুলো? বিশ্বদেব দেখল। মদন দেখল। বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠল। মদন চেঁচাল। দেখ দেখ, ঐ যে ওরা উঠছে। ওরা চূড়ার খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছয়টা বিন্দু। নড়ছে। উঠছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভারী এক মেঘের যবনিকা ঝপ করে কে যেন ফেলে দিল। সে পর্দা আর উঠল না। নন্দাঘুন্টি দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। কাউকে না।

বেলা আড়াইটে। কিচ্ছু দেখা গেল না। শুধু মেঘ।

বেলা সাড়ে-তিনটে। শুধু মেঘের কুণ্ডলী। আলো বিবর্ণ হয়ে আসছে।

বেলা চারটে। নন্দাঘুণ্টি পূর্ববৎ অদৃশ্য। মেঘেরা ক্রুদ্ধ মল্লের মত পাঁয়তারা কষছে।

বেলা সাড়ে-চারটে। দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কিচ্ছু দেখার আশা করা বাতুলতা।

একরাশ উদ্বেগ নিয়ে মদন আর বিশ্বদেব তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল।

৩নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। সুকুমার চা খেয়ে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল। আজ সু-কভারও পরল সে। তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। আঙ শেরিং, আজীবা, টাসী আর নরবু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ তখনও তাঁবুর ভিতরে। দুটো মোজা পরে বাঁ পায়ে জুতো গলাতে পারছে না। পা কষে ধরছে। নানাভাবে চেষ্টা করল দিলীপ। জুতোকে জুত করতে পারল না।

"দিলীপ, আয়।" সুকুমার ডাকল। "দেরি করছিস কেন?"

দিলীপ এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। তারপর ধুত্তোর বলে নিতান্ত গোঁয়ারের মত এক কাজ করে বসল। একটানে একটা মোজা বাঁ পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর একটা মোজা পরেই জুতোর মধ্যে বাঁ পা গলিয়ে দিল। সু-কভার বাঁধল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওরা আজ ক্র্যাম্পনও পরেছে।

বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। রোদ ফুটেছে। সুকুমারের মনটা খুশীতে নেচে উঠল। টাসী, আজীবা আর নরবু আগে বেরিয়ে গেল। আজ কারো কাছেই বিশেষ বোঝা নেই। প্রথম দলটা 'কল'-এর উপর উঠল, তারপর এদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এবার সুকুমাররা যাত্রা করল। প্রথমে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, পিছনে দিলীপ। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা 'কল'-এর উপরে পৌঁছে গেল। হাওয়া নেই। চলতে ফুর্তিই লাগছে। 'কল'-এর পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। ওদিকে যে-সব পাহাড় আছে, তাদের কারোরই চূড়া 'কল'-এর উপরে ওঠে নি। পাহাড়গুলোকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। 'কল'-টা এত উঁচু যে, নীচু দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনেক দূরে পাহাড়-পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। ওদের মনে হল, কেউ যেন এক কাপ জল রেখে দিয়েছে।

দক্ষিণে নন্দাঘুণ্টির গিরিশিরা। টাসী, আজীবা আর নরবুকে দেখা গেল। ওরা পাহাড়ের গায়ে গজাল পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে খাটিয়ে পথ বানিয়ে চলেছে। আজ শুরু থেকেই ওরা দড়ি বেঁধে চলেছে। এক দড়িতে টাসী, আজীবা আর নরবু, অন্য দড়িতে আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। দিলীপকে ছবি তুলতে হচ্ছে, তাই সে আছে সবার পিছে।

ওরা নন্দাঘুণ্টির উত্তর গিরিশিরার পূব দিকের পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে প্রথম কুঁজটার নীচে এসে পৌঁছল। পথটা এত খাড়া, এক দিকে আবার অতলস্পর্শ খাদ যে, টাসীরা এ-পথে দড়ি খাটিয়ে অর্থাৎ 'ফিক্সড রোপ' করে গিয়েছে।

সুকুমাররা নিজের নিজের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁসের সঙ্গে ক্যারাবিনা দিয়ে ফিক্সড রোপ যুক্ত করে দিলে। তারপর বাঁ হাতে ক্যারাবিনা ধরে ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ খাড়া কুঁজের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ওদের আন্দাজ সেই কুঁজটার উচ্চতা ৭০০ ফুট হবে। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একেবারে সরাসরি উঠতে দম বেশী লাগে। তাই ওরা একটু এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। চলার গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। হাঁফ ধরছে বেজায়। তৃষ্ণা পাচ্ছে। গলা বুক শুকিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা এই কুঁজটার উপরে উঠল। দেখল আজীবা, টাসী আর নরবুও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে। ওরাও বসে পড়ল। এই ৭০০ ফুট চড়াইটা উঠতে ওদের সময় লাগল পুরো আড়াই ঘণ্টা। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা যখন আবার উঠতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ হয়েছে। ওরা সেদিকে চাইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও ৪০০ ফুট উঠল। বেলা তখন বারোটা।

সামনে, দূরে বেথারতলির পিছন দিয়ে নন্দাদেবীর সূচীতীক্ষ্ণ শিখর একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। নন্দাদেবীর মাথায় মেঘ জমছে। দিলীপ ফটো নিল। উত্তর দিকে রণ্টি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রণ্টি হিমবাহটাকে মনে হচ্ছে বরফের নদী। দুধের নদীও বলা যায়। পূব দিকে এর আগে বিশেষ কিছু দেখা যায় নি। এবারে বিরাট এক ফাটল দেখা গেল। নিমাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন জায়গাতে বিরাট বড় এক ফাটলের দেখা মিলবে। কী আশ্চর্য, তার কথা হুবহু মিলে গেল। দিলীপ থেমে থেমে ফটো তুলছে। আঙ শেরিং বার বার ওকে তাড়া লাগাচ্ছে। এত দেরি করলে পৌঁছতে পারা যাবে না।

আবার ওরা ভসভসে নরম বরফে এসে পড়ল। এতক্ষণ দুটো দড়ি আলাদা আলাদা যাচ্ছিল, এখান থেকে ওরা দুটো দড়ি একসঙ্গে জুড়ে নিল। এবার ওরা ছয়জন একসঙ্গেই চলতে লাগল। প্রথমে যাচ্ছে টাসী, তারপর আজীবা, তারপর যথাক্রমে নরবু, আঙ শেরিং,

সুকুমার আর দিলীপ। আজীবা টাসীর পিছনে থাকলেও সে-ই প্রকৃতপক্ষে আজ পথ দেখাচ্ছে। আজীবার মত এত ভাল আর বুঝি কেউ বরফ চেনে না। আজীবার নির্দেশেই টাসী পথ বানিয়ে চলেছে।

ওরা আবার বিশ্রাম নিতে বসল। দিলীপ একাগ্র মনে ফটো তুলতে লাগল। সে নীচের দিকে চেয়ে ২নং শিবির দেখতে পেল না বটে, তবে আশেপাশের জায়গাগুলো চিনতে পারল।

আপন মনে ছবি তুলে যাচ্ছিল দিলীপ। অন্য সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় কানফাটানো প্রচণ্ড এক শব্দ শূন্য আকাশ থেকে ওদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দিলীপের পিলে চমকে গেল। হাত থেকে ক্যামেরা ছিটকে গেল। ভাগ্যিস, ক্যামেরাটা গলায় ঝোলানো ছিল, না হলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত।

ধক-ধক বুকে হাত চেপে দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তারপর আকাশের দিকে চাইল। ততক্ষণে অন্য সকলেও আকাশে চোখ তুলেছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে দেখল, ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা জঙ্গী জেট বিমান ছোঁ মেরে ওদের দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পেল না। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া, জেট বিমানের ধোঁয়া, তার পিছনে কুটিল কালো মেঘের দল, তার পিছনে তীব্রগতি তুষার-ঝটিকা সবেগে ওদের আঘাত করল। এই তীব্র, হিংস্র, অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অভিযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার কথাও যেন ভুলে গেল সব।

অবশেষে সংবিৎ ফিরে আসতেই সুকুমার নির্দেশ দিল, "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, বরফে মুখ গুঁজে শুয়ে পড় সব, জলদি।"

মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে সকলে নেতার নির্দেশ পালন করল। তারপর পনেরো মিনিট ধরে চলল তুষার-ঝড়ের অবর্ণনীয় তাণ্ডব। সুকুমারের মনে হল, নরক বুঝি জেগে উঠেছে। নিস্তার পাওয়া শক্ত। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে যাচ্ছে। শরীরের অস্থিমজ্জায় শীত যেন ঢুকে পড়ছে। চোখে-মুখে তুষারঝড়ের হিংস্রতম ঝাপটা এসে লাগছে। মুখের গালের অনাবৃত অংশের চামড়া বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হাওয়ার বেগ কমে এল। শুরু হল তুষারপাত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ২০/২৫ ফুটের বেশী আর দৃষ্টি চলে না। ওরা এবার উঠে বসল। সুকুমার বোধ করল, তার পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে গ্রাহ্য করল না।

আজীবা আর আঙ শেরিং দুজনেই পোড়-খাওয়া শেরপা। ওদের চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। আবহাওয়ার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। বহোৎ খতরনাক হ্যায়। হিসেব করে দেখল এখনও ১৬০০ ফুট উঠতে হবে, তারপর ২৭০০ ফুট নামতে হবে। এই দুর্যোগে। সাব্‌রা নতুন লোক। যদি ফিরতে না পারে? তা হলে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু যদি নাও হয়, বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। অতএব—

আঙ শেরিং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়াই ভাল।

আজীবা পরামর্শ দিল, ফিরে চল সাব্। নরবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। সে বরাবরই চুপ করে থাকে। এতদিনের মধ্যে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনে নি। হঠাৎ সে মুখ খুলল।

বলল, "শুনো সাব্, বাঙালকা ইজ্জৎ তুম্হারা হাত মে হ্যায়। উঠো, চলো উপর, আগু বাঢ়। বাঙালকা ইজ্জৎ বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।"

সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। সে দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "উপরে চল।"

দিলীপের বুক ফেটে যাচ্ছে, সুকুমারের বুক ফেটে যাচ্ছে। আজীবা, আঙ শেরিং, টাসী, এমন কি নরবুও কাহিল হয়ে পড়েছে। জল চাই এখন, এক ফোঁটা জল। না হলে দিলীপ বুঝি মরেই যাবে। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। প্রায় আড়াইটা বাজে। দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। না, এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী, এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতলে জল ভর্তি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

আঙ শেরিং দেখল, দিলীপ ওর জলের বোতলটা উপুড় করে ধরে বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল ওর বোতলে বোধ হয় জল নেই। তাড়াতাড়ি নিজের বোতলটা এগিয়ে দিল। দিলীপ কালবিলম্ব না করে, ছিপি খুলে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এক ফোঁটা জলও গলায় পড়ল না। আগের মতই ভিতরের জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। বার বার একই বিড়ম্বনা। তবু দিলীপ বিরক্ত হল না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।

আঙ শেরিংকে বোতলটা ফেরত দিয়ে সে উঠতে শুরু করল। বেলা আড়াইটা। আকাশে এখনও মেঘ, তবে আগের মত হিংস্র কুটিল নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ছিঁড়ে আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। ওদের দৃষ্টির দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ১০/১৫ ফুট দূরে কি আছে, তাও তারা দেখতে পাচ্ছিল না। এখন অবস্থা একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। ২০/২৫ ফুট পর্যন্ত ভালই দেখতে পাচ্ছে। তার বেশী না।

দুটো কুঁজ পার হয়ে আসার পর থেকে দিলীপের মনে হচ্ছে, চড়াইটা যেন আর তেমন খামখেয়ালিপনা করছে না। একইভাবে উঠে যাচ্ছে। এ তবুও ভাল। এ যেন চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। খামখেয়ালি শুরু করেছে বরফ। বরফ কখনও বেশ শক্ত। এমন শক্ত যে, ক্র্যাম্পনের কাঁটা বেঁধে না। ওরা যেই সেইমত, অর্থাৎ পায়ে চাপ দিয়ে দু-চার কদম এগিয়েছে, অমনি ভস্ভস্—অতর্কিতে নরম বরফের মধ্যে জানু পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওদের। মহা ঝামেলা।

ধীরে, অতিশয় মন্থরগতিতে ওরা উঠে চলেছে। সকাল সাড়ে-আটটায় ৩নং শিবির থেকে বেরিয়েছিল। ছয় ঘণ্টা অবিরাম উঠেছে। উঠছে। তবু চূড়ার দেখা নেই। 'ফিক্সড রোপ' করতে করতে ওদের দড়ি ফুরিয়ে গেল, তবু রাস্তা ফুরোল না। কখনও কি ফুরোবে? ওরা কি পৌঁছতে পারবে নন্দাঘুন্টির শিখরে? সুকুমার যেন প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাঝে মাঝে এখনও হাওয়া বইছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া। সুকুমার বুঝতে পারছে ওর সহ্যশক্তি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সুকুমারের। কিন্তু কোথায়? দেহে, না মনে? পায়ের ফোস্‌কায়, না ব্যর্থতার আশঙ্কায়, সুকুমারের শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন্য সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না। মনে-মনে শুধু একটা কথাই আওড়ে চলেছে, ভেঙে পড়ো না সুকুমার, পথ এখনও বাকী আছে।

সুকুমার স্বেচ্ছায় আর চলছে না। এক অন্ধ শক্তি, একটা প্রবল ইচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় এক তাড়না তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেঙে পড়ো না সুকুমার, ভেঙে পড়ো না, পথ এখনও বাকী। থেমো না সুকুমার। আগে চল।

কে আমি? আমি সুকুমার, সুকুমার রায়, খিদিরপুরের সুকুমার। এখানে কেন? পর্বত অভিযানে। কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগছে? আমার শরীরে কি? আমার গায়ে? আমার পায়ে? নাকি হাতে? নাকি বুকে? ফুসফুসে? হৃদ্‌পিণ্ডে? প্লীহায়, যকৃতে, অন্ত্রে? নাকি মনে? আত্মায়? নাকি জগৎচরাচরে অথবা কোথাও না?

এ কী, থামলাম কেন? আমি থেমে গেলাম নাকি? ওরাও যে থেমেছে। ওরা? হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল সুকুমারের, ওর সঙ্গীরাও আছে। সে একা নয়। মনে পড়ল, সঙ্গে দিলীপ আছে। কোথায় দিলীপ? ঐ যে দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা। দড়ির অগ্রভাগে কে? এতক্ষণ আজীবা ছিল। ঐ যে আজীবা, গুরুতর পরিশ্রমে কাতর আজীবা, দড়ি খুলে ফেলছে। এবারে এগিয়ে গেল কে? টাসী। ঐ যে, আজীবার জায়গায় নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

থেমো না, সুকুমার, আগে চল। আবার চলা শুরু হল। আবার উঠতে লাগল ওরা। উঠছে, উঠছে, একজন পিছনে পড়ল, পিছনের লোক তাকে সামাল দিল। উঠছে, উঠছে একজনের পা ফসকাল, পিছনের লোক ধরে ফেলল। উঠছে, একটু একটু করে উঠছে। থেমো না থেমো না, ওঠো।

টাসী উঠছিল সবার আগে। বহু অভিযানের পোড়-খাওয়া টাসী। দৈত্যের মত ক্ষমতাধর টাসী। সাতাশ বছরের জোয়ান টাসী। সকলের আগে আগে উঠছিল। চড়াইটা একটা সুষম ঢালুতে অবস্থান করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা বেপরোয়া লাফ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল। টাসী থমকে দাঁড়াল সেখানে। খাড়াই-এর উচ্চতা বেশী নয়। ফুট ছয়েক হবে। উপরে একটু কার্নিসের মত। গোদের উপর বিষ-ফোড়া। টাসী আজীবার মুখের দিকে চাইল। আজীবা পলকে তার ইঙ্গিত বুঝে নিল। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কঠিন ভিত্তি তৈরী করে দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর শক্ত মুঠোয় দড়ি ধরে 'বিলে' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আজীবা চোখ ইশারায় টাসীকে ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ়।

টাসী সেই বিপজ্জনক উচ্চতার অস্তিত্ব কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে অসাধারণ তৎপরতায় লাফ মেরে বরফের কার্নিস ধরে ঝুলতে লাগল। একটা মুহূর্ত মাত্র। টাসী তার আঙুলের জোর ফিরে পাবার আগেই তাকে কেউ যেন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল। আজীবা এই মুহূর্তটির জন্যই যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের পলকে সে দড়ির কেরামতিতে টাসীর টলমলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল। টাসী শিশুর মত হেসে উঠল। আজীবাও।

আজীবা আবার ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ় টাসী। টাসী আবার এক লাফ মেরে সেই বরফের কার্নিসে ঝুলে পড়ল। কিন্তু সে বরফ এত নরম, এতই পলকা যে, এবার কার্নিসের খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে টাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজীবা এবারও তাকে সামাল দিল। বার বার কয়েকবার টাসী লাফ দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বার বার সে ব্যর্থ হল। মাঝে মাঝে মেঘ ফাঁক করে আকাশ ওদের ব্যর্থতা এক ঝলকে দেখে নিয়েই আবার চকিতে মেঘের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিল।

ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুণ্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং সে সহজে পথ দেবে না। আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। তুষারবর্ষণও আরম্ভ হয়ে গেল। আবার ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যেটুকু আলোও এতক্ষণ ছিল, তাও কমে যেতে থাকল।

আজীবা দক্ষ সেনাপতির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, কোথায় নন্দাঘুণ্টির দুর্বলতা। সে এবারে টাসীকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে, সেখান থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। টাসী আজীবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক প্রবল লাফে কার্নিস ধরে ফেলল। তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে শরীরটাকে একটা দোল খাইয়েই উপরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভীষণ বেগে কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অজস্র তুষার-কণিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাসী তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে একটা গড়া মেরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে।

এবার টাসী উপর থেকে দড়ি নামিয়ে দিল। আজীবা উঠল। তারপরে নরবু, তারপরে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, দিলীপ। দিলীপের মুভি ক্যামেরা আঙ শেরিং-এর হাতে। দিলীপ হাত কামড়াতে লাগল।

চড়াইটার উপর একটা চাতাল। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল। গোটা দুই তাঁবু অনায়াসে টাঙানো যায়। পশ্চিম প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই ওদের খেয়াল হল, আরে, আর তো ওঠার জায়গা নেই! এই তো চূড়া!

এই তবে চূড়া! চূড়া, চূড়া, নন্দাঘুণ্টির চূড়া!!! হা ঈশ্বর। যাক বাবা, বাঁচা গেল, আর উঠতে হবে না। সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিলীপের বুকের ভিতরে প্রবল এক বিপ্লব। ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা আওয়াজ, প্রচণ্ডভাবে একটা চিৎকার করতে চাইছে দিলীপ। তাহলে সে স্বস্তি পাবে। কিন্তু দিলীপের মুখ দিয়ে একটু সামান্য শব্দও বের হল না।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই শেরপারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর বুকে। কোলাকুলির পর কোলাকুলি। কে যে কার সঙ্গে কতবার কোলাকুলি করল, তার হিসেব রাখল না কেউ। এমনি করে আবেগের উত্তাল ঢেউগুলো ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এরই ফাঁকে দিলীপ ঘড়ি দেখে নিয়েছে—৩-৫ মিঃ। এরই মধ্যে দিলীপ অল্টিমিটার দেখে নিয়েছে—২০,৮০০ ফুট। ২০,৮০০? ওদের অল্টিমিটারে তাই বলল। তবে যে সে পড়েছিল নন্দাঘুণ্টির উচ্চতা ২০,৭০০ ফুট। যাক গে। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছবি তুলতে শুরু করল। শেরপারা ততক্ষণে নিয়ম-রীতি পালন করতে লেগেছে। অশোককুমার সরকার যে জাতীয় পতাকাটি হাওড়া স্টেশনে সুকুমারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সুকুমার সেই পতাকাটি নিজের তুষার-গাঁইতিতে বেঁধে পুঁতে দিল চূড়ায়। শেরপারা রমের বোতল খুলে খানিকটা রম ঢেলে দিলে। কলকাতা থেকে কারা যেন নারকেল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ভেঙে তার জল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, সেই জলও বরফ হয়ে গিয়েছে। দিলীপ আশা করেছিল, নারকেলের জল খেয়ে তেষ্টা মিটাবে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও জমিয়া যায়।

সে ক্ষুণ্ণ মনে রোলিকর্ড ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডার খুলে ছবি নিরিখ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিউ-ফাইণ্ডারটি বরফের গুঁড়োয় ভরতি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে আন্দাজে সেরেফ চোখের নিরিখেই ছবি তুলে গেল।

ওরা এক বাণ্ডিল দড়ি ওখানে গোল করে পুঁতে দিল, তার মধ্যে একখানা জাতীয় পতাকা পেতে, তার উপর সকলের নাম লেখা কাগজখানা রেখে তার উপর পিটন চাপা দিয়ে রেখে দিল।

আঙ শেরিং দিলীপকে ডাক দিল। একটা মগ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "লেও, পিও।"

দিলীপ দেখল তরল পদার্থ। ওর তেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এক চুমুকে সেটা খেয়ে নিল। হায় ভগবান! এ যে রম! নির্জলা রম। ওর গলা বুক জ্বলে গেল। মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। শেরপাদের সে কী হাসি! দিলীপের মনে হল, সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি সে খানিকটা বমি করল। তারপরে মাথার টুপি খুলে ফেলল। মাথায় খানিকক্ষণ বরফ পড়তেই সে খানিকটা চাঙ্গা হল।

তারপর, ওরা নামতে শুরু করল।

দিলীপ ঘড়ি দেখল। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ। আরোহণ যতটা কষ্টসাধ্য, অবতরণও প্রায় তাই। ওরা উঠবার সময় যে রাস্তা বানিয়ে রেখে গিয়েছিল, নতুন বরফ তা ঢেকে দিয়েছে। আবার নতুন করে পথ বানাতে হল। ফলে গতি খুব শ্লথ হয়ে এল। ওরা যে সময় বড় কুঁজটার উপর এসে পৌঁছল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। কিছু দেখবার উপায় নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিপজ্জনক ৭০০ ফুটের খাড়া উৎরাই। বিপদের উপর বিপদ, ওরা যে 'ফিক্সড্ রোপ' করে গিয়েছিল, বরফ পড়ায়

তার চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আঙ শেরিং এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে বললে, এই অন্ধকারে, এই নিদারুণ বিপজ্জনক পথে নামা ঠিক হবে না। এসো আমরা এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই। কাল সকালে নামব। নরবু বলল, আমাদের সঙ্গে তাঁবু নেই, সাব্‌দের যা পোশাক, তাতে রাত্রে এখানে থাকলে পাষাণ হয়ে যাব। মৃত্যু অবধারিত। নামবার সময়ও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয়, এখানে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চাইতে নামবার চেষ্টা করাই উচিত। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাও ভাল।

নরবুর কথাতে সকলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে 'ফিক্সড্ রোপ' পাওয়া গেল। তারপরে শুরু হল এক দুঃসাহসিক অবতরণ। টাসী আগে আগে নামছে। তার হাতে দড়ি, মুখে টর্চবাতি। সে কয়েক ধাপ নেমে একে একে পিছনের লোকেদের নামতে সাহায্য করছে। সুকুমার দেখল, একটা টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নিশ্চিদ্র অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হাওয়া নেই। দুর্যোগের চিহ্নমাত্রও নেই। আছে শুধু শীত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর আকাশে অজস্র তারা।

দিলীপের অদ্ভুত লাগছিল। কী নিস্তব্ধতা! এই জমাট অন্ধকার রাত্রির মতই ঘন সেই নৈঃশব্দ্য। ওর কানে কেউ ভারি সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর এই উজ্জ্বল তারাগুলো কত নীচে ঝুলে আছে। ও যেন ইচ্ছে করলেই একটা তারা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলতে পারে।

আরে, ও কী! দিলীপ চমকে উঠল। ওর দড়িতে ঝাঁকুনি লাগল। একটা টর্চের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা অতি দ্রুত খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বনাশ! সেই শীতেও দিলীপের গায়ে ঘাম দেখা দিল। টাসী পড়ে গিয়েছে।

'ফিক্সড্ রোপ' ধরে নেমে যাচ্ছিল টাসী। হঠাৎ গোটা কয়েক পিটন উপড়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সে ২৫/৩০ ফুট নীচে সোঁ করে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সে দড়ি ছাড়ে নি। তাই বেঁচে গেল। ওকে তুলে আনা হল। পিটনগুলো আবার পোঁতা হল ভাল করে। তারপর অতি সাবধানে নামতে নামতে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময় ৩নং শিবিরে পৌঁছে গেল। তের ঘণ্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সবাই তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা সুরুয়া গরম করে নিয়ে কোনমতে গিলে ফেলল। তারপরে তলহীন নিদ্রার সুগভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল সবাই। *

অমরনাথ

চারুবালা দত্ত

□ *১লা আগস্ট, সোমবার—পাঠানকোট থেকে পহেলগাঁও ঃ*

আজ আমাদের পহেলগাঁও রওয়ানা হওয়ার দিন। বাসে করে যেতে হবে, সুতরাং আগে থেকেই আমাদের জন্য বাস রিজার্ভ হয়েছে। বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে নির্ধারিত বাসে সবাই উঠে বসেছি। দুপুর ১১-১৫ মিনিটে বাস যাত্রা আরম্ভ করেছে। এখানে আমরা গরমে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম। কিন্তু বাস যত উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে, এবং বেলাও বাড়তে সুরু করেছে, ক্রমশ আর গরম বোধ হয়নি। পার্বত্য পথের নানারকম মনোরম দৃশ্য দেখে মন ভরে যাচ্ছে। ক্রমে আমরা জম্মু শহরে এসে পৌছালাম এবং দুপুরের খাবার খেলাম এখানকার ট্যুরিস্ট হোটেলে। মুরগীর মাংস এবং সুগন্ধি আতপ চালের ভাত, যেন অমৃতসমান। পাঠানকোট থেকে জম্মু শহর ৬০ মাইল দূর।

এখানে লক্ষশিলার মন্দির দেখেছি। এখানেই রাম-লক্ষণ-সীতার মন্দির এবং গোপীনাথজীর মন্দির দেখে আবার হোটেলে এলাম। তারপরে আবার গিয়ে দেখলাম দুটি স্ফটিকের শিবলিঙ্গ—একটি বেশ বড়, অন্যটি ছোট। এখানেই আর একটি শিবলিঙ্গ আছে, সেটি মানুষের ডবল আকার এবং গায়ে একটি বৃষের মুখের ছাপ, আর একটি কচ্ছপের ছাপ। এই শিবমন্দির তৈরী হয়েছে রাজা গোপালসিং-এর সমাধির উপর। গোপালসিং ছিলেন জম্মুর রাজা। এখনও তাঁর সুবিশাল রাজবাড়ী এবং অন্যান্য অনেক কিছুই তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। জম্মুর প্রতিরক্ষাবাহিনী খুব বিখ্যাত।

□ *বিকালবেলা—জম্মু থেকে কুড ঃ*

বিকাল ৩-৪৫ মিনিটে আবার বাসে করে কুডের দিকে রওয়ানা দিয়েছি। জম্মু থেকে কুডের দূরত্ব ৬৪ মাইল। রাত ৮টার সময় এসে কুডে পৌছলাম এবং রাতের মত ডাকবাংলোয় আশ্রয় নেওয়া হ'ল। খাওয়ার ব্যবস্থাও এখানেই করা হয়েছে। কুডের উচ্চতা ৫,০০০ ফুট।

□ *২রা আগস্ট, মঙ্গলবার—কুড থেকে বানিহাল ঃ*

আজ খুব ভোরে উঠেছি। বিছানাপত্র বেঁধে বাসের উপরে দিয়ে, বাসে চড়ে বসেছি। ভোর ৫টার সময় আমরা কুড থেকে পহেলগাঁও-এর দিকে রওয়ানা দিয়েছি। কিছুক্ষণ বাদে ৭-৪৫ মিনিটে বানিহালের আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকালের টিফিন হালুয়া ও চা খেয়েছি। এবারে আমাদের বানিহাল টানেল পার হতে হবে। দীর্ঘ ৪ মাইল পাহাড়ের মধ্যে সুরঙ্গ কেটে এই পথ কেবলমাত্র বাস যাতায়াতের জন্যই করা হয়েছে।

আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন সুরঙ্গের মধ্যে তেমন আলোর বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি। যেতে যেতে দেখলাম, তখনও চারদিকে মিলিটারী পাহারায় খোঁড়া খুঁড়ির কাজ চলছে, এবং ভবিষ্যতে যাতে যাত্রীদের জন্য আরও সুব্যবস্থা হয় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু বাস চলার পথকে দূরে তীব্র আলোর নিশানা দিয়ে ঠিক করে দিয়েছে। ঘন অন্ধকারময় টানেলটি অতিক্রম করতে বাসের প্রায় ৫/৬ মিনিট সময় লাগে।

বানিহালের এই গুরুত্বপূর্ণ সুরঙ্গটির নতুন নাম 'জহর টানেল'। এখনও টানেলটির সব কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গা দিয়ে জল পড়ছে এবং উপর থেকে ঠিক বৃষ্টির ফোঁটার মত হয়ে আমাদের বাসের উপরেও পড়ছিল। কুড থেকে বানিহাল ৯০ মাইল।

যাহোক, এই টানেলটি পার হয়ে কোয়াজিদগঞ্জ নামে একটা জায়গায় এসে একটা পাঞ্জাবী হোটেলে মাংস-ভাত খেয়ে দুপুরের ক্লান্তি দূর করলাম।

বেলা ১২-৩০ মিনিটে আবার বাসে উঠে যাত্রা সুরু করেছি। বানিহাল থেকে পহেলগাঁওয়ের দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল। বেলা ২-৩০ মিনিটের সময় আমরা পহেলগাঁও পৌছলাম। বানিহাল থেকে পহেলগাঁও এই ৫০ মাইল পথ কী যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ তা বর্ণনা করা যায় না। পাহাড়ের উঁচুনীচু পথ বেয়ে যখন বাসটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠছিল তখন কত যে বিচিত্র সব সৌন্দর্য-শোভা চোখকে তৃপ্ত করেছে তা কি বলব।

পহেলগাঁও পৌছতে বেশ দেরী হয়েছে। এসেই স্নান করে আরামে চা ও খাবার খেয়ে বিশ্রাম। এখন আমরা স্থান পেলাম ওয়াজীর হোটেলে। এটি পহেলগাঁওয়ের একটি বেশ ভাল হোটেল। এখানকার তিনতলায় ১ নম্বর ঘরে আমরা ৭ জন ছিলাম—মনু, বিজলী, অতুল, লক্ষ্মীবাবু, আমি, শচীনদা ও বৌদি।

খুব আরামে এই ঘরে বাসা বাঁধলাম। ভিতরেই বাথরুম, পায়খানা থাকাতে কোন অসুবিধাই ছিল না। হোটেলের একদম নীচে বেশ চৌকো সবুজ ঘাসপূর্ণ একটা বসার জায়গা ছিল। উপরে চাঁদোয়া ঢাকা থাকাতে এবং চায়ের মজলিশ ওখানেই হ'ত বলে আরও যেন ভাল লাগল।

পহেলগাঁও থেকেই অমরনাথ যাত্রার সব ঠিক করতে হয়। মনু ও আমার জন্য দুখানা ডাণ্ডি ঠিক করা হয়েছিল এবং এইরকম অনেক যাত্রীই ডাণ্ডি ছাড়া অসুবিধা বোধ করত বলে তাদের জন্যও ডাণ্ডির ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সময় সব ডাণ্ডির কুলীরা কাশ্মীর গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করাতে কোন কুলীই পাওয়া গেল না। অথচ হোটেলের নীচে ৫/৬ খানা ডাণ্ডি মোতায়েন দেখছি। একথা শুনে আমরা—ডাণ্ডির যাত্রীরা বড়ই অসহায় বোধ করলাম। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ যাত্রীই ঘোড়ায় যাবে বলে ঠিক হয়েছিল। সুতরাং ঘোড়া-চালকেরা এসে ঐসব যাত্রীর সাথে কথাবার্তা বলে ঠিক করে গেল, আমরা দেখলাম।

আমাদের কপালে এদিন কোন ঘোড়াই ঠিক করা গেল না, কারণ ঘোড়ার খুবই অভাব হয়েছে হঠাৎ ডাণ্ডি ধর্মঘটের জন্য। কী যে করা যায় কিছুই ভাবতে পারছি না। আমি

তো কান্নাই সুরু করে দিলাম, মন খুব খারাপ লাগছে। অথচ আগামী পরশু আমাদের অমরনাথ যাত্রা সুরু করার দিন।

□ *৩রা আগস্ট, বুধবার*

আমরা পহেলগাঁও বাজার থেকে সঙ্গে নেবার জন্য নানারকম টুকিটাকি জিনিস কিনে-কেটে নিলাম। কিন্তু মনটা কিছুতেই শান্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত সকল চিন্তার ভার সেই চিন্তামণির পায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেছি।

রাতে কোনরকমে খেয়ে শুতে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হ'ল না। লক্ষ্মীবাবু ও শচীনদা আমাকে নানারকম প্রবোধ দিয়ে নিজেরা বিকাল বেলায় রাস্তায় গিয়ে আমার ও মনুর জন্য ঘোড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘোড়া পাওয়া গেল না। আমি ও মনু ছাড়া আমাদের ঘরের অন্য পাঁচজন সাথী ঘোড়ার যাত্রী ছিল।

□ *৪ঠা আগস্ট, বৃহস্পতিবার—চন্দনবাড়ী, উচ্চতা ৭০০০ ফুট ঃ*

আমরা আজ সবাই খুব সকালে উঠে নীচে চলে এসেছি। খুব সকালেই চন্দনবাড়ীর দিকে রওয়ানা হব। আমাদের চোখের সামনে যাত্রীরা সব যে যার ঘোড়ায় উঠে বসেছে রওয়ানা দেবার জন্য। বেচারা আমি ও মনু দুখানা ডাণ্ডির মধ্যে বসে এইসব দৃশ্য দেখছি। ঐসব যাত্রীরা হোটেলের গেট পার হয়ে চলে গেল, আমি তখন ঠিক ছেলেমানুষের মত কান্না শুরু করেছি। মনু কিন্তু আমার কান্না দেখে খুব হাসতে আরম্ভ করেছে। অথচ ওর মনেও তো আর কম কষ্ট হয়নি! এদিকে ফকীরবাবু ও বাদল আমাদের জন্য কোনরকমে দুটো ঘোড়ার খুবই চেষ্টা করছে। তারপর বাদল, সুকুমার ও শান্তিবাবু চন্দনবাড়ীর দিকে চলে গেল অন্য যাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য। আমরা বেচারার মত সারাদিন কেবল নীচে বসে ভাবছি, কী হবে?

ভাবনার আর শেষ নেই। হঠাৎ ফকীরবাবু এসে বিকেলে বললেন যে আমাদের জন্য দুটো ঘোড়া পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু তারা এখানে আসবে না, আগামীকাল রাত থাকতেই আমাদের সঙ্গে নেবার সব জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে ঘোড়াওয়ালাদের বাড়ী যেতে হবে। আমাদের সাথে যাবে বলাই। আমরা তাতেই রাজী হলাম। পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ীর দূরত্ব ১০ মাইল।

□ *৫ই আগস্ট, শুক্রবার—শেষনাগ ঃ*

মনু ও আমি অন্ধকার থাকতেই উঠেছি। সঙ্গে নেবার জন্য একটা থলিতে করে সব জিনিসপত্র এবং গায়ে দেবার গরম জামা ইত্যাদি নিয়ে বলাইয়ের সাথে রওয়ানা হলাম ঘোড়াওয়ালাদের আস্তানায়। হোটেল থেকে প্রায় এক মাইল হেঁটে অন্ধকারে শীতের মধ্যে কোনরকমে ঘোড়াওয়ালাদের কাছে এসে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হওয়ার জন্য তাগাদা আরম্ভ করে দিয়েছি।

আমার ঘোড়াওয়ালার নাম ছিল রমজান খিরি। কি যেন একটু গণ্ডগোলের জন্য সে আর আমাদের নিতে চাইল না। অবশ্য তার আপত্তির মধ্যে প্রধান ছিল আমার বপুর ওজন। ওর ঘোড়ায় আমাকে নিতে রাজী হয় না। মনু তো হালকা পাতলা, তাই রমজান মনুকেই নিতে রাজী। অথচ মনু অন্য একটা ঘোড়া ঠিক করেছে। সে যাই হোক, বাবা-বাছা বলে রমজানকে রাজী করিয়ে আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠে রাস্তা চলতে সুরু করলাম। শীতের মধ্যে অতি ভোরবেলা আমরা দুজন যাত্রী ঘোড়সওয়ার হয়ে চলেছি, আর সাথে আছে বলাই। আমরা দুজনে অন্য যাত্রীদের থেকে একদিন পিছিয়ে রওয়ানা হয়েছি, কাজেই আমাদের একদিনেই দুদিনের পথ অতিক্রম করে অন্যদের সাথে মিলতে হবে। চন্দনবাড়ী থেকে শেষনাগ ৮ মাইল পথ। এই ১৮ মাইল পথ একদিনেই আমাদের ঘোড়ায় করে যেতে হবে।

'জয় বাবা অমরনাথ' বলে বেশ উৎসাহে যাত্রা সুরু করেছি। একটা কাঠের পুল পেরিয়ে যখন ঘোড়া ক্রমশ উঁচু দিকে যাচ্ছে তখন একটু ভয় করেছে, কারণ দেখলাম, রাস্তা ক্রমশ খুবই উঁচু এবং একদিকে ভয়াবহ খাদ। আমাদের যাওয়ার পথে কত যে মিলিটারীরা সুবন্দোবস্ত করার জন্য যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। যত উঁচু দিকে যাচ্ছি, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ততই যেন কঠিন হাতে যাত্রা পথের সুব্যবস্থা করতে তৎপর। এইসব দেখে আমরা অনেক নির্ভয় হলাম। ক্রমে আমরা চন্দনবাড়ীতে পৌঁছালাম।

নানা দেশের নানা জাতির ভিড়ে আর যেন স্থান নেই, অথচ আমাদের কোন যাত্রীই সেখানে ছিল না। কেবলমাত্র বাদল আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করছিল। আমাদের পৌঁছতে দেখেই সে চা ও খাবার এনে দিল।

তারপরেই আবার যাত্রা সুরু করেছি। চন্দনবাড়ী থেকে যখন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রমজান বলল যে সামনে খুব খাড়াই-পথ বেয়ে উঠতে হবে। সেই পথটার নাম পিসু চড়াই। এর উচ্চতা ১০,৫৫০ ফুট। এখানকার প্রকৃতি অতি রুক্ষ। রাস্তাটা কেবলই ছোট-বড় পাথরের ঢিবি দিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠেছে। কোনরকম গাছপালা বা সবুজের নামগন্ধও নেই।

অথচ, ঐ ভয়ঙ্কর পথে ঘোড়ার উপরে একা আমাদের ছেড়ে দিয়ে লোকগুলো যে কোথায় উধাও হয়েছে বলা যায় না। আমি তো ভয়ে অস্থির। এ-হেন পথে চালকবিহীন ঘোড়ায় চড়া আর যমের সাথে চলা প্রায় একই রকম। ঘোড়ার পা যদি একটুও এদিক-ওদিক হয় তবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রমজানকে প্রাণপণ ডাকছি, কোথা থেকে যেন অস্পষ্ট জবাব আসছে, "মাঈজী ফিকারো মৎ, ঘোড়ে আপসে চলেগা।"

আমার মেজাজ তখন তিরিক্ষি, ভয়ে আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। হঠাৎ একটি ছোট ছেলে এসে আমার ঘোড়ার লাগামটা ধরেছে। মনে হল ঐ বালকটিই তখন আমার ভগবান। সে প্রাণপণ চেষ্টায় আমাকে বোঝাচ্ছে যে, এই পথের পরে আর কোথাও কাঠ বা শুকনো ডালপালা পাওয়া যাবে না, যা দিয়ে কুলীরা উপরে উঠে রান্না করবে। সুতরাং রমজান

তখন কাঠ কুড়োতে পাহাড়ে গিয়েছে। যাহোক ছেলেটিকে পেয়ে আমার রমজানের দুঃখ গিয়েছে। এই সুযোগে মনু আমার চাইতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে এবং উপরে উঠে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কিছু সময় পরে মনুকে পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি, মনুও আমার বেঁচে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ঘোড়ায় উঠে আবার চলেছি, আর পিছন থেকে রমজানও এসে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে কাঁধে এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে।

পিসু চড়াই-এর পরেই রাস্তাটা খুব উঁচু-নীচু। আমি তখন ঘোড়া থেকে নেমে লাঠির সাহায্যেই ঐ ভয়াবহ রাস্তাটা পার হলাম। এ পর্যন্ত আর অন্য কোন দিকেই খেয়াল ছিল না। এখন দেখছি যে কত বৃদ্ধ, কত বৃদ্ধা, এমন কি কানা, বোবা, খোঁড়া কত যাত্রীই না অমরনাথ দর্শনের জন্য যাচ্ছেন ঐ পথেই লাঠির সাহায্যে। কে তাদের তুলে নিয়েছে? দেখে আমিও মনে অনেক শক্তি পেলাম।

ক্রমশ আবার ঘোড়ার পিঠেই সমানে চলেছি শেষনাগের দিকে। শেষনাগের উচ্চতা হ'ল ১২,৩০০ ফুট। আমরা ক্রমশ উঁচু দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু এখন পথটি মোটামুটি ভালই।

অনেকটা এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে একটা ছোট নদী বয়ে যেতে দেখলাম। তার জলের রং অদ্ভুত, ঠিক যেন দুধ ও নীলকালি-গোলা জল।

পথের শোভা মনমাতানো। পাহাড়গুলো একদম নেড়া। কোন গাছপালা বা পাখী কিছু চোখে পড়েনি। কেবল পাহাড়ের নীচে অনেকটা জমি জুড়ে ছোট ছোট হলুদ ফুলে যেন জায়গাটা ঢাকা হয়ে আছে। আর এরই রং যেন সূর্যের আলোতে প্রতিফলিত হয়ে যাত্রীদের দেখার আনন্দ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু রমজান বলল যে এই হলুদ ফুলগুলো খুবই বিষাক্ত, ওদের ঘ্রাণে মানুষের দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। সেইজন্যই ঘোড়াওয়ালারা চেষ্টা করে যাতে ঐ রাস্তাটা সূর্যাস্তের আগেই শেষ করা যায়।

ক্রমে আমরা শেষনাগ লেকের কাছে এসেছি। তখন আর ঘোড়া থেকে না নেমে পারলাম না। মনুও তার ক্যামেরা নিয়ে নীচে নেমেছে আর বহু ফটো তুলেছে। দূরে শেষনাগ পাহাড়ের একাধিক চূড়া সাদা বরফে ঢেকে যেন রূপার মুকুট পরে আছে, মাঝে মাঝে কিছু মেঘ জমা, এবং সূর্যের আলো পড়ে এক অপরূপ রূপের মেলা মিলিয়েছে।

নীচে শেষনাগ লেকটিও তার নিজের রূপ দেখিয়ে যাত্রীদের যেন আকর্ষণ করছে। সামনের দিকে এগোবার-পথে পিছনে যে নদী দেখে এসেছি, সেটি এর থেকেই বয়ে গিয়েছে। হ্রদের জল আরও ঘন, দুধ ও নীলের আভাযুক্ত, কোন কম্পন বা চঞ্চলতা সে জলে নেই। এখানে অক্সিজেন অত্যন্ত অল্প।

এই লেক সম্বন্ধে একটি ভারী মজার গল্প আছে। এখানে নাকি একটা ভয়ঙ্কর দানব থাকত এবং পথচারীদের নানাভাবে উৎপাত করে মেরেও ফেলত। দেবতারা এ অন্যায় অত্যাচার সহ্য না করে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে এই কথা বলার পরে তিনি অধর্মের দমনের জন্য নাগদেবতাকে এই শেষনাগ হ্রদ রক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই

থেকেই নাগরাজ নাকি এখানে পাঁচ-মাথা বিরাট সাপ হয়ে আছেন। অনেক সময় নাকি যাত্রীরা সেই সাপকে দেখে পুণ্যার্জন করেন। আমরা অবশ্য নাগরাজের দর্শন পেলাম না।

ক্রমশ বেলা-শেষের দিকে রোদ কমার সাথে সাথেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হ'ল। মনু খুবই অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু পথ না চলে উপায় নেই। কোথাও মাথা গোঁজার স্থান দেখা গেল না। আকাশে মেঘও তার স্বরূপ দেখাবার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং সেই অবস্থাতেই আমরা চলেছি। শুনছি যে, আজ আমাদের জন্য যে রাতের আস্তানা হয়েছে তা আর বেশী দূরে নয়। অথচ অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গিয়েছে, দূরের কিছু দেখা যায় না। কেবল শেষনাগ পাহাড়ের বিস্তীর্ণ বরফ দূরে চকচক করছে।

টর্চ নিয়ে কোনরকমে তো আমাদের তাঁবুতে পৌঁছলাম। তখন মনে হ'ল এই বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। কিন্তু বাবা অমরনাথের মহাকৃপায় সেটা আর হ'ল না। আমরা অসম্ভব ক্লান্তিতে কোনরকমে চুপচাপ শুয়ে পড়েছি। অতুল ও বিজলী যে আমাদের কী যত্ন করে সেবা করেছে, তা কোনও দিন ভুলে যাব না।

আমাদের ক্লান্তির আর দোষ কি? আজ পহেলগাঁও থেকে ভোর ৫টার সময় এই দুরূহ পাহাড়ে-পথে রওয়ানা দিয়ে একদিনেই একদম শেষনাগ আসতে হয়েছে। পহেলগাঁও থেকে শেষনাগের দূরত্ব ১৮ মাইল। অন্যান্য যাত্রীরা যেখানে দুদিন বসে শেষনাগে এসেছে, তা আমাদের একদিনেই কাবার করতে হয়েছে। তাতে আবার এ-হেন অক্সিজেনশূন্য রাস্তা ও ঐরকম মৃত্যুগ্রাসী পিসু চড়াই। কিছুসময় পরে চোখ খুলেছি,, একটু ভাল মনে হ'ল। কিন্তু মুখ, চোখ এবং সর্বাঙ্গ ফুলে এক রাবণমূর্তি হয়েছে। তবু যাহোক এই সান্ত্বনা যে দলের সঙ্গে এসে মিলেছি, এবং এবারে সকলের সাথেই অমরনাথ দর্শনে যেতে পারব।

আমি আর মনু ছাড়া সবাই তাঁবুর বাইরে শেষনাগের অপরূপ শোভা দেখার জন্য বেরিয়েছে। পূর্ণিমা তিথি কাছেই, তাই তখন নাকি বাইরের শোভা দেখার মত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ-হেন প্রকৃতিকে দেখার থেকে বঞ্চিত করেছে আমাদের পথের ক্লান্তি।

রাতে মোটেই ঘুম হয়নি। বৃষ্টিতে পড়ে ঘোড়া ও কুলীদের কষ্টের অবধি ছিল না। আমাদের কুলী ও ঘোড়াওয়ালা কেউ কেউ তাঁবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছে।

☐ *৬ই আগস্ট, শনিবার—পঞ্চতরণী যাত্রা ঃ*

আজ ভোরবেলা তাঁবুর বাইরে এসেছি। এখন আর তেমন কষ্ট নেই। রোদ উঠেছে এবং অক্সিজেনের অল্পতাকে একটু লাঘব করে যাত্রীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

এখানেই আমাদের জন্য খিচুড়ি ও পাঁপড়ভাজা হয়েছে। মুখ-হাত-পা কোনরকমে ধুয়ে খেতে বসলাম। বেলা ৯টার সময় এই শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর দিকে রওয়ানা দিতে হবে। মনু তার ক্যামেরা নিয়ে শেষনাগ পাহাড়ের তুষারঢাকা চূড়ার ফটো তুলছে।

শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল হবে। আমরা ঘোড়ার চড়ে এই পথে আসতে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করেছি। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ঘোড়ার পিঠ থেকে সবাই নামতে বাধ্য হলাম, তাই পায়ে হেঁটেই চলেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না, কিন্তু কোন কোন জায়গায় বরফের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে যে ভয় হয়েছে, তারও তুলনা মেলে না।

সামনেই আছে আর এক প্রচণ্ড চড়াই তিন মাইল রাস্তা। এর উচ্চতা ১৪,৬০০ ফুট। এ রাস্তাও পার হতে হবে। বাবা অমরনাথই পার করবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই হাঁটতে সুরু করেছি। এখন হাতের লাঠি আমাদের একমাত্র ভরসা। এই উঁচু রাস্তা হ'ল মহাগুণাপাস বা বায়ুযান। এখানে অক্সিজেন মোটে নেই বললেই চলে, সেইজন্যই মাথা ভার ভার লাগে এবং নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়।

অবশেষে এক মহাশক্তির আবেশে যখন তিন মাইল চড়াই পেরিয়ে উপরে উঠেছি, তখন আর আনন্দের সীমা নেই।

সেই উপরের জায়গাটি পাহাড়ের উপরের সমতল জায়গা। এখানে অনেক অস্থায়ী দোকান সাজিয়ে দোকানীরা চা ও খাবার বিক্রি করে পথিকদের শ্রান্তি দূর করে। চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা পর্যন্ত আছে। আমরাও এ সুযোগ ছেড়ে দিলাম না। দিব্যি চেয়ার-টেবিলে বসে বিশ্রাম করার সাথে সাথে চা ও নানারকম খাবার খেয়ে নিলাম।

উঁচুতে ওঠার ক্লান্তি অনেক কেটেছে। আবার যেন নূতন শক্তি পেলাম—যেন অমরনাথের স্নেহের পরশপূর্ণ আশীর্বাদ। এই পর্যন্ত আমরা পহেলগাঁও থেকে ২১ মাইল দুরূহ পথ উঠে এসেছি।

এখান থেকে আবার চলেছি। এবারে যাব পঞ্চতরণীতে। শেষনাগ থেকে পাঁচটি ধারা এখানে একত্রে মিলিত হয়েছে বলে এখানকার নাম পঞ্চতরণী।

নদীর ধারার সাথে জায়গাটি ক্রমশ সমতল এবং এখানে জলের খুব সুবিধা। অমরনাথ-দর্শনের পথে এই জায়গাটিই শেষ তাঁবু ফেলার জায়গা। সুতরাং আজকের রাতের মত এখানেই বসবাস করতে হবে। শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী ৮ মাইল পথ।

সকালবেলা ৯টার সময় রওয়ানা দিয়ে বেলা ১-২৫ মিনিটে এসে এই পঞ্চতরণীতে পৌঁছেছি। এই জায়গায় এসেই একটু বিশ্রামের জন্য ওয়াটারপ্রুফ পেতেই শুয়ে পড়েছি।

এখানকার চারদিক দেখে খুবই ভাল লাগছে; কারণ, এখানে না আছে জলকষ্ট, না অক্সিজেনের অভাব। আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ। এসে অবধি সকলে মিলে চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখেছি। নদীর স্রোতে স্নান করেও বেশ ভাল লাগল। আগামীকাল পূর্ণিমা, আমাদের যাত্রা সুরু হবে অমরনাথের গুহার দিকে। সেই আনন্দেই মশগুল।

৭ই আগষ্ট রবিবার, শ্রাবণী-পূর্ণিমা :

আজ সেই আকাঙ্খিত দিনটি এসেছে। অমরনাথশিব দর্শনে যাব। আগেই সব মালপত্র বেঁধে কুলীর কাছে দিয়েছি। সাধারণ পূজার উপচার কাঁধের ঝুলিতে নিয়ে বহু আশা নিয়ে

ঘোড়ার পিঠে করে রওয়ানা হয়েছি ভোর ৪-৩০ মিনিটের সময়। রওয়ানা দেবার সময় যাত্রীরা সব একসাথেই ছিলাম, কিন্তু প্রায় মাইলখানেক পথ যাওয়ার পরেই মিলিটারী পুলিস এসে আর ঘোড়া যেতে দিল না। সুতরাং সকলের ঘোড়াই নীচে থাকল, আর আমরা সকলেই পায়ে হেঁটে লাঠি নিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছি। নিয়ম হ'ল যে, পায়ে-হাঁটা যাত্রীদের সবচাইতে আগে ছাড়ে। তারপরে ডাণ্ডি (এবারে ডাণ্ডি ছিল না), আর ঘোড়ার যাত্রীরা সবার শেষে চলে। সুতরাং আমরা পায়ে হাঁটার যাত্রী হিসাবেই আগে চললাম। কিন্তু কিছুটা পথ বেশ ভালভাবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পায়ে এমন ব্যথা ও শিরটান ধরল যে আর যেন পা চলে না। অতুল বলে ছেলেটি হঠাৎ আমার চলার পরিবর্তন দেখে সাহায্য করার জন্য আমার পাশে-পাশেই ছিল, অর্থাৎ ওর কাঁধে এবং লাঠির উপর ভর রেখে আরও প্রায় এক ফার্লং পথ উপরে উঠেছি। কিন্তু তারপর এক জায়গায় বসে পড়তে বাধ্য হয়েছি। অতুল আমার সাথে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু এ-হেন কষ্টের পথে আমি তাকে জোর করেই পাঠিয়ে দিলাম ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

নীচে থেকে সবাই এসে ক্রমশ উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায়-চড়া যাত্রীও সবাই প্রায় উপরে উঠে এল, কিন্তু তখনও খালি ঘোড়া আর দেখতে পাচ্ছি না। আমার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। মনে মনে বললাম, বাবা অমরনাথের বুঝি ইচ্ছা নেই আমাকে দর্শন দেবার। প্রচণ্ড অভিমানে চোখের জলের ধারাকে আর রুখে রাখা গেল না। এও বুঝি ভগবানের একরকম পরীক্ষা। আমার ডান পা একেবারেই অচল হয়ে গিয়েছে। অনেকবার হাঁটার চেষ্টা করেছি কিন্তু পা বাড়াতেই পারা গেল না। সুতরাং আবার এসে বসেছি। এবারে বসামাত্র উপর থেকে একখানা প্রায় দু-সের ওজনের পাথর গড়িয়ে এল। ঠিক এক চুলের জন্য আমার মাথায় পড়েনি, এও তো ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।

আমাকে কাঁদতে দেখে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে, এমনকি কুলীরা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ বাদেই দেখি বিরাট এক ঘোড়ায় করে একজন বাঘা মিলিটারী অফিসার যাচ্ছেন। আমাকে ঐ অবস্থায় কাঁদতে দেখে ঘোড়া থেকে নামলেন, এবং আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর এই স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি দেখে আমি যেন আর কথা বলতে পারছি না। কান্নায় আমার গলা বন্ধ হয়েছে আর অনর্গল চোখের জল পড়ে কাপড় ভিজে যাচ্ছে। তবু কোন রকমে ইংরাজী হিন্দী মিশানো ভাষা দিয়ে আমার দুঃখের কারণ তাঁকে বোঝালাম। অনেক মিলিটারী, পুলিস ও কুলীরা এসে গিয়েছে। কিন্তু ঐ বড় বাঘা অফিসারের তো আর সময় নষ্ট করা চলে না! কারণ উপরের লোকেদের সুবন্দোবস্ত করাও তাঁর কাজ। আমাকে অনেক প্রবোধ দিলেন এবং ২।৩ জন কুলীকে উপরে পাঠিয়ে বলে দিলেন যে কোন মিলিটারী পুলিসের ঘোড়া এনে যেন আমাকে অবশ্যই উপরে নিয়ে যায় খুব সাবধানে।

এই অর্ডার দিয়ে এবং আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি উপরে উঠে গেলেন। মিনিট কুড়ি পরেই চমৎকার একটা ঘোড়া নিয়ে একজন লোক এল, আর আমার কাছে এসে হেসে দাঁড়াল।

আমি তা দেখে আহ্লাদে আর একচোট কেঁদেই ফেলেছি। আমাকে ঘোড়াওয়ালা বহুরকমে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "মা, আমি তোমার ছেলে। তুমি আমার সঙ্গে চল, খুব আরামে ও সাবধানে তোমাকে অমরনাথ দর্শন করাব। বাবুসাহেব আমাকে এই হুকুম দিয়েছেন।"

লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম, ওর নামও রমজান। আমাকে দুজনে মিলে খুব সাবধানে ঘোড়ার পিঠে বসাল. এবং বহুযত্নে ঘোড়ার লাগাম ধরে ও আমাকে ধরে ধরে উপরে নিয়ে চলেছে।

আমার তখন কোনও দিকে আর দৃষ্টি নেই। ভাবছি যে আমার মত এত বড় আশীর্বাদ তো আর কেউ পায়নি। ভগবানের উদ্দেশে মাথা নত হয়ে গেল এবং তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি। মিলিটারী অফিসার এবং ঘোড়াওয়ালাকে মনে হ'ল—এঁরা অমরনাথ-প্রেরিত দূত। এছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তখন আমার মাথায় ছিল না।

উপরে গিয়ে এক জায়গায় দেখা হ'ল মিলিটারী অফিসারের সাথে। আমি ঘোড়ায় বসেই আমার কৃতজ্ঞতার নমস্কার তাঁকে জানালাম. এবং তিনিও প্রতি-নমস্কারে তাঁর কৃতকার্যতায় খুশী হয়ে হেসে হাত বাড়িয়ে আমাকে যাত্রাপথে অভিবাদন করলেন।

বারে বারেই মনে হয়েছে—আজ আমার মত সুখী ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত আর কে আছে?

ক্রমশ, অনেক দুরূহ পথ অতিক্রম করে যখন ঘোড়া আবার নীচের দিকে নামতে থাকল—দেখতে পেলাম, গুহায় পৌঁছানোর প্রায় মাইলখানেক আগে পর্যন্ত অনেকখানি চওড়া জায়গা সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা।

রমজান আমাকে ঘোড়ায় করে নিয়ে একদম গুহার কাছে পৌঁছাল। আমাকে দেখতে পেয়ে মনু ও অন্যান্য সাথীরা নিশ্চিন্ত ও খুশী হয়েছে। বাদল ও রমজান ধীরে ধীরে আমাকে গুহার উপরে নিয়ে গিয়েছে, তাই ভালভাবে দর্শন করতে পেরেছি। যাত্রীর ভিড় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আমার কোন কষ্ট হয়নি।

ভিতরে গিয়ে আনন্দে আমি একটা কাণ্ডই করেছি। গিয়ে দেখি, তিনটি দেবতা আছেন এবং প্রত্যেককে আলাদা করে পূজা দিতে হয়। অথচ, মিছরি আছে আমার কাছে বড় এক চাকা। তাকে ভাঙ্গতে হবে। আমি ন্যাকড়ার মধ্যে জড়িয়ে দেবতা গণেশজীর মাথার উপরেই ঘা মেরে ঐ মিছরি তিন ভাগ করেছি। ভাগ্যিস তিনি রাগ করেন নি।

অপূর্ব দর্শন! ঢুকেই ডান দিকে বরফের বিরাট এক স্তূপ—ইনি গণেশজী। তারপর বেশ উঁচু একটি বরফের শিবলিঙ্গ—বেশ উঁচু, প্রায় ৫।৬ ফুট হবে। ইনিই অমরনাথ। তাঁর পিছনে বাঁ দিকে দেবী পার্বতীও বরফের তৈরী। গণেশজীর থেকে একটু উঁচু এবং কিছু লম্বা।

যাই হোক, আরাধ্য দেবতাকে দর্শন ও পূজা করে আবার চলে আসছিলাম, এই সময়েই কলরব শুনে পিছন ফিরে দেখি, দুটি কালো রঙের পাখী মন্দিরে ভোগের কাছে বসেছে। একটি তখনই উড়ে গেল, আর একটি কিছুসময় বসে উড়ে গেল। এই কালো পাখী দুটিই হলেন হরপার্বতী।

এত ঠাণ্ডা বরফের মধ্যে এপর্যন্ত কোন প্রাণীর আর সাড়া বা দেখা পাইনি। আশ্চর্য এই পাখী দুটি কোথা থেকে ঠিক ভোগের সময় আসে! অতি আশ্চর্য ভগবানের লীলাখেলা। কত রূপে এবং কতভাবেই না তিনি মানুষকে দেখা দেন, এবং সবাইকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করেন!

দর্শন করার পরেই মনু ওরা কতভাবেই না আমাকে সুস্থ করেছে। গুহা থেকে নীচে নেমে এসে এক জায়গায় জড় হয়েছি। ইতিমধ্যে আমার ঘোড়া ও শ্রীমান রমজান খিরি উপরে উঠে এসেছে, কিন্তু আমাকে ওর ঘোড়ায় করে উপরে না তুলতে পারার জন্য সে খুবই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল।

এবার দ্বিতীয় রমজানকে বিদায় দিতে হবে। ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও এমনই মিষ্টি স্বভাবের লোক যে আমাকে ওর ঘোড়ায় নিয়ে আসতে পারাতে যেন কতই খুশী হয়েছে।

পহেলগাঁও-এ আমি কোথায় থাকব বলে দিলাম এবং আমার সাথে দেখা যেন নিশ্চয় করে, বলে দিয়ে আমার পুত্রসম দ্বিতীয় রমজানকে বিদায় দিলাম। মনটা খুবই খারাপ লাগছিল।

আজই আমাদের এ:ং উঁচু পাহাড়ে-পথ চড়াই ভেঙ্গে উতরাই করে নেমে যেতে হবে। পথের কথা ভাবতেও ভয় পাচ্ছি। এবারে আর নামার পথে পঞ্চতরণী বা শেষনাগে রাত কাটানো হবে না। জজপাল নামে একটা জায়গায় সোজা যেতে হবে। সুতরাং আর কথা নয়, ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে চলতে সুরু করেছি। আবার সেই মহাগুণাপাসের ৩ মাইল খাড়াই পথ নামতে হবে। ভাবলেও কেমন যেন ভয় হয় এখনও।

যাই হোক, আমরা অমরনাথ-দর্শনের আশীর্বাদ নিয়ে নির্বিঘ্নে সব পথ চড়াই-উৎরাই করে সন্ধ্যা ৭টার সময় জজপাল পৌঁছালাম। একই দিনে অতটা পথ ওঠানামা করাতে বড়ই অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কোনরকমে তাঁবুর মধ্যে বিছানা করে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। শরীরটা একটু ভাল লাগার পর রাতে সাধারণ একটু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

❑ *৮ই আগস্ট, সোমবার—আবার পহেলগাঁও ঃ*

গতকাল রাত প্রায় ৩টা পর্যন্ত ভাল ঘুম হ'ল না। অত্যন্ত বেশী পরিশ্রমই ঘুম না হওয়ার কারণ। চা ও খাবার খেয়ে সকাল ৬-৩০ মিনিটে জজপাল ছেড়ে চলেছি পহেলগাঁও-এর দিকে। নামার পথে আবার পিসু চড়াই উতরাতে হবে। কিন্তু, একেবারে লাঠি ও নিজের উপর ভর রেখে। এদিক-ওদিক হলেই মরণের পথে। সুতরাং সবাই ভগবানের নাম নিয়ে পিসু চড়াই থেকে নেমেছি।

এবারে ঘোড়ায় করে আবার লম্বা পথের যাত্রী আমরা। প্রায় ৬ ঘন্টা নানা উঁচুনীচু বিপজ্জনক পথ পার হয়ে পহেলগাঁও এসে পৌঁছালাম। এবার চলেছি বেশ সরল পথ ধরে আমাদের হোটেলের দিকে। কিছুদূর এসে একটা কাঠের পুল পার হবার সময় একদল

সন্ন্যাসী আমাদের ঘোড়া থেকে নামতে অনুরোধ করল এবং একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম করতে বলল। প্রতিটি ফিরে আসা যাত্রীকে এরা পুরি, হালুয়া ও জল দিয়ে পথশ্রান্তি কিছুটা লাঘব করে। এটাই এদের ধর্ম। আমরা খেয়ে সত্যই যেন একটু শক্তি পেলাম।

আবার চলেছি। এবারে দেখা হ'ল আমার সেই দ্বিতীয় রমজানের সাথে। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সে এই চলার পথে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকে দেখে খুব আনন্দ পেলাম এবং পেট ভরে খাওয়ার জন্য তাকে কিছু দিলাম।

আবার চারদিন আগে ছেড়ে যাওয়া হোটেল ওয়াজীরে এসেছি। মাথায় সাবান দিয়ে বেশ করে স্নান করেছি। বিকাল প্রায় ৪টার সময় ভাত খাওয়া হয়েছে আজ। গা-হাত-পায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। রমজানকে দিয়ে গা-হাত-পা একটু টিপিয়ে নিয়েছি। তারপরে রমজানকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দিলাম। বকশিশ পেয়ে খুব খুশী হয়ে সে চলে গেল।

ঘুমাবার চেষ্টা করেও ঘুম এল না। সন্ধ্যার সময় উঠে একটু বাজারের দিকে বেড়াতে গেলাম। এখান থেকে এক কৌটা মধু ও কয়েকটা কমদামী সোয়েটার এবং অনেকগুলো গাব্বা কিনে হোটেলে এলাম। আগামীকাল আমাদের পহেলগাঁও ছেড়ে যেতে হবে। এমন প্রকৃতির শোভাপূর্ণ মনোরম জায়গা ছেড়ে যেতে খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু, আমরা যে চলার পথের যাত্রী, তাই চলতেই হবে।*

সেকালের যোশীমঠ

জলধর সেন

২৭ মে, বুধবার,—আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটীতে ছিলুম সেখানে হোতে যোশীমঠ মোটে পাঁচমাইল মাত্র কিন্তু এই পাঁচমাইল আসতেই আমাদের সময় লেগেছিল। যোশীমঠ যখন আর প্রায় এক মাইল দূরে আছে, সেই স্থানে এসে দেখলুম, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে চোলে গিয়েছে; আরো দেখলুম যে বেশীর ভাগ যাত্রী আসছিল দুই একজন বাদে সকলই সেই পথে নেমে গেল। তারা কোথায় যায় জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লুম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা যে পথে যাচ্ছি, এইটি যোশীমঠের পথ। যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণদর্শন কোর্ত্তে যায় না, তারা ঐ নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চোলে যায়; তারপর নারায়ণ দেখে ফিরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে। সেও যে সকলে আসে তা নয়। আমাদের এই রাস্তা থেকে একটা প্রকাণ্ড 'উৎরাই' (দেড়মাইলের বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ।

নারায়ণ দর্শনে অনেক যাত্রীই যায়, কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে কেন যে আশ পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করে, তা আমি বুঝতে পারি নে। হিন্দুর কাছে ত যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী; তবু এখানে লোকের গতি-বিধির অভাবের কারণ এই বোলে মনে হয় যে, এ পথে যারা আসে সত্যের প্রতি তাদের ততটা আদর নেই এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বোলে মনে করে; সুতরাং সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যোশীমঠের তেমন সম্মান দেখা যায় না। আমি এখন পর্য্যন্ত বদরিকাশ্রম দেখি নি, কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হোলো যত কষ্ট কোরেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া যাক্, যোশীমঠে আস্‌বার জন্যে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট স্বীকার করাও সার্থক। যদি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত স্থান থাক্‌তো, তা হোলে কত পণ্ডিত, ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাবান কত শিক্ষিত যুবক, প্রতি বৎসর সেখানে সমবেত হোয়ে কত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার কোরে ফেল্‌তেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দেশে সে সম্ভাবনা কোথায়?

যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটি মহাতীর্থ; কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান, তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহাদেবের কিম্বা অন্য কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই হিন্দুর পবিত্রতীর্থ; কিন্তু যেখানে দেবোপম মানব আপনার শান্ত, পবিত্র চরিত্রে চারিদিক মধুর স্নিগ্ধ কোরে রাখেন, এবং মানবের ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতার অনেক উর্দ্ধে দেবমহিমায় বিরাজ করেন, সেস্থান শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, সে স্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার প্রদানের জন্য সেখানে কেহ ফল পুষ্পাদি নিয়ে যায় না বটে, কিন্তু নিখিল মানবহৃদয়নিঃসৃত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্যসৌরভে সেই দেবমানবের অমর কীর্ত্তি-মন্দির পরিব্যাপ্ত হোয়ে থাকে।

এই যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্ত্তিমন্দির। শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা, এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হোয়েছিল। অতএব, বলা বাহুল্য যে যোশীমঠ শুধু ভক্ত হিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকদের কাছেও বিশেষ আদরের সামগ্রী। শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময় জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন, সে তত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সে জন্য কোনরকম চেষ্টাও করি নি; চেষ্টা কোল্লে হয়ত একটু ফল লাভ হোতো, কিন্তু বাঙালী জন্মগ্রহণ করে সেরূপ করা যে এক মহা দোষের কথা! আমরা প্রত্নতত্ত্ব লিখি. কিন্তু তাতে কতটুকু নিজস্ব থাকে? কেবল তর্জ্জমা করি এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন সাধনদ্বারা যে সত্যটুকু আবিষ্কার কোরে গেছেন. তারই উপর টিকা, টীপ্পনী, ভাষ্য কোরে, দোষগুণের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা আপনাদের পাণ্ডিত্য স্তূপাকারে ফাঁপিয়ে তুলি; এই ত আমাদের ক্ষমতা! আজকাল শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বেশ একটু আলোচনা চোলচে; আমাদের মনে হয়, সে আলোচনা আন্তরিক নয় এবং তা ইতিহাসের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যহীন উপায় মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই যদি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠ্তো, তা হোলে কি আমরা স্থির থাক্তে পাত্তুম? কখন না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচনা, প্রাচীন গ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝলুম একটু বেশী চেষ্টা কোল্লেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা সহজে জান্তে পারা যায়। কিন্তু আমি মূর্খ, জ্ঞানলালসা-বিরহিত দ্বিপদ মাত্র, কাজেই সে দিকে আমার মন যায় নি। কিন্তু বাস্তবিক যাঁরা ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তাঁদের এই সমস্ত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে এসে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হওয়াই উচিত। যাহোক অন্যান্য দেশ হোলে এরকম আশা করা অন্যায় হোতো না, কারণ সে সকল দেশের লোক জীবনটা অসার মায়াময় বোলে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে রাজী নয়; যার উপর সমাজের ও দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল নির্ভর করে, এমন কাজে তারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে যখন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন আর একদল অকম্পিতহৃদয়ে সেই উদ্দাম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমি তুল্য। কোন রকমে চোক মুখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হোতে পারি, তা হোলে আমাদের আর পায় কে? ইহজীবনের কাজে ইস্তাফা দিয়ে শৈশবের সুখস্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হই, না হয় পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হোয়ে তাদের সঙ্গে নানা রকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরাণো মর্‌চেপড়া রসিকতার প্রবৃত্তিকে কিছু উজ্জ্বল কোরে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে। যোশীমঠে উপস্থিত হোয়ে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুনতে শুন্তে নিজের সম্বন্ধে আমার মনে এই প্রকার ভাবেরই উদয় হোচ্ছিল। দুঃখ বেশী হোলে মনের মধ্যে নিজের দুর্ব্বলতার কথাই বেশী বাজে; এ কথার উপর কোনও যুক্তি তর্ক নেই এবং কোনও দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তা হোলে আমি সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করি না।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুর চারিটি মহাতীর্থে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। তাঁর আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ ও জড়তা সম্পন্ন হোয়ে পড়ে, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রাচীন ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত প্লাবিত হোয়ে যায়। হিন্দুধর্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন ভেদ কোরে তার যে পুনরুত্থান হয়, তা মহাভারতীয় যুগের সেই তেজোময় মহাপ্রতাপ সম্পন্ন কর্ম্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করতে পারে নি সত্য, কিন্তু তা যে হিন্দুসমাজে এক নব প্রাণের সঞ্চার কোরেছিল, তার আর সন্দেহ নাই; শঙ্করাচার্য্যই এই নব প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চতুষ্টয়ই তাঁহার প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দ্বারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম "শারদা মঠ"; সেতুবন্ধ রামেশ্বরে স্থাপিত মঠের নাম "সিঙ্গিরী মঠ", পুরুষোত্তমে "গোবর্দ্ধন মঠ", এবং হিমাচলের এই দুর্গম প্রান্তে "যোশীমঠ" যুগাতীত কাল হোতে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্ত্তি ঘোষণা কোচ্চে! স্থানমাহাত্ম্যের অনুসরণ কোল্লে এই মঠ বদরিকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উচিত ছিল, কিন্তু বদরিকাশ্রম বৎসরের মধ্যে আট মাস বরফে ঢাকা থাকে সুতরাং সেখানে বাস করা অসম্ভব বুঝে সে স্থানের পরিবর্ত্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হোয়েছে। এই মঠ অতি পুরাণো বোলেই মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ কোরেছেন, তাতে কারো মতে তিনি ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে এবং কারও কারও মতে আরও দুই শ বৎসর পরে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন। বদরিকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হোয়েছিল, কথাপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠলে তিনি বোল্লেন, স্বামীজী (শঙ্করাচার্য্য) অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আরো বোল্লেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হোলে এ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর প্রমাণও দেখাতে পারতেন। যোশীমঠে অনেক পুরাণো পুঁথি ছিল, তার কতক কতক নানা রকম বিপ্লবে নষ্ট হোয়ে গিয়েছে; কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্ত্তমান আছে এবং আমরা যদি পুনর্ব্বার যোশীমঠে যাই, তা হোলে মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের আহ্লাদের সঙ্গে তা দেখাবেন। সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা তৎকালিক রাজনীতি, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাদির উন্নতি বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্ম্মে আস্থা এবং ধর্ম্ম সমন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। এই সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকার সাধন করা যেতে পারে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার কোরে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ কোরবে? আমাদের দেশে এখনো সে সময় আসে নি এবং আমরা এখনো এরূপ কঠিন ব্রত গ্রহণ করবার উপযুক্ত হই নি। সত্যের জন্যে প্রাণ দেবার কথা বহু পূর্ব্বে শুনা যেত বটে. কিন্তু এখন নকল নবিশেরই প্রাধান্য।

মনে কোরেছিলুম, বদরিকাশ্রম হোতে ফিরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব সংগ্রহ কোরে নিয়ে যাব, কিন্তু নানা রকম বাধা বিঘ্ন ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারি নি। কখনো যে সে আশা পূর্ণ হবে, তারও কোনও সম্ভবনা দেখা যায় না। যদি আমাদের উৎসাহশীল ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক এই দেশহিতকর কাজে হস্তক্ষেপ কোরতে চান, যদি লুপ্তপ্রায় গুপ্ত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন, তা হোলে যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো দুচারিটী স্থানের নাম কোর্‌তে পারি, যেখানে সন্ধান কোল্লে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার হোতে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলুম, সে পথটী পাহাড়ের গায়ে; আঁকা বাঁকা পথের দুধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। দোকানগুলি নিতান্ত সামান্য, তার প্রায় অধিকাংশই দোতলা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ গুলি যেন পর্ব্বতের গায়ে মিশে রোয়েছে। কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে যাঁরা চিরদিন বাস কোরে আস্‌ছেন, তাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখ্‌লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে, এইটুকু ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানুষ কিরূপে বসবাস করে! এই কথা বৈদান্তিক ভায়াকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা কোল্লেন। কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হোলেও তার একটা সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মুখে শুন্‌লুম, পূর্ব্বকালে এক ঋষি ছিলেন, সেই ঋষি অনেক বৎসর যাবৎ তপস্যা করার পর তাঁর কেমন সখ হোলো যে, একটু খানি ঘর তৈয়েরি কোরে তার নীচে মাথা রেখে দিনকতক আরামে থাক্‌বেন। কিন্তু মানুষের পরমায়ুর কথা ত আর বলা যায় না, যদি শীঘ্রই পরমায়ু শেষ হয়, তবে অকারণ একখানা ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধ্যান কোরে পরমায়ুর শেষ মুড়োর অনুসন্ধান করা হোলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখ্‌লেন তাঁর পরমায়ুর আর মোট পাঁচ হাজার বছর বাকি! অতএব এই সামান্য দিনের জন্যে ঘর তুলে খামকা ঝঞ্ঝাটের আবশ্যক কি? এই সিদ্ধান্ত কোরে তিনি এক গাছতলায় বসেই সেই সামান্য কয়েকটী বছর কাটিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটী বড় গোছের দেবতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর দেবতাটী বোল্লেন, "আপনার একখানি কুঠির হোলে ভাল হয়, গাছতলাটা বাসের পক্ষে খুব নিরাপদ স্থান নয়।"—আমাদের অল্পায়ু ঋষি ঠাকুরটী উত্তর দিলেন যে, "মোটে পাঁচ হাজার বছর বাঁচ্‌ব, তার জন্যে আবার ঘর!"—অর্থাৎ যদি দু'পাঁচ লাখ বৎসর বাঁচবার সম্ভাবনা থাক্‌তো তা হোলে একদিন একটা কুঁড়ে টুঁড়ে তয়েরী কোল্লেও করা যেত। বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না; তিনি বোল্লেন, এই ঘটনা হোতে বুঝা যাচ্চে, ইহলোককে আমরা কত তুচ্ছ জ্ঞান করি, পরলোকেই আমাদের স্থায়ী বাসস্থান; দিন কতকের জন্যে এই ইহলোকের প্রবাসে এসে তিন চার তালা বাড়ী তুলে স্থায়ী রকমে বাসের বন্দোবস্ত, সে কেবল ইউরোপীয়গণের বিলাসরসসিক্ত দুর্ব্বল অন্তঃকরণের পক্ষেই শোভা পায় এবং তাদের অনুকরণপ্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও একথা খাট্‌তে পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল। আমি বল্লুম, "হাঁ, ইউরোপীয়গণের এ একটী ভয়ানক ত্রুটী বলে অবশ্য স্বীকার কোর্ত্তে হবে, কারণ তাঁরা যে কয়টা বছর বাঁচেন, তাতে

তাঁদের মহাপ্রাণী একটু সুখস্বচ্ছন্দতা, একটু আরাম ও তৃপ্তি অনুভব করবার অবসর পায়; আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন, তাতেও তাঁদের নামগুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী কর্‌বার কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টো ব্যবস্থা; জীবনটী পরিপূর্ণমাত্রায় অপব্যয় করাই আমাদের বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ"। যা হোক্ সুখের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হোয়ে গেল। আমরা চল্‌তে চল্‌তে বাজার দেখতে লাগলুম; দেখ্‌লুম বাজারে সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়, এমন কি সোনা-রূপার কারিকর এবং টাকা কড়ি লেনদেনের মহাজন পর্য্যন্ত এখানে আছে। এ সকল এখানে থাকবার কারণ যোশীমঠ বদরি-নারায়ণের মোহান্তের "হেড্ কোয়াটার", তিনি এখানে সশিষ্যে বাস করেন। এতদ্‌ভিন্ন যে সমস্ত পাহাড়ী ভুটীয়া ও নেপালীগণ বদরিকাশ্রমে বাস করে, তারা শীতকালে সেখানে থাক্‌তে না পেরে এখানে এসে কয়েকমাস কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের দু'মাইল নীচে পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তাছেড়ে আর খানিক আগে গেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বল্‌তে গেলে বদরিকাশ্রমের রাস্তায় বার মাসের লোকালয়ের এখানেই শেষ; তবে এর পরেও দু' একটি জায়গা আছে সেখানে কোন কোন বছর শীতের প্রাবল্য কিছু কম হোলে, দুই একঘর লোক বাস কোরে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের মতন এমন আড্ডা আর নেই।

এই সকল কারণেই যোশীমঠ সহরের মত। কিন্তু যে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বর্ত্তমান আছে, তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না। আমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আশ্রয় নিলুম।

যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে। যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাঁকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই খানিক সমতল স্থান। এইস্থান টুকু এক বিঘার কিছু বেশী হবে; তারই উপর পর্ব্বতের কোলের মধ্যে হিন্দুর গৌরব-স্তম্ভ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটী বেশী বড় নয়। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলুম, মন্দিরের চূড়া ততদূর পর্য্যন্তও উঁচু নয়।

আমরা দোকানে আর বিশ্রাম কল্লুম না! লাঠি আর কম্বল-দোকান ঘরে ফেলে তখনই মঠ দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখ্‌তে পেলুম। এই মন্দিরে প্রবেশ করি কি না ভাবচি, এমন সময় একজন পদপ্রদর্শক জুটে গেল; তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ কল্লুম। দেখলুম, মন্দিরটা বহুকালের পুরাতন; কত শতাব্দীর বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণপ্রাচীরে বন্দী আছে, তা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু এ মন্দির এতই দৃঢ় যে, একটা জমাট পাহাড়ের স্তূপ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হোলো সৃষ্টির শেষ দিনেও তা থেকে একখণ্ড পাথর বিচ্যুত হোয়ে পড়বে না। আমাদের পথ-প্রদর্শক বোল্লে, এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত!

আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করি নি, তখন মনে হোয়েছিল, অন্যান্য মন্দিরে যা দেখি এখানেও হয় ত' তাই দেখ্‌বো; সেই অনাদি শিবলিঙ্গ, না হয় অনন্ত শালগ্রামশিলা; খুব বেশী হয় ত সুন্দর সুবেশ এক নারায়ণ মূর্ত্তি! কিন্তু সে সব কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হোল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাড়ে তিনহাত লম্বা ও এক হাত চওড়া একখান সিঁদূর মাখান জিনিস; তা কাঠও হতে পারে, পাথরও হতে পারে, আবার লোহা কি ইস্পাত হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, কারণ তেল সিঁদুর ছাড়া তার কোন স্বরূপ অবধারণ কোর্ত্তে পাল্লুম না। প্রথমে মনে কল্লুম, হয় ত বা লোকে এই আসন খানিই পূজা করে। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক যে এক রোমহর্ষণ কাহিনী বোল্লে তা শুনে আতঙ্কে আমার সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌লো। তার মুখে শুন্‌লুম যে, এইখানে এক দেবী মূর্ত্তি বহুকাল হোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নররক্ত ভিন্ন অন্য প্রাণীর রক্তে তাঁর পিপাসা দূর হোতো না বোলে তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন নিয়মমত নরবলি দেওয়া হোতো! এতদ্ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন দিন এত মনুষ্যমুণ্ড দেহচ্যুত হোতো যে, তাদের উচ্ছ্বসিত শোণিতপ্লাবনে মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হোয়ে যেতো। সে বোল্লে যে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচেই শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই ভয়ানক অনুষ্ঠানের অনুরোধে নিহত হোয়েছে। বোধ করি, তাদের অবরুদ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও নিরাশ ক্রন্দন পাষাণ প্রাচীর ভেদ করবার পূর্ব্বেই তাদের জীবনের উপর চির অন্ধকারের যবনিকা পতিত হোয়েছে। আমি সভয়ে সম্মুখে চেয়ে দেখ্‌লুম; বোধ হোতে লাগলো, শত শত রক্তাপ্লুত, ছিন্ন-মস্তক যেন শোণিতস্রোতে তীরবেগে ভেসে আস্‌ছে, আর ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হোচ্ছে। হায় দেবি, কতকাল থেকে তুমি মাতার সুপবিত্র, স্নেহ-কোমল ও নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ কোরে সন্তানের উষ্ণ রুধিরে আপনার লোল জিহ্বা তৃপ্ত কোরেছো। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, তোমাদের নামে মানুষ প্রতিদিন অসঙ্কোচে কত কুকার্য্যই না করে?

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যুত হোয়েছেন, তা ঠিক জান্‌তে পাল্লুম না। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য্য যখন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময় তিনি এই ভয়ানক কাণ্ড নিবারণ করেন, সেই সময় হোতে দেবীমূর্ত্তি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হোয়েছেন; এখন শুধু তাঁর শূন্য আসনখানিই দেখা যায়, এবং তারই পূজা হোয়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো মতে এই বিপ্লব শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের একজন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর উপর শিবত্ব পর্য্যন্ত আরোপ করে থাকে; সেই শঙ্করাচার্য্য যে এমন একটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কাজ কোরে ফেলবেন, এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস কোর্ত্তে রাজী নয়। কিন্তু এরা বোঝে না, ধর্ম্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয়, সুতরাং ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য যে কাজ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, এরা তা ধর্ম্মবিনাশক মনে কোরে কখনই ধারণা করতে পারে না যে, এমন অধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্য দ্বারা কিরূপে সাধিত হোতে পারে? যা হোক এ সম্বন্ধে এদের মতও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এরা বলে বৌদ্ধেরা যখন এখানে আসেন,

তখনই তাঁরা এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ কোরে ছিলেন। এই দুই মতের কোন্ মত সত্য, তা অনুমান করা কঠিন, এই বিষম অপ্রীতিকর জায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে পাল্লুম না। দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ কল্লুম, বোধ হোতে লাগ্‌লো শত শত নরকঙ্কাল আমার পাছে পাছে ছুটে আসচে!

মন্দির থেকে বা'র হোয়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হোলুম; বাহিরে একটা ঝরণা হোতে অবিরাম জল পোড়ছে; সেই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট দ্বারপথে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ কোল্লুম। দেখি, একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারাণ্ডা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠুরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উঠান, তিন দিকে দোতালা কোঠা, আর এক দিকে মন্দির। অনুচ্চ মন্দির, মন্দিরের মধ্যে দিনের বেলাতেই ভয়ানক অন্ধকার। সচরাচর মন্দিরের মধ্যে যেখানে মূর্ত্তি থাকে এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া বেষ্টিত স্থূল গদি দেখ্‌তে পেলুম; এইটী শঙ্করাচার্য্যের গদি। এই গদি বাঁ পাশে রেখে অগ্রসর হোতেই দেখি এক চতুর্ভূজ মূর্ত্তি; তেমন জাঁকাল নয়, বিশেষতঃ একটা অন্ধকারময় কুঠুরীতে পোড়ে তাঁর মাহাত্ম্যও খুব খাট হোয়ে গিয়েছে বোলে বোধ হোলো।

মন্দির থেকে বেরিয়ে উঠানের এক পাশে বোসলুম! উঠানটি পাথর দিয়ে বাঁধানো, দেখ্‌লুম্ সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ কোলাহল কোচ্ছে। একজন পাণ্ডা একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া কোরছে যে, সেখানে দুদণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হোয়ে উঠলো! কোথায় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হোয়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ করবো, না পাণ্ডাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্যে হিমালয়ের শৈত্য ও শান্তিময় ক্রোড়স্থিত এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান এক বিড়ম্বনার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হোয়ে গিয়েছে, তা শুন্‌লে মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হয়। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য মঠের সেই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত কোরচি।

শঙ্করাচার্য্য এই মঠের ভার ত্রোটকাচার্য্য গিরির হাতে সমর্পণ কোরে যান। এই মঠ তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অধিকারে থাকে, গিরি, পুরী ও সাগর। সন্ন্যাসী মহাশয়েরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হোয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আর ঠিক রাখ্‌তে পারলেন না। দীর্ঘকালের কঠোর সংযম ও বৈরাগ্যকে বিলাস সাগরে ভাসিয়ে শুষ্ক প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চয় করতে লাগলেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু শারীরিক সুখ সম্ভোগই তাঁদের জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হোয়ে উঠলো। ক্রমে তাঁদের অবস্থা এ রকম হোয়ে উঠলো যে, মঠ আর চলে না। এই অবস্থায় মঠাধ্যক্ষ "গিরি" সন্ন্যাসী অন্য সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুয়া খেলে যথাসর্ব্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজী রেখে খেলা আরম্ভ করেন; দুর্ভগাক্রমে মঠটিও হারাতে হয়! সন্ন্যাসী ঠাকুরের যে রকম পণ, তাতে যদি দ্রৌপদী থাক্‌তো তা হলে তাঁকেও হয় ত পণে ধোরতেন। যাহোক তা না থাক্‌লেও এখানেই এক পর্ব্ব অভিনীত হোয়ে গেল। সর্ব্বত্যাগী হয়েও যিনি ইচ্ছা করে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনার মন প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এখন বাধ্য হোয়ে তাঁকে নিবৃত্তির অঙ্কে

আশ্রয় নিতে হোলো ও আসক্তিবর্জ্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্ত ত্যাগ কোরে চলে যেতে হোলো; কিন্তু তাঁর এই চিরন্তনের বিলাসক্ষেত্র ছেড়ে যেতে মনে যে দারুণ আঘাত লেগেছিল মায়াবদ্ধ গৃহীর নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নয়।

যা হোক, যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ কোল্লেন, তিনি ইহা দক্ষিণ দেশী রাওল ব্রাহ্মণদের কাছে বিক্রয় কোল্লেন। তাঁরাই এখন এই মঠের অধিকারী, সুতরাং বদরিনারায়ণের মন্দির আজও তাঁদের দখলে। শুনলুম, এ পর্য্যন্ত সাতাশ জন রাওল-ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা কোরে গেছেন। তাড়িত সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপালে আছেন শুনা গেল। তিনি অতি মহৎ লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টা কোচ্ছেন। তিনি বলেন, মঠ দান বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দেবার সম্পত্তি নহে, কিম্বা মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই, তিনি আজীবনকাল মঠের স্বত্বাধিকারী মাত্র, তাও যদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অনুশাসন মেনে চলেন, তা হোলেই। কলুষিত-চরিত্র বা ভ্রষ্টাচারী হোলে তাঁকে মঠচ্যুত হোতে হবে, ইহাই শঙ্করাচার্য্যের আদেশ। কেবলানন্দ গিরির এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানি না এই মঠ নিয়ে মামলা মকদ্দমা হওয়া সম্ভব আছে কি না।

বিস্তৃত মঠ প্রাঙ্গণে বোসে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে মঠের শোচনীয় ইতিহাস শুনতে লাগলুম। মহিমান্বিত যোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা, হীনতা ও স্বার্থপরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হোতে মনে হোত, যারা সংসারতাপদগ্ধ ক্লিষ্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক উর্দ্ধে শান্তি ও প্রীতির সুশীতল ছায়া উপভোগ করেন, পর্ব্বতের কোলের এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁহাদের দর্শন কোরে এবং তাঁদের কাছে সান্ত্বনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও দুর্ব্বলতা খানিকটে দূরে যাবে, চতুর্দ্দিকে বাহ্য প্রকৃতি শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র পরিতৃপ্ত কোরে তুলবে; সেই আশাতেই এত দূরে এত কষ্ট কোরে এসেছিলুম। বাহ্যপ্রকৃতি তার অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত কোরে আমাকে মুগ্ধ কোরে ফেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে। কিন্তু মানবের সে দেবহৃদয় কই? সেই আত্মত্যাগ ও সমদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যা বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং যা দেখবার আশাতে এতদূর এসে পড়েছি,—তা কোথায়?*

* লেখকের 'হিমালয়' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

বিয়াসের আকর্ষণে

তারকনাথ ভট্টাচার্য

হিমালয়ের কোলে স্বপ্নরাজ্য হিমাচল। পর্বতের পটভূমিকায় এই পাহাড়ি রাজ্য পর্যটকদের স্বর্গ। পাহাড়ের নিবিড় আহ্বান, ফার-পাইনের সবুজ সমারোহ, নুড়িভরা গিরিপথ, তুষার আচ্ছাদিত পর্বতমালা, প্রাচীন মন্দির, উচ্ছল নদী স্বপ্ন বুনে চলেছে অনবরত। ভ্রমণ পিপাসুদের হিমাচল যুগযুগ ধরে আকর্ষণ করছে তার অনাবিল সৌন্দর্য নিয়ে। এখানে হিমালয় যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে—যদি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে চাও, যদি অপার আনন্দ উপভোগ করতে চাও, যদি মনে প্রাণে শান্তি পেতে চাও তাহলে সবকিছু ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পার আমার কাছে চলে এস। আমার কাছে এলে সংসারের জটিলতা, কুটিলতা, দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষি, মায়া মোহ সব কিছু অচিরেই ভুলে গিয়ে উদার আকাশের মত তোমার হৃদয় মনও উদার হয়ে যাবে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আবার বিরাট সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে শুধু বলবে—এ কোথায় এলাম, কি দেখলাম।

হিমালয়ের এই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না তাই বেড়িয়ে পড়লাম সিমলা, কুলু, মানালি ভ্রমণে। অবশ্য শুধু হিমালয় নয় আকর্ষণ ছিল বিপাশারও। হাওড়া থেকে দিল্লী-কালকা মেল ধরে কালকা এসে পৌঁছালাম। কালকা থেকে ন্যারো গেজ লাইনের ট্রেন। পাহাড়ের ছোট ট্রেনখানি দাঁড়িয়েছিল পাশের প্ল্যাটফর্মে। তাকে দেখামাত্র শিহরিত হয়ে উঠলাম আনন্দে। এই ট্রেন আমাকে নিয়ে যাবে অনিন্দ্য সুন্দর হিমালয়ের সাহচর্যে। এখানে এই তো মাত্র আর কিছুক্ষণ, তারপর চলে যাব দূরে—বহুদূরে। যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে শান্ত বনানী ছাওয়া নির্জন পাহাড়, শুভ্র সুন্দর শৈল শিখরের হিমশীতল অনুভূতি, কুয়াশাভরা ভোরের রহস্যময় আলিঙ্গন, বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠা হিমালয় নন্দিনীদের মত ঝরণা আর নৃত্যরতা কলস্বনা নদী—এই সব নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দিন রাত্রি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। শুধু আমার জন্য।

ট্রেন ছেড়ে দিল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে সীটে এসে বসলাম। ট্রেন চলেছে। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে কামরার ভিতরে। এরকম ভাবে চলবে সারাটা পথ। কারণ কালকা থেকে সিমলা পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ কিমি পথে পড়বে ছোট-বড় প্রায় ১০৪টি সুড়ঙ্গপথ বা টানেল। এরই আকর্ষণে আমি বাসে না গিয়ে ট্রেনে চলেছি। এ চলা কেবল পাহাড় ঘুরে ঘুরে বৃত্ত রচনা করে উঠে চলা নয়, মাঝে মাঝে কঠিন পাথরের বুক চিরে সশব্দে, সবেগে ছুটে যাওয়া। বৈচিত্র্যময় পথের আনন্দে এক আলাদা অনুভূতি। পাহাড় জঙ্গল গিরিখাত বাড়ি ফুল উপত্যকা ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসছে চোখের সামনে। আর আমরা উঠে চলেছি, চলেছি ক্রমশঃ উপরের দিকে। চারপাশে বয়ে চলেছে ঠাণ্ডা হাওয়া। সে হাওয়ায় আছে হিমশৈলের হাতছানি। ছোট ছোট পাহাড়ি ষ্টেশনে ট্রেনের সাময়িক বিরতি।

আবার যাত্রা শুরু। চলা পাহাড় ডিঙিয়ে, মাড়িয়ে, নাড়িয়ে শুধু এগিয়ে চলা। সিমলায় গিয়ে যখন পথ শেষ হলো তখন পাহাড়ের উপর থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে দিনের আলো। বিলীন হয়ে আসা আলোর পথ ধরে নামতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা। নামছে দিনান্তের শান্ত নীরবতা। খুব ধীরে ধীরে যেন কোন অস্পষ্ট সঙ্গীতের রেশ টেনে।

ট্রেন থেকে নেমে কালীবাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। ২২১৩ মিটার উঁচুতে একদা ভারত সরকারের রাজধানী বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলা একটি পৃথিবী বিখ্যাত শৈল শহর। ১২ কিমি অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক পাহাড়ের মাথায় এর অবস্থান। পূর্বে সিমলা ব্রিটিশ সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। ১৮২৩ সালে কয়েকজন বাঙালী ইংরেজ সেনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে এখানে জরিপের কাজ করতে আসেন। সেই সময় একজন সাধু এখানে চণ্ডীর বিগ্রহ পূজা করতেন। সাধু মারা যাওয়ার পর ঐ বাঙালীরা সাধুর গুহার পাশে একটি কাঠের মন্দির নির্মান করে চণ্ডী পূজার ভার গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে জয়পুর থেকে কালো পাথরের একটি কালীমূর্তি এনে পূজা আরম্ভ করেন। এরপর ঐ মন্দিরে শ্যামলা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর আস্তে আস্তে সেদিনের সেই কাঠের কালীমন্দির বর্তমানের কালীমন্দিরে রূপান্তরিত হয়। কালীমন্দির থেকে চারিদিকের দৃশ্য ভারি সুন্দর দেখায়। বিকেল বেলায় মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে এসে দাঁড়ালাম। সূর্য তখন পশ্চিম পাটে। দিগন্তে আবিরের আলপনা। তুহিন শিখরে শিখরে লাল আভার ছোঁয়া লাগে। গিরিরাজ যেন রূপ বদলান। ঘরে ফেরা পাখীর কূজনে মুখর হয় বসুন্ধরা। নীলিমার বুকে ইতস্তত ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। ঢেউ খেলানো উপত্যকার বুকে কুয়াশার হালকা প্রলেপ। মন উদাস হয়ে যায়। ক্রমে চুপিসাড়ে সন্ধ্যা নামে ধরনীর বুকে। আকাশ তারায় তারায় ভরে যায়। হিমেল হাওয়া বইতে থাকে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে সাজানো বাড়ীগুলিতে আলো জ্বলে ওঠে। যেন অসংখ্য আলোকবিন্দু খচিত বস্ত্র পরিধান করে দাঁড়িয়ে থাকে সিমলা।

পরদিন কালীবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম ম্যালের উদ্দেশ্যে। সিমলার প্রধান আকর্ষণ ম্যাল বা রিজ। ম্যালের কাছেই বাজার, হাট, দোকান। এখানে ২টি থিয়েটার হল আছে 'গেইটি থিয়েটার' এবং 'গ্রীনরুম'। এখানকার একটা জায়গার নাম ইংরাজরা রেখেছিল স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট। বর্তমান নাম লালা লাজপত স্কোয়ার। সেই সময় নিশ্চয় কিছু স্ক্যান্ডাল হয়েছিল বা হোত। ম্যালের শেষ প্রান্তে ক্রাইস্ট চার্চ। নিও-গথিক ধারায় ১৮৫৭-তে তৈরি। ভারতের পুরানো চার্চের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। এর পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেলে চৌরা ময়দানে মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামের ১২টি গ্যালারিতে পাহাড়ি শিল্প-সংস্কৃতির সংগ্রহ আছে। ম্যালের পূর্ব দিক দিয়ে একটা রাস্তা জাখু পাহাড়ে উঠেছে। সিমলা শহর থেকে ২ কিমি দূরে ২৪৫৫ মিটার উচ্চতায় জাখু পাহাড়। এই পাহাড় থেকে সিমলা শহরের দৃশ্য ও তুষারাবৃত হিমালয়ের চূড়া দেখা যায়। দূর দিগন্তে শৈলমালা, যেন ডানা মেলা বকের সারি। এখানে একটা হনুমানের মন্দির আছে। গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে যাওয়ার সময় হনুমান এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিল। সিমলা থেকে ৫ কিমি দূরে ২১৪৫ মিটার

উচ্চতায় প্রস্পেক্ট হিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় একই সঙ্গে সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখে জীবন সার্থক হয়। পাহাড় চূড়ায় আছে কামনাদেবীর মন্দির। এই মন্দিরে ৩০০ বছরের পুরানো পাথরের দুর্গা মূর্তি আছে। অনেক দূরে দেখা যায় রূপালি রেখার মত শতদ্রু নদীকে। সিমলার আগের রেল ষ্টেশন সামার হিল। সিমলা থেকে ৫ কিমি দূরে ১৯৮০ মিটার উচ্চতায় এর অবস্থান। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। এখানে আছে হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩ কিমি দূরে মাসোব্রায় স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির বাসস্থান 'রিট্রিট'। কাঠের সিঁড়ি, পাথরের বাড়ী। এখানে জওহরলাল নেহেরু ভারত ভাগে সম্মতি দেন।

এরপর একদিন কনডাকটেড ট্যুরের বাসে বেড়িয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বাগিচাঘেরা ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল। স্বাস্থ্যকর এবং রোমান্টিক পরিবেশের জন্য লর্ড রিপন এখানে প্রায়ই আসতেন। বরফ ঢাকা শীতেও এর পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। এরপর গলফ্ খেলার মাঠ দেখতে গেলাম নলধারায়। তরঙ্গিত পর্বতমালা, আকাশ ছোঁয়া দেবদারু আর উচ্ছল শতদ্রু নদীতে ঘেরা নলধারাকে ভালো লাগে। আর এক সুন্দর সুবিস্তৃত উপত্যকাকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুফরি। কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব সারিবদ্ধ ধাপ। কুফরির আসল স্ফূর্তি অবশ্য সেই শীতকালে যখন এখানে স্তরে স্তরে জমে থাকে বরফ। স্কী করতে আসেন অনেক মানুষ। নির্জন পাহাড় তখন মাতোয়ারা আনন্দে। খেয়ালী মেঘের আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, ঝরে পরা মিষ্টি রোদ্দুরের মধুর পরশ নিয়ে সারাদিন ফুটে ওঠে কত অনিন্দ্য সুন্দর ছবি। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। তবু ছেড়ে গেলেই মন কেমন করে উঠছে আর একবার দেখার জন্য। এখানকার আর এক জনপ্রিয় শৈলাবাস ফাগু। আলু নিয়ে এখানে গবেষণা হচ্ছে। এরপর সিমলা ফিরে এলাম। মোটামুটি সিমলা এবং তার আশেপাশে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কুলুর উদ্দেশ্যে।

সকালবেলা বাস ছাড়ল। চারিদিকে সোনালী রোদ। উত্তর আকাশে মেঘেরা চলেছে ডানা মেলে। দূরে হিমবান হিমালয়ের তুষারমৌলি শিখরমালা। শহর ছাড়িয়ে নির্জন পথে বাস ছুটতে থাকে। দুদিকে সারি সারি ক্ষেত। সবুজের মাঝে সোনালী ফসল দোলে। যেন ছোট ছোট তরঙ্গমালা ভেসে চলে শ্যামলিমা প্রকৃতির বুকে। বাস এসে থামে কুলুতে। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হোটেলে উপস্থিত হই।

দেবভূমি কুলু।

কল্লোলিনী বিয়াসের তরঙ্গে লীলায়িত ছবির মত উপত্যকা 'ভ্যালি অব গড্স' নামে খ্যাত কুলু ১২১৯ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। শীতে উপত্যকার বুকে তুষার পড়ে। বরফে আচ্ছাদিত তরুবীথি মুক্তোর মত ঝলমল করে। মনে হয় গিরিরাজের পদমূলে কেউ শত সহস্র রৌপ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বসন্তে বরফ গলে। ফুলে ফুলে ফুলময় হয়ে ওঠে কুলু। আর শরতের সোনালী ক্ষেত বোনে স্বপ্নের জাল। ন্যাসপাতি, আপেল, চেরি, পিচ সাজিয়ে তোলে কুলুকে।

কুলুর প্রাণকেন্দ্র ঢোলপুর ময়দান। দশেরা উৎসবে কুলুতে আনন্দের বান ডাকে। ঢোলপুর ময়দানে রঘুনাথজীর মন্দির চত্বরে বিজয়া দশমীর বিকাল থেকে শুরু হয়ে এই উৎসব চলে ৭ দিন। স্থানীয় গ্রামের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব পোষাকে সেজে পাল্কীতে করে নিজেদের গ্রাম দেবতাকেই মেলায় যোগ দিতে নিয়ে আসেন। আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রায় ২০০ দেবতা আসেন শোভাযাত্রা করে। কুলু রাজপরিবারের দেবী হিড়িম্বাও মানালি থেকে আসেন পাল্কী চেপে। রথ টানা হয় দশমীর দিন। রঘুনাথজী রথ চেপে পরিক্রমায় বের হন।

এই দশেরা উৎসব কি ভাবে প্রচলিত হল তা শুনেছিলাম স্থানীয় একজনের মুখে। ১৬৫১ সালের জুলাই মাসে দামোদর দাস নামে এক ব্যক্তি অযোধ্যা থেকে রঘুনাথের মূর্তি চুরি করে এনে কুলুতে প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় কুলুতে রাজত্ব করতেন রাজা জগৎ সিং। জগৎ সিং ছিলেন অত্যাচারী রাজা। প্রজাদের নানাভাবে পীড়ন করতেন। তাদের কাছে টাকা পয়সা, মুণিমুক্তো, ধনদৌলতের খবর পেলে রাজা তা জোর করে লুঠ করে আনতেন। ঐশ্বর্যের লিপ্সায় তিনি ছিলেন পাগল। একদিন দুর্গাদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের ধন সম্পত্তির ওপর নজর পড়ল তার। শুধু ধন সম্পত্তি নয় সেই সঙ্গে নজর পড়ল ব্রাহ্মণ কন্যার ওপর। সেই কন্যাটিকে তার চাই। লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রাহ্মণ যেন তার সমস্ত ধন সম্পদ এবং কন্যাটিকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেন। তা না হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

ব্রাহ্মণ ভয়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন। কারণ উপায় ছিল না। রাজার লোকেরা ব্রাহ্মণের মুখে সেই কথা শুনে ফিরে গেলেন। ক্রমে দিন এগিয়ে আসে। রাজভাণ্ডারে কিন্তু ধনরত্ন জমা পড়ে না। রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। লোক পাঠিয়ে ব্রাহ্মণের ওপর অত্যাচার শুরু করলেন। ব্রাহ্মণ সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এক রাত্রে নিজের গায়ে নিজে আগুন লাগিয়ে সপরিবারে পুড়ে মারা গেলেন।

ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবার আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার পর প্রতি রাতে রাজা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি চারিদিকে রক্তের ছাপ দেখতে লাগলেন। ভয় পেয়ে ঘুমের ঘোরে তিনি মাঝে মাঝে রক্ত রক্ত বলে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলেন। দিনের পর দিন এইভাবে কাটতে লাগল। রাজার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। ডাক্তার এল কবিরাজ এল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। রাজার মনে শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। প্রজারা বলতে লাগল ব্রাহ্মণের অভিশাপে রাজার এই রকম অবস্থা হয়েছে।

অবশেষে রাজা পণ্ডিত সমাজকে ডাকলেন। তারা সব ঘটনা শুনে বললেন ব্রাহ্মণের শাপেই রাজার এই অবস্থা। সুতরাং পাপ বা শাপ মোচন করা দরকার। আর এই শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এক মাত্র পথ হলো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা। রাজা যদি রঘুনাথজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা করেন এবং রঘুনাথজীর নামে রাজ্য পরিচালনা করেন তাহলে রাজা পাপ মুক্ত হতে পারবেন।

পণ্ডিতদের এই বিধি শুনে রাজা রঘুনাথজীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। রঘুনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রঘুনাথকে বসালেন। তার নামেই রাজ্য, রাজকোষ বলে রাজা ঘোষণা করলেন। রাজা নিজেকে ভৃত্য এবং রঘুনাথকে প্রভু বলে ঘোষণা করলেন। সমস্ত কুলু অধিবাসী রঘুনাথজীর প্রজা হয়ে গেল। রাজা পাপ মুক্ত হলেন। মনে শান্তি ফিরে এল। কুলুর সমস্ত কুসংস্কার মুছে গেল। রঘুনাথের নানা ধরনের উৎসবে তারা মাতোয়ারা হলেন।

এর কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস বৈরাগী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। রাজা কৃষ্ণদাসের শরণাপন্ন হলেন। রাজা ও কৃষ্ণদাস বৈরাগীর চেষ্টায় সব গ্রামের দেবতাকে নিয়ে রঘুনাথজীর পুজোর ব্যবস্থা করা হলো। যে দিন তারা এই কথা প্রথম আলোচনা করেন সে দিন ছিল বিজয়া দশমী। আর সেই থেকে এই দশেরা মহাসমারোহে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই উৎসব রঘুনাথজীর উৎসব। দেবতাদের মহামিলনের দিন।

পরদিন গেলাম বিজলী মহাদেব দেখতে। ২৪৩৮ মিঃ উচ্চতায় মন্দিরটি। চড়াই পথ। সকালে রওনা দিয়ে মহাদেব দেখে ফিরে এলাম। মন্দির থেকে কুলু শহরকে ছবির মত দেখায়। পাহাড়ের মাথায় কুলুর বিখ্যাত বিজলী মহাদেবের মন্দির। বড় বড় পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বিশাল মন্দির তৈরী হয়েছে। শোনা যায় পাথর জোড়া দেবার জন্য কোনো প্লাস্টার ব্যবহার করা হয় নি। মন্দিরের কাছে বিরাট একটি দণ্ড পোঁতা আছে। উচ্চতা ২০০মি.। এই দণ্ডের মধ্যে দিয়ে মহাদেব আশীর্বাদ স্বরূপ বিদ্যুৎ পাঠান। বছরে অন্তত একবার বজ্রপাত হয় এবং লৌহদণ্ডের মধ্যে দিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ভেঙ্গে চুরে দেয়। পূজারী ছাতু এবং মাখন দিয়ে ভগ্ন মূর্তির টুকরোগুলি জুড়ে দেবতাকে মন্দিরে স্থাপন করেন। এমন ভাবেই চলতে থাকে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগাবার কাজ।

এরপর গেলাম নাগর। কুলু উপত্যকার মনোরম শহর এবং কুলু রাজাদের রাজধানী নাগর জনপদটি আপন শোভায় সজ্জিত। বন্য-অরণ্য সম্পদে বলীয়ান এই জনপদটি সভ্যতার জগৎ থেকে দূরে প্রকৃতির আপন হাতে গড়া শান্ত নিভৃত আলয়। ফুলে ফলে সমৃদ্ধ। এখানকার পার্বত্য উপত্যকা নানা ধরনের ফলের জন্য বিখ্যাত। সোনালী আপেলের ভারে গাছগুলি যখন নুয়ে পড়ে তখন মনে হয় বাগানে স্বর্ণালী আগুন লেগেছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে একটা না একটা ফলের বাগান আছে। শরতে উপত্যকার বুকে নানা ফুলের সমারোহ গন্ধে বর্ণে উপত্যকার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃতি রাণী সেজে ওঠে অপরূপ সাজে। আসে মৌমাছির দল। মধু গুঞ্জরণে মাতিয়ে তোলে। আসে প্রজাপতি নানা রঙের রঙীন পাখা মেলে। বিচিত্র বর্ণালীর ছটা ছড়িয়ে পড়ে বনে—উপবনে।

জীপে এখানে এলাম। পাহাড়ের টিলার ওপর কুলু রাজাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। কাঠ ও পাথরের বাড়ী। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা। রাজপ্রাসাদ তিনতলা। তিনদিকে চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের শোভা দেখতে ভালো লাগে। দূর দিগন্তে দেখা যায় বীরবঙ্গাল ও ধৌলাধারের শুভ্র চূড়ার সারি। মনে হয় নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

অতীতে এই রাজপ্রাসাদ ছিল প্রাণ চঞ্চল এবং ঐশ্বর্যে ভরপুর। কিন্তু বর্তমানে তার কিছুই নেই। তবু এই রাজপ্রসাদের স্মৃতিস্তম্ভ আর পাষান ফলকগুলো দেখলে কুলুর ইতিহাস মনে পড়ে যায়। এখন নতুন করে রাজপ্রাসাদের ভগ্ন অংশের সংস্কার হয়েছে। ট্যুরিষ্টদের যাতায়াত বেড়েছে। রাজপ্রাসাদের কিছুদূরে জারি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মন্দিরের নীচে নাকি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাদ এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এক সন্ন্যাসী নাগর থেকে প্রতিদিন মণিকরণের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করতে যেত। নাগরের রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুটা পথ গিয়ে পৌঁছালাম রোয়েরিখ এস্টেটে। অতি রমনীয় পরিবেশে নিকোলাস রোয়েরিখের বাসস্থান। দোতলা বাড়ী। চারিদিকে ফুল ও ফলের বাগান। বিভিন্ন দেশ ও বিদেশ থেকে আনা নানা ফুলের গাছ বিচিত্র চারাগাছে সাজানো বাগানটি। নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে বসে শিল্পী তার সার্থক শিল্প রচনা করতেন। নীচের ঘরে কয়েকটি ছবি টাঙানো আছে। এই ছবিগুলি নিকোলাস রোয়েরিখ ও তার পুত্র সোয়ৎসলভের আঁকা।

কুলু থেকে এরপর চললাম মণিকরণের উদ্দেশ্যে। পার্বতী নদীর তীর ধরে বাস ছুটে চলে। পাথরে পাথরে লাফিয়ে চলেছে পার্বতী। ডান দিকে পাইন, চীর ও দেওদারের বন। নদীর তীরে ক্ষেত। শষ্য শ্যামল উপত্যকা। ছায়ানিবিড় বনভূমির অন্তরালে গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে অবশেষে মণিকরণে এসে বাস থামে। পার্বতী নদীর ওপর ঝোলাপুল পার হয়ে ওপারে গেলাম। কিছুদূর হাঁটার পর দেখি উষ্ণকুণ্ড। গরম জলের বাষ্পীয় ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে। গন্ধকের গন্ধ নাকে আসছে। পার্বতী উপত্যকার সৌন্দর্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গাছপালা, নদী, পাহাড়, ক্ষেত সব কিছুতেই মোহময়তা। মণিকরণ নামের পিছনে একটি কাহিনী আছে। কোন এক সময় শিব ও পার্বতী এই উপত্যকায় বেড়াতে এসে পার্বতীর কানের মণিকুণ্ডলটি হারিয়ে যায়। উপত্যকার সৌন্দর্যে বিমোহিত পার্বতীর খেয়ালই থাকে না যে তার কানের মণিকুণ্ডলটি নেই। খেয়াল হতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এদিকে শেষনাগ কুণ্ডলটি নিয়ে পাতালে চলে যান। শিব পার্বতীর কুণ্ডল হারানোর কথা শুনে তপস্যায় বসে জানতে পারেন শেষনাগ কুণ্ডলটি নিয়ে গেছে। শিব অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে শেষনাগ কুন্ডলটি ফিরিয়ে দেন। পাতাল ফুঁড়ে প্রস্রবনের সঙ্গে পার্বতীর মণিকুণ্ডলটি বেরিয়ে আসে। ১৯০০ মি. উচ্চতায় মণিকরণ হিন্দুতীর্থ হলেও শিখদের পূণ্যভূমি। গুরু নানক শিষ্যসহ মণ্ডি হয়ে সুমেরু পর্বতে যাওয়াব সময় পথে ক্লান্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সেই সময় শিষ্য গুরুদেবকে খিদের কথা বলতে গুরুজি হাসতে হাসতে তাকে রুটি তৈরি করতে বলেন। শিষ্য রুটি তৈরি করে গরম কুণ্ডে ফেলে। কিন্তু রুটিগুলি ডুবে যায়। ক্ষুধার্ত শিষ্য হতভম্ব হয়ে গুরুদেবের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। গুরুদেব তখন একটু মুচকি হেসে তাকে বলেন—হরিহরকে ডাক বল আমরা ক্ষুধার্ত, তবেতো খাবার মিলবে। শিষ্য করজোড়ে হরিহরকে ডাকতে থাকে। রুটিগুলো আপনা থেকে ভেসে ওঠে। শিষ্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে এর মাহাত্ম্য। একটি রুটি রেখে বাকিগুলি তুলে নেয়। সেই থেকে শিখদের কাছে

এটা দেবভূমি। তাই এখানে যাত্রীদের মধ্যে শিখদের সংখ্যা বেশি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। ডানদিকে কুণ্ড। বাঁদিকে আশ্রম। উষ্ণকুণ্ডের উৎস আশ্রমের কাছে। মাটির নীচে থেকে গরম জল উঠছে। চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে আছে, এখানে ২টি কুণ্ড আছে। একটি কুণ্ড স্নানের অপরটি রান্নার। স্নানের কুণ্ডটি ২ ভাগে বিভক্ত। বাঁ দিকেরটি পুরুষদের, ডান দিকেরটি মহিলাদের। গুরু নানক যে পাথরে বসেছিলেন সেটি দেখে রান্নার কুণ্ডটি দেখলাম। চারিপাশে ভীষণ গরম আর গন্ধকের গন্ধ। খালিপায়ে দাঁড়ানো যায় না। ভক্তের দল কাপড়ের পোঁটলায় চাল, ডাল বেঁধে কুণ্ডের জলে ফেলে দিচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে ভাত হয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের কাছেই একটি মন্দির। মন্দিরটি দোতলা। নীচের তলায় শিবলিঙ্গ। ওপরে একটি পিতলের ঘড়া থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে শিবলিঙ্গের মাথায়। ওপর তলায় বিষ্ণুমূর্তি এবং মন্দির শীর্ষে ত্রিশূল ও গৈরিক পতাকা। মণিকরণ দেখে ফিরে এলাম কুলুতে।

এই অঞ্চলের একটি অদ্ভুত জনপদের কথা না বলে থাকতে পাচ্ছিনা। দুর্গম, দুরারোহ, সুউচ্চ গিরি-প্রাচীর ঘেরা দেশ। এই জনপদের দেবতা হলেন 'জমলু'। স্থানীয়রা বলে জমলু অশেষ শক্তিধর এক দানব। এই জনপদটির নাম মালানা। জমলু মালানার রাজা। এই রাজ্যের যাবতীয় ভূসম্পত্তি সবই দেবতার। যত কিছু নিয়মকানুন সবই দেবতার নামে প্রচলিত। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য প্রভৃতি যাবতীয় সম্পদ সবই জমা থাকে দেবভাণ্ডারে। ভারতবর্ষে বহু দেবমন্দিরে একটি সচ্ছিদ্র লৌহ সিন্ধুক বা দানপত্র থাকে। দেবদর্শনার্থীরা তাদের সামর্থ্য মত অর্থ অলঙ্কার মণিমাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড সেই ছিদ্রপথে প্রণামীস্বরূপ জমা দিয়ে থাকেন। এখানেও সেই ব্যবস্থা। তবে এখানকার দানপাত্রটি লোহার বা কাঠের সিন্দুক নয়। প্রকাণ্ড একটা ঘর। চারিদিকে পাথরের নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তুলে একেবারে ছাদশুদ্ধু নিয়ে গাঁথা। ঐ ছাদটিতে আছে একটি মাত্র ছিদ্রপথ। যতকিছু প্রণামী ঐ ছিদ্রপথে গলিয়ে ঘরের ভিতরে চালান করা হয়। জনসাধারণের কাজে অর্থের প্রয়োজন ঘটলে পুরোহিত ঐ ছাদের ফুটো দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলে যান। তার দুহাতের মুঠোয় যা ধরে—মণিমুক্তো, টাকাকড়ি, সোনা বা রূপোর গয়না—দু হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে আসেন পুরোহিত। এই দেবতার ধনভাণ্ডার সোনা-রূপো, মণিমুক্তো, টাকা পয়সায় পরিপূর্ণ। এই গ্রামে অধিবাসীরা জমলু দেবতার প্রজা। চাষবাসের শষ্যাদি দেবতার নামে যৌথ খামারে জমা হয়। এই যৌথ খামার থেকেই গ্রামবাসীদের ভরণপোষণ চলে। যদি কোন বিদেশী এই গ্রামে গিয়ে পড়ে, দেবতার অতিথি বলে তিনি গণ্য হন। গ্রামের কর্তারা অর্থাৎ দেবতার প্রতিনিধিস্থানীয়রা দুধ, খাবার ও জ্বালানী কাঠ দিয়ে অতিথি সৎকার করেন। বাইরের জগতের সঙ্গে এই গ্রামের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। বনজ ওষধিপত্র ও গাছের শিকড় হল এখানকার একমাত্র পণ্যদ্রব্য। যার মারফত বাইরে থেকে অর্থাগম হয়ে থাকে। এটুকু ছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক রহিত হয়ে বছরের পর বছর ধরে স্বয়ংশাসিত এই জনপদে বাস করছে এরা। এই দেবতা নিজের রাজ্য ছেড়ে কখনও বাইরে যান না। অন্য দেবতার কাছে নতি স্বীকার করেন না।

পরদিন বাসে পাড়ি দিলাম মানালির দিকে। পাহাড়ের পাদদেশ ধরে বাস এগিয়ে চলে। বিপাশা কখনও কাছে আসে আবার কখনও দূরে চলে যায়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে বিপাশা। সুনীল আকাশের বুকে মেঘেরা পাখনা মেলে। সবুজ পাহাড়ের কোলে কুয়াশা। নিস্তব্ধ হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকা, বনময় পর্বতের সুশীতল ঝর্ণাধারা, উচ্ছল নদীর চঞ্চল প্রবাহ, বনবীথির শ্যাম শোভা, নির্ঝরের কলতান, তুষারমৌলি হিমালয়ের শোভা, নীল আকাশে মেঘের ভেলা, ফুলের মালঞ্চ দেখতে দেখতে বিপাশা বেষ্টিত মানালিতে এসে পৌঁছালাম।

হিমাচল হিমালয়ের রূপসী কন্যা মানালি। কল্পলোকের মানুষকে সুরলোকের সন্ধান দেয়। মনুর আলয় থেকে মানালি। অতীতে মানালির নাম ছিল মানালসু। আপেল, চেরী ও পীচ ফলের বাগানের মাঝে সবুজে মোড়া মানালিতে শীতে তুষার পড়ে। আর গাছে গাছে ফুল ফোটে বসন্তের আগমনে। কুলু উপত্যকার উজাড় করা সৌন্দর্য নিয়ে মানালি নিজেকে সাজিয়ে তোলে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে। চারিদিকে তুষারবস্ত্র তুহিন পর্বতমালা পরিবেষ্টিত পর্বতের পটভূমিকায় সামান্য সমতল আর অরণ্যের মাঝে মাঝে এবং পাহাড়ের ধাপে ধাপে ঘরবাড়ি নিয়ে ৫ বর্গ কিমির ছোট শৈলশহর মানালির সৌন্দর্য ছবির মত। নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা বিয়াস। কেউ বলে বিয়াস। কেউ বলে বিপাশা। কেউ বলে ব্যাস কন্যা। যেন কোন এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা গীতিময় চিত্র। আবার শীতে বরফে ঢাকা মানালির অন্য রকম সৌন্দর্য দেখা যায়।

বাস থেকে নেমে হোটেল ঠিক করে মালপত্র রেখে বারান্দায় গিয়ে বসি। সামনে হিমালয়। নরম রেশমী আলোর পরশ লেগেছে হিমানী শিখর মালায়। অপূর্ব জ্যোতির বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে অদৃশ্য থেকে কোন আলোর যাদুকর আলো নিয়ে খেলা করছে। হিমগিরির বিচিত্র শোভায় মন উদাস হয়ে যায়। কানে আসে বিয়াসের নূপুর নিক্কন।

পরদিন সকালবেলা হাঁটাপথে বশিষ্ঠকুণ্ডের দিকে রওনা দিলাম। আর তখন প্রথম দেখলাম বিপাশাকে। ছোট ছোট ঢেউ তোলা সাদা বুটির নীলাভ শাড়ীতে শরীর ঢেকে তটিনীর দুকূল মুখর করে নূপুরের মধুছন্দে বয়ে চলেছে বিয়াস। তার দুপাশে আজ্ঞাবহ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব মহীরূহ—যেন তার চলার পথের সৌন্দর্যকে আরো সুন্দর, আরো মনোহারী করে তুলতে। পাহাড় ও বিপাশা বিধৌত অনুপম শ্যামল শোভায় সজ্জিত বশিষ্ঠ একটি প্রাচীন জনপদ। সবুজ বনানীর ফাঁকে উঁকি দেয় রজত শুভ্র হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গমালা। মানালির রূপ-সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল মুনি-ঋষিদেরও। এখানে এসে ছিলেন মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস। এসেছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। পূজারীর কাছে বিপাশার ইতিহাস শুনি।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শত পুত্রকে বিনাশ করেন। শোকার্ত পিতা প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তাতেও তার মৃত্যু হয় না। তখন তিনি নিজেকে পাশ বন্ধ করে আবার ঝাঁপ দেন নদীর জলে। নদী তাকে পাশ মুক্ত করে তুলে দেয়

তীরে। বশিষ্ঠ তখন এই নদীর নাম দেন বিপাশা। কারো মতে ব্যাসদেবের নাম থেকে বিপাশা। এরপর পূজারী আমাদের নিয়ে যান রামসীতার মন্দিরে। বশিষ্ঠ মন্দিরের সামনেই। মন্দির কক্ষে আরও কতগুলি দণ্ডের গায়ে লাগানো মূর্তি দেখতে পেলাম। পূজারী বলেন এ হচ্ছে আমাদের দেবতা। দণ্ডের গায়ে লাগানো ব্রোঞ্জ বা অন্য কোন ধাতুর তৈরী মূর্তিগুলিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে দশেরার দিন ঢোলপুর ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের বাঁ-দিকে একটু ওপরে গরম জলের ঝর্ণা। তার ঠিক নীচে স্নানাগার। ঝর্ণার আশেপাশে সবুজ উপত্যকা। দূর থেকে ভেলভেটের মত দেখায়। উষ্ণ জলের কুণ্ডে স্নান করলে বাত, বেদনা, পেটের রোগ সেরে যায়। পূজারীর সঙ্গে মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দির বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট এক মূর্তি দেখলাম। পূজারী বললেন এটি বশিষ্ঠ মূর্তি। মূর্তির পায়ের নীচে জলধারা। বশিষ্ঠ মন্দিরের সামনে রামসীতার মন্দির। সব দর্শন করে আবার হোটেলে ফিরে এলাম।

বিকেলবেলা গেলাম হিড়িম্বা মন্দির দর্শনে। ডানদিকে পাইনের বন। বাঁদিকে আপেল বাগান। মাঝখান দিয়ে পথ উঠেছে ওপর দিকে ঘুরে ঘুরে। পথের পাশে কয়েকটি হোটেল রেস্তোঁরা যেন এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। পাইনের বনটিও সুন্দর। সহরের বুক থেকে তার বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ডেকে নিয়ে যায় যাত্রীদের তার গভীরে। হারিয়ে যেতে মানা নেই পাইনের বনে। সহরের মধ্যে এমন চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়েনা। এমন আপেলভরা গাছের সারি কোথাও দেখা যায় না। নদী, বন, আপেলের অপূর্ব বাগান নিয়ে মানালি বোধ হয় তাই অনন্যা, অপরূপা। সমগ্র পাহাড় জুড়ে গড়ে উঠেছে তার এই নিবিড় সৌন্দর্যের পরিবেশ। নরম ঘাসের সবুজে ঢাকা বিস্তৃত একখণ্ড জমিতে এসে আপাতত শেষ হলো আমাদের পথ। দু-সারি লম্বা গাছের মাঝে শেষ পথটুকুতে রয়েছে রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন। পথ শেষে ছোট সুন্দর মন্দিরটির ছায়া, সুশীতল বারান্দা, ঠাণ্ডা জল আর সমগ্র পরিবেশের মাধুর্য নিমেষে জুড়িয়ে দিল আমাদের পথশ্রমের ক্লান্তি। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পত্নীর নামেই মন্দিরটির নাম। চারতলা প্যাগোডা ঢঙের কাঠের মন্দির। মদিরের পাষাণবেদীতে দেবী হিড়িম্বার পায়ের ছাপ। ভেতরে মূর্তি ভালো বোঝা যায় না।

হিড়িম্বা বা হাতিম্বা দেবীর মন্দির স্থানীয় মানুষদের কাছে এক পরম তীর্থস্থান। বিশ্বাস, জতুগৃহদাহের পর পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীর এখানে ক্ষণিক অবস্থানকালে দেখা হয়েছিল রাক্ষসী হিড়িম্বার সঙ্গে। ভাই হিড়িম্ব চেয়েছিল পাণ্ডবদের বধ করতে। কিন্তু পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয় সে ইচ্ছা। ভীমের প্রতি হিড়িম্বার অনুরাগের কথা ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। তাদের সকলের ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে দ্বিতীয় পাণ্ডব হিড়িম্বাকে বিবাহ করলেন এই অরণ্যে। ফলে জনমানসে হিড়িম্বা হয়ে উঠলেন দেবী। এই তার বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে শিল্পী এই মন্দির তৈরী করেন তার ডান হাত কেটে দেওয়া হয় যাতে তিনি এই রকম মন্দির আর তৈরী করতে না পারেন। কিন্তু সেই শিল্পী এরপর বাঁহাত দিয়ে তৈরী

করেন ত্রিলোকনাথের মন্দির। এরপর যাতে তৃতীয় মন্দির তৈরী না হয় সেইজন্য সেই শিল্পীর প্রাণদণ্ড হয়। বনবেষ্টিত পাহাড়ের প্রাচীন বনস্পতির শাখা-প্রশাখার নিভৃতে হিড়িম্বার মন্দির।

হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলি হোটেলের দিকে। সূর্যদেব তখন পশ্চিম আকাশে। গোধূলির ছায়ামাখা অন্ধকার নামছে দিগ্‌বলয়ে। কুলায় ফিরছে শ্রান্ত বনের পাখী। কাকলির শব্দে মেতেছে মানালি। শুরু হয়েছে যেন সুরের ঐকতান। দলহারা একখণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে যেন সাথীর সন্ধানে। আকাশের গায়ে মসিরেখা টেনে এঁকে বেঁকে দুলে দুলে চলেছে মেঘের বলাকা আপন গৃহপানে। দিনের শেষে দিণমণি এসে শেষ চুম্বনখানি দিয়ে গেলেন শ্যামলা ধরিত্রীর কপালে। দিগন্তের অন্তিম সীমানায় এঁকে দিলেন কুমকুমের আলপনা। জ্বলজ্বল করে ঐ সন্ধ্যাসূর্য। বিদায় নিয়ে সেও চলেছে যেন নতুন দেশে। শিখরে শিখরে লেগেছে লাল রঙের ছোঁয়া। যেন হিমানী শিখর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হোলির নেশায় মেতেছে বিপাশা। চলেছে নেচে নেচে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে। ক্রমে ঘোমটা পরা এক অজানা কালোছায়া ধীরে ধীরে নেমে এলো এই ঘুমের দেশে। নবনীল নভোমণ্ডলে দেখা দিলো সন্ধ্যাতারা। সামনের পাহাড়গুলো কুয়াশার চাদরমুড়ি দেয়। পাইনের ডালে ডালে তন্দ্রা নেমে আসে। পাহাড়ী শহর। শীতের সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলাতেই মনে হয় নিঝুম নিশুতি রাত এসে হানা দিয়েছে। সবাই যেন ঘুমের আমেজে আছে। শুধু দুচোখে ঘুম নেই বিয়াসের। হাসির রোল তুলে, সঙ্গীতের বোল তুলে ছুটে চলেছে সে।

সন্ধ্যাবেলা হোটেলের বারান্দায় এসে বসি। চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা। পাহাড়ের মাথায় এসে এখনো পৌঁছায়নি। পশ্চাদভূমি আলোয় আলোকিত। ধীরে ধীরে চাঁদ ওঠে। আলোর বন্যা বইয়ে দেয় পাহাড়ের মাথায়। স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বিশ্ব-প্রকৃতি। চাঁদের আলোয় ভেসে যায় মানালি। এতক্ষণ আকাশে যে টুকরো টুকরো মেঘ ছিল তা সরে যায়। যেন যবনিকা সরিয়ে হেসে ওঠে গিরিরাজ। কোন এক পরী যেন উড়ে এসে পরিয়ে দিল তার কণ্ঠে মুক্তমালা। ফুটে উঠল হিমানী হিমালয়ের অসীম সৌন্দর্য। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল অপূর্ব জ্যোতির বর্ণচ্ছটা। প্রতিবিম্বিত হলো বিপাশার মুক্তোচুনি মাখানো জলে। চিরমহান শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের পদতলে বসে ভাবি কত কথা। এই অনির্বর্চনীয় সৌন্দর্যের মাঝে নিজেকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়

পাখীর ডাকে আর বিপাশার ঘুম ভাঙানি গানে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে। আজ যাব রোটাং পাস। বাস বিপাশার পুল পার হয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। সূর্যের নতুন আলো ছুঁয়ে যায় শিখর থেকে শিখরে। নিশ্চল তরঙ্গ তুষার মণ্ডিত চূড়ায় চূড়ায় যেন জ্বলে লক্ষ লক্ষ প্রদীপমালা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় হিমালয়ের শৃঙ্গমালা। প্রাণ ভরে দেখি দেবতাত্মা হিমালয়কে। যেতে যেতে বাঁ-দিকে কলকল ছলছল শব্দ কানে আসে। বাঁ-দিকে তাকাতে দেখি এক বেগবতী স্রোতস্বিনী শ্যামল উপত্যকার বুক বিদীর্ণ করে প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপাশার বুকে। এই স্রোতস্বিনীকে কেউ বলে সোলান নালা কেউ বলে সোলন্দ। সোলান শিখর থেকে এ নদীর উৎপত্তি।

বাস এসে থামে কোটিতে। পরপর বাস, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশের বাস এবং গাড়ি পার হলে তারপর এপারের গাড়ি যাবে। এই অবসরে বাস থেকে নামি। ডানদিকে বনের মধ্যে চলে গেছে আঁকাবাঁকা কাঁকর বিছানো পথ। পাহাড়ের বুকে যেন সিঁথি। ঘন নীল বিপাশার কলকল্লোল ও শ্যামল তরুবীথির ছায়ায় পরিবেষ্টিত কোটি। পাখীর গানে ভরা, ফুলের রঙে রাঙানো মধুময় গ্রামখানি। এবার আমাদের বাস ছাড়বে। বাসে উঠে পড়ি। কিছুক্ষণ পরে বাস চড়াই পথে উঠতে থাকে। চড়াই শেষে দেখা যায় রাহালা জলপ্রপাত। স্থানীয় লোকেরা বলে রালা। চারিদিকে বিশাল বন। সেই বনের মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর্ণা নামে। বিক্ষিপ্ত পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে ভীম গর্জন তুলে। রাহালা ছাড়িয়ে বাস সর্পিল গতিতে এগিয়ে চলে। এবার বাস থামে মারি নামে একটা জায়গায়। এখানে কয়েকটা হোটেল এবং চায়ের দোকান আছে। আমরা নেমে চা খেলাম। আবার বাস চলতে শুরু করে। চড়াই পথে উঠতে থাকে বাস। চড়াই শেষে দেখা যায় তুষার শৃঙ্গমালা। সামনে রোটাং পাস। বাস থামে। নেমে দেখি ছোট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা রোটাং গিরিবর্ত্ম। উচ্চতা ১৩০৫০ ফুট।

মেঘহীন সুনীল আকাশ। চারিদিকে তুষারের শুভ্র শোভা। ধ্যান গম্ভীর হিমালয়ের বিরাট মৌনতা। রোমাঞ্চকর রূপের সমারোহ। যেন কোন শিল্পী ক্যানভাসে একটা অপূর্ব ছবি এঁকেছেন। সোনালী সূর্যের স্পর্শে চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তুষারে তুষারে প্রতিফলিত হয় আলোর ঝলকানি। স্বর্গীয় শোভার মাঝে হাসেন গিরিরাজ। মহামৌনি হিমালয় থেকে নেমে আসে এক ধবল রেখা। যার হৃদয়ে বিগলিত করুণায় জন্ম হয় বিপাশার। আহা কি রূপ। কি তার শোভা। যেন ধ্যানমৌনি দেবাদিদেবের জটা থেকে খসে পড়া হীরক খণ্ড। কুলকুল রবে বয়ে চলে বিপাশা। পথে অজস্র নদী ও ঝর্ণা তাকে জলের অঞ্জলি দেয়। এইভাবে হিমাচলের প্রাণ নির্ঝরিনী বিপাশা ছুটে চলে স্বর্গ থেকে মর্তের দিকে।

বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি ধরে। গায়ে ভাল করে চাদর জড়িয়ে নিলাম। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। যে দিকে তাকাই তুষার শুভ্র গিরিমালা। যেন ডানা মেলা বকের সারি। এই বুঝি উড়ে যাবে নীল আকাশে।

রোটাং গিরিবর্ত্ম কুলু ও লাহুলের যোগসূত্র। এপারে কুলুর শ্যামশোভা। ওপারে শুষ্ক লাহুল। রোটাং চিরতুষারাবৃত নয়। মাঝে মাঝে বরফ জমে। শীতের জমা বরফের না গলা অংশ ও নতুন বরফে এ অঞ্চলের পর্বতগুলি তুষারময় হয়ে থাকে। রোটাং তিব্বতী শব্দ। এর অর্থ মৃতদেহের স্তূপ। এখানে সারাদিন প্রবল বেগে হাওয়া বয়ে যায়। রোটাং-এর উচ্চতম স্থানে আছে একটা ছোট কুণ্ড। এরই নাম ব্যাস কুণ্ড বা বিয়াস রিখি। সেই বিয়াস রিখিই বিপাশার জন্মস্থান। এই কুণ্ডের ধারে একটি ছোট মন্দির আছে।। সেই মন্দিরে আছে ভগ্ন পাথরের মূর্তি। সেটি নাকি ব্যাসদেবের। তার নাম অনুসারে এই কুণ্ডের নাম ব্যাস কুণ্ড। সাহেবরা ব্যাসকে বিয়াস রিখি বলে উচ্চারণ করতেন। সেই থেকে আজও বিপাশার জন্মস্থান বিয়াস রিখি নামে পরিচিত। ইতিহাসে পাই পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং কুলুরাজ্য অধিকার করার পর তার সেনাপতি লেহনা সিং এই মন্দির তৈরি করেন।

১৮২০ সালে মুরক্রাফট ১৪ই আগষ্ট এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার সময় সেই মূর্তিটি দেখতে পান। ১৮২০ সালে উইলিয়াম মুরক্রাফট ও তার সহযাত্রী জর্জ ট্রেবেক যখন এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন তখন এর নাম ছিল 'রিতাঙ্কা জোত'। 'জোত' কথার অর্থ গিরিবর্ত্ম। স্থানীয় লোকেরা তখন কেউ কেউ একে পর্বত শিখর বলে মনে করতো। কিন্তু মুরক্রাফট বুঝতে পারেন এটা গিরিপথ ছাড়া আর কিছুই নয়। মুরক্রাফটের প্রায় ১০ বছর বাদে ডঃ গোরার্ড যখন আসেন তখন 'রিতাঙ্কা জোত' নামটা পরিবর্তন হয়ে রোতাং হয়। তিনি অবশ্য এই গিরিবর্ত্মের উচ্চতা ১৩০০০ ফুট বলেছিলেন। ১৮৮৪ সালের ১০ই মে স্যার ফ্রানসিস ইয়ং হাজব্যাণ্ড এই গিরিপথ অতিক্রম করে লাহুল যান। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে তাকে সারাটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। মাথায় যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে তিনি এগিয়ে যান। তিনিও এর উচ্চতা বলেছিলেন ১৩০০০ ফুট। রোটাং এর উচ্চতা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে ১৯৬১ সালের আদম শুমারী রিপোর্টে রোতাং-এর উচ্চতা আছে ১৩০৫০ ফুট। গিরিপথের বাঁ-দিকে প্রায় ৫০০—৬০০ ফুট উঁচুতে সরকুণ্ড নামে একটি ছোট হ্রদ আছে। প্রতি বছর ২০শে ভাদ্র কুলু, লাহুল, স্পিতি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু পুণ্যার্থী আসে এই কুণ্ডে স্নান করতে। তাদের বিশ্বাস এই শুভদিনে পুণ্যকুণ্ডে স্নান করলে সর্বরোগ মুক্ত হয়। আবার বাসে এসে উঠি। বাস মানালির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

বিকেলবেলায় ফিরে আসি মানালিতে। পড়ন্ত সূর্যের স্বর্ণরশ্মি এসে পড়েছে মানালির মুখে, বিয়াসের বুকে। পড়েছে হিমানি হিমালয়ের শিখর চূড়ায়। জগৎজোড়া আসন জুড়ে দেবাদিদেব যেন আজ সমাহিত। ধ্যান গম্ভীর। স্বর্ণ জটাজালে ঐ সোনার আলো লুকোচুরি খেলে যায়। সুন্দরী মানালির গায়ে লাগে বিচিত্র বর্ণালী। সূর্য ডুবছে আকাশ রাঙিয়ে। আবিরের আলপনা এঁকে। লাল রঙ ছড়িয়েছে নীল নভোমণ্ডলে। মেঘের আঁচলে আঁচলে লেগেছে তার ছোঁয়া। মন্থর গতিতে সূর্য নামছে পাহাড়ের আড়ালে। অন্ধকারে ছেয়ে যায় বনভূমি।

রূপসী চাঁদ ওঠে। লক্ষ লক্ষ তারা নিয়ে দীপালির দীপ জ্বেলে। গিরিরাজের নিদ্রা ভাঙে। চন্দ্রিমা উছলে পড়ে বিপাশার রূপোলী জলে। সেও চুমকি বসানো নীল ঘাঘরা পরে নাচতে থাকে। কম্বল জড়িয়ে হোটেলের বারান্দায় বসে প্রকৃতির পাগল করা রূপ দেখতে থাকি। বুকের ভেতর টনটন করতে থাকে। কি যেন হারিয়ে গেছে তা আর খুঁজে পাই না। এক সময় খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি।
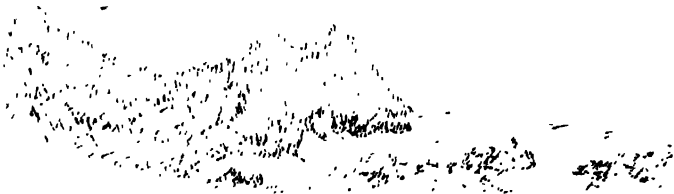
সেকালের টিহরী

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

আজ আমাদের টিহরী পৌঁছিবার কথা, প্রায় ১৪ মাইল পথ চলিতে হইবে ; তবে শুনিলাম আজ শীঘ্রই উৎরাই আরম্ভ হইবে। কানাতালের বাংলা প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত আর টিহরী কেবলমাত্র ৩০০০ ফুট। চা পান করিয়া ও জিনিস পত্র বাঁধিয়া আমরা বেলা প্রায় ৮ টার সময় টিহরী অভিমুখে চলিলাম। কুলীরা আপন আপন মোট এক প্রকার বুঝিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য আজ আর কুলীদের লইয়া বিশেষ কোন গোল হইল না। মালপত্র টাণ্ডেলের হাতে ছাড়িয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। মাইল দুই আসিয়া একটি রাস্তা দেখিতে পাইলাম, যাহারা টিহরীর রাজধানী না যাইতে চাহেন তাহারা এই পথে ভড়লানা নামক স্থানে যাইতে পারেন। ভড়লানা এ স্থল হইতে প্রায় ৮ মাইল। আমরা সে পথ ছাড়িয়া টিহরীর পথেই চলিলাম, উদ্দেশ্য সহর দেখা ও রাজ দরবার হইতে শীকারের জন্য পাশ লওয়া। আরও ৪ মাইল পথ আসিয়া আবার দুইটি পথের সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত পথই আমরা অল্প অল্প নামিতেছিলাম। আমাদের দক্ষিণদিকের পথটি একেবারে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে, ইহাই টিহরীর পথ। অপর পথটি উপরের দিকে উঠিয়াছে। শুনিলাম এই পথ দিয়া প্রতাপনগর যাইতে হয়। প্রতাপনগর টিহরীর নিকট সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। সেখানে টিহরীর রাজার একটি গ্রীষ্ম নিবাস আছে। টিহরী হইতে প্রতাপনগরের বাড়ী ঘর অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপনগরের পথ বামে রাখিয়া দক্ষিণের পথ দিয়া আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। এপথে দৃশ্য কিন্তু বদলাইয়া গেল। এতক্ষণ আমরা সুন্দর বন উপবনের মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, এখন ক্রমেই বৃক্ষের সংখ্যা কমিয়া পর্ব্বত গাত্রে কাল পাথর ও মাটিই অধিক দৃশ্য হইল। আমাদের বিশ্বাস ছিল উৎরাই সহজ, কিন্তু ক্রমাগত ৪৫° ডিগ্রির হেলান রাস্তায় নামিয়া পা শীঘ্রই ব্যথা হইল এবং হাঁটুর উপর অধিক জোর পড়িতে লাগিল। আর কিছুদূর নামিতে নামিতে আমার বাম পদের হাঁটুর নিকট একটি ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। মাস্‌কুলার পেন মনে করিয়া তত গ্রাহ্য না করিয়া চলিলাম কিন্তু যতই নামিতে লাগিলাম ব্যথাও তত বাড়িতে লাগিল। আজ সূর্য্যের উত্তাপও অধিক উষ্ণ বোধ হইল, চলিতে চলিতে দাঁড়াইলে আর তত সুন্দর শীতল বাতাস পাওয়া গেল না। বেলা ১০টা আন্দাজ এক গাছের ছায়ায় বসিয়া সঙ্গের রুটি ও তরকারী খাওয়া গেল।

আজ কিন্তু পথের শ্রান্তি বেশী বোধ হওয়াতে আহারে তত রুচি ছিল না। আহার শেষ করিয়া আমরা আবার শীঘ্রই চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখনও টিহরী পৌঁছিতে প্রায় ৬/৭ মাইল পথ বাকি। আমার গতি এখন অতি মৃদু হইয়া আসিয়াছে কাজেই অপর সকলে আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। আজ উৎরাই পাইয়া ফণী ও সত্যেনের ডাণ্ডি বাহকগণ অতি উৎসাহের সহিত চলিয়াছে। উৎসাহের আরও এক কারণ ছিল। তাহাদের অধিকাংশেরই বাড়ী টিহরীর নিকট ও টিহরী সহর তাহারা বেশ ভালরূপে জানে।

তথায় কাহারও কাহারও আত্মীয় বন্ধুও বাস করে। আমার সঙ্গীরা শীঘ্রই দৃষ্টির বাহির হইল। আরও দেড় দুই মাইল যাইবার পর এক নদী গর্ভে আসিয়া পৌঁছিলাম। নদীটি একটি কাষ্ঠের পুল পার হইয়া অপর পারে অল্প চড়াই পাইলাম। সমস্ত সকাল উৎরাই করিয়া এ চড়াই ভাল লাগিল। কিন্তু এ সময় আমার রীতিমত কষ্ট হইতেছিল। পায়ের ব্যথা, রৌদ্রের তেজ, ধুলা, ছাওয়ার অভাব এই সকল কারণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। চড়াই প্রায় শেষ করিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জলের বোতল হইতে প্রাণ ভরিয়া জল পান করিলাম।

পাহাড়ের গায়ে পৃষ্ঠ দিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া আছি, কিছু পরেই একদল মিউল সেই পথ দিয়া টিহরীর দিকে গেল। প্রথম মিউলটি রাস্তার মাঝে কি এক অদ্ভুৎ জানোয়ার বসিয়া আছে মনে করিয়া একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইল। আমিও মিউলের খুরোত্থিত ধুলা অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া রহিলাম, কেননা তখন যেন আর উঠিবার শক্তি নাই বলিয়া বোধ হইল। প্রায় ১৫/২০ মিনিট বিশ্রামের পর অগ্রসর হইলাম। ১ মাইল চলার পর আবার দুই পথের সন্ধিস্থলে আসিলাম। বামদিকের পথ ভড়লানা হইয়া গঙ্গোত্তরীর দিকে গিয়াছে আর দক্ষিণ দিকের পথ টিহরীর দিকে গিয়াছে। এখান হইতে টিহরী প্রায় তিন মাইল। এই সন্ধিস্থলে একটি প্রকাণ্ড গাছ আছে। তাহার গোড়াটি বেশ বাঁধান ও ছায়াযুক্ত, ক্লান্ত পথিককে যেন বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছে। দেখিলাম আমাদের দুই চারি জন কুলীও সেখানে তাহাদের মোট নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুসূরী আসার পর আজ প্রথম সমতল ভূমি দৃষ্টি গোচর হইল। গত কয়েক দিন পাহাড়ের গাত্রে হয় উঠিয়াছি নয় নামিয়াছি। আমি যে স্থলের কথা বলিতেছি তথা হইতে টিহরীর দিকে যাইতে হইলে এক বিস্তৃত সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। টিহরী হইতে উত্তর কাশী পর্য্যন্ত এরূপ প্রান্তর অনেকগুলি পাইয়াছিলাম। এগুলি দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ উপত্যকা কিন্তু প্রায় সমতল। দেখিলাম উহাতে প্রচুর ধান্য হইয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে এরূপ ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়া আবার শস্য শ্যামলা দেশের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় ছিল না। তখন ভাবনার বিষয় তিন মাইল পথ কোন ক্রমে অতিক্রম করা। সঙ্গীরা সকলে অদৃশ্য হইয়াছে আমি কোন ক্রমে পা টানিয়া অগ্রসর হইতেছি। সূর্য্যের প্রখরতা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম, পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ ছাড়া আর বড় গাছ দৃষ্টি পথে পতিত হইল না। সে দেশ-বাসী লোক দুই চারিটির সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইল। তাহারা টুপি দেখিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। মেয়েরা কিছুদুর গিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। আরও প্রায় এক মাইল পথ আসিয়া আর একটি বড় গাছ পাইলাম। তাহার ছাওয়ায় বসিয়া বোতলের জল শেষ করিলাম। তারপর গাছের শিকড়ে মস্তক রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া অতি কষ্টে বাকি পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। আজ দশহরা বা দূর্গা পূজার বিসর্জ্জন। টিহরীর লোকেরাও সব উৎসবে মত্ত। দূরে সহরের বাড়ী ঘর দেখিতে পাইলাম। ক্লক টাউয়ারের মত একটি টাউয়ার (tower) বা স্তম্ভ রহিয়াছে দেখিলাম। টিহরী সহর বেষ্টন করিয়া একদিকে গঙ্গা ও অপর দিকে অলকানন্দা প্রবাহিতা। এই নদীদ্বয়ের স্রোতের তীব্র ঘর্ঘর শব্দ ও দশহরার

বাদ্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। মনে আশার সঞ্চার হইল এইবার টিহরী পৌঁছিব। সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উৎরাই পাইলাম। পথে অগণ্য লুড়ি পড়িয়া আছে। এই উৎরাইয়ের শেষে তারের রজ্জুতে ঝোলান একটি কাষ্ঠের পুল গঙ্গার উপর রহিয়াছে। এই পুল দিয়া গঙ্গা পার হইয়া টিহরী সহরে ঢুকিতে হয়। কলিকাতা ছাড়িবার পর গঙ্গার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। এখানে কিন্তু গঙ্গার অন্য মূর্ত্তি। কবি হইলে সুবিধা মত গঙ্গার বর্ণনা করিতাম। সে যা হোক এখন ছোট খাট একটা উপমা না দিয়া ছাড়িতেছি না। গঙ্গা যেন এ স্থলে তরুণী, এখনও বাল সুলভ চাপল্য রহিয়াছে তাই যেন লঘু পদে বেগে দৌড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু চাপল্যের সহিত যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই আর বাধা বিপত্তি কিছু মানিতে চাহিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত পুলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিলাম দুই দিকে কাল পাহাড়ের মধ্য দিয়া, বড় বড় প্রস্তরখণ্ড সকলকে সবলে আঘাত করিয়া, সফেন তরঙ্গ রাশির দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত ও উলঙ্ঘন করিয়া প্রচণ্ড বেগে নিম্নমুখে ধাবমান হইতেছে। এস্থল হইতে গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত গঙ্গার এই মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃশ্য পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই অবিরাম দ্রুত গতি।

পুল পার হইয়া টিহরী সহরে প্রবেশ করিলাম। স্থানটিকে দেখিয়া পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। কিছুদূর গিয়া সহরের মধ্যে দ্বিতল ধর্ম্মশালা পাইলাম। আমার সঙ্গীরা এই স্থানেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। সহর বলিতে কলিকাতা কি বোম্বাই যেন কেহ বুঝিবেন না, তবে পশ্চিমের ছোট সহরের সঙ্গে কতক সাদৃশ্য আছে। বাড়ীগুলি ছোট ছোট দ্বিতল। আমরা যে রাস্তায় ছিলাম এইটিই প্রধান রাস্তা বলিয়া বোধ হইল। রাস্তাটি বেশ চওড়া। বাড়ীগুলির নীচের ঘরগুলিতে দোকান। ধর্ম্মশালার সম্মুখে রাস্তার অপর পারে ডাক ও টেলিগ্রাফ্ অফিস্। ধর্ম্মশালাটি বেশ প্রশস্ত। দ্বিতলে ৪/৫টি ঘর, ঘরের সম্মুখে চওড়া বারাণ্ডা ও বারাণ্ডার সম্মুখে ছাদ। আমাদের জিনিস কতক বারাণ্ডাতেই ও কতক ঘরে রাখা হইল। ঘরগুলিতে যতদূর সম্ভব আলো ও হাওয়া অবরোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আমরা সেই জন্য বারাণ্ডাই শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের সঙ্গের খাট খুলিয়া বিছান হইল। সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মশালা একেবারে খালি ছিল কেবল একজন রক্ষক ছিল। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম টিহরীতে দুইজন বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা টিহরী স্কুলের হেড ও সেকেণ্ড মাষ্টার। আজ দশহরা অর্থাৎ আমাদের দেশের বিজয়ার দিন। বিজয়া বলিতে বাঙ্গালীর প্রাণে কেমন এক দুঃখ জড়িত শান্তির ভাব আসে। সে দিন তর্ক বিবাদ ভুলিয়া সকলকে আপনার করিয়া নিতে মন কেমন ব্যাকুল হয়। বাঙ্গালী যতই কেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হন না বিজয়ার প্রেম আলিঙ্গন তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতে হয়।

এস্থলে ৪/৫ বৎসর পূর্ব্বের এক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পূজার অবকাশে দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তথায় একটি বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের সহিত আমাদের আলাপ হয়। দেখা হইলে ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গলা ভাষায় তিনি কখনও কথা বলিতেন না, ও কথায় ও ভাবে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর আচার ও ব্যবহারের বিদ্বেষী বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি গল্পও শুনা

গিয়াছিল যাহাতে তাঁহার উক্ত ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। বিজয়ার পরদিন প্রাতে আমরা দার্জ্জিলিং নিবাসী বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিজয়ার সম্ভাষণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে এই বাঙ্গালী সাহেবটির সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা, তাঁহাকে বিজয়া সম্ভাষণ করা উচিৎ কিনা, এই বিষয় স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন বিশেষ ইতস্ততঃ না করিয়া, "আসুন মহাশয় বিজয়ার কোলাকুলি করা যাক" বলিয়া, ও তাঁহাকে কথা কহিবার কোন অবসর না দিয়া, রাস্তার মধ্যে তাঁহার সেই বাঙ্গালী সাহেব মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। বাঙ্গালী সাহেব কি ভাবিলেন জানি না কিন্তু তাঁহাকে একে একে আমাদের সকলের আলিঙ্গন সহ্য করিতে হইল। বোধ হয় তিনি ভাবিতেছিলেন কোন ইউরোপীয় নর নারী সে দৃশ্য না দেখিতে পায়। এগল্প বলার উদ্দেশ্য, যে পসন্দ না করিলেও বাঙ্গালী হইয়া বিজয়ার সম্ভাষণ অগ্রাহ্য করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যাহা হউক আমরা বাঙ্গালীর বিজয়া ভুলি নাই, তাই টিহরীতে কোন বাঙ্গালী থাকেন কিনা খোঁজ করিলাম, ও দুইজন বাঙ্গালী থাকেন শুনিয়া আমাদের আগমন সংবাদ তাঁহাদের প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইল। আমি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা রক্ষকের হস্তে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের নিকট পাঠাইলাম, ফলে সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় শিক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, লোকটি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট। আমরা বেশ আগ্রহের সহিত ও অসঙ্কোচে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহিলাম, কিন্তু তাঁহার কিছু সঙ্কোচ ভাব লক্ষ্য হইল ; বোধ হয় অপরিচিত বাঙ্গালী যুবক বা মধ্য বয়স্ক লোকের সহিত বিদেশে আলাপ করিতে সে সময় ভারতবর্ষের অনেক লোকেই কিছু সঙ্কুচিত হইতেন। তবে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে সে সঙ্কোচ ভাব কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা হউক পরদিন আবার আসিবেন ও প্রধান শিক্ষককে লইয়া আসিবেন বলিয়া মাষ্টার মহাশয় বিদায় হইলেন। আমাদের টিহরী যাইবার প্রধান কারণ রাজ সরকার হইতে বন্দুকের পাশ জোগাড় করা। এই দিন সে সম্বন্ধে কোন কাজ হইল না। দশহরার জন্য বিকালে টিহরীর ফৌজ্‌দের প্যারেড্ ছিল শুনিলাম সকল আফিসই বন্ধ ও কর্ম্মচারীরা প্যারেড্ ও দশহরার উৎসবে ব্যস্ত। আমাদের ধর্ম্মশালার কিছু উচ্চে পাহাড়ের উপর সমতল ভূমিতে প্যারেড্ হইতেছিল, ধর্ম্মশালা হইতে তাহা দেখা গেল না, তবে, বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ পাহাড়ের গা দিয়া তামাসা দেখিবার জন্য উপরে উঠিতেছে, আমরা দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বে যে ফৌজের কথা বলিলাম তাহা ইংরাজের শিক্ষিত গুরখা সৈন্য। টিহরীতে সর্ব্ব সময়েই প্রায় ২৫০ জন ইংরাজদের সৈন্য থাকে। ইহারা ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত নেতার অধীন, কিন্তু ইহাদের সকল ব্যয় টিহরী ষ্টেট্‌কে বহন করিতে হয়।

আজ প্রাতে আমি ও শৈলেন শিকারীকে সঙ্গে লইয়া উজীর ও রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিতে গেলাম, উদ্দেশ্য বন্দুকের পাশ জোগাড় করা, কেননা আমরা দুই একটি স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম সে সময় গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তর কাশীর উর্দ্ধে শিকারের পাশ বন্ধ ছিল। ধর্ম্মশালার সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে সেইটিই সহরের প্রধান রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে কিছুদূর পর্য্যন্ত দোকান রহিয়াছে, ব্যবসাদার কিছু মারোয়ারী ও বাকি পাহাড়ী, কাপড় কম্বল, ইত্যাদির

দোকানই অধিক। ক্রমে উঠিতে উঠিতে আমরা স্কুল ছাড়াইয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি স্তম্ভের নিকট আসিলাম। ইহার উপর একটি বড় ঘড়ী আছে তাহা টিহরী সহরে সময়ের গতি বিজ্ঞাপন করে। কিন্তু টিহরী সহরের এই ঘড়ী আমাদের সাধারণ ঘড়ীর মত সময় রাখে না। সে তাহার ইচ্ছামত কখন থামে কখন চলে। এক কথায় সে ঘড়ীর মতে ২৪ ঘণ্টায় দিন হয় না। আর কিছু উর্দ্ধে উঠিয়া আমরা কতকগুলি পাকা ইমারত দেখিলাম। শুনিলাম সেগুলি আদালত ও কারাগার। এই দুইয়ের এত নিকট সম্বন্ধ দেখিয়া সে দেশের আসামিদের প্রতি কিছু সহানুভূতি হইল। তারপর একটি বড় ফাটক পার হইয়া আমরা একটি বাগানের মধ্য দিয়া এক দ্বিতল বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত ফটকের নিকট দুইজন প্রহরী ছিল। আমাদের দেখিয়া একবার যেন তাহাদের দৃষ্টিতে প্রশ্নের ভাব দেখিলাম। কিন্তু টুপির কি গুণ, ইহা ভারতবাসীকে ভেড়া বানাইয়াছে, প্রশ্ন আর উচ্চারিত হইল না, আমরা গম্ভীর ভাবে ফটক পার হইলাম। উপরোক্ত বাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলাম একজন শাস্ত্রী পাহারা দিতেছে অপর কতকগুলি লোক নীচের বারাণ্ডায় বসিয়া লিখিতেছে ও কথা বার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে উজীর ও প্রাইভেট সেক্রেটারী দুইজনেই সেই বাড়ীতে উপস্থিত আছেন। আমরা আমাদের কার্ড পাঠাইয়া দিবার কিছু পরে একজন লোক আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল। শিকারীকে তথায় রাখিয়া আমরা সেই লোকের সহিত এক ঘোরাণ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির নীচে ও উপরে আরও শাস্ত্রী দেখিলাম কিন্তু তাহারা আমাদের কিছু বলিল না। সঙ্গের লোক আমাদের একটি ঘরে লইয়া গেল। তথায় দেখিলাম একটি কাষ্ঠের বড় গোল টেবিল ও তাহার চতুর্দ্দিকে ৫/৬ খানি কাষ্ঠের চেয়ার রহিয়াছে। তাহারি দুইটিতে দুইটি লোক আসীন। একটির পরিহিত চাপকান্ ও মাথায় ফেল্টের গোল কাল বা ব্রাউন রংয়ের টুপি। লোকটিকে দেখিতে পশ্চিমে মুন্সিদের মত চেহারা দেখিতেও সুপুরুষ নয়। অপরটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি, তাহার পরিধানে শুভ্র চাপকান্ ও পায়জামা ও মস্তকে শুভ্র উষ্ণীশ, গলায় সাদা চাদর, কপালে চন্দনের ফোঁটা। লোকটি গৌরবর্ণ ও সুপুরুষ। উভয়কেই অভিবাদন করিয়া আমরা ইংরাজীতেই কথা বার্ত্তা সুরু করিলাম। তাঁহারা আমাদের বসিতে বলিলেন। কথা গোল টুপি পরিহিত লোকটিই কহিলেন। তিনিই রাজার প্রাইভেট্ সেক্টোরী। অপর লোকটিই উজীর, তাঁহাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হইল। তিনি ইংরাজী জানেন না জানিতে পারিয়া আমরা হিন্দিতে কথা কহিলাম। আমাদের পরিচয় কতক বলিলাম। বন্দুকের পাশের বিষয় তাঁহারা কিছুই আপত্তি করিলেন না ও আমাদের থাকিবার কোন কষ্ট আছে কিনা ইত্যাদি কথা কহিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা হৃষ্ট চিত্তে বিদায় লইলাম, তাঁহারা আরও বলিলেন যে আমাদের সহিত তাঁহারা ষ্টেটের একজন চাপ্‌রাসি দিবেন। ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া পরদিন প্রত্যুষে আমরা টিহরী ছাড়িয়া অগ্রসর হইবার সংকল্প ও বন্দোবস্ত করিলাম। আমাদের কুলীদের মধ্যে অনেকের বাড়ী টিহরী ও নিকটবর্ত্তী স্থানে। তাহারা আমাদের নিকট, পরদিন প্রত্যুষে আসিবার অঙ্গীকার করিয়া, ছুটি লইয়া বাড়ী গেল। আমরাও তাহাদের কথায় নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে ছুটি দিলাম। কিন্তু পরে আমাদিগকে সেইজন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে

হইয়াছিল। আজ আমাদের ছুটি। বাল্যকালে মাষ্টার মহাশয় না আসিলে ছুটি পাইয়া কে না আনন্দ ভোগ করিয়াছে। সে পড়ার ছুটির ন্যায় আজ চলার ছুটিও অতিশয় মিষ্ট লাগিয়াছিল। এ পথে যেন রুটীন করিয়া দিন ১০ মাইল পথ চলিতাম। একমাস ৪/৫ দিনের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৪/৫ দিন আমাদের চলা বন্ধ ছিল, কিন্তু সেই কয় দিনই বাল্যকালের সেই ছুটির মতই ভাল লাগিয়াছিল। আমরা সকলে এখান হইতে বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। আমাদের মুসূরীর বন্ধুদেরও লিখিয়া জানাইলাম যে আমাদের একস্‌পিডিসান টিহরী আসিয়াছে ও আরও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। ধর্ম্মশালা রক্ষক আমাদের গঙ্গোত্তরীর পথের খবর কিছু দিল। পথে হরশিল নামক স্থানে একটি ভাল বাংলা আছে ও তাহার সঙ্গে আপেল ও পেয়ারের বাগান আছে। গাছে আপেল ও পেয়ার ফলিয়াছে দেখিতে পাইব, এ সংবাদে আমরা সকলেই কিছু আশ্বস্থ হইলাম। মনে হইল হিমালয়ে এত ঝাউ ও দেবদারের বন না হইয়া আপেল ও পেয়ারের বন হইলে আমাদের কাহারও বিশেষ আপত্তি হইত না। কিন্তু হরশিলের সম্বন্ধে আপেল ও পেয়ার ছাড়া আরও যাহা বলিল তাহাতে সতীশ ও ফণীর আপেল আস্বাদ করিবার আগ্রহ কিছু কমিয়া গেল। সে বলিল "সেখানে শীত অতি বিষম ও রাত্রে যতই কেন গরম কাপড় ব্যবহার কর না, সকলকেই শীতে হিহি করিতে হইবে"। এই বলিয়া পাখিতে স্নান করিয়া পক্ষ বিস্তারিত করিয়া ও কাঁপাইয়া যেমন জল ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া ও দশটি আঙ্গুল কাঁপাইয়া দেখাইয়া দিল। একেত সকলেরই মনে ধারণা যে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে শীত তত বাড়িবে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে অতি দুরুহ শীত ভোগ করিতে হইবে স্থির করা গেল। বিকালে হেড মাষ্টার আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর টিহরীতে মাষ্টারী করিতেছেন। তাঁহার শ্বশুর রাজ সরকারে কোন বড় চাকরী করিতেন, তিনিই তাঁহাকে এস্থলে আনয়ন করেন। আদি বাস হুগলির নিকট, এখন বেশী সময় এস্থলেই স্থিতি। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী উত্তর ভারতে কিরূপ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমান সর্বত্রই পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব পুরুষ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ সরকারে ও ইংরাজাধিনে নানাবিধ প্রধান প্রধান পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। এখনও অনেক স্থলে বাঙ্গালীরা এই সকল পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের স্মৃতি সম্মানের সহিত রক্ষিত। আজি কালিকার দিন, যখন বাঙ্গালীর মন্দ ছাড়া ভাল কেহ দেখিতে পায় না, তখন এই সুদুর দেশে, হিমালয়ের মধ্যে, বাঙ্গালী শিক্ষক দেখিয়া আমরা আত্ম গৌরবের বিষয় কিছু পাইয়াছিলাম। আজ বিকালে বন্দুকের পাশ আমরা পাইলাম। দুই জনের নামে পাশ লওয়া হইল বলিয়া আমাদের ২০্ টাকা দিতে হইল।

* লেখকের 'গঙ্গোত্তরী' ও যমুনোত্তরী (১৯১৪) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
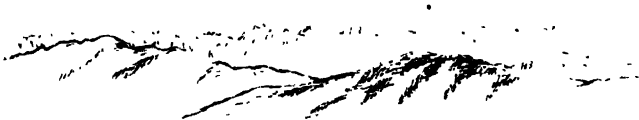
নেফা হিমালয়ে

নবনীতা দেবসেন

তাওয়াং গুম্ফা মস্ত বড়ো ব্যাপার—দুর্গের মতো, কেল্লার মতো, এবং তারই ভেতরে মন্দির। পথে এক জায়গায় একটা গ্রাম দেখিয়ে ঘনশ্যাম ছেত্রী বলেছে—"এখানে জং ছিল, কেল্লা—খাম্পারা এসে মোম্পাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে খাজনা আদায় করত। এখানে মাটির নীচে গুহাঘরে বন্দীদের আটকে রেখে দিত—খাম্পারা আসতো তিব্বত থেকে—খুব নিষ্ঠুর জাত। শেষকালে মোম্পারা একদিন ওদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।"—আমার মনে হলো, সেটা নিশ্চয় ইংরেজদের আসার পরে। ছেত্রীই বললো—"তাওয়াং গুম্ফাতেও জং আছে—বাইরে—গুম্ফাতে বহুৎ সোনা তো, জং না থাক্‌লে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেত খাম্‌পা ডাকুরা।"

কিন্তু এই গুম্ফাটাতে নিশ্চয় মোটেই সোনাদানা নেই। ছোট্ট মন্দির, পাথরের তৈরি খুদে দোতলা বাড়ি। কেল্লাটেল্লার ব্যাপার নেই। ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনের বারান্দাময় কী যেন একটা শস্য ছড়ানো। শুকুতে দেওয়া হয়েছে। ঘাসের বীজের মতো দেখতে। আর তারই মধ্যে গোটা চারেক লোমঝুলঝুল কুকুর আরাম্‌সে শুয়ে আছে।

আমাকে দেখবা মাত্র কুকুরগুলোর কী প্রচণ্ড চীৎকার, নির্জন শীত সকালের শান্ত স্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল।

আমি কুকুর ভয় পাইনা, ভালবাসি। এগিয়ে গিয়ে শিস্‌ টিস্‌ দিয়ে ওদের ভোলানোর চেষ্টা করতেই, ওরে বাব্বা! আরও জোরে জোরে হল্লাগুল্লা সুরু করে দিল। গুম্ফাবাসী সন্ন্যাসী কুকুরের ব্যাপারই আলাদা। তখন গুম্ফায় ঢোকবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে প্রদক্ষিণ করতে গেলুম। ওরাও চুপ করে গেল। বাইরে প্রেয়ার হুইল রয়েছে। ঘোরালেই ওম মণিপাম হুম্‌ বলা হবে একশো আটবার। বাইরে থেকে একটা সরু পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে গুম্ফার দোতলায়। সেখান থেকে নেমে এলেন এক গেরুয়াধারী লামা।

—"নমস্কার।"

—"...।" তিনিও নমস্কার করলেন।

—"গুম্ফাকা অন্দর যা সক্‌তা?"

—"...।" তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন, কিন্তু কী যে বললেন বোঝা গেলনা। তাঁকে দেখে কুকুররা মহা উল্লসিত, বেঁটে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পিছু পিছু মন্দিরের ভেতরে এসে ঢুকল। মন্দিরে কুকুর ঢুকতে আগে দেখিনি। একটু অস্বস্তি হল না, তা বলব না। কুকুরদের পশ্চাদ্ধাবন করলুম আমি।

ভিতরটা বেশ বড় একটি হলঘর। শেষ প্রান্তে পূজাবেদী ইত্যাদি। সেখানে একটি স্তম্ভ, তাতে থাকার কথা বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু আছে কী? পাঠক, বিশ্বাস ধারণ করুন। বেদীর ওপরে

ঘৃতপ্রদীপের সামনে ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত,—কে? গান্ধীটুপি জহরকোট পরা নেহরুর প্লাস্টার অফ প্যারিসের মূর্তি। তারই সামনে জ্বলছে ধূপধুনো। চারিপাশে ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর ফোটো ঝুলছে। বড়ো বড়ো পোস্টার সাঁটা রয়েছে সঞ্জয়ের বাণী উদ্ধৃত করে। সবচেয়ে মজা লাগলো 'তাংখা'গুলি দেখে। তিব্বতী তাংখা তো আগেও দেখেছি। সিল্কের ওপর মাটির রং দিয়ে আঁকা তিব্বতী দেবদেবীদের ছবি, ওপরে-নীচে জরিসাটিনের ব্রোকেড আঁটা, ফ্রেমের মতো করে নীচে ওপরে কাঠের রুল ভরা, আর তলায় ঝালর।

এখানে ঠিক সেই রকম বহু তাংখা, কেবল দেবদেবীর ছবির জায়গায় আছে ইন্দিরা, সঞ্জয় এবং জবাহরলালের সিংগল এবং গ্রুপ ফোটোগ্রাফ। কখনো একা, কখনো ভিড়ের ছবি। সভার বক্তৃতামঞ্চের ছবিও ঢের।

এটা তো বড্ড দূরে, আর বড্ড উঁচুতে, এখানে কি এখনও খবর আসেনি, যে ইন্দিরা-সঞ্জয় আর গদীতে নেই? ১৯৭৭-এর নবেম্বর মাস।—মার্চ মাসেই তো রাজনীতির আকাশ থেকে সঞ্জয়-উল্কার পতন হয়েছে। বেদীতে দূরে দূরে কয়েকটি ধূলিমলিন, ম্রিয়মান, অপূজিত, অবহেলিত বুদ্ধমূর্তি অবশ্য পড়ে আছে। ধূপ-দীপ জ্বলছে জবাহরলালের সামনে।

বাইরে প্রেয়ার হুইল ঘোরালে কি এই গুম্ফার 'মানি' যন্ত্রটি "ওম্ মণিপদ্মে হুম্"-এর বদলে অন্য কিছু মন্ত্র বলে? "নেহরু পদ্মে হুম্"? আমার অবাক মুখচ্ছবি দেখে বৃদ্ধ লামাটি বলেন—"নেহরু-গুম্পা, নেহরু-গুম্পা!"

তারপর বাইরে উঠোনে আসেন, কুকুরের পাল সমেত। উঠোন অযত্নে, আগাছায় ভরা। তৃণহীন, ছাগলনাদিতে অলংকৃত। সেখানে একটি ঘণ্টাতলা আছে, পাথরে বাঁধানো। লামা ধীরে পায়ে এসে ঘণ্টাটি বাজান। কেন বাজান? চমৎকার গম্ভীর ধ্বনি, পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আমি কিছুই বুঝিনা।

ভাষার সেতু নেই দুজনের মধ্যে।

আস্তে আস্তে ফিরে যাই।

কুকুররা কিছু বলে না।

তাড়া করে না।

যে চলে যায়, তার পথে বাধা নেই। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অন্য একটা ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ পাই। একটা নয়, অনেকগুলো। টুং টাং টুং টাং টুং। একটি বাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসে হৃষ্ট পুষ্ট একটি চমরী গাই। গলায় চৌকো ঘণ্টা বাঁধা। যেমন ঘণ্টা দেখেছি আল্পসের টিরোল অঞ্চলের গরুদের গলায়। তারপর আরোকটি, তারপর আরেকটি। একপাল ঘণ্টাঝংকৃত চমরী গাই নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ পায়ে চরাতে যাচ্ছে, দুটি তিব্বতী কুকুর! বিলিতি বইতে যাদের বলে শীপ-ডগ। তাদের পিছনে লাফাতে লাফাতে আসছে একটি ক্ষুদে লাঠি হাতে, অতীব ক্ষুদ্র একটি প্রাণী, তার নাকের সামনে সর্দি সবুজ হয়ে আছে, গায়ে নোংরা মোটা ভুট্‌কম্বলের বাকু, পায়ে জড়ানো জড়ানো রঙীন ফিতের মতন তিব্বতী জুতোমোজা। ফুটন্ত গোলাপফুলের মতন মুখটি। আমার দিকে অবাক চাউনি

ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেল। বাঃ, চমরী গাইদের গিন্নিবান্নি রাখালীটি তো ভাল? বয়েস বছর চারেকের বেশি মনে হল না।

নেহরু গুম্ফার উঠোনে সেই লামার বাজানো গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির পরে, এই হালকা টুং টাং—দুটো মিলে চমৎকার একটা সুরেলা আমেজ সৃষ্টি করেছে ; এই কূজনহীন ভোরের নগ্ন নৈঃশব্দ্য তবু কিছুটা ঘুচিয়েছে।

ডাক্তারের কোয়ার্টারটি সামনেই। ঢুকেই দেখি ডাক্তার বারান্দায়। দু' হাতে দু' কাপ চা। দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল—"কোথায় গিয়েছিলেন? আমি ভয় পাচ্ছি, নতুন জায়গা, হারিয়ে টারিয়ে না যান!"—হায়রে, হারাতে চাইলেও কি হারাতে পারবো এই জনহীন জনপদে? ঘরবাড়ি নেই গাছপালা নেই মানুষজন নেই শুধু তো পাথর! পাথরের সঙ্গে মিলে মিশে হারিয়ে যাবো, এমন অবস্থা এখনো হয়নি! হলে অবশ্য মন্দ হয় না।

ডাক্তারের ঘাড়ে সেই যে গভীর রাত্রে চাঁদনিরাতের পেত্নি পিসি হয়ে চেপে বসলুম, সার্কিট হাউসে, যাবার আর চেষ্টাই করলুম না, কেননা সেটা একটা উঁচু শৈলচূড়ায় একলা বসে আছে। সেখানে বন্ধু পাব কোথায়? বাহাদুর ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে—"এক হফ্‌তা তো ঠাহ্‌রিয়ে, মেমসাব? ইধরপে কোঈ মেহমান নেহী আতা—"শুনে শুনে ডাক্তারও মনে বল পেয়ে এখন বলছে—"নো পয়েন্ট ইন ইওর মুভিং আউট, নাউ দ্যাট আই হ্যাড বরোড দ্য বেডিং"—

আমিই বা আর আপত্তি করি কেন? অসুবিধে কিছু তো নেই, বরং একটা ভাল বন্ধু পেয়েছি। লাজুক, কিন্তু মানুষটা মোটেই খারাপ নয় ডাক্তার। তা না হ'লে আমাকে দুপুরের আগেই আরও চারজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়? ডাক্তার কর, যাঁর বাড়ি থেকে বিছানা ধার করা হয়েছে, আর ডাক্তার মহান্তি, এঁরা দুজনে উড়িষ্যার, ডাক্তার গুপ্তা বিহারের।

ডাঃ করের বাড়িতেই লাঞ্চ্‌ খেলুম, ওঁর স্ত্রীর রান্না ট্রাউট মাছের ঝোল, ডাল, ভাত, আলুভাজা। খুব ভাল লাগলো।

লাঞ্চের পর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ডাঃ লালওয়ানী, সেটি একটি "সারপ্রাইজ"। সেই প্রায়-কিশোরী মেডিকাল অফিসারটি ডাঃ স্বপ্না চৌধুরী, সদ্য পাশ করা বাঙালী মেয়ে। স্বপ্না তার কোয়ার্টারে আমাদের ধরে নিয়ে গেল, সেখানে বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকে সে। ছিমছাম্‌ সংসারটি দেখে খুবই ভাল লাগলো। পুত্র-সন্তানের কাজ করছে মেয়ে। এই পাণ্ডববর্জিত দুর্গম প্রবাসে জেনারেল হসপিটালের জাঁদরেল মেডিকাল অফিসার কে? না, একটি অবিবাহিতা ছেলেমানুষ বাঙালী মেয়ে। ওর মায়ের হয়ে আমারই তো গর্বে ছাতি দশহাত! স্বজনশূন্য দেশে অবশ্য ওঁদের স্বাভাবিক ভাবেই মন বসছেনা, বদলির অপেক্ষায় আছেন। স্বপ্নাকে দেখে আমি যত না অবাক, র‍্যাশনট্রাকে

চড়ে বিনা প্রয়োজনে বিনা পরিচিতিতে এমন হুট্ করে আমি তাওয়াং চলে এসেছি বলে, স্বপ্না এবং তার মা ততোধিক অবাক। এমনও করে মানুষ? চাকরি বাকরিতে নয়, কাজেকর্মে নয়, শুধু শুধুই?......

তাওয়াং গুম্ফা

আমি তো ইতিহাস লিখ্‌তে বসিনি। তাওয়াং গুম্ফার কথা নানা জায়গায়ই আছে। আলাদা করে বলবার মতন কিছু বিশেষ জ্ঞান আমার নেই। লে-লাদাখের গুম্ফাও শুনেছি নাকি এই রকমই। বিরাট ব্যাপার। বাইরে দিকে বহু জনবসত্ পাথরের ঘরবাড়ি, কেল্লার মতন দেওয়ালের ভেতরে গুম্ফার চত্বর। চত্বরে খুব দীর্ঘ একটা খুঁটি, সারাগা উজ্জ্বল নানারঙে রং করা, তাতে মস্ত নিশান উড়ছে। দেয়ালের বাইরে দিকে একজায়গায় বহু খুঁটির জঙ্গল, তাতে বহু শাদা নিশান। শুনলুম আত্মাদের শান্তির জন্যে আত্মীয়রা ওগুলো দান করে। গুম্ফার বাইরে বিরাট ঘণ্টা ঝুলছে। ভেতরে অনেক তরুণ লামা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে। আশ্চর্য একটা উদাত্ত সুর। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেও পবিত্র গুম্ফা ঘরে ঢোকার আগে লাফিয়ে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে ঢুকছে।

ভিতরে নানাবয়েসের ছাত্র লামার পড়াশুনো চলছে। আট থেকে আঠারো তো বটেই।

গোলমাল বাধলো প্রধান গুম্ফার ভিতরে ঢুকে, বুদ্ধমূর্তি দেখতে গিয়ে। মূল বৃহৎ ঘরটির মধ্যে আরেকটা ছোট ঘর। সেখানে কাচের দেওয়ালের ওপাশে 'ঠাকুর' আছে। অর্থাৎ বুদ্ধমূর্তি। মস্তবড় একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপটা পিতলের বোধহয়, দেখতে সোনারই মতন।—সুভাষবাবু বল্লেন—"পিওর চওঁরীঘিউ।" একটি প্রকাণ্ড রূপোর বাটিতে জল রাখা। কিন্তু ঠাকুর কৈ? বেদীর ওপরে পদ্মাসনে বসা দুটি শ্রীচরণ। তারই সামনে ধূপ, দীপ, জল। উঁকিঝুঁকি মেরে বুদ্ধমূর্তির বাকীটা দেখা গেলনা। সুভাষবাবু বললেন—"সিঁড়ি দিয়ে, বাকীটা সিঁড়ি দিয়ে।"—দোতলায় উঠে ভয়ে ভয়ে দেখি ঐযে বরাভয়ের মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। স্কন্ধকাটা মূর্তি। মন ভরল না।

আবার সিঁড়ি।

সত্যি সত্যি দুটি শব্দের অর্থ এমনভাবে মর্মে মর্মে বুঝিনি আগে। —একটা হল "ক্রমশ প্রকাশ্য", আর অন্যটা—"আপাদমস্তক"। তাওয়াং গুম্ফার বুদ্ধ এই দুটি শব্দেরই মূর্তিমান মর্মার্থ। তাঁর পা থেকে মাথা অবধি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে দেখতে পেলাম তাঁর প্রসন্ন হাসি আর অর্ধনিমীলিত চোখ।

ত্রিশচল্লিশফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি সিংহলেও দেখেছি, কিন্তু সেই সব মূর্তি খোলা আকাশের নিচে। শ্রবণবেলগোলার জৈন মহাবীরের দীর্ঘ মূর্তিটিও এমন গুম্ফাঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে নেই। একতলায় পা, তিনতলায় মাথা বললে ব্রহ্মদৈত্যের কথাই মনে পড়ে, বুদ্ধমূর্তির

কথা নয়। এভাবে দ্বিতল-ত্রিতলের গৃহস্থ ঘরোয়া হিসেবে ঐসব মূর্তি তো ধরা পড়ে না। নাঃ এভাবে দেখে সুখ নেই।

মন ভরল না। মূর্তির বিরাটত্ব তো হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, কিন্তু কৈ, মর্মে মর্মে শিহরণ তো উঠল না? প্রতিবার সিঁড়ি ভাঙবার সময়ে যে একটু একটু করে মনটাও ভেঙে ভেঙে যায়। এই বিশাল পিতল প্রতিমাটি যদি একটু দূর থেকে দর্শকের সামনে এক নজরেই উদ্ভাসিত হ'ত পরিপূর্ণভাবে, তার প্রতিক্রিয়া হত অনেক বেশি।

চীনে যাইনি। কিন্তু জাপানে দেখেছি তো, কিরোটোতে ও নারুতে বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তিগুলি মন্দিরের ভিতরেই—। মস্ত উঁচু ছাদের নিচে বিশাল ঘরে, দর্শককে একনজরেই দেখা দেয় সেই মহান্ মূর্ত প্রতিমা, আর তার ফলও হয় শ্বাসরোধকারী।

এই গুম্ফার মূল ঘরটিও খুবই বড়ো, কিন্তু জানিনা কেন বুদ্ধমূর্তিটিকে রাখা হয়েছে এমন আলাদা একটা খুপ্‌রির মধ্যে বাক্স বন্দী করে। কিসের এত সতর্কতা। লিফ্‌টের জন্য তৈরি ঘরের মত সরু লম্বা একটা ফাঁক তৈরি করে তার মধ্যে মাপে মাপে বসানো আছে এই মূর্তি। কিন্তু এই টুকরো টুকরো দেখায়, পায়ের পরে হাত, হাতের পরে মাথা,—এতে অখণ্ড দর্শনের তৃপ্তি কই? এ তো কমিক ষ্ট্রীপের মতন দেবদর্শন। দেখলুম বটে, কিন্তু না-দেখারই মতো। একটা অপূর্ণতা, একটা খিদে-তেষ্টা রয়েই গেল।

আমি আগে বুজতুম না সব সাহিত্যেই প্রেমিকরা তাদের ভালোবাসার নারীকে পূর্ণ নগ্নতায় দেখতে চায় কেন? আজ তাওয়াংয়ের বুদ্ধমূর্তির খণ্ড খণ্ড দর্শনে বুঝতে পারি, পোশাক আশাকের ফাঁকে ফাঁকে ভালোবাসার মানুষটিকে দেখা যায় না। ও দেখায় 'দর্শন' নেই।

একদিকে কাচের আলমারির মধ্যে সহস্র বুদ্ধমূর্তি, (বোধহয় পেতলেরই, কিন্তু) বলল তো সোনার। তারপর দেখলুম, সেই অসামান্য গ্রন্থাগার। সারাজীবনে পুঁথি এমনিতেই দেখেছি দু'চারটে মাত্র। এখানে দু'হাজারের বেশি বৌদ্ধ পুঁথি রাখা আছে। প্রত্যেকটি হলদে কাপড়ে জড়ানো, দড়ি দিয়ে বাঁধা। যত্ন করে তাকে সাজানো। নিয়মিত ঝাড়া মোছা হয়। আমাদের কোনো আধুনিক গ্রন্থাগারের stack এর মতন দুরবস্থা নয় তাদের। এসব বই পড়বার সৌভাগ্য আমার নেই। আমার মাষ্টারমশাই স্যার হ্যারল্‌ড বেইলি এখানে এলে, তাঁর আহ্লাদের অন্ত থাকত না। তিনি এর মর্মোদ্ধার করতে পারতেন।

সুভাষবাবু বলছিলেন অরুণাচলে গ্রামে গ্রামে গুম্ফা আছে, আর গ্রাম্য গুম্ফাগুলোতেও গ্রন্থাগার আছে। সেইসব আর্কাইভ্‌স্ মোটে ঘাঁটাই হয়নি। সেখানে ঐতিহাসিকদের অনেক মালমশলা মজুত। স্থানীয় ইতিহাস সেখানে জমা আছে। ইংরেজরাও এদের ঘাঁটায়নি, চীনেরাও লুটে পুটে নেয়নি। সবই এখনও রয়েছে। গবেষকরা কেউ সেগুলো ব্যবহার করেন না। বুঝতে পারি, সেখানে অজস্র মিথ্ পাওয়া যাবে। অনেক হীরেমুক্তো, অনেক ফোকলোর। শুধু তো ওতে রাজামন্ত্রী আর লামাদের ইতিহাস নেই। কিন্তু তাব প্রস্তুতি আমার কোথায়? অপ্রস্তুত অবস্থায় গিয়ে পড়েছি, কিছুই কাজে লাগাতে পারলুম না। কিন্তু খুব ইচ্ছে হল একটা গ্রামে গিয়ে মোম্পা উপজাতির কোনো পরিবারের সঙ্গে থাকি।

যেই মনে হল, অমনি সেটা সুভাষবাবুর কাছে পেশ করলুম। হাসিমুখে উনি বললেন—"অসম্ভব হবে কেন? দেখি চেষ্টা করে। ভাবতে দিন একটু।"

আনি-গুম্ফা

দূরে পাহাড়ের মাথায় আরেকটা শাদা গুম্ফা দেখা যায়। ওটা কী? —"ওটা আনি-গুম্ফা। অনেকটা পথ খচ্চরেব পিঠে চড়ে যেতে হবে। গাড়ি যায় না। হাঁটতেও, চড়াই তো, পারবেন না।"

—"আনি-গুম্ফা আবার কী? নেহরু-গুম্ফার মতন? কারুর নামে?"

—"না, আনি হলো সন্ন্যাসিনী। আনি-গুম্ফা সন্ন্যাসিনীদের মঠ। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। নানারি আর কি। ভারতবর্ষে মাত্র দুটি আছে। এই তাওয়াঙে একটা, আর ধরমশালায় একটি, দালাই লামা যেখানে থাকেন। খুব রেয়ার জিনিস। ক'দিন যদি থাকেন, খচ্চর ঠিক করে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব ইয়েশির সঙ্গে।"

—"ইয়েশি কে?"

—"একজন আনি। আমাদের বন্ধু। হিন্দি জানে। তাওয়াঙেরই মেয়ে। এখন এসেছে।"

—"সত্যি? তার সঙ্গে আলাপ হয় না?"

—"কেন হবে না? আজই আলাপ করিয়ে দেব'খন। এই তো, পাশেই শিউ-বসতিতে ওদের বাড়ি। ওর বাবা মা এখানে আছে। বস্তি মানে কিন্তু স্লাম্ নয়, বসতি।"—

ফেরার সময়ে আলাপ করে এলুম শিউবসতিতে গিয়ে ইয়েশি আনির সঙ্গে। সে আমাদের লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলো পরদিন। নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব। কী সুন্দরী মেয়েটা! বছর উনিশকুড়ি বয়েস। ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতে পারে, ভাঙা ভাঙা ইংরিজিও। —"আমরা ফিমেল মাংক" ইয়েশি একগাল হেসে বলল—"আমাদের পাপ করতে নেই। মেয়েদের এমনিতেই অনেক পাপ হয়, আনি হয়ে পাপকর্ম করলে আরো বেশি বেশি পাপ হয়ে যায়।" একেবারে শিশুর হাসি তার মুখে। সাত ভাইবোনের সবচেয়ে বড় মা বাবা তাকে আনি করে দিয়েছে। এতে তারও পুণ্য, তার বাবা মায়েরও পুণ্য। তিন ছেলে হলে, মেজ ছেলেকে লামা করতেই হয়, গুম্ফাতে পাঠানো আইন। মেয়েদের বেলা কোনো আইন নেই। ইচ্ছে, শখ হোলো, তো আনি হোলো। বহু সন্ন্যাসিনী আছে, বাচ্চা মেয়েরাও হতে পারে। ইয়েশি পনেরো বছর বয়সে গুম্ফাতে গেছে, এখন তার বয়েস কুড়ি।

—"সকালে উঠে কী করো মঠে?"

—"পুজো করি। পুজো করতে পায়। ঘুম থেকে উঠে ঝাঁটপাট দিয়ে ধূপ জ্বেলে, বুদ্ধকে রূপোর বাটিতে পুজোর পানি দিয়ে, চা খাই। তারপর পুজো করি। যে দিন বেশি বেশি কাজ থাকে, সেদিন পুজোটা কম কম করি। পুজো করে নাস্তা খাই। কভি রোটি,

কভি জাউ, কভি হালুয়া। বস্তিতে এসে র‍্যাশন নিয়ে যাই, উদূখলে আটা ভাঙি, কাজ কি কম? সন্ন্যাসিনীদের অনেক কাজ।

পয়সা? না আমাদের পয়সা নেই। পয়সা অন্য লোকেরা দেয়। যখন বাড়ি যাই, বাড়ি থেকেও পয়সা দেয়। চল্লিশজন আনি থাকি গুম্ফাতে। পনেরো দিন অন্তর তিনচার জনে মিলে রান্না করি। সুবা-শ্যাম পূজা করি। পড়াশুনোও করি। পাঁচছ'টি ছোটা-আনিকে এক একজন বড়া-আনি বসিয়ে তিব্বতী ভাষা শেখায়। পুঁথি পড়তে শেখায়। সারাদিন পড়াশুনো হয় তাদের। হেড-আনি আছেন একজন। চাবী থাকে তার কাছে। ধর্মগ্রন্থের চাবী। এ ছাড়া আর চাবী দেবার কী আছে আনিদের?

অবশ্য হ্যাঁ, জীবনে আনিদের অনেক কিছু 'মনা হ্যায়।' যমন—'ঝুট নাহি বোলনা, চোরী নাহি কর্‌না, শাদী নাহি কর্‌না, প্যার নাহি কর্‌না, আদমীকা সাথ কুছ্ নাহি কর্‌না, বাত-উত্ কুছ্‌বি নাহি! কিসিকা সাথ বাত কর্‌না, ঘুম্‌না ফির্‌না, তো বদনাম হো জায়েগা প্যার কর্ লিয়া বোলকে। তব্‌ভি কোঈ কোঈ আনি ভাগ্ যাতা, কিসিকো মিল্ গয়া, তো গুম্ফা ছোড়কে ভাগতা, শাদী কর্ লেতা।' ফাইন দিতে হয় অবশ্য, আনি-লামাদের 'চায় খিলানা পড়তা'।

যারা পালায় না, তিনচার বছর সন্ন্যাস নেবার পরে ভালো করে একটা পুজো হয় হাজার/পাঁচশো/দুশো/একশো যে যেমন পারে, আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে পুজো দেয়। তারপরে সে ভালরকম সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়।" ......

অধরা মাধুরী

"—সর্বনাশ! তিব্বত বলবেন না ম্যাডাম, দিস্ ইজ ইনডিয়া! দেখছেন না চতুর্দিকে কেমন 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' পোস্টার মারা?

—"আমরা ভারতীয় বলে গর্বিত' প্ল্যাকার্ড টাঙানো? কলকাতায় কখনো এসব দেখেছেন? কিম্বা দিল্লিতে?"

—"কিন্তু দেশটা যে তিব্বত তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? মানুষগুলো তিব্বতী উপজাতি, তাদের ভাষা তিব্বতী, তাদের খাওয়া দাওয়া, পোশাক আসাক, ধর্মকর্ম, সবই তিব্বতী, মায় কুকুর বেড়াল গরু ছাগলগুলো পর্যন্ত তিব্বতী, টিবেটান হাউন্ড, লাসা আপসো, আর ইয়াক্—তবু বলবেন এটা তিব্বত নয়?"

—"জ্বালালেন ম্যাডাম আপনি! কবিতা ফবিতা লেখেন, না জানেন পলিটিকস, না জানেন হিস্ট্রি, না অ্যানথ্রপলজি—তিব্বতী কালচার মানেই যে তিব্বত নয়, এটাও বোঝেন না? জলপাইগুড়ি তো আঠারো শো ষাট সত্তর পর্যন্ত ভূটানের অন্তর্গত ছিল। তা বলে কি ওটা ভূটান? দার্জিলিং তো তার বিশ ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত সিকিমের অংশ ছিল, তাবলে কি দার্জিলিং এখন সিকিমে? যে তাওয়াং হবে তিব্বতে? চীনেরা যে কথা বলে, আপনিও, সেই কথা বলবেন?"

সত্যি, বড্ডই মুখ্যুর মতন কথাবার্তা বলছি।

—"আচ্ছা, চীনেদের আপনি দেখেছিলেন?"

—"কী করে দেখব? আমি তো সাতষট্টিতে এলাম। তবে যে-পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, চীনেদের তৈরি সেই পথটা দেখেছি! লাসা-তাওয়াং রোড। দশদিনের মধ্যে ব্যাটা চীনেরা আশ্চর্য রাস্তা বানিয়েছে, সত্যি। এত বছর, পনেরো বছর তো মেইনটেনান্সের নামগন্ধ নেই। তবুও একদম ঠিকঠাক আছে। জীপ যেতে কোনোই অসুবিধে হয়না।"

ঐ পথেই কিছুদূর গেলে, মানস সরোবরের রাস্তা। অপূর্ব এরিয়া, জানেন? মাইল দশেক পর্যন্ত যাওয়া যায়, কেউ কোনো বাধা দেয় না, এ.ডি সির পারমিশন নিয়ে পিকনিকে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা নীল পদ্মতারা দীঘি আছে। কত হাঁস। এইরাস্তা থেকেই মাইল কয়েক ভিতরদিকে গেলেই কৈলাস, মানস সরোবর।" বলেন কি? এইখানেই? এত কাছে?—মানস? কৈলাস? বাঃ! অমনি, "আমিও যাব, আমিও যাব" করে ভয়ানক ঝুলোঝুলি সুরু করলুম। তাতে যখন হলো না, তখন—"চুপি চুপি চলুন যাই" বলেও অনেক গূঢ় চেষ্টাচরিত্র করলুম। কিন্তু নো লাক্। অনড় হয়ে সুভাষরঞ্জন বললেন ঃ—"অমন হট করে হয়না। পারমিশান চাই।" তবু দয়া করে খানিকটা আমাকে ঘুরিয়ে আনলেন ওই স্বপ্নের রাস্তাটার পাশ দিয়ে। অনেকখানি উঁচুতে সোজা পরিষ্কার, চওড়া রাস্তা চলে গেছে উত্তর পশ্চিমে। এক্কেবারে কৈলাস, মানস সরোবর পার হয়ে সেই লাসানগরীর চির-রহস্যের আড়ালে। আর ঐখানেই সেই অধরা মাধুরী—ম্যাকমাহন লাইন।

—"লাসা-তাওয়াং রোড?" মিস্টার সাইগল বললেন, "এঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা অসামান্য উদাহরণ।"

ওখানকার চীফ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার সাইগলের বাড়িতেই পরোটা সব্জী খেতে খেতে রাত্তিরবেলা গল্প হচ্ছিল। ছেলেদের মধ্যে তাস আর রাম্‌ও চলছিল, চওড়া তক্তাপোশের ওপরে। সাইগলদের বাচ্চাদুটি তারই এক ধারে। শুচ্ছেনা কিছুতেই, আড়চোখে তাকাচ্ছে, হাসছে। খালি দুষ্টুমি করছে। তাওয়াং-এই ইশকুলে পড়ে তারা। মিসেস সাইগলের ইচ্ছে, বড় হলে কোনো ভালো বোর্ডিংয়ে দেওয়া ওদের।

—"লাসা-তাওয়াং রোড তো একটা মেয়ের তৈরি"—মিসেস সাইগল বলেন।

—"সেকি? সত্যি?"

—"হ্যাঁ, ছাব্বিশ বছর বয়স্ক একটি চীনে মেয়ে, আর্মি এঞ্জিনিয়ার। তারই তৈরি এই রাস্তা।"

এঞ্জিনিয়ার সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।—"চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'তনা যে এই অলটিচ্যুডে এই অ্যাভেলেবল মেটিরিয়াল্‌স দিয়ে এমন রোড বিলডিং সম্ভবপর। এবং সময়ই বা কত? দশ দিন। ঐ পথে আসবে কী? না হেভী ভিহিক্লস। ট্যাংক ইত্যাদি। একটা আশ্চর্য, প্রচণ্ড অ্যাচীভ্‌মেন্ট এই লাসা-তাওয়াং রোড। লোকাল পাহাড়ীদের কাজে লাগিয়ে পাথর দিয়ে জলা-জমি ভর্তি করেছে। মাটি শক্ত হলে তাতে কাঠের বীম আড়াআড়ি ভাবে, রাইট অ্যাঙ্গেলে ফেলেছে। বীমগুলো সাজিয়েই রাস্তাটা তৈরি করেছে। ঐ সব কাঠ

আসবার পথে গাছ কেটে তৈরি করে নিয়েছে, নিজেরাই বয়ে এনে ফেলেছে কেননা এ অঞ্চল তো ট্রী লাইনের ওপরে, এখানে বড় গাছপালা গজায় না। ওদিকের উপত্যকা থেকেই গাছ কেটে বীম বানিয়েছে। সব সেই মেয়ের বুদ্ধি!"

এই সেই বিখ্যাত ম্যাকমাহন লাইন। ৪০০০—১৯০০০ ফুট অলটিচ্যুডে বিস্তৃত এই তাওয়াং বর্ডার সাবডিভিশন, কামেঙ্ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। পাশেই, লুম্‌লা গ্রামের ওপরে তিব্বত— ভূটান সীমান্ত। সে-লা পাসের ওপাশে আছে বুম্‌লা পাস, সেটাই ভূটানে যাবার রাস্তা। সে-লার চেয়ে আরও একটু উঁচু। আমার খুবই ইচ্ছে হ'ল, বুম্‌লা গিরিপথে বেড়াতে যাবার, এবং সেখান দিয়ে ভূটানে যাবার—কিন্তু হাতে তো মোটে সময় নেই। ছুটি খতম্। কলেজ এবারে খুলে যাবে।

সত্যি সত্যি তো বনের পাখিটি নই আমি; শেকল না থাক, তবু দাঁড়েরই পাখি। খাঁচায় থাকিনা বটে, কিন্তু ফিরে ফিরে যেতেই হয়। সেইখানে যে দানা-পানি বাঁধা আছে! আর, বনের পাখিরও তো বাসা থাকে, বাসাতে লাল টুকটুকে হাঁ-করা ছানারা থাকে। ফিরতে হয় তাকেও।

মুক্তি কখনো নিশ্চয় নয়! আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে। আর আমরা তো তুশ্চু প্রাণী। উড়াল দিই, ফিরেও আসি।

—"তিব্বতী গ্রামে যাবেন বলছিলেন? এই যে লামা পেমা খাণ্ডু, ইচ্ছে করলে এর বাড়িতে থাকতে পারেন গিয়ে। এ হিন্দি বলতে পারে।" সুভাষবাবুর সঙ্গে সুন্দর দেখতে একটি তরুণ লামা আমাকে "নমস্তে" বলছেন।" কথা হয়ে গেল, বিকেলবেলায় ওর ছোট্ট গ্রামে, সাম্‌প্রুং (চমপ্রুং?) যার নাম, জীপ আমাকে নিয়ে যাবে। পেমা খাণ্ডুই আমাকে রিসিভ করবেন সেখানে। এখনই গ্রামে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিতে হবে তাঁকে। বেচারী এ. ডি. সির অফিসে কী কাজে এসেছিলেন, হঠাৎ সুভাষবাবু ওঁকে ধরে ফেলেছেন। এ. ডি. সি. আজ তাওয়াঙে নেই, কাজও উদ্ধার হচ্ছে না। আমি তো মহা উল্লসিত। দুপুরে যাচ্ছি ইয়েশি আনির বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনে, ডিনার খাব লামা পেমা খাণ্ডুর বাড়িতে। 'তিব্বতী লাইফ' তবু খানিকটা দেখা হবে। লামাদের, আর আনিদের জীবনযাত্রার ধরণ সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা হবে। ......

লামার বাড়ির আব্দার

পেম্পা গে সত্যিই রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো যখন আমাদের জীপগাড়ি পৌছোলো। ডাক্তার নেমে আমার বাক্স এবং আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল পেম্পা গের বাড়ি। বেশ একটু উঁচুতে, খানিক সিঁড়ি ভেঙে, পেম্পা গের গুম্ফাঘর। ডাক্তার বসলোনা, জীপ ছেড়ে দিতে হবে।

—"পরে দেখা হবে, চলি!" হঠাৎই পেছন ফেরে ডাক্তার।

—"কবে? কোথায়? কখন? ধন্যবাদ, ভাই শ্যামসুন্দর, অনেক ধন্যবাদ, এমন বিভূঁই-বিদেশে তোমার মতন একটা ভাই না পেলে আমি কী করতুম?"

—"আর কাউকে পেয়ে যেতে। তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না কোনোকালে।"

—"কালই তো চলে যাচ্ছি"—

—"আবার তো দেখা হবে—টেক কেয়ার, গুডলাক।"

—"কী করে? কোথায়?"

—"হবে হবে, কোথাও না কোথাও"—প্রায় দৌড়ে ডাক্তার গিয়ে জীপে উঠল। ঘোরানো পথ দিয়ে জীপ মিলিয়ে গেল উপরের দিকে। আবার কবে দেখা হবে, ডাক্তার? কোথায়?

—"এই আমার গুম্ফা। আমিই এর লামা।" পেম্পা বলে হিন্দিতে। —"আমার বড় ছেলেও লামা, তার বয়েস আঠারো—অন্য একটা গ্রামে তার গুম্ফা—ঐ যে দেখা যায়"—দূরে, আরেকটু নিচের দিকে আঙুল দেখালো সে। সাম্‌গ্রুং তাওয়াঙের চেয়ে নিচে; এখানে অনেক গাছপালা, ফলের বাগানে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। সামনেই, নীচের ঢালুতে আরেকটি জনবসতি, ঐ যে, সেখানে আরেকটি ছোট গুম্ফার ছাদ দেখা যায়। তাতে গোধূলির আলো লেগেছে।

পেম্পা সগৌরবে বললো ঃ

—"আমার ছেলেই ঐ গুম্ফার লামা।"

গুম্ফাঘরের মধ্যে জমা অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে প্রদীপ আর মোমবাতির সঙ্গে। অমন সুন্দর ধূপের গন্ধে প্রণাম করবার ইচ্ছে আপনিই হয় মনে মনে। মেঝেয় পুরু, নরম, চমৎকার কারুকাজ করা কার্পেট পাতা। ভিতরদিকের গর্ভগৃহে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু তিনি তো একা নন? পাশাপাশি বেশ ক'জন বীভৎস মূর্তিমান দেবদেবীর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের সামনে একটি "চওঁরীঘীউকা দীয়া!" আর তাঁদের সামনে বেশ কয়েকটি মোটাসোটা মোমবাতি জ্বলছে। ভীমভৈরবের সবাই দাঁত খিচিয়ে চোখ পাকিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। বেশ বড় বড় পিতলমূর্তি। মানুষ প্রমাণ দেবদেবীগুলি মোটেই ভাল দেখতে নয়। তুলনায় নিজেকে পরমাসুন্দরী মনে হয়। (একটা চেড়ি-পরিবৃতা সীতা টাইপের সেল্‌ফপিটির অনুভূতিও জাগে!) ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে লামা পেম্পা গে-র সঙ্গে গল্প করি। কিন্তু ওরা চোখ যে ফিরিয়ে নেয় না! বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে বিঁধতে থাকে।

পেম্পার বয়েস এখন চল্লিশ। তার স্ত্রীর বয়েস চুয়ান্ন। বিয়ের সময়ে ছিল কুড়ি আর চৌত্রিশ। বাবা মা পছন্দ করে বৌ এনেছিলেন। বাবাও লামা ছিলেন, পিতামহও তাই।

পিতামহ পিতামহীকে পেম্পা দেখেছে, তাঁরা মৃত, বাবা মাও মৃত। "বুই তো বুড়টী হোগয়া"—বেশ দুঃখ ভরে বল্‌ল পেম্পা।—"চৌধা সালকা বড়া হ্যায় না?"—বাবা মা অমন বিয়ে দিলেন কেন?—"আচ্ছা লড়কী থা, বহুত কামকা থা, বুড্‌ঢা পিতাজী বুডটী মাতাজীকো দেখ্‌ভাল্ করতা থা—ইস লিয়ে।"

—এখন বুঝি সে আচ্ছা লড়কী নেই আর? আপনাকে দেখ্‌ভাল করে না বুঝি?

—তা করে। খুব খাটে। বাচ্চাদের দ্যাখে। বাগান টাগান দ্যাখে।

—কয়টি বাচ্চা?

—এক ছেলে। লামা। তিন মেয়ে। বড় মেয়ের নাম কিন্দন খামো, বয়েস সতেরো, বাড়িরে কামকাজ করে। মেজটির বয়েস চোদ্দ। সে আনি হয়েছে, আনি গুম্ফায় থাকে। আর ছোটর আট, সে ইশকুলে যায়। তার নাম উড়াকিন খামো।

—এত হিন্দি শিখলেন কোথায়?

—ইনডিয়ায়। আমি তো অনেকবার ইনডিয়ায় গেছি। তিনবার ধরমশালাতে দালাই লামাকে প্রণাম করতে গেছি। ছাব্বিশে জানুয়ারি দেখতে দিল্লিতে গেছি দু'বার। বুদ্ধগয়া গিয়েছিলাম এই তো চারবছর আগে। তা ছাড়া কুলুমানালি—আমি ইনডিয়াতে অনেকবার গেছি কিনা"—

মনের সুখে পেম্পা কথা বলছে, আর আমি ভাবছি, হায়রে ভারত সরকার! এত করে "ইহা হয় মাতা ভারত"—"আমরা হই গর্বিত, হইয়া ভারতবর্ষীয়"—ইত্যাদি পোস্টার সেঁটেও এদের ল্যাঙ্গুয়েজটা পোষ মানাতে পারা গেল না? 'ইনডিয়াতে গেছি" কী ভাষা? এটা শুনলে চীনেরাই বা কী বলবে, পাকিস্তানই বা কী বলবে!

—"সাম্‌গ্রুং বস্তি থেকে দশজন গিয়েছিলাম কুলু মানালি, আপেলচাষের শিক্ষা নিতে। অ্যাপল্ প্রুনিং শিখতে। তখন চারমাস ছিলাম তো—জানুয়ারি থেকে এপ্রিল—ভাল করে হিন্দি বোলি শিখে গেছি। কুলুতে, থানাদার বলে জায়গাটার নাম, সেখানে দেখলাম একজন চাষীর দু'শো একর আপেল ক্ষেত আছে জানেন? এখানে এত জমিই নেই কারুর। লামাদের তো জমিজমা থাকেই না। চমরীও থাকে না। কেবল ঘোড়া থাকে—চড়ে ঘুরতে হয় বলে।"

—"দালাই লামা কেমন লোক? কথা বলেছিলেন আপনার সঙ্গে?"

—"খুব ভালো। আমার মা মারা যেতে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর জন্য টাকা দিতে, দালাই লামার পুজো দিতে। এত ভালো লোক তিনি, গেলে খানা দেন, চায় দেন, যত্ন করে বাত্‌চিত্ করেন, যানেকা টাইমমে বোলা, 'সাবধানীসে যানা, রাস্তামে বহুৎ গুণ্ডা হ্যায়!' আমরা বিশ পঁচিশজন লামা মিলে গিয়েছিলাম, দালাই লামাকে পুজো করতে. সবাই খুশি হয়ে ফিরেছি।" কথা বলছি, এমন সময়ে দোর গোড়াতে একটি অপরূপ সুন্দরী কিশোরী এসে দাঁড়ায়। তিব্বতী ভাষায় কী কথা বলে। বাইরে তখন অন্ধকার। লামা আমাকে বলেন—

—"আমার বড় মেয়ে, কিন্দন খামো। জিজ্ঞেস করছে খানা এখানেই এনে দেবে না আমাদের বাড়িতে গিয়ে খাবেন? তারপর আবার এখানে আপনাকে পৌছে দিয়ে যাব।"

—"ওরে বাবা। এখানে পৌছে দেবেন কেন? এখানে রাত্তির বেলা একা একা কে থাকবে?" (এতগুলো ভয়ঙ্কর দর্শন অচেনা দেবদেবীর মধ্যে! চেনা শুনোর মধ্যে ওই যা একা বুদ্ধদেব। অমন হাসিহাসি মুখে আধাবন্ধ চোখে "ভয় নেই, ভয় নেই" বলে হাত তুলে পদ্মাসনে থাকলেই কি হয়? ভয় করবেই! মানুষকে আমি ভয় পাই না, যত অচেনাই হোক। তা বলে তিব্বতী দেবদেবী?) না বাবা! "আমি...আপনাদের বাড়িতেই যাইনা কেন? সেখানেই খাবো, সেইখানেই শুয়ে থাকবো। কিন্দন খামোর কাছে কি শুয়ে থাকা যাবে না?"

—"কেন যাবে না? কিন্তু আপনারই তো কষ্ট হবে। আমাদের গরীব ঘর। লামাদের গেস্টরুম এই গুম্ফা। ইধরই জেয়াদা আরাম হোগা।"

—"জেয়াদা আরাম কে চায়? আমি বাবা একা একা এই এতজন ঠাকুর দেবতার মধ্যে রাতভোর থাকতে পারবো না। মনে হবে স্বর্গেই এসেছি বুঝি। আমি মানুষজনের মধ্যেই থাকতে চাই।"

—"চলুন তবে।" আমার ব্যাগ তুলে নেয় লামা পেম্পা খাণ্ডু।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে খানিকটা হেঁটে গিয়েই পেম্পা গে-র বসতবাড়ি। দরজার বাইরে প্রেয়ার হুইল লাগানো। এখানে সবার বাড়ির বাইরেই এটা দেখছি। চাকাটি ঘুরিয়ে দিয়ে, ঈশ্বরের কাছে আগেই খবরটি পাঠিয়ে, যে হ্যাঁ দিনের কাজ শেষ করে আমি নিরাপদে ঘরে ফিরেছি, তোমারই কল্যাণে, 'তোমার জয় হোক'—বলে, গৃহস্থ তার গৃহে পা দেয়। এটা আমার ভারি পছন্দ হল। যদি পারতুম আমাদের বাড়িতে না হোক অন্তত আমার ঘরের বাইরে আমি এমনি একটা ব্যবস্থা করতুম। রোজ যাতে গৃহে পা দেবার আগেই গৃহদেবতাকে একবার স্মরণ করা যায়। আমরা তো বিপদে পড়লে, শুধু বিপদতারণের মুখটি মনে পড়ে। আনন্দে থাকলে আনন্দরূপের মুখখানি মনে থাকে না। ভগবানের কেবলই আমাকে বিপদে ফেলা উচিত, যদি আমাকে দিয়ে তাঁর কথা ভাবানোর ইচ্ছে হয় তাঁর। তাই প্রেয়ার হুইলটা বেশ ব্যবস্থা আমার মত আর যারা, তাদের জন্যে। "ভগবানকে তো ভালইবাসি, কিন্তু পুজো-আচ্চা ভালবাসি না"—টাইপের নিশ্চয় আরো অনেক দুর্ভাগা-দুর্মতি আছে এই জগতে।

প্রেয়ার হুইল ঘোরালে আবার টুংটাং শব্দ হয় সুন্দর। প্রত্যেকেই একবার করে ঘুরিয়ে, দরজার সদর চৌকাঠ পেরুলুম। উঠোন। উঠোন পেরিয়ে কাঠের বারান্দায় (মাথায় ঢাকা নেই) উঠতে হয়। সেখান থেকে, মাথাটি নিচু করে, আর উঁচু পাথরের চৌকাঠ পার হয়ে গুহার মতন ঘরে ঢুকতে হয় নিচু দরজা দিয়ে। শীতের দেশ বলেই দরজা নিশ্চয় এত নিচু। এখানকার মানুষরা বেঁটে নয় বিশেষ। লম্বাও নয় অবশ্যই। কিন্তু পেম্পা, ও তার মেয়েকে, বাঙ্গালী মতে লম্বাই বলা যায়।

ঘরে ঢুকতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা।

—"কারমো, আমার পত্নী!" বসে বসে কিছু পান করছে সে। একটি হাত জামার মধ্যে ভরা। হায়রে একেই বুড়ী বলছিল নেমকহারাম স্বামী? কোথায় বুড়ী? হ্যাঁ বলি রেখা দেখা দিয়েছে কপালে, কিন্তু মুখের লাবণ্যে, ঝকঝকে দাঁতের আর চোখের হাসিতে, এবং দেহের গঠনে যুবতীই। বছর পঁয়ত্রিশ চল্লিশের বেশি কিছুতেই মনে হবে না। পেম্পা গে-কে অবশ্য চব্বিশ পঁচিশ দেখায়, এই যা! রূপসী বড় মেয়ের পাশে তাকে বাপ বলে মনেই হচ্ছে না।

ঘরে আরেকটিও মানুষ আছে—অল্পবয়সী একটি ছেলে, মুণ্ডিত মস্তক, এখনো, দাড়ি গোঁপ ওঠেনি, মুখখানি খুবই কচি, খুব মিষ্টি। চোখের দিকে চোখ পড়তেই লাজুক হাসি হেসে দিল। হাসিটা দেখে ভীষণ চমকে উঠি। এ তো পুরুষের হাসি নয়? এ নিশ্চয় মেয়ে!

—"আমার আন্নি-মেয়ে! তবিয়ত খারাপ বোলকে গুম্ফাসে চলা আয়া।" ফের কালই ফিরে যাচ্ছে সে গুম্ফায়। মিষ্টি হাসিটি দেখে বুকের মধ্যে মোচড় দিল। এই মেয়ে সারাজীবন থাকবে ব্রহ্মচারিনী হয়ে, ন্যাড়া মাথায়? ইয়েশি আনির অবশ্য মাথায় চুল আছে, বয়জ কাট্। চোদ্দ বছরের মেয়েটি মাথায় মায়ের মতই লম্বা হয়েছে, মায়ের মতই রূপসী! বালক সন্ন্যাসীর মতো চেহারা।

রূপবতী মা সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে নিজের সাজানো সংসারের মাঝখানে মা লক্ষ্মীর মতো বসে আছে। লামা স্বামীর অপেক্ষায়। আপনমনে আগুন পোয়াচ্ছে, জপ করছে, আর রক্‌শি খাচ্ছে। হাতে কাঠের জপমালা। উনুনের ধারে বসে বসে এই জপ করতে করতে রক্‌শি খাওয়া, ভারি সুদৃশ্য মনে হলো আমার। রিল্যাক্‌স্‌ড। প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ মুহূর্ত। আমাকে দেখেই একগাল হাসি। তারপর উঠে খাবারের ব্যবস্থা সুরু। গিন্নি তো?*

তিব্বত ও লাদাখ

প্রবোধকুমার স্যান্যাল

সন্ন্যাসী বলছেন, জ্বলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তা'র পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন, সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।

প্রশ্ন করলুম, সে-আচ্ছন্নভাবটি কেমন, মহারাজ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহচূর্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

পুরাকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কম্বোজ আর যবদ্বীপ, যেমন সুমাত্রা আর শ্রীলঙ্কা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণদ্বীপ। তিব্বতকে সেই পুরাকালে বলা হোতো কিম্পুরুষখন্ড, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি ত' বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পুঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখন্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পুরুষপর্বত। প্রতি তুষারচূড়ায় পুরুষোত্তমের নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। পুরাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে,—বনস্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, কম্বোজ, সিয়াম ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ,—একে একে সবাই চলে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে ব্রহ্মদেশ,—এখনও পঁচিশ বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষতস্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। এমনি ক'রে যুগযুগান্তর ধ'রে ভারত ছোট হচ্ছে, সীমানা তা'র সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। শুধু আনন্দের কথা এই,—ধর্মবোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের সঙ্গে ভারতের সমগোত্রিয়তা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। তবে কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌদ্ধদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পারেনি? তবে কি আর্য-দ্রাবিড়ের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের মিল ঘটলো না কোনও কালে? কে কাকে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে এর জবাব কোনওদিন মেলেনি। সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্রও পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হোলো ধর্মবাদের, দর্শনমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপস্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খুঁজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দুর্গমে আর দারুণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে? তা'রা নিঃশব্দে জয় করেছে

মানুষের শ্রদ্ধা, নিভৃতে নির্ণয় করেছে মানবসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশ্নোত্তর মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত-সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তার জ্ঞানের জগতে। বুদ্ধিকে নির্মল করেছে, সভ্যতাকে সুন্দর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন সহজ হয়নি। পথ দুঃসাধ্য ব'লে নয়, কিন্তু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থযাত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও তেমন কাম্য নয়। মৌর্যসাম্রাজ্যকালে, সিথিয়ান যুগে, ব্যাক্‌ট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমুদ্রগুপ্ত-স্কন্দগুপ্তের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমান্তে 'জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে-পঞ্চধাতুনির্মিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটি পবিত্রতম ব'লে পূজিত হয়, সেই মূর্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালেই মগধে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং মুসলমান আক্রমণকালে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই মূর্তিটি চীনসম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসম্রাটের কন্যার সহিত যখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধূবেশিনী সম্রাটদুহিতা এই মূর্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এই মূর্তিটি স্থাপিত করেন।

বুঝতে পারা যায়, ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুসলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভুত্ব লাভ করেছিল,—কিন্তু এদের থেকে গোঁড়া বৌদ্ধ-তিব্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এতকাল ধরে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সঙ্গে পর্যটককেও সরিয়ে রেখেছে যুগের পর যুগ। তিব্বত হয়ে গেল নিষিদ্ধ।

ওরা নাকি পৃথিবীর একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ওদের দেশব্যাপী গ্রন্থ-ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ পুঁথি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জানে পৃথিবীর অন্তিম পরিণাম, সভ্যতার আদিঅন্ত ইতিহাস। হিমালয়ের ওপারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ষোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের অভ্যুত্থান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কিস্তান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিপ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তিব্বত তাদেরকে গ্রাহ্য করেনি। ওরা চিরকাল পুঁথি পড়েছে আর মন্ত্র জপেছে; 'মণিচক্র' ঘুরিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির দ্বারা টুক্‌রো-টুকরো করে কাটে, এবং শৃগাল-শকুনি আর কুকুর যখন সেগুলি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জোরে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢুকে তম্বি করেছে, তাই ওদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় মন-কষাকষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেও চায়। বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব

না ঢোকে, মুসলমানছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধুনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া তিব্বতের ঘৃণা বয়ে বেড়ালো প্রায় সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহ্রদ। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশূন্য। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মাত্র সাত জনের বেশি মানুষ নেই। খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না,—ক্ষুধার্ত তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র সৃজন করেছে অরণ্য, শস্যক্ষেত্র আর নিম্নভূমি। বালুপাথরে, কাঁকরে, লবণে সোডায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম, এবং অন্ধ আচারঅনুষ্ঠানের কঠোরতা। পূর্বতিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের স্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার পোটালা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘুরেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজও ঘুরছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ীর চাকা কখনও ঘোরেনি তিব্বতে। আজ সভ্যতার ধাক্কা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তারা গাড়ী চালাতে চায় তিব্বতে, তারা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মানবতার দাবিকে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাবার জন্য তারা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দুস্তর ভূখণ্ডে। এবার হয়ত কলের এবং কালের চাকা ঘুরবে!

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা বৃথা। সেখানে আছে নুন, দামি পাথর, ভূগর্ভের স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবসতির এখানে ওখানে আদিমকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুম্ফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রখর সূর্যে, নির্মল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমর্জী প্রাকৃতিক চটুলতায়, আকাশের অত্যুগ্র নীলিমায়,—তিব্বত অপার্থিব রহস্যে আচ্ছন্ন। উত্তরে তার আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মরুভূমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচূড়া,—ধবলগিরি, মুক্তিনাথ, মানসলু, গোঁসাইথান, গৌরীশঙ্কর, এভারেষ্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুন্‌রি, চমলহরি,—এমনি আরো অনেক। এই সব চূড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিব্বতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে বলশালী করে তুলেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে পৃথক করে রেখেছে কারাকোরাম, লাডাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বতশ্রেণী নেপালসীমানা অবধি চলে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাংলাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান্ তিব্বতে। সংরক্ষণশীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটু আধটু চেহারার অদলবদল হয়েছে

মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাংলার সঙ্গে তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চলে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শান্তরক্ষিত' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ক'রে তিব্বতে যান্, এবং তৎকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গৌরব আজও আছে তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকে আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়ে গৌতমবুদ্ধের মতোই তাঁকে পূজা করে। অতঃপর বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিতও যান্ তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,— বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ছিল বলেই সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দুদর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌদ্ধদর্শন—এ কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দু ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপুরুষের কথা ওঠে, তিনিও বাঙালী। তাঁর বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আচার্য শঙ্করের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দীপঙ্করও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পন্ডিতগণকে তৎকালে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান্ এবং বৌদ্ধদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা করে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশুদ্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তান্ত্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে 'কদম্‌পা' নামক একটি নূতন লামা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাবধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপঙ্কর তেরো বৎসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রদ্ধেয় এবং পূজ্য। বুদ্ধের পরেই তিনি বোধিসত্ত্বস্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মূর্তি পূজা করেন। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধকরি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাস্ত্র , ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে তিব্বতীদের কিছু কিছু যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বলেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজশক্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধর্মীর প্রভুত্ব—তিব্বতকে হারাবার মূলে এই কারণ দুটি প্রধান। যারা দূরে সরে গেল, তারা অদৃশ্যলোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ

করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অল্পকালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেত্রিশ বছর পরে দুজন ফরাসী মিশনারী লাসায় স্বল্পকালের জন্য প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরাও কোনো বিবরণ রেখে যাননি। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন অবধি ধূমায়িত হতে থাকে। এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভুত্ব তিব্বতের চক্ষুশূল ছিল, এবং যাদের সাহায্যে ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা চালাচ্ছিল,—সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে ভারতের এমন কোনও বিষয়ে কোনও যোগাযোগ ছিল না, যার জন্য বৃটিশ ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া চলতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। পুনরায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উস্কানি ছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপূরণ' অর্থাৎ নমস্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ করে থাকে কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বালা করে তার মন।

শোনা যায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধুর' সহায়তায় তিব্বত প্রবেশের অধিকার পান্। শরৎচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গভর্নমেন্টের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপথের পরিমাপ করবেন, এবং খোঁজখবর আনবেন—এই ছিল সর্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবাল্ড উইলিয়মস্ বলছেন,—"These men were the emissaries of the Indian Government their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expeditions of Kischen Sing..........who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West........and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই ছদ্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিব্বত ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এনেছিলেন তিব্বতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাস কাল তিব্বতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলের অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর সঙ্গে পানচেন্ রিন্‌পোচের প্রধান লামা পুরোহিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে তিনি আবার তিব্বতে যান্। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন্। শুধু লাসা নয়—প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন তিব্বতীয় শহরে ভ্রমণ করে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিব্বতের কর্তৃপক্ষ ঘুণাক্ষরেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য একটুও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক এবং কূটনীতিক,—সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ঝুলিতে ভরে এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভর্ণমেন্ট তাঁকে এক বিশেষ উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটির' নিকট থেকে তিনি অর্থ সাহায্যও পান্। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে,—তাসিলানপো থেকে ভারত প্রবেশের পথে,—সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা 'পানচেন্ রিন্পোচের' প্রধান লামাপুরোহিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান। 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেপ্তার করে তুষারগুহায় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাবুক মারতে-মারতে তাঁকে মৃত্যুমুখে আনা হয়,—এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দুখানা পিঠের দিকে বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের তুষার গলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি আরও বীভৎস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি করে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হননি, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষুও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।—এখানে বলে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিন্চেনও জানতেন না! শুধু এরা নয়, আরও অনেকে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর 'শাস্তিলাভ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সমস্ত ঘটনাগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একখানি গ্রন্থ রচনা করে যান্—"Narrative of a journey to Lhasa".

—এই ঘটনার পনেরো বছর পরে সুইডেনের জগৎপ্রসিদ্ধ অভিযানকারী ডাঃ সোয়েন হেডিন্ মধ্যএশিয়ার 'তাক্লা মাকান' মরুভূমি পেরিয়ে তিব্বতে ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তৎকালীন দলাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খৃঃ) লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অল্পকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে হয়ত লাসায় গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্বত বৃটিশ ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামেমাত্র চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতাস্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারটুকু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবধি হিংসার আশ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত পাছে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অবরোধ করে। এর কারণ ছিল। কম্যুনিষ্ট চীন নেহরু-গভর্ণমেন্টকে প্রথম দিকে বিশ্বাস

ও শ্রদ্ধা করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদন করে নেহরু গভর্ণমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গত (Tibet region of China) বলে স্বীকার করে নিলেন, সেইদিন থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে চীন পুনরায় তিব্বতের উপর তার দখল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাটুকু শেষ করি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের অধিনায়ক লর্ড কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রবর্ণিত পথঘাট দিয়েই তিব্বত অভিযান করেন, এবং তিব্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদু আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয় সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কাইচুর তীর ধরে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত, তীর্থকেন্দ্রিক বলেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ বলে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নয়, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর বাসস্থান,—যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি মোগল শব্দ,—উৎপত্তি বোধ করি মঙ্গোলীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। যেমন হলেন রোমের পোপ, যেমন জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনোটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু অঞ্চল এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালু আছে। ধর্মমন্দিরের পুরোহিত সম্মতিদান করেননি বলে অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ করে তবে স্বামীপরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল, গির্জার সম্মতি না থাকার জন্য এই সেদিন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হোলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধ্যযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমার হেলিয়োডোরাস মালোয়া রাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ার বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধবিকা সখীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন। তরুণ সুদর্শন হেলিয়োডোরাস মাধবিকাকে দর্শন করে মুগ্ধ হন্, এবং রাজকুমারকে দেখে মাধবিকাও অনুরাগে অভিভূত হন্। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভয়ের বৈবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধ্যভারতে গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ভীলসার নিকটে দু'হাজার বছরেরও আগে কুমার হেলিয়োডোরাসের নির্মিত 'গরুড়স্তম্ভ'টি আজও তার সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধরে গির্জাতন্ত্রী ইংরেজ সমস্ত পৃথিবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হোলো যোগী-ফকির, মারণ-উচাটন, যাদু-ভোজবাজি, বাঘ-ভল্লুক-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতকিমাকার

রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেয়ে আগুণে ঝাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয়, ন্যাংটা সন্নাসী, লতাপাতার সঙ্গে গোবর খায় দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপুড়ে, এবং নাগা-ফকিররা 'শিরাসন' করে ঠ্যাং দুখানা শূন্যে তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তারা বলেনি,—উল্‌কির ছাপ সর্বাঙ্গে মুদ্রিত করে ইংরেজ নরনারী অর্ধনগ্ন চেহারায় নর্মাণ্ডির তীরে-তীরে নৌকা নিয়ে যখন 'বোম্বেটে' হয়ে ঘুরে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানবাত্মার অবারিত মুক্তিসাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বসিনি, কিন্তু এ কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় পাই, একটি বৌদ্ধমঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্ত্রিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেষ্টা প্রধান। সোয়েন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভ্য' হতে চাইনে, কারণ 'সভ্য' জগতকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যান-ধারণা জপ-তপ বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কারো সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইনে। দয়া করে একা থাকতে দাও।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথার এখানে পুনরুক্তি করি। "তিব্বতের পথে-ঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বুদ্ধমূর্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়—এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠাণ্ডা গুহাগহ্বরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষু লুক্কায়িত।"

'জো-খান' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরৎচন্দ্র বলেছেন, দেড় হাজার বছর হতে চললো মন্দির। পুরাতন কাঠের মোহাচ্ছন্নকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তার ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগুলি অদ্ভুতভাবে চিত্রাঙ্কিত। পূজার স্বর্ণপাত্রগুলি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধূমেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একদা কোনও এক অপরাহ্নে ইয়ংহাসব্যান্ড এই মন্দিরে প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান্। এখানে বলে রাখি, ইয়ংহাসব্যান্ড যদিও সমর-অধিনায়ক ছিলেন, তবু তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধুনিক কালের যোগিশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ রক্ষা করে যোগনিমীলিত হন্, সেই সংবাদের পর স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিসমিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস মাত্র কিছুকাল আগে বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন।

স্যর ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেদীপ্যমান। মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে আমি উদার উদাত্ত গম্ভীর ডম্বরুর গুরুগুরুধ্বনি শুনলাম,—তারই সঙ্গে পূজারীগণের করুণ মধুর এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দূরদূরান্তরের শঙ্খ-

ঘন্টারব! দেখলাম ভক্তিনম্র অনুরাগের ভাবাবিষ্ট বিহ্বলতা! সহসা আমারও সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপরূপ দৈবপ্রেরণার উৎস।...... তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারবিহীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মানুষ কোথাও স্বীকৃত নয়। দু'একজন ভিন্ন এমন কোনও মানুষ তিব্বতে শ্রদ্ধালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মগত নয়। বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে একবার দেখে নিতুম সেই দেশকে, যেখানে মানুষ অবিশ্রান্ত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে বুদ্ধভগবানকে,—কিন্তু মানুষের নারায়ণ যেখানে শ্রদ্ধালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহুল্য, অস্থির ক্ষুধায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানার গিরিসঙ্কটে, কুলুতে, কিন্নরে, জোজিলায়,—কতবার ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছি। সিকিমে, ভূটানে, কুমায়ুনে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজস্র। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগৎ—যেখানে পিশাচ-লোকের প্রতীকও পূজ্য,—কিন্তু গণদেবতা আরাধ্য নয়!

মনে পড়ে গেল একশো বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। মহারাজা গুলাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করেছিল পশ্চিম তিব্বত। সে-আক্রমণ নৃশংস—তার মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গুম্ফা মন্দির জনপদ—কোনও কিছুকে ক্ষমা করেননি। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জোরোয়ার সিং। ধ্বংসের পর ধ্বংস,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। জোরোয়ারের নির্মম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত ওরফে 'লাডাখ' এলো ভারতের মধ্যে। কিন্তু জোরোয়ারের উপরে ভাগ্যের বিদ্রূপ সঞ্চিত ছিল। পরের বছরে বিজয়ী জোরোয়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তীর্থাপুরী' থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকোটে'। সেখানে তাঁর ক্যাপ্টেনের জিম্মায় সৈন্যদলকে রেখে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাখতে গেলেন 'গারটকে'। ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জোরোয়ারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। জোরোয়ারের অতিমানবিক শক্তি ও যুদ্ধপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা— জোরোয়ার একজন তান্ত্রিক যাদুকর,—পিশাচসিদ্ধ! ওরা সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গুলীবিদ্ধ করে মারে। সে-গুলিটি সিসার নয়, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে টুকরো টুকরো করে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসখন্ড নিয়ে তাঁরই স্মৃতিফলক ও সমাধিমন্দির নির্মাণ করে। আজও 'শিম্বিলিং' ও 'শাক্যগুম্ফায়' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ টুকরো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অসুর' বলেই তিব্বতে অতিখ্যাত।

এই ঘটনার তেষট্টি বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যান্ড পূর্ব তিব্বত আক্রমণ করেন—একটু আগে যেকথা বলেছি। সেই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা 'পোটালা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান্। অতঃপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত

হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দখল' (Suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। পঁয়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। চীন পুনরায় এসে তিব্বতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুক্তি নাকচ করে। নেহরুগভর্নমেন্ট ইয়াটুং, গেয়ানৎসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলিসহ সৈন্যরক্ষা ব্যবস্থাও প্রত্যাহার করে নেন।

মাত্র পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল,—১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গত 'কারগিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দস্যু চৈনিক তুর্কীস্তানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রসিদ্ধ মঠ তাদের হাতে লুণ্ঠিত হয় এবং তীর্থাপুরী গুম্ফা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ভারতীয় অন্ধ্রপ্রদেশী সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশব্যাপী লুটতরাজের পরে দস্যুদল যখন লাডাখে পৌঁছয় তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার ঝব্বু, দু-হাজার ঘোড়া ও অশ্বতর, পাঁচশত রাইফেল ও বন্দুক, হাজার-হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ, অলঙ্কারাদি, মণিরত্নাদি এবং সোনা রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা।" তারা লাডাখের সীমানায় এসে পৌঁছলে কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট তাদেরকে নিরস্ত্র করে ভারত প্রবেশে অনুমতি দেন। তৎকালে বৃটিশ-রুশ মৈত্রীচুক্তি বলবৎ থাকায় বৃটিশ ভারত গভর্ণমেন্ট সীমান্তের 'হাজারা' জেলায় তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ করেন, এমন কি তাদের জন্য খরচপত্রেরও দায়িত্ব নেন্। কিন্তু তৎকালে দুটি 'ঘরের শত্রু' ছিল ভারতে—তারা হায়দারাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তাঁরা উক্ত দস্যুদলকে আপন আপন অঞ্চলে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান বলে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাডাখ। বৌদ্ধ-হিন্দু সম্রাট ললিতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাখসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। সেটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত মুসলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মাত্র লাডাখ ভারতের সীমানাভুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমিপ্রদেশ হোলো লাডাখ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো ষোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতী। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সঙ্গে লাডাখের পার্থক্য কম।

লাডাখ হোলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূভাগ—যেটি মূল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবর্তী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লাডাখের দক্ষিণ সীমানা অনির্দিষ্ট। শিপকির গিরিসঙ্কটে রংচুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়ত বাঁ তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয়

বাণিজ্যপথ। কিন্তু রূপসু, হান্‌লে, দোমেত ও রংচুং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্ণেল ল্যাম্‌বটন্‌ ভারতের প্রথম জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমাপটির অদ্যাবধি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্ণমেন্টের এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের দ্বারা অবরুদ্ধ। এর মধ্যে পড়ছে স্কার্দু, বালতিস্তান, ব্রাল্‌দা, হুন্‌জা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির, সোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিরাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি, অসংখ্য হিমাঙ্গ এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড় পার্বত্য জনপদ,—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্তির অগণিত ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। উত্তর লাডাখের বাল্‌তিস্তান উপত্যকার উত্তরপূর্বাঞ্চল আবহমানকাল থেকে হিমবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। পৃথিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশৃঙ্গের দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি তুষারস্তূপে পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসের অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলশ্রেণীর ক্রোড়ভূভাগে শত শত মাইল অবধি বিপুল পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাটুরা, চোগো ইত্যাদি বিশালকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে ভিতরে একেকটি তুষারমন্ডিত গগনচুম্বিত শিখরলোক,—এবং তাদের প্রত্যেকটি কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুষিত মনুষ্যপদ চিহ্নহীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অধ্যাপক 'দেশিয়োর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অষ্টিনের' শিখরে (২৮,২৫০ ফুট) আরোহণ করতে সমর্থ হন্‌। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃঙ্গ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান অবরুদ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্ধুনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। 'স্কার্দু' অঞ্চল থেকে আরম্ভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে 'অর্ণব' অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তার শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার সুনির্দিষ্ট জরীপ আজও অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হোলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাখ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধুর সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্‌-হিন্দুস্থান-পথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্‌কির ভিতর দিয়ে। পূর্বপথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সোনার খনি 'থোক্‌ জালুং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগুলি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে ষোল হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চ'লে গেছে।

মানস সরোবর! সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁড়াতে হলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবতপ্তা'—আবার কোথাও এর নাম 'পদ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া। পরমাশ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণকমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল ক'রে উঠেছে তীর্থযাত্রীর অশ্রুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোখের ভ্রম—সবাই জানে। কিন্তু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্তরে সূর্যরশ্মির বৈচিত্র্যহেতু এবম্বিধ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চূড়ায় আদি অন্তহীনকাল ব'সে রয়েছেন 'বজ্র-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাকলাকোটের পথ ধ'রে গেলে কুড়ি মাইল দূর থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় আলোক-বৈচিত্র্যবর্ণা মানস ও রাবণসরোবরের উর্মিতরঙ্গায়িত জল ঝলমল ক'রে ওঠে,—তার প্রখর স্বচ্ছতার মধ্যে আরও কুড়ি মাইল দূরবর্তী বজ্র-বরাহী কৈলাসের ধবলমুকুট প্রতিবিম্বিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ইতিহাস কত লক্ষ বছরের জানিনে, কিন্তু মানব ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কৃত হ্রদ হোলো মানস,—যেখান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণপক্ষ বিস্তার ক'রে অনন্ত নীলিমায় বলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মানুষের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং প্রথম মানববংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রাক্তণ কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হ্রদ হোলো মানসসরোবর। হিন্দুপুরাণে মানস প্রসিদ্ধ। বস্তুত, সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হ্রদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানসসরোবর মানবজাতির নিকট যশোলাভ করে। ইতিহাসের উষা কালেরও পূর্বে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বৎসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শারদা, কালী ও ধবলীগঙ্গার তীরে-তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে 'গার্বিয়ং' নামক উপত্যকায় পৌঁছতে হয়। এখান থেকে তুষারসীমানা ও দুঃসাধ্য চড়াই আরম্ভ। গার্বিয়ং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট ত্রিশ মাইল। সরকারি হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উঁচুতে (সমুদ্র সমতা থেকে) লিপুলেক গিরিসঙ্কটে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থলে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনন্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপ্যমণ্ডিত' শুভ্রতুষারাবৃত তিব্বতের গিরিশৃঙ্গদল উজ্জ্বলন্ত নীলিমার নীচে প্রখর সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দূরত্ব হোলো যথাক্রমে দুশো আটত্রিশ ও দুশো আঠারো মাইল, এবং লাসানগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম 'কাং রিন্‌পোচে।' মানসসরোবর সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়ান্ন মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল'। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত এবং নরকপালভূষিত।

এক হাতে তাঁর ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। যিনি শক্তি, তিনি 'বজ্রবরাহী',—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মধ্যে ' যৌনসংযোগে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে রয়েছেন'। কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে থাকলে শোনা যায় অপার্থিব শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও খঞ্জনী করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতঝঙ্কার।

যিনি মানস-রসিক সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিহীন সংস্কার থেকে বর্জিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবাবিলতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত—তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমালয়ে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলো কৈলাস ও মানস। চতুর্দিকব্যাপী সমগ্র অঞ্চল পরমাশ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি যে কোনো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশয়াচ্ছন্ন অবিশ্বাসবাদী হও, হও আস্তিক কিংবা নাস্তিক—এক সময় হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতন্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে কখন্ যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত-বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রানুগ মহৎ কামনা।"

সন্ন্যাসী বলছেন, "আজন্ম যার ঘ্রাণশক্তি পঙ্গু—গোলাপের গন্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারযন্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দূর দেশের কোনও সঙ্গীত-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াও! পঙ্গুনাসা মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তাঁ'র সত্তার মধ্যে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।।"

বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে চলেছে সিন্ধু উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধুর আদিঅন্ত দিশাহারা। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধু। সিন্ধু অপরিণামদর্শী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে সিন্ধুনদ। সিন্ধুর উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধু চলে গেছে লাডাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুম্ফা সমগ্র লাডাখে বর্তমান,—তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গুম্ফা লে-শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দুস্তর ও লোকশূন্য পার্বত্যপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই গুম্ফার মধ্যেই মহামানব যীশুখৃষ্টের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-রুশযুদ্ধের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন্। তাঁকে হেমিসগুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শুশ্রূষা করা হয়। সুস্থ হবার পর তিনি একখানি দুলর্ভ গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান্ এবং দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যায় কিশোর বয়সে যীশুখৃষ্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধ্যএশিয়ার

বণিকদলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতমবুদ্ধের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় ষোল বছর কাটে। তিনি পুরী, কাশী, কপিলাবস্তু, কুমায়ুন, নেপাল এবং কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সঙ্গে যীশুর বিরোধ বাধে। উনত্রিশ বৎসর বয়সে যীশুখৃষ্ট যেরুশালেমে ফিরে যান্। অতঃপর ক্রুশবিদ্ধ হবার পর যীশুকে তাঁর ভক্তরা ক্রুশ থেকে নামিয়ে গুল্মলতাশিকড়ের রসের সাহায্যে তাঁর ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করেন এবং পুনরুজ্জীবিত যীশু পুনরায় চ'লে আসেন তাঁর স্বপ্নভূমি ভারতে। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবর্তী 'থানা-ইয়ারী' নামক স্থানে যীশুখৃষ্টের নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে। এই পুঁথিবর্ণিত আনুপূর্বিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁ'র নাম—"The unknown life of Jesus Christ." দুইজন মাত্র বাঙ্গালী এই পুঁথিখানি হেমিসগুম্ফায় দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দজীরই নিত্যসেবক ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য।

হেমিসগুম্ফার প্রধান পুরোহিত বলেন, যীশুখৃষ্ট পালিভাষা শিখে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শেষদিকে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌদ্ধনীতিকে ভিত্তি ক'রে একটি নূতন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশুখৃষ্টর "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথনটি অবিকল এবং হুবহু বৌদ্ধ তথা হিন্দু ধর্মনীতিবাদের একটি নকল মাত্র।

সিন্ধুর জন্ম কৈলাসে, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম ব্রহ্মাসৃষ্ট মানসসরোবরে। এই নদের দক্ষিণে হিমালয়, উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেনটাংলো।' গগনের অনন্ত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ ক'রে সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মালোক থেকে ছুটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে অধিকাংশ নদ তুষারাচ্ছন্ন। ওর দুই পাশের পার্বত্যগুহাগহ্বরে থাকে শ্বেত পীতাভ ভল্লুক; নামহারা অতিকায় জন্তুরা ধূসরবর্ণ রাত্রির ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শুঁকে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে ভয়াবহ তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে লুকোয়। কখনও কখনও খুঁজে পাওয়া যায় তীর্থযাত্রী ও বণিকদলের কঙ্কাল,—পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তা'রা স্থির হয়ে আছে চিরকালের মতো। কখনও আসে ভয়াল পার্বত্য মহানাগ, কখনও বা পথভ্রান্ত ঈগল। ওরা আসে জলের পিপাসায়। কিন্তু জল না পেয়ে রক্তের খোঁজে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাঞ্চল অগম্য। ভীষণাকৃতি পাতালপথ, শূন্য অন্ধকার গহ্বরলোক, বালুপাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা আচ্ছন্ন করেছে শত শত বর্গমাইল। পৃথিবী এখানে মৃদুগতি, মহাকালের জপের মালা ঘোরে অতি ধীরে, কর্মচাঞ্চল্য কোথাও নেই. মানববসতি চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে মঙ্গোলীয় কিংবা তিব্বতী ঘোড়সওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের ক্যারাভান,— রেখে যায় ওই লবণাক্ত বালু-কাঁকর-পাথরের

মরুভূমিতে রক্তের করুণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেনটাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে তুষারের ঝঞ্ঝা,—আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বজ্রে, অন্ধকারে ইয়ারখন্দে আর খোটানে, তাকলামাকানে আর তুর্কিস্থানে, কৈলাসে আর মানসে।

রৌদ্রের প্রচণ্ড জ্বলজ্বালার মধ্যে হঠাৎ প্রবল তুষারপাত ঘটতে থাকে তিব্বতে। হঠাৎ নেমে আসে করকা প্রবল বর্ষণের সঙ্গে। দিনান্তের তমসায় হঠাৎ ভলকে ভলকে লালাভ অগ্নিপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,— সেই অগ্নিপ্লাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ণ ধূম্রপুঞ্জ। একটি দিনমানের মধ্যে অগ্নিক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়নৃত্যরূপিনী বর্ষা, নির্মল নীলিমা শরতের, প্রচন্ড শীতের সাংঘাতিক তুষার,—এবং তা'র সঙ্গে বসন্ত সমীরণের মধুর স্বগত প্রলাপ উদ্বেলিত মানসহৃদয়ের রক্তকমলদলকে টলোমলো ক'রে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শুক্লপক্ষের অসহ্য প্রখর চন্দ্রচ্ছটা। সেই জ্যোতির্বিকিরণের নীচে কৈলাসশিখরস্থিত দেবাদিদেবের ক্রোড়বদ্ধা বজ্রবরাহীর নিবিড়-নিমীলিত মৈথুনযন্ত্রণা তীর্থবাসীগণের প্রাণসত্তাকে আবেগ-উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তা'রা কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করে নব বিশ্বসৃজনের! *

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

সকলেই জানে, ভগবানের একটি নাম বাঞ্ছা-কল্পতরু। সেই নামটি যে কতদূর সত্য তা আস্তিকেরা ত বিশ্বাস করেই, আর নাস্তিকেরাও করে, তবে তারা করে মনে মনে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই পেয়েছি, অনেক জনকে দেখেছি পেতে। যাই হোক, এখন আমি আবার যেভাবে ঐ বাঞ্ছা-কল্পতরুর প্রমাণ পেলাম, এমনটি বুঝি আর কেউ পায়নি।

ঠিক হয়ে গেল যে ঘর থেকে না বেরুলেই নয়,—কারণ ঘরে থেকে ইষ্টলাভ যাদের হয়, সে পাত্র আমি নই। মনের ঝোঁক থেকেই টের পাওয়া যায় যে, কার কি ভাবে ও পথে যাবার কথা। শুনেছি অনেক ভাগ্যবান আছেন যাঁরা ঘরে বসে সবই পেয়ে যান,—কিন্তু সে ভাগ্য ত সকলের হয় না! এর মধ্যে চমৎকার কথা এইটুকু যে, নিজ সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হতে যে সময়টা, ঐটুকুই যা কিছু দ্বন্দ্ব, দুঃখ, অশান্তি বা অব্যবস্থিত চিত্তের ব্যাপার। যেইমাত্র সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, ঘরে থাকব না, বা ঘরে থাকলে ইষ্টলাভ হবে না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনোমত এক স্থানও জুটে গেল। সবদিক দিয়েই মনোমত, বাড়ি থেকে বহু দূরে, প্রাণের প্রিয়তম ক্ষেত্র,—চির আকাঙ্ক্ষার ধন,—সেই হিমালয়ের কোলে নৈনিতালের মধ্যেই মল্লিতালের কাছে, তার থেকে বড় জোর তিন-চার রশি দূরে একটি বেশ ফাঁকা স্তূপাকার উঁচু জায়গা আছে; গোটাকতক চীড় বা পাইন গাছ ছাড়া সেখানে আর কোন গাছপালা নেই। সেই গাছগুলি দিয়ে ঘেরা স্থানটুকু যেন প্রকৃতির হাতে গড়া একটি রম্য সাধন ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রটির ঠিক মাঝামাঝি আছে একটা বিরাট ফাঁক,—দূর থেকে সেটা দেখা যায় না। সেই ফাঁকটার মধ্যে,—ফাঁক বলছি এই কারণে, সেটা ফাঁকের মতই দেখতে বলে,—আসলে প্রবল জলধারা নেমে বড় বড় খাঁজ পড়ে সেই স্থানটায় হয়ে গেছে এক বিরাট ফাঁক; তার এক ধার দিয়ে বেশ নামব'র জায়গা বা পথের মত আছে। উপর থেকে স্তরে স্তরে নেমে আসা যায় সেই ফাঁকের মাঝখানে, যেখানটা উপর থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফিট গভীর। সেই নীচের স্তরে গিয়ে দাঁড়ালে পাশেই একটা গুহা দেখা যায়। কোন সময়ে কোন সংসার বিরাগী সাধু মহাত্মা সেটা তৈরী করে থাকবেন। তপো-জীবনের আশ্রয়স্বরূপ সেই গুহাটি কত কাল কত তপস্বীর হাত-ফেরৎ হয়ে শেষে যাঁর হাতে ছিল তাঁর সঙ্গেই সম্বন্ধ। তিনি আমার উপর তাঁর গুহাশ্রম রক্ষার ভার দিয়ে অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা জনকে নানা কথাই বলতে শুনেছি। সেখানকার একজন বললে, উনি অনেক দিনই এখানে ছিলেন, এখন সারা ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে যত তীর্থ আছে, সব প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়েছেন। আর দ্বিতীয় একজন বললে,—উনি কোন পলিটিক্যাল অফেন্ডার, সাধু সেজে এখানে ছিলেন, এখন ধরা পড়বার ভয়েতে সরে পড়েছেন। আর তৃতীয়

একজন বললে, একটি শৈব গুরুকে ধরে তিনি তাঁর শিষ্য হয়ে মুঙ্গেরে অনেক দিন ছিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে এক ভৈরবীর যোগাযোগ হয়। গুরুর আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি ঐ ভৈরবীকে নিয়ে এইখানে এসে অনেক দিন বাস করছিলেন। তারপর, এক রাত্রে সেই ভৈরবী হঠাৎ পালিয়ে যায়—এখন তিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছেন।

আমার সঙ্গে এই গুহাবাসী সাধুর বিশেষ কোন সম্বন্ধই ছিল না। যখন ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য ছটফট করছি, তখন আমার এক প্রিয়বন্ধু—দেবানন্দ তাঁর নাম—ইউ. পি. সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন এবং তখন নৈনিতালেই ছিলেন। আমার সকল কথাই জানতেন, সব খবর রাখতেন ফটিকদার পত্রের মধ্য দিয়ে। তিনিই এক পত্রে এখানকার সন্ধান দিয়েছিলেন এই বলে, যদি দীর্ঘকালের জন্য হিমালয়ের কোন গুহায় বাস, আর সেই গুহাটি রক্ষার ভার গ্রহণ করতে রাজী থাক, তাহলে চলে এস। তিনিই এখানে এনে অধিকারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বৃদ্ধ তাঁকে বলা যায়,—তাঁর কথায় মনে হ'ল তিনি বাঙ্গালীই। অত্যন্ত রোগা, বয়স মনে হয় আন্দাজ ষাট বৎসর হবে। বললেন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আমায় কিছুদিন বাইরে যেতে হবে, দীর্ঘকালও হতে পারে। তুমি আপন মনে করে কি গুহাটি রাখতে পারবে, যতদিন আমি না আসি? এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। কোন নারী তাঁর সঙ্গে আমি দেখিনি। বয়সেও তিনি ছিলেন প্রবীণ যাকে বলে তাই। যাই হোক এর উত্তরে একথা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে কোন সঙ্কোচ হ'ল না যে, আমি ঠিক এই রকমই আশ্রয় চাইছিলাম অন্তর থেকেই,—আর তাঁর এই অনুগ্রহ ভগবানের দান বলেই নিয়েছি।

ব্যস্, পরদিন তিনি চলে গেলেন, আমিই হলাম গুহার অধিকারী। যে কথাটা বলবার জন্য এতটা কথা বলতে হ'ল সেটা এই যে, বড় জ্বালাতন হয়ে, বড়ই কষ্টের পর এই চমৎকার সাধন স্থানটি পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম, মনে হ'ল, যেন সিদ্ধি হাতের কাছে এসে গিয়েছে, ধন্য হয়ে গিয়েছি,—জন্ম জীবন এতদিন, হে দয়াময়! তুমি সার্থক করেছ,—আমার প্রতি তোমার অসীম দয়া—এত দয়া বুঝি আর কারো প্রতি প্রকাশ করনি।

সফলকাম প্রত্যেক মানুষই ভগবানকে লক্ষ্য করে ঠিক ঐ কথাটাই বলে। যাই হোক, চার-পাঁচ সপ্তাহ, তারপর মাস দুই-তিন কেটে গেল, এখন আসনটি বেশ জমেছে। নিয়মমত সাধনের সকল কিছুই চলছে।

প্রতিদিন এক প্রহরের পর ভিক্ষায় বেরিয়ে যাই-যেদিন যা জোটে দুই-একজনের কৃপায়, দ্বিপ্রহরে এসে তাই বানিয়ে নিয়ে ভোজনের পর কাঠকুটা কুড়াতে যাই। সে দিন আর সেই রাতের মত আগুনের জোগাড় করে একটু লেখাপড়া করতে বসি। বৈকালে আবার দু'একজন আসে, ভালকথা সৎবাক্য শুনতে। বন্ধুবর আসেন, প্রায়ই তত্ত্ব করেন ভোজন জুটছে কি রকম। তাছাড়া দু'চারজন আসে—তার মধ্যে আবার কেউ কলাটা, মূলাটা, কেউ বা ঘটিতে একটু দুধ নিয়ে আসে। না গ্রহণ করলে মনে দুঃখ পায়, নিলে খুসী হয় সে জন্য নিতেও হয়। ঐ সব উপহার রাত্রের জন্য রেখে দিই। আবার কেউ বা

একটা ঔষধ চায়—বড় কঠিন রোগে ভুগছে, সাধুর কৃপায় আরোগ্য হবে এই বিশ্বাস। তাদের এড়াতে না পারলে একটু জল দিয়ে বলি, ভগবানের নাম করে এটা খাইয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে। জানি এতে তার ইষ্ট কিছু হোক না হোক অনিষ্ট কখনও হবে না, অথচ আমি বেঁচে যাব। কারণ এখানে এটা দেখেছি—কিছু-না-কিছু না দিলে রেহাই নেই; তারা কিছুতেই মানবে না, বুঝবে না। তাই যতই সত্যি বলি না কেন, তারা ঠিক মনে করবে যে, সব জেনেশুনে তাদের পাপী বলে এড়িয়ে যেতে চাই। কাজেই দিতে হয় কিছু। মনে মনে ভগবানকে ডাকি, হে দয়াময়, তুমি অন্তর্যামী, সবই জানো, ভাল করবার কোন শক্তি আমার নেই, তোমার দয়াতেই যেন ওর ভাল হয়। সত্য বলতে কি, ভালও হয়। যাকে যা দিয়েছি, পরে খবর পেয়েছি, তারা সত্যিই ভাল হয়ে গেছে, মহা উৎসাহে তারা নিজেরাই এসে বলে যায়।

সন্ধ্যায় ধুনীটা ভাল করে জ্বালিয়ে গুহার ভিতরে আসনে বসি। এক প্রহরের পর একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর মধ্য রাত্রে উঠে আবার ধুনী জ্বেলে আসনে বসি। মাঝ-রাতে মন্ত্রজপের কাজ খুব ভালই হয়। আবার শেষ রাত্রে একটু ইচ্ছা হয় ত শুই, না হয় আর না শুয়ে ভোরের দিকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। এই ভাবে এখানে মহা আনন্দে সাধনের নেশায় মশগুল হয়েই দিনগুলি কাটছিল। এখন এই বার্দ্ধক্যের অবসন্ন দিনে যখন চিন্তা করতে বসি, তখন মনে হয় যে, সারা জীবনে যা কিছু আনন্দ, বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি বা সার্থকতা তা প্রথমে ঐখানে, তার পরে বৃন্দাবনে ঐ সময়েই হয়ে গিয়েছে। এর চেয়ে বড় কিছু এ জীবনে আর হয়নি—যার ফল অবশিষ্ট জীবনে পথের সম্বল হয়ে আছে।

এখন যা বলছিলাম ঃ কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, একজন প্রৌঢ় মাঝে মাঝে আসছে। তার উদ্দেশ্য যে কি তা বুঝতে পারিনি, কারণ সে মোটেই কথা বলে না। ক্রমে রোজ রোজ তাকে আসতে দেখছি, কিন্তু এক সময়ে আসে না, আবার পাঁচজনের মত কিছু নিয়েও আসে না। একদিন এল বৈকালে, পরদিন এল সন্ধ্যায়, তার পরদিন এল দুপুরে, কোনদিন সকালেই এসে হাজির। আজ দেখি ভোরেই এসেছে। তখন বাইরে গিয়েছিলাম, এসে দেখি সে বসে আছে। আসে, বসে কিন্তু কিছুই বলে না, এইটাই বিচিত্র। চুপ করেই বসে থাকে; এদিক ওদিক, গুহার ভিতরের দিকে লক্ষ্য করে—যেন কি খুঁজছে, মুখে কিন্তু রা নাই। আমারও তার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা হয়নি, এ পর্য্যন্ত তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু ক্রমে তার কথাটা বেশ চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল; অন্য কারণে নয়, সেটা তার নির্বাক অবস্থার জন্য।

এখন, এ লোকটা কে? হিন্দুস্থানী কি বাঙ্গালী তাও জানি না, তবে সে যুবা নয়—প্রৌঢ়, কাঁচাপাকা মেশানো ধুলায় ধূসর চুল—মাথায় যেন একটা ঝোপ-জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে, গাছে যেমন সোঁদাল ঝোলে, দু'তিন চার পাঁচটা জটা ঝুলছে। এক সময়ে হয়ত গৌরবর্ণই ছিল, এখন হয়েছে তামাটে, মুখে অল্প গোঁফ, অল্প অল্প ছাগল-দাড়ি, তাও ঐ রকম কাঁচাপাকা চুলে ভরা। দীর্ঘ রোগা শরীর, ঢুলুঢুলু লাল চোখ দুটি, যেন কোনদিকেই স্থির

দৃষ্টি নেই, একজনের চক্ষের সঙ্গে যখন মেলে তখন দেখায় যেন জলভরা। ঘন কালো ভ্রূ, প্রথমেই সেটা চোখে পড়ে। গায়ে একখানা কম্বল মাত্র, ভিতরে কৌপীন।

আমার নিয়ম ছিল কারো সঙ্গে আগে কথা না কওয়া; আর যত কম কথায় কাজ শেষ করা যায় মাত্র ততটুকুই কথা। ঐ অবস্থায় বাক্‌সংযম অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই কোথাও বেশী কথার উদ্যোগ দেখলেই, 'দোহাই বাবা' বলে জোড় হাতে তাকে বুঝিয়ে দিতে হ'ত যে, সাধুগিরি করতে আসিনি, উদ্দেশ্য শুধু সাধনপথে চলা। আমি সাধুও নই, সিদ্ধও নই, সংসার আছে, ঘরে স্ত্রী, মা, বাপ, এমন কি ঠাকুরমা পর্যন্ত আছে। কেবল কিছু দিনের জন্য সংসারের গোলমাল থেকে বেরিয়ে এসে একটু সাধন ভজন করছি মাত্র।

যাই হোক, এখন দেখছি এ লোকটার নির্বাক ব্যবহারের সঙ্গে আমার বেশ একটা মানসিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেল। কোথা থেকে ধূমকেতুর মত এই অদ্ভুত লোকটা আরও অদ্ভুত রহস্যময় নির্বাক অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হ'ল, একটা যেন অশান্তির কারণ হয়ে। আমার আসনে এসে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করতে চায়! আমি কথা কই না আমার নিয়ম বলে,— কিন্তু সে কথা কয় না কেন? ঐ পাগলাটে ভাবের মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য তার আছে কি না কে জানে?

এখানকার যে গুহাটি তার একটু ভিতর-বার আছে। প্রথমে যেটি,—প্রায় দশ ফিট উঁচু আর পাঁচ-ছয়জন বসতে পারে এমন জায়গা। তারই একপাশে ধুনী জ্বলে। সেই গুহার ভিতরে আর একটা গুহা আছে, সেটা অন্ধকার আর ছোট আর নীচু, ভিতরে পাঁচ ফিটের বেশী নয়। সোজা দাঁড়ানো যায় না। বাইরে থেকে ভিতরের গুহায় যেতে একটা প্রায় দেড় হাত চৌকা কাটা পথ সেইটাই দ্বার, ভিতরে গিয়ে ঝাঁপটা বন্ধ করলেই বেশ গরম, পাহাড়ে শীতে আদুড় গায়ে থাকা যায়। আর গরমের সময়েও বেশ ঠাণ্ডা। ভিতরে প্রায় চার হাত লম্বা আর তিন হাত চওড়া হবে গুহাটা, আমার আসন ঐ ভিতরের গুহায়। সব সময়ে ত ভিতরে থাকা যায় না—কেউ এলে বাইরেই বসি। শীতের দিনে বাইরে আগুন না হলে চলে না। কাজেই এই লোকটি যখনই আসে, তাকে বাইরে বসতে হয়, আর ধুনীর কাছেই বসে। সে যখনই বসে দেখছি, তার দৃষ্টি বেশীর ভাগ থাকে ভিতরের গুহায়। যাই হোক, একে নিয়ে অন্তরের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'ল, তাতে আর চুপ করে থাকা, সম্ভব রইল না,—ঠিক করলাম আজ একটা হেস্তনেস্ত যা হয় করে ফেলব। —জিজ্ঞাসা করব কেন সে আসে এখানে, কি উদ্দেশ্য তার।

মনে এই সঙ্কল্প করবার পরই আবার মনে হল, আমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে ভগবানের একটা অদ্ভুত ছলনা নয় ত? যথার্থ আপন সাধনে অভিনিবিষ্ট কি না, এ ভাবের ব্যাপারে সাধনের ধারা বিচলিত হয় কি না, ইষ্ট সেই পরীক্ষায় ফেলেন নি ত? এইসব ভেবে আবার সঙ্কল্পের গোলমাল হয়ে গেল, কি করব তা ঠিক করতে পারলাম না।

সেদিন লোকটা এল সন্ধ্যা ঘেঁষে, আমি তখন ভিতরে, আসনে আছি। বাইরে ধুনী জ্বালাই ছিল, বোধ হয় আগুন ছিল কম। বেশ টের পেলাম সে এল, ধুনীর কাছে যেখানে

চেটাই পাতা, সেখানেই বসল। মন ছিল চঞ্চল, সে আসার পর আর বেশীক্ষণ আসনে থাকতে না পেরে বাইরে এসে ধুনীটা আবার ভাল করে জ্বালিয়ে কতকগুলি কাঠ ফেলে দিলাম যাতে কিছুক্ষণ বেশ আলো থাকে। আমার আলো ছিল না, রাত্রে যা কিছু কাজ ঐ ধুনীর আগুনেই চলে যেত। একখানা মৃগচর্ম্ম ছিল। তাইতেই বসতাম। আর কেউ এলে খান-কতক চেটাই ছিল। হাঁটু উঁচু করে দু'পা মুড়ে আর দু'হাত দিয়ে সেই খাড়া-মোড়া হাঁটু জড়িয়ে লোকটা বসে আছে।

মনের রাজ্যের দ্বন্দ্ব এসে মহাগোল বাধিয়ে দিলে,—কি করে কথাটা আরম্ভ করি। আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমায় বলতে হ'ল না, সেই-ই আমায় রক্ষা করলে আগে কথা কয়ে। হিন্দিতে সে জিজ্ঞাসা করলে,—ভারী গম্ভীর তার স্বর—বাবু সাহেব কলকাত্তাকা আদমী? আমি,—জী হাঁ, বলে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম।

তখন সে আবার বললে—বাঙ্গালী বাবুলোককো এল্‌ম বহুত হৈ, সারা হিন্দুস্থানমে উসিকো বরাবর কোই নহি। আংরেজ লোক ভি উসিকো,—

বাধা দিয়ে আমি বললাম,—আপ ক্যা বোল রহা, মেরে সমঝমে নহি আতি। সে সেইভাবেই বসে, উত্তরে সেইভাবে বলল,—ময়নে ইয়ে বোল রহা হুঁ—যে, আপ বাঙ্গালীওঁ কো আংরেজ ভি বহোৎ ডরতে। শুনে আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম,—ইসব বেফায়দা বাত সৎ সাধু-সন্ত কো বাস্তে নহি। আপকো কোই প্রয়োজন কী বাৎ হো তো আচ্ছা, কহিয়ে।

সে এতক্ষণ ধুনীর দিকে চেয়েই কথা বলছিল, এখন আমার কথা শুনেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে,—তার চক্ষে এক অদ্ভুত জ্যোতি, ধুনীর আগুনে যতটুকু দেখা যায় দেখে অন্তরে আমি যেন একটা কম্পন অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যেন আমার মধ্যে স্বীকৃত হয়ে গেল। সে বললে,—আপ্ সায়দ হামিকে বিস্‌ওয়াস্ নহি করতে—! শুনেই আমি বললাম,—উও বাত্ নহি, উহ সব বাৎসে হামারা কুছ কাম নহি, ইএ হাম বোলতা হুঁ, আপ ফির ওহি বাৎ হামসে মৎ বোলা করো জী।

—কাহে মহারাজ?

লোকটা পাগল নাকি? আবার একটা বিরক্তির ভাব আমার মধ্যে দেখা দিলে, তবুও সংযত হয়ে বললাম,—সাধু, সেবক আদমীকো উৎ বাৎসে কুছ ফ্যায়দা নহি, ইসিবাস্তে।

—আপ ঘর ছোড়কে আয়া কি নহি?

—আয়া তো সহি!

—আপনা দেশকা কুছ কল্যাণ কি লিয়ে তো আয়া হোগা? এই কথাগুলি বলেই সে আসন পিঁড়ি হয়ে বেশ যুৎ করে বসল। আমি বললাম,—পহ্‌লা আপনা কল্যাণ, পিছে দেশকী বাৎ,—ফির, হাম অজ্ঞানকী দরিয়ামে ফাস রহাহুঁ,—না মালুম কৈসি আপনা জান বাঁচাউ,—হামসে দেশকী কল্যাণ ক্যা হো সকতা, বাৎলাও, জী!

সে তবুও দেশের কথা ছাড়ে না, বলে,— দেশ কি বাৎ, সবকোই কো অধিকার, হৈ কি নহি?

---হামরা বাস্তে নহি, বলেই আমি এমনভাবে চুপ করে রইলাম যেন আর ও-প্রসঙ্গ না ওঠে।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, যেন কি বলবে তাই ভাবছে। মনে করলাম বাঁচা গেল। কিন্তু এত সহজে কি বাঁচা যায়! আবার সে আরম্ভ করে দিলে। এবার আর হিন্দিতে না বলে আমার কথাতেই বলি। সে বললে,---দেশের কল্যাণের সঙ্গে ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই কি?

আমি বললাম,—দেশের কথায় আমার কোনই কৌতূহল নেই, আকর্ষণও নেই। আমার সঙ্গে ওসব কথা কয়ে তোমার কিছুই লাভ হবে না। মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে এবার সে বললে.—তুমি নিশ্চয়ই আমায় গোয়েন্দা মনে করেছ। আমি ত অবাক, বললাম,—তাতে কি? শুনে সে মৃদু হাসতে হাসতে বললে, ---হয়তো সেই জন্যেই তুমি আমার কাছে মনের কথা বলছ না।

—আমার মনে কোন কথাই নেই। আর যদিও কিছু থাকে, তার সঙ্গে আসলে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। একথার পর সে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন সে আমার মনের কথাটা খুঁজে বের করে নেবে। তারপর বললে, কেমন করে জানলে? আমি বললাম, তোমার আলাপ দেখে, আলাপের বিষয় দেখে, আর কি দেখে হতে পারে, তুমিই বল না।

সে বললে,—ওটা তোমার ভুল। তোমায় আমি একটু পরীক্ষা করছিলাম—যথার্থ সাধু না ভণ্ড রাজদ্রোহী তাই দেখছিলাম।

বললাম,---আমার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নেই। আমি নিজের জ্বালায় জ্বলে মরি, সেই জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি একটু শান্তির আশায়, কেমন করে জ্ঞানের আলো পাব। বাধা দিয়ে সে বললে, তাহলে তা তোমার আরও বেশী সাধু-সঙ্গ দরকার।

বললাম,---সে ত ঠিকই, নিশ্চয় দরকার---কিন্তু সে সাধু পাব কোথায়?

লোকটা একবার আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে তার পর আরও একটু কাছে এসে বসল। তার সেই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাকে যেন একেবারে অনুগত করে ফেললে। এবার সে বললে,—তুমি কি যথার্থই তা চাও? যথার্থই কি তুমি সাধনপথে এগিয়ে যেতে চাও? একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই কি তুমি এখানে এসেছ?

আমি বললাম,—আপনি কি অনুমান করেন? আপনি ত মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আমার কথাটা শুনেই সে খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেললে, তার পর আমার মুখের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—

বাবু! আজ দশ দিন আমি তোমার আসল ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সত্য বলতে কি, আমি একটু ধোঁকায় পড়েছিলাম,—কারণ তোমার নিজের মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল, সেই কারণে তোমার অন্তরের ভাব আমি কিছুতেই ঠিক ধরতে পারছিলাম না,---এই এখন সেটা পেরেছি। বল, তোমার মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল কি না? আমি স্বীকার করলাম,—এখনও চলছে।

—তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে কি নিয়ে যে তোমার দ্বন্দ্ব,—তা আমি বলে দিতে পারি। শুনে আমি জিজ্ঞাসুভাবেই তার মুখের দিকে চাইলাম।

সে নিঃসঙ্কোচেই বললে,—এই যে ঘর ছেড়ে তুমি এখানে এসে যোগের নিয়মে যেসব ক্রিয়া আরম্ভ করেছ—তা ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না এই সন্দেহ তোমার মনের তলে তলে আজ কয়েকদিন থেকে বেশী রকমেই পীড়ন করছে।

—ঠিক তাই! আপনি যখন বুঝেছেন তখন আমায় এত পরীক্ষা করলেন কেন?

ঠিক কি নিয়ে দ্বন্দ্বটা চলছে আগে তো টের পাইনি, কারণ তুমি আমায় এড়াবার ইচ্ছায় বরাবর বিরুদ্ধ ভাবেই দেখে এসেছ, তাই তোমার অন্তরের নাগাল পাইনি। এখন আমি তোমায় ধরেছি—বল, এখন আমি কি করব? তোমার মত একজন আমার চাই। তোমার কাছে আসার উদ্দেশ্যই হল তোমায় পরীক্ষা করে নিয়ে আগে তোমার জন্য কিছু করা, তার পর তোমায় আমার জন্য কিছু করবার উপযুক্তভাবে তৈরী করা। কেমন,—আমার কথা তোমার ভাল লাগছে?

এখনও কিন্তু অন্তর থেকে একে বন্ধু বলে মেনে নিতে প্রাণ চায় না;—এতটা কথার পরও সন্দেহ, বিশেষতঃ শেষের কথাটাতে একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের সঙ্কেত পেয়ে মনটা দমে গেল। সাধনরাজ্যে এসব চুক্তির কথা কেন?

মনের মধ্যে কত কথাই উঠতে লাগল,—লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে ঠায় চেয়ে রইল,—কি বুঝছে কে জানে। বোধ হল যেন মনের মধ্যে যে যে ভাব উঠছে যেন সব পড়ে নিচ্ছে।—অনেকক্ষণ পর যেন একটা নূতন কিছু পেয়েছে এমনভাবে বললে,—দেখ, তুমি যেমন আমায় ঠিক বুঝতে পারোনি, আমায় নিয়ে গোলমালে পড়েছ, আমিও ঠিক তেমনি তোমায় নিয়ে পড়েছি, আমিও তোমায় ঠিক বুঝতে পারিনি; এই বলে সে হা হা হা হা করে আমায় চমকে নিয়ে এক রকমের অনর্থক হাসি আরম্ভ করলে,— যেন একটা পাগল। তার মুখের ভাবটা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

সহ্য করতে না পেরে, যথার্থই ভয় পেয়ে বললাম, আমি আপনাকে বুঝতে পারব না,—আপনি আমার মধ্যে বড়ই উদ্বেগ আর অশান্তির সৃষ্টি করেছেন, আর কাজ নেই, আপনি দয়া করে সরে পড়ুন—তাহলেই আমি শান্তি পাব।

সে আবার হা হা হা করে সেই পৈশাচিক হাসির সঙ্গে কি অদ্ভুতভাবে চাইতে লাগল আমার দিকে। অসহ্য! সেই আঁধার আলোয় তার ঐ ভাবটি বড় ভয়ানক রকম ক্রিয়া করলে মনে। নির্বাক, নিস্পন্দ বসে রইলাম তার দিকে চেয়ে।

—আবার ভয়ও আছে দেখছি, আরে আমার শিশু— মেরে লালা, তুই এইটুকু হৃদ্‌পিন্ড নিয়ে সাধনে নেমেছিস? একটুখানি গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম দেখছিস আর ভয়ে কেঁপে মরে যাস, এই পুঁজি তোর?—এই কথাগুলি বলে আমার ডান হাতখানি নিয়ে তার দু'হাতের মধ্যে ধরে দোলাতে আরম্ভ করে দিলে।

ঐভাবে হাত ধরে দোলাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় চলে গেল, ক্রমে সাহস এল,

বুঝলাম, অন্তরে অন্তরে বিশ্বাসের সঙ্গে এই বোধ এলো—এ ব্যক্তি সাধারণ নয়, পাগল নয়, পিশাচও নয়—এই যে মূর্তি সুমুখে রয়েছেন ইনি কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ। এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত ছেড়ে দিয়ে—ঐ দেখ! বলে, পিছনে গুহার মধ্যে দেখতে ইঙ্গিত করলেন।

পিছন ফিরে দেখলাম, গুহার ভিতরে,—কিছুই বিশেষ দেখতে না পেয়ে তাঁর দিকে ফিরে দেখি,—কেউ কোথাও নেই। অথচ দুই মুহূর্ত পূর্বে কি ভয়ানক জীবন্ত ভাবের একটা প্রহসন চলছিল। অবাক হয়ে বসে রইলাম কতক্ষণ।

কি জানি এর মধ্যে এমন কি দেখলাম, চক্ষু দিয়ে দর দর ধারা বইতে সুরু করে দিলে। কি ভেবে যে এটা হল তা ভাল বুঝতে পারিনি। কেবল এই কথা মনে হতে লাগল যে, তোমার এত দয়া আমার উপর? আমি ভয় পেয়েছিলাম,—তোমার ভয়ানক মূর্তি, ভয়ানক হাসি, দেখে শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম তুমি নিজগুণে সেই ভয় থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেলে! হায় ক্ষুদ্র শক্তি আমি, এই ক্ষুদ্র শক্তি দুর্বল মন বুদ্ধি নিয়ে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মহা সত্তার সন্ধানে বেরিয়েছি! ধিক্কার এল—দুর্বল, ক্ষুদ্র অস্তিত্বের এই মহাপ্রয়াস দেখে। বামনের চাঁদে হাত! নিজেকে যত ক্ষুদ্র মনে হয়, ততই বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে চক্ষু দিয়ে তপ্ত অশ্রু ঝরতে থাকে—কেবল তাঁর ঐ দয়ার কথা ভেবে, আর উনি কত মহৎ এই অনুভব করে।

এইভাবে বহুক্ষণ হয়ত কেটেছিল, অনুমান করলাম পাশে ধুনী একেবারেই শীতল হয়ে গেছে দেখে। উঠলাম, ভিতরের গুহা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম, প্রাণের মধ্যে একটি অপার্থিব সাধনলব্ধ শক্তির অনুভূতি, তার সঙ্গে শান্তি নিয়ে। বেশ কন্‌কনে শীত, তখন কার্তিক মাস। আমার জন্ম-মাস।

একটা বড় ঘুমের পর যেমন নিত্য উঠে থাকি, উঠলাম। ঝাঁপটা সরিয়ে বাইরের গুহায় এসে আগুন জ্বালাবার উপকরণ আর শুকনো সরু চীড় বা পাইনের ডালপালা পাশেই গাদা করা আছে তাই নিয়ে আগুন করে ছোট ছোট কাঠ নিয়ে শেষে বড় কাঠ একখানা ফেলে, ঐ ধুনীর কাজ শেষ করলাম। একবার বাইরে যেতে হবে। বাইরের গুহাটা থেকে বাঁদিকে খানিকটা গিয়েছি,— সেখান থেকে মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। রোজই একবার করে আকাশের দিকে চাই, তখন কালপুরুষ দেখা যেত ঐ সময় প্রায় মাথার উপর। চেয়ে দেখি আকাশের গায়ে আজ সেই জায়গায় আর একটা মূর্তি।

কি মূর্তি? যা কখনও দেখিনি। যেন আকাশের গায়ে আঁকা! পিছনে ঘোর অন্ধকারে সে মূর্তি যেন ফুটেছে। আজ কিছুদিন ধরে ঐ সময়টা দেখতাম কালপুরুষের তারাগুলি একটু পশ্চিমে হেলেছে, তাই আজও দেখব এই ধারণায় চেয়ে দেখেছিলাম,—কিন্তু যা দেখলাম সে তারাও নয়, নক্ষত্রও নয়, এক অনির্বচনীয় মূর্তি। ভাল করে দেখতে গেলাম, অল্পক্ষণেই মিলিয়ে গেল। মূর্তি মিলিয়ে গেলেও তার রূপের রেশটা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ধরা ছিল। উজ্জ্বল নীল, আকাশ পাতাল জোড়া শরীর; মাথায় কিরীট; কানে কুণ্ডল, বুকে

হারসংযুক্ত মণি, চাঁদের মত স্নিগ্ধ জ্যোতি তার,--কোমরে উজ্জ্বল রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার ঝুলছে, তার নীচে ঝালরের মত পীতবস্ত্র। এক হাতে গদা, প্রকাণ্ড তার শেষ দিকটা। দৃষ্টি তার আমার দিকেই ছিল মনে হল।

যেই মাত্র ঐ মূর্তি মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ মূর্তি আমার চিত্ত-ক্ষেত্রের দেবমূর্তির কল্পনা, মনের সৃষ্টি। সত্য অস্তিত্ব এর নেই বা আছে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। নারায়ণ বা বিষ্ণু মূর্তির যে কল্পনামূলক অনুভূতি ছিল চিত্তের মধ্যে, তা-ই ঐ শান্তিময় অবস্থায় নির্জন আকাশের পটে দেখা দিয়েছে। এ মূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করতাম না,—করলাম শুধু এই জন্য যে, এর পর যে ব্যাপার ঘটেছিল, তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কিছু থাকতে পারে;—এই মনে করেই এ বিষয় উল্লেখ করছি।

মোটের উপর দেখছি আজ সকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে তা আমার সাধনের দিক থেকেও যেমন বিচিত্র, আর অজ্ঞাত এ মহাপুরুষের কৃপা, আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ উপলক্ষে যা যা আমার মানসক্ষেত্রে ঘটেছিল, সৌভাগ্যের দিক দিয়েও তেমনি অদ্ভুত। যাই হোক এখন ধুনীতে আরও গোটা গোটা কাঠ দুটো ফেলে দিয়ে ভিতরে গিয়ে আসনে বসেছি।

যখন গুহার ভিতরে আসনে বসতে হয়, প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার পক্ষে দরজাটা খুলে রাখাই প্রয়োজন, কারণ বদ্ধ স্থানে, যেখানে বাতাস খেলে না, সেখানে কোনরূপ যৌগিক ক্রিয়া নিষিদ্ধ। সেই জন্যই শোবার সময় ছাড়া সব সময় গুহাদ্বার খোলাই রাখতে হয়।

বেশ সুখকর স্মৃতি, আজ ভাগ্যে যা যা ঘটেছিল, শেষে আকাশের গায়ে ঐ নারায়ণ বা বিষ্ণুমূর্তি দর্শনের এক মহানন্দময় অনুভূতি নিয়ে বসেছি। ধ্যান ত সহজভাবেই রয়েছে—কাজেই কোন আরম্ভ বা উদ্দেশ্য না নিয়েই স্বাভাবিক প্রাণ-চৈতন্যের গতি অনুসরণ করে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি। এইভাবে কতকটা কাল বাহ্যশূন্য অবস্থায় কেটে গেল; হঠাৎ ধুনীর সেই অল্প আলোয় দেখছি কি? গুহার মধ্যে কে একজন আসনে বসে, নিস্পন্দ শরীর, যেন সমাধিমগ্ন। এ কি ব্যাপার?—এ যে আমারই শরীর;—আমি ত একটু আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বিষ্ণুমূর্তি দেখে,—পরে নিয়মিত আসনে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিল না, কোন ভাবে ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় ছিলাম,—এখন দেখছি ঐ অবস্থায় শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আগে এমন কখন হয়নি, এটা কি হ'ল? কেমন করে এটা যে হ'ল— কে জানে? আমার পক্ষে ত অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি একেবারে স্বপ্নের অতীত বিষয়, কখনও ওদিক কল্পনাও করিনি। এটা অহংএর খেলা ত নয়! আশ্চর্য বোধ হ'ল শরীর ইন্দ্রিয় সবই ঐখানে ঐ আসনের উপর স্থাণুবৎ পড়ে আছে,—আর আমি সেটা দেখছি এখান থেকে চক্ষু দিয়ে যেমন সব দেখা যায় ঠিক সেই রকম অথচ আমার চক্ষু-ইন্দ্রিয়-যন্ত্রটা নেই। এ কেমন করে হয়? আসল চক্ষুর তন্মাত্র হয় যে বস্তু তা ইন্দ্রিয় ব্যতীত থাকতে পারে কি? চক্ষু দিয়ে যেমন ষ্টিরিয়োস্কোপেও ছবি দেখা যায় আবার শুধু চক্ষুতেও সেই ছবি দেখা যায়—যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যখন দেখি,

তখন সেই যন্ত্রের অনুগামী হয়েই দেখি, যখন যন্ত্রসাহায্যে না দেখি তখন স্বাভাবিক দৃষ্টি। ঠিক এও তাই, যখন চক্ষু-ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি তখন তার বশেই যা কিছু দৃশ্যগোচর হয় আর যখন ব্যতিরেকে দেখি তখনই স্বভাবিক দৃষ্টি ফুটে ওঠে, তার মধ্যে যন্ত্রের প্রভাব থাকে না। যন্ত্র দিয়ে দেখলে যেটুকু দেখা যায় তার প্রভাবে আশপাশে সুমুখে বাধা থাকলে উদ্দিষ্ট বস্তু দেখা যায় না, কিন্তু এখন আত্মচৈতন্যের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখছি তার কোন বাধা নেই। ঐ গুহার ভিতর সবই দেখতে পাচ্ছি, তা ছাড়িয়ে আরও দেখতে পাচ্ছি; দৃষ্টি প্রসারিত করলে বিশাল প্রান্তর নদনদী দেশ সমুদ্র আকাশ বাতাস গ্রহনক্ষত্র সবই দেখছি, কোনই বাধা নেই।

একটা প্রবল বোধশক্তি মাত্র আছে, তা সুখ বলা যায়। শরীর যে কতটা ভার তা এখন বুঝতে পারি। বিজ্ঞানময় কোষমাত্র আমার সকল স্মৃতি, সকল অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার আধার হয়ে রয়েছে। কি আনন্দ এই দেহমুক্ত অবস্থায় তা কেমন করে বুঝাব। এক একবার যেন আনন্দের তরঙ্গ আসছে আর আমায় বিহ্বল করে দিচ্ছে। এ এক অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, পূর্বে আর কখনও হয়নি। সিদ্ধ সাধু মহাপুরুষদের এটি সর্বক্ষণ হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তাঁরা ত্রিলোকের খবর পান, ত্রিকালজ্ঞ হয়ে যান।

আরও একটি বিচিত্র ব্যাপার,—যখন রয়েছি কোন লক্ষ্যে, তখন যেন আমি সুদ্ধ দৃষ্টি ও দ্রষ্টা এক, মধ্যে যন্ত্রও নেই, শরীরও নেই—শরীর-বোধও নেই। দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মহাপ্রসারিত হয়ে পড়েছে,—যেমন লক্ষ্য বস্তু আর লক্ষ্য, যা আমা থেকে বস্তুর সঙ্গে যোগ রাখছে তা মোটেই পার্থিব দৃষ্টিও নয় বা বস্তুও নয়।

হঠাৎ মনে হ'ল আমার মৃত্যু হয়নি ত? না হলে কেমন করে বাইরে এলাম? দেহত্যাগ হয়ে গেল নাকি এই সূত্রে? সে কেমন করে হবে? আমার দেহত্যাগ, আমি জানব না। তা কি হয়? কেন হবে না! অনেকের ত হয়, যাদের অত্যন্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি, সজ্ঞানে দেহ ছাড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব বলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের মৃত্যু-মূর্চ্ছা আসে আর সেই অজ্ঞান অবস্থায়ই তারা দেহত্যাগ করে। তারপর ত আর ঢুকবার উপায় তাদের হাতে থাকে না,—তারা জড়বুদ্ধি ভোগী জীব মাত্র। আমার কেন তা হবে? না, না, না, না,—এ মৃত্যু নয়। জীবের যথার্থ দেহত্যাগের পূর্বে একটা দ্বন্দ্ব আছে, তার মৃত্যুর একটা আভাস আছে, মৃত্যুসংস্কার থেকে তার মধ্যে একটা আন্দোলন চলে কতকক্ষণ; সে সব তো কিছুই হয়নি। সকলের উপর বড় প্রমাণ আছে। এখন দেহত্যাগ যে হয়নি তার বড় প্রমাণ আমার বোধে—আমার চৈতন্য কিছুতেই এ অবস্থাকে মৃত্যু বলে স্বীকার করছে না।—আমার মৃত্যু, এ কখনও নয়। এখন বুঝেছি সেই মহাপুরুষের শক্তির প্রভাব নিশ্চয়—এটা তাঁর সিদ্ধির প্রভাব,—তিনি কৃপা করে বিদেহ মুক্তির আভাস দিয়েছেন। তাঁর বাহ্য অন্তর্দ্ধানেও তিনি আমায় ত্যাগ করেন নি।

কেমন করে বেরিয়ে এসেছি তা জানি না, কেমন করে আবার প্রবেশ করব তাও জানি না, তা সত্ত্বেও এটা মৃত্যু নয়,—কারণ আত্মচৈতন্য প্রতিবাদ করছে। যাই হোক

এখন এইসব তোলাপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক রকম গতি হতে লাগল। যেন উপর দিকে টানছে। আপন ভাবেই টান, কোন অপর শক্তির টান নয়। যেন ইচ্ছা হল আমি ঊর্দ্ধলোকেরই বস্তু, গতি আমার ঐ দিকেই। এর মধ্যেও সংস্কারের কাজ কিছু আছে কি না তা জানি না, তবে আমার নিজের দিক থেকে বেশ অনুভব হচ্ছিল যে, আমি যখন এখানকার, বা এ রাজ্যের বিষয় বস্তু নয়, তখন কেন এখানে রয়েছি। এখানে কারা থাকে? যারা স্থূল, অহং-সর্বস্ব, যারা পঙ্কিল, যারা কর্মবিপাকগ্রস্ত—ভোগ-সর্বস্ব, দেহত্যাগ হলেও তারাই এখানে থাকে। যাদের ভোগায়তন খসেছে, তারা এখানে কেন থাকবে? থাকতে পারেই না,—দুঃসহ এখানে থাকা। এইসব যুক্তি, আমার মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে ভেসে উঠেছে বটে, কিন্তু আমি ত একটুও নড়বার নাম করছি না! অন্তরে একটা আনন্দ ত আছেই, গতি যদি হয় তাও সেই আনন্দেরই গতি হবে, কিন্তু কেন 'আমি' এখান থেকে নড়ছি না,—কি হল?

হায় রে কপাল! ঢেঁকি যে স্বর্গে গেলেও সে ধান ভানা ছাড়া আর কি ভাবতে পারে? কেন নড়তে পারছি না, একটু অনুসন্ধিৎসু হতেই বুঝলাম যে, ঐ যে দেহটি ওখানে রয়েছে,—তাকে ফেলে যে যেতে চাই না। মমতা দেহত্যাগেও যায় না, এইটিই দেখাতে এতটা তোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হ'ল, আর এ ক্ষেত্রে যে আমার দেহত্যাগ হয়নি এইটিই প্রমাণ হয়ে গেল,—কারণ তা যদি হ'ত তা হলে ঊর্দ্ধগতিতে আপনিই ভেসে যেতাম। আসল কথাটা এই যে, যদি দেহ থেকে বেরিয়ে এসে অবস্থান্তরে গতি হয়, দেহটা যে অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল, কে রক্ষা করবে? লোকে দেখলে ত্যক্ত দেহ মনে করে মাটিতে পুঁতে দেবে, না হয় পুড়িয়ে দেবে। দেহটা রক্ষা করবে এমন ত ব্যবস্থা করে আসিনি? কেমন করে আসব? আগে কি জানতাম বা প্রস্তুত হতে পেরেছিলাম? যখন বুঝলাম ঐ দেহটার জন্যই ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়েছে, দেহটা যে কত বড় বন্ধন এখনই তা প্রত্যক্ষ করলাম। একটা যেন বিষাদ এসে পড়ল; ঠিক বলতে গেলে যেন একটা বিষণ্ণ ভাবের হাওয়া,—ফাগুন মাসের রাত্রের শেষে ভোরের দিকে গায়ে লাগে আর গা-টা শির শির ক'রে ওঠে সেই রকম। যেন অশান্তির প্রবাহ একটা বয়ে গেল আমার মনবুদ্ধির উপর দিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঊর্দ্ধগতি অনুভূত হ'ল, যেন অন্ধকার রাতের পর অরুণোদয় হল। আঃ কি আনন্দ, গম্ভীর পরিপূর্ণ আত্মপ্রসার। কেমন করে প্রকাশ করব তা জানিনি, সাধ্যও নেই।

ঊর্দ্ধগতি শুনে কেউ যেন না মনে করেন যে, উপর অর্থাৎ আকাশের দিকে গতি। মোটেই তা নয়। ঊর্দ্ধগতির সহজ অর্থ এখানে বুঝতে হবে চৈতন্য-সত্তার প্রসার। সে কেমন? এই যে আমি, এই বোধ যেন গলে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে গেল—তার মধ্যে কোন দিকের ব্যাপার নেই। এ ছাড়া অন্যভাবে বুঝানো এই অল্প ভাষাতে সম্ভব নয়। আমি আর খণ্ড সত্তা নয়—আমি বিশাল, যেন সকল বাস্তব ছাড়িয়ে এক মহা আনন্দময় অস্তিত্বে পরিপূর্ণ। পূর্ণ জ্ঞান আর আনন্দ হ'ল একমাত্র অনুভূতির বিষয়-মাত্র-আনন্দই সম্বল। প্রবাহময় সে আনন্দ। ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন সমুদ্রে অনেক দূর থেকে এসে তীরে

মিলিয়ে যায় তেমনি অনন্ত আনন্দের রাজ্য থেকে আনন্দের ঢেউ, একটার পর একটা নিরবচ্ছিন্ন এসে আমাতে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার বর্ণনা নেই, কারণ ভাষা নেই।

এইভাবে সেই ব্যাপক অবস্থায়, আনন্দের সমুদ্রে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মহানন্দ উপভোগের পরই আবার সেই পূর্বাবস্থায় এসে পড়লাম। ঐ যে আমার দেহটি রয়েছে—আমি দেখছি। একটা বিষাদের শীতল তরঙ্গ আবার যেন আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। আবার পরক্ষণেই সেই আত্মচৈতন্যের বিস্তার। আনন্দের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আমাতে মিলিয়ে যাচ্ছে দেশ কালের ব্যবধান পেরিয়ে। তারপরে আবার সঙ্কুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় এসে পড়া, ঐ আমার দেহ! এ রকমই চলছিল। তার পরই—

একটা যেন গোলমাল বেধে গেল, ঐ দেহটি নিয়ে। স্থূল দেহটি ছেড়ে আত্মচৈতন্য একেবারে উধাও হতে চাইছে না। কি হবে আমার দেহের গতি যদি আর আমি দেহের মধ্যে ফিরে যেতে না পারি? অথচ এদিকে আত্ম-চৈতন্যও প্রসারমুখী হয়ে রয়েছে,—এই ভাবের অবস্থা যখন তখন আর একটা কিছু হ'ল। যা হ'ল তা কোন বাস্তব ঘটনা নয়, তাকে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হবে, যেমন মাছ ধরতে ছিপ ফেলে বসে ফাৎনার দিকে দেখতে দেখতে দেখা যায়, যখন মাছে ঠোকরায় তখন ফাৎনাটা ওঠে নামে, তারপর চোঁ করে ডুবে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়—এ ঠিক সেই রকম হ'ল। আমার চৈতন্য, অর্থাৎ আমি—এই বোধ, এই আমার দেহ আর এই আমি, সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাপক সত্তা এই বোধ হতে ঐ ডুবে-যাওয়া ফাৎনার মতই ঘোর একটা অন্ধকারের মধ্যে যেন একেবারে ডুবে গেলাম, জ্ঞান, চৈতন্য, কোন প্রকার বোধ রইল না।

পরে যখন এই অবস্থার কথা চিন্তা করেছি, তখন যেন মনে হয়েছে, ঐ যে প্রগাঢ় অন্ধকার, আলোর অভাবে যে অন্ধকার অনুভব করি, অন্ধকারটা সে রকম নয়। চৈতন্যের প্রসার যখন হয়েছিল, তখন যেমন আমি চৈতন্যময় সত্তা এই বোধ প্রসারিত হয়ে চৈতন্যের দীপ্তিময় একটা বিরাট রূপ অনুভব করেছিলাম, এ যেন ঠিক তার বিপরীত রকমেরই একটা আমি-বোধের অভাব বা শূন্যতা, তাকেই অন্ধকার বলছি, যদিও সে সময়ে প্রথমটা সে অবস্থায় অন্ধকার বোধই হয়েছিল। আরও সহজ করে বললে একথা বলতে হয় যে, প্রথমে যেটা অন্ধকার অনুভূত হয়েছিল পরে সেটাই আত্মজ্ঞান বা অস্তি বা আমি আছি এই বোধের অভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন প্রথম অনুভবের যে অন্ধকার, এই আমি-বোধশূন্য ভাবের আভাস, সে অন্ধকার বড় চমৎকার।

তার পরেই মনে হ'ল যেন আমি আছি,—সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে। সে কিন্তু ভয়ের অন্ধকার নয়, ওতপ্রোত ব্যাপক অস্তিত্বের অভাবগত আঁধার। এক একবার দেখছি যেন আমি অন্ধকারের মধ্যে, আবার একবার দেখছি আমিই চৈতন্যময় বিরাট সত্তা। আর কিছুই নেই— সেখানে কল্পনা নেই, সংস্কার নেই, কোন শব্দ নেই, গন্ধ নেই, আছে আমায় স্পর্শ করে এক যেন সীমাহীন বিরাট অস্তিত্বের আভাস, তাই-ই সেটা অন্ধকার। এই অবস্থার আর কোন ভাষা নেই বলেই অন্ধকার বলছি,—কিন্তু এখানে আমরা অন্ধকার বলতে

যা মনে করি তা নয়, নয়, নয়। সে বড় মহান, পবিত্র ও সত্যই তার অস্তিত্ব,—কি বলব সেই অন্ধকারের তুলনায় আমাদের জাগ্রত অবস্থার যে সূর্য আর আলো তা মিথ্যা। যখন ভাষায় আর কিছুতেই বোঝাতে পারছি না,—তখন তার পরের কথাটা বলি।

কতক্ষণ ঐ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন অন্ধকার হয়েই ছিলাম আচ্ছন্নের মত, তারপর একটা শব্দময় অবস্থায় এলাম। এলাম না বলে জেগে উঠলাম বললেই ঠিক হয়। যেন জাগরণের মতই অবস্থা হ'ল, অসংখ্য ধ্বনির সমষ্টি যেন আমি, একান্তই ঐ শব্দ বা ধ্বনি অনুভব করছি 'কানে শোনার মত নয়' যেন শব্দময় অস্তিত্ব আমার হয়ে গেছে এখন। অদ্ভুত সে ধ্বনি, গম্ভীর, শত শত শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মেঘের গর্জন মিশালে যেমন শোনায় সেই ধরণের শব্দ—তার অন্য উপমা নেই। এটা যেন বিরাট বিশ্বের আবর্তন-শব্দ, দেশকালের অতীত এইসব অনুভব যতই প্রত্যক্ষ ততই গভীর, ভুলবার নয়। সেই অবস্থায় এই অস্তিত্ব নিয়ে আরও কতো কি অনুভব করেছি না-করেছি সে কথায় আর কাজ নেই। কেমন করে ফিরে এলাম সেই কথাই বলছি এবার।

যেমন ভাবে অন্ধকারে ডুবেছিলাম, ঠিক তেমনি ভাবেই কতক্ষণ পর যেন হঠাৎ দিব্য ভেসে উঠলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমার দেহ! যেন কোন্ মহানন্দময় একটি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম স্মৃতিময় অনুভূতির রেশ নিয়ে। ও কি? সেই মহাপুরুষ আমার শরীরের কাছেই একখানা আসনে উপবিষ্ট। চৈতন্যের মধ্যে তখন একটা প্রবল আলোড়ন চলতে লাগল ঐ দেহ অধিকার করতে: আমার দেহের মধ্যে যেতে চাই আর ঐ মহাত্মার সঙ্গ করতে চাই। উনি অতি আপন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চমক,— দেখি, এখন দেহের মধ্যে এসেছি। চক্ষু মেলে দেখি মহাপুরুষ মৃদু মৃদু হাসছেন আমার দিকে লক্ষ্য করে,—তাঁর মধ্যে যেন জগৎভরা রহস্য। বুঝলাম, এইসব তাঁরই শক্তির খেলা।—এই দেহাত্মবোধের রাজ্যে, যেখানে রোগী, ভোগী, কর্মী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী নির্বিচারে দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে ভোগের কামনায় হাবুডুবু খাচ্ছে—তিনি আমার অসহায় অজ্ঞান অবস্থা দেখে কৃপা করে দেখিয়ে দিলেন যে, দেহমুক্ত অবস্থা কি, আর ঐ দেহই আমি-সত্তার কত বড় একটা বন্ধন।

এখন এই অবস্থার কথা বাবা মুক্তিনাথকে জানাবার একটা প্রবল আগ্রহ হ'ল। সেই মহাত্মাকে ঐ গুহায় রেখেই তার পরেই আমি কলকাতায় ফিরে আসি একবার। বাবা মুক্তিনাথের সঙ্গে দেখা করে সকল কথাই বললাম। তিনি বললেন,— তোমার মধ্যে কতকাল থেকে ঐ সাধু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের জীবন কি রকম, তারা কেমন থাকে, কেমন করে তাদের ক্রিয়াকর্ম চলে এইসব শুধু দেখা শোনা নয়—বিশেষত এই গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে তফাৎটা কোথায়, এইসব ঠিকমত বুঝবার জন্য প্রাণ তোমার ছটফট করছিল তাই তোমার বাইরে যাবার এতটা আগ্রহ। এখন সেটা এইরকমে কিছুকাল থেকেই বেশ ধারণা হয়েছে কিন্তু তোমার ঘুরপাক খাবার অতীব প্রবল মোহ যে একটা আছে—তার ফলে এখন আর ঘরে থাকা মুস্কিল তোমার পক্ষে বুঝতেই পারছ, আবার বাইরে যেতে হবে,

আর শীঘ্রই হবে। কেবল ঐ খবরগুলি আমার গোচরে আনবার জন্যই তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসা; — নয় কি?

মনে মনে বুঝলাম সত্য কথাটাই বলেছেন। কোন কথা না বলে চুপচাপ বসেই আছি. অবশ্য ঠিক একেবারেই বসে নেই. ভিতরে কাজ ঠিকই চলছে। তিনি আবার বলছেন,— দেখ, তুমি মূর্তি দেখ তো,—একটা বিশেষ লক্ষ্য ক'রো দিকে,—যখন ঐ মূর্তি মিলিয়ে যাবে তার পরই স্মৃতিতে কি ভাবে ধরা থাকে, কতক্ষণ স্পষ্ট থাকে লক্ষ্য ক'রো। যদি দেখ যে স্মৃতিতে কোন দাগ নেই, ঠিক সেই রূপ কিছুতেই মনে আনতে পার না তাহলে বুঝবে তুমি সাকারের দলে নও।

আমি বললাম. আর্ট স্কুলে যখন ছিলাম তখন মেমারী ড্রইং অভ্যাস ছিল, সেইজন্য প্রায়ই কোন মূর্তি আঁকলে মেমারীতে রাখতে পারি। তিনি হেসে বললেন, এ তোমার স্টাডি করা মূর্তি নয় যে স্মৃতিতে থাকবে, এগুলি যোগ-বিভূতির বিষয়, এ মূর্তির ঐশ্বর্য্য স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। দৈবমূর্তি ঠিক ঠিক স্মৃতিতে ধরে রাখাও সহজ কথা নয়। তবুও যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে বিশেষ সাকার ভাবেই তোমার সিদ্ধি। একটু থেমে আবার বললেন. সাধনের অবস্থায় যে সকল দেব-দেবী মূর্তি দেখা যায় তা তো রক্ত মাংসে গড়া মূর্তি নয় যে স্মৃতিতে ধরা যাবে। ঐ বিভূতির মূর্তি তুমি আঁকতে চেষ্টা করেছিলে? আমি বললাম, যা চিত্তের মধ্যে দেখি তা এমনই বিশাল. এমনই ব্যাপক, তা কাগজে রংয়ে ধরা সম্ভব নয়। তিনি যেন একটু কৌতূহলী হয়েই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর কি বৈশিষ্ট্য তার বল তো? আমি বললাম, তার ব্যাক্‌গ্রাউন্ড নেই, সমস্ত ক্ষেত্রটাই ভরা। তিনি বললেন, ঠিক ঠিক, সত্যই তোমার দেখার বৈশিষ্ট্য একটা আছে। বাইরের কারো সঙ্গে আলোচনা ক'রো না। এসব যে দেখে তারই, আর কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই তার। সেইজন্য আলোচনাও বিফল। তুমি তো এটা জানো, তোমায় না বললেও চলে কিন্তু ঐ যে বিষ্ণুপদ, জান তো? ও প্রথম প্রথম একটু বেশী একাগ্র হয়ে কাজ করেছিল, কিছু পেয়েও ছিল। মহা উৎসাহে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জাঁক ক'রে আলোচনা করতে শুরু করে দিলে, ফলে ঐ পর্যন্ত হয়েই ঠেকে গেল, আর অগ্রগতি নেই। তারপর এখন বছরখানেক হল নিত্য-নৈমিত্তিক এসে খোসামোদ করছে, খাবার আনছে. কাপড় আনছে,—কত কি সব করছে। বলে—আমায় আবার একটু এগিয়ে দিন। হাতিকে হাতের ঠেলা দিয়ে সরানো যায় কি? ও একটা হাতির সামিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ বিষ্টুই তো আমায় এনেছিল? তার আগেই কি ঐ সব ব্যাপার? তিনি বললেন. হাঁ, তার আগেই যা কিছু হবার সব হয়ে চুকে গিয়েছে,—এখন টেনেটুনে চলছে; আসল গতিবেগ বন্ধ;—ঐ অবধিই তার হয়ে গেল—

একটু দুঃখ পেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম. ঐ সামান্য একটু বহির্মুখী হয়েছিল বলেই ওর আর কিছু হবে না, এ ত বড় ভয়ানক কথা. —

তিনি বললেন, তা আমি কি করব? ওর যদি দ্রুত ওঠবার শক্তি না থাকে. খানিকটা এগিয়ে আর না চলতে পারে, আমি কি তাকে টেনে টেনে নিয়ে যাব?

আমি বললাম, তা না হলে গুরু কি? আপনি ওকে সাহায্য করবেন না আবশ্যক হলে? তিনি বসে ছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন, এবং বললেন, সাহায্য করাটা চলতে পারে আর সেটাই করা উচিত, সত্য—কিন্তু, তার সব কিছু সম্পূর্ণ করিয়ে আগাগোড়া ঠেলে তুলে দেওয়া তা আমারই হোক বা আর একজনের শক্তিতে হোক, তার কোন অর্থ হয়? এটা বুঝতে পারছ না, তুমি তার পঙ্গুত্ব কামনা করছ?

—তা বুঝেছি কিন্তু এইটুকুই বুঝতে পারছি না যে একবার একটু স্খলন হয়েছে বলেই তার আর উর্দ্ধগতি হবে না, একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল সারাপথ, এটা ঠিক বিচার কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার বিচার? শুনবামাত্রই বলতে যাচ্ছিলাম, আপনারই,—কিন্তু ঠিক যেন একটা বিদ্যুতের আঘাত পেলাম এবং তৎক্ষণাৎ সংযত হলাম, বুঝলাম জীব ও প্রকৃতি বা ঈশ্বরের খেলা চলছে তাতে গুরু এক মধবর্তী অংশ বা যন্ত্রমাত্র। তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির বিধি নিয়মই বলবৎ। যেই সংযত হলাম অমনি তিনি বুঝলেন সূত্রটি ঠিক ধরতে পেরেছি;—তখন বললেন,— দেখ, ছোট একটা স্খলনেই সব শেষ হয় না, যদি সে পাত্র নিজ ভ্রম বুঝে সামলে আবার শক্ত হয়ে ঠিকমত চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। আমায় সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, এমনকি তার যদি সত্য সত্যই অগ্রসর হবার মত বল না থাকে তাহলে আমাকেও ছেড়ে দিতে হবে তাকে, আমি অপাত্রে কেন শক্তি নষ্ট করব? অধ্যাত্ম বিধাতার এইই বিধান। যত লোক আসে সবাই কি সিদ্ধ হয়, সবাই কি পায় ইষ্টকে যারা ইষ্টের ইঙ্গিত বোঝে না?

আমি স্থির হয়ে গেলাম, মনের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ে গেল,—তখন তিনি আবার বললেন,— দেখ, তুমি নিজের অবস্থাটাই এর সঙ্গে জড়িয়ে তত্ত্বটা যে কি তাই জানতে চাইছিলে, অর্থাৎ তোমারও যদি ঐ রকম অবস্থা হয় তাহলে কি হবে? এটা তোমার গোপন মনের কথা, তুমি হয়তো স্পষ্ট এটি ধরতে পারনি, কিন্তু আমি তো জানি। এখন তুমি বুঝেছ, যাও বাবা, নিজের পথে নিজের তালে চল। তুমি শক্ত আছ জানি, খানিক সামলে চলতে পারবে,—তারপর আপনিই বুঝতে পারবে তোমার গতি কতদূর,—তারপর যা করতে হবে তা কাকেও বলে দিতে হবে না। তুমি আবার তো বেরিয়ে পড়বে;—সেই তালেই আছ? তা যাও;—কলকাতায় এলে খবর দিও যদি থাকি।

বুঝলাম বিদায় দেওয়া হচ্ছে;—আমি কিছুক্ষণ আরও ছিলাম যদি গুহ্য সাধনের তত্ত্ব উপদেশ পাই আর ভবিষ্যতে জটিলতার সৃষ্টি যাতে না হয়, সাবধান হতে। চক্ষের ওপর বন্ধু বিষ্ণুপদের যে ত্রুটি দেখলাম ও শুনলাম এর পরও যদি কারো চৈতন্য না হয় তাহলে আর কাকে দোষ দেওয়া যাবে?

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আসবার সময় পথেই ঠিক করলাম কোথায় যাব, বাড়িতে তো কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।—একখানা ছবি মদনের কাছে অল্পমূল্যে বিক্রয় করে সেই রাত্রেই প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদে যাত্রা করলাম,—সেখানেও বেশীদিন থাকতে পারলাম না। বাড়িতে রটেছে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি।

মেসোমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন,— একি সব শুনছি? বললাম, আমি যে সন্ন্যাসী হইনি তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তবে কিছুদিন বাইরেই থাকব স্থির করেছি। আমি দীক্ষা নিয়েছি,—আরও কিছুদিন সাধন ভজন করব তার পর আবার ঘরেই যাব। তিনি কি বুঝলেন তা জানি না, তবে সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ মাসিমার কাছে শুনলাম, তিনি বলেন, ঘরে বসে কি সাধন ভজন হয় না, এই তো আমরা করছি, আমরাও তো দীক্ষা নিয়েছি,—তাতে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে তো হয়নি। আমি বললাম, এই তো তোমরা মাঝে মাঝে দুমাস আড়াই মাস বাইরে চলে যাও।—মাসিমা বললেন, সে তো তীর্থধর্ম করতে। আমি বললাম, আমিও তাই তীর্থধর্ম করে আসব কিছুদিন! যাই হোক তখন থেকে পাঁচ ছয় বৎসর কাল উত্তর ভারতে, হিমালয়ের নানা তীর্থে পর্যটনে কেটেছে,— শেষের কিছুকাল কোন মহাপুরুষের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনেই আসন করে বসে যথার্থই ইষ্টলাভ করে যখন গার্হস্থ্যজীবনে ফিরে এলাম তখন ইউরোপের প্রথম মহাসমর শেষ হয়ে এসেছে।*

* লেখকের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

মানা-শৃঙ্গে (২৩,৮৬২)

(প্রথম ভারতীয় আরোহণ)

প্রাণেশ চক্রবর্তী

যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়। তাদের কোনটি ত্রিভুজাকৃতি, কোনটি গোল, আবার কোনটি বা ছুঁচলো। একটির সঙ্গে আরেকটির কোন সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্তপলাশী রঙ্ ঠিক্‌রে পড়েছে ঐ সব ধ্যানগম্ভীর তুষারধবল শিখরে। মনে হচ্ছে, কে বা কারা যেন লাল আবির লেপে দিয়েছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ পাসাং ফুতারের ডাকে সম্বিত ফিরে আসে—সাব, আভি চলিয়ে।

আজ আমরা দু'টি দল মানা শিখরের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে চলেছি। নিমাইদা, ছুঞ্জে আর আঙ নিমা চলে গেছে উত্তর-পূর্বের গিরিশিরার দিকে। আর আমরা চলেছি উত্তর পশ্চিমে। সোজাসুজি শিখরের পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব।

আমরা দু'টি দড়িতে চলেছি। একটিতে পাসাং ফুতার আর আমি। অপরটিতে পাসাং শেরিং ও লাকপা।

পাসাং ফুতার সবচেয়ে হুঁশিয়ার শেরপা। তাই সে আগে আগে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপেই তুষার গাঁইতি দিয়ে বরফ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে। নিঃসন্দেহ হলে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক জায়গায় বেশ কয়েকটা বড় বড় ফাটল পার হতে হল। এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। রোদের তেজ যত বাড়বে, এগুলি তত বেশি চওড়া হবে। পাসাং শেরিং লাল নিশান পুঁতে জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে রাখল।

সত্যি কথা বলতে কি, আপাতদৃষ্টিতে বেসিনটাকে যতখানি নিরাপদ ভেবেছিলাম আসলে তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। এর অনেক জায়গাতেই নিচে একেবারে ফাঁপা। ওপরে শুধু একটা পাতলা বরফের আস্তরণ। খালি চোখে বোঝা শক্ত। পা ফেলার আগে বরফ যাচাই করে না নিলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

বেসিনের প্রান্তভাগের বরফ অপেক্ষাকৃত কঠিন। এখানে আগাগোড়া প্রায় জুতোর ডগা দিয়ে 'কিক্' করে করে এগোতে হল। মাঝে মাঝে দু'চারটে ধাপও কাটতে হল।

দীর্ঘ তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় আমরা মানার পদপ্রান্তে হাজির হলাম। দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার পথচলা শুরু হল। একটু এগোতেই এক বিরাট গভীর খাদ। তার পশ্চিমপারে ভাঙাচোরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাঁই। সমুদ্র-ঢেউ-এর মত দেখাচ্ছে। বটের ঝুড়ির মত অজস্র সরু সরু বরফের মালা ঝুলছে তার গা থেকে। আর সেগুলি থেকে ফোঁটা করে জল চুইয়ে পড়ছে। রৌদ্রকিরণে কিন্তু ওদের ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। .....

১৮ই সেপ্টেম্বর। শিবিরে বসে প্রাতঃরাশ সারছিলাম। শেরপা আঙরিতা একটু আগে এনামেলের থালায় করে দু'খানা চামড়ার মত শক্ত পরোটা, খানিকটা মেটে ভাজা, পর্ক

ও লঙ্কার চাটনি দিয়ে গেছে। সহসা চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল। মনে হল অনেকগুলি কামান যেন একসঙ্গে গর্জে উঠল। তার তীব্র ধ্বনি চারিপাশের তুষারশুভ্র গিরিগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ বাতাস ব্যাকুল করে তুলল। তা হলে কি সুন্দরী মানার গা থেকে ভয়ঙ্কর তুষার ধস্ ভেঙে পড়ল?

তাপস ভট্টাচার্য ও তিনজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল নেতা এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁরা মানার ভয়াবহ উত্তর-পশ্চিম গাত্রের ঠিক নিচে একটি শিখর-শিবির প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্থির হয়েছে, আবহাওয়া ভাল থাকলে আজ ঐ শিবির থেকে তাঁরা চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

আগে অবশ্য এ ধরনের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ঠিক ছিল—পঞ্চম শিবির থেকেই শিখরাভিযান করা হবে। সেইভাবে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল। তুষারপাত সমস্ত পরিকল্পনাকে পাল্টে দিল। তিনদিন ধরে অবিরাম তুষারঝঞ্ঝা ও তুষারপাতের ফলে আমাদের অমানুষিক শ্রম দিয়ে গড়া পথ তুষারে চাপা পড়ে গেছে। পঞ্চম শিবির ও মানার উত্তর-গাত্রের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত প্রান্তরে মানুষ-সমান উঁচু নরম তুষার জমেছে। অক্সিজেনের স্বল্পতাহেতু যেখানে উঠতে-বসতে ফুসফুসের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, সেখানে তুষারকাদা ভেঙে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ অবাস্তব ও অসম্ভব। তাই ওঁরা কাল ঐ বিপজ্জনক পথটুকু অতিক্রম করে শীর্ষারোহণ শিবির এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যাতে শিখরাভিযানের দিন অভিযাত্রীরা অযথা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়েন।

প্রাতঃরাশের থালাটা তাঁবুর ছোট্ট দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিই। তাড়াতাড়ি 'ক্যাম্পস্' পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। পাসাং শেরিং, আঙরিতা আর ছুঞ্জেও হাতের কাজকর্ম ফেলে বাইরে ছুটে এসেছে। তাদের চোখেমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। তা হলে কি আমার অনুমান মিথ্যে নয়? সবাই তাকিয়ে আছে সামনে—যেদিকে ঐ মহাপ্রলয় ঘটে গেছে। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। একহাত দূরের জিনিসও নজরে আসছে না। সুন্দরী মানা কুয়াশার ওড়নায় তার মুখখানি লুকিয়ে রেখেছে।

আমাদের কি কর্তব্য? শীর্ষারোহণ শিবিরের সহযাত্রীরা কেমন আছেন? গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে। আমরা এগিয়ে যাব কি?

শেরপারা যেমন নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে। আমি একা দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর সামনে। ভাবতে থাকি সহযাত্রীদের কথা। আর ঐ অজানা তুষার ধসের কথা।

তুষার ধসের কবলে পড়ে বহু পর্বতাভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে জার্মান পর্বতাভিযাত্রীদের বিখ্যাত নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬২০ ফুট) অভিযানের কথা। গভীর রাত্রিতে অভিযাত্রীরা যখন তাঁবুর ভেতরে ঘুমে অচেতন, হঠাৎ পর্বতশৃঙ্গের বিস্তৃত এলাকা তাঁবুর ওপরে ভেঙে পড়ল। পরে বরফের স্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকারীরা বহু কষ্টে নিহত অভিযাত্রীদের হিমশীতল দেহ খুঁজে বার করেন।

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। দূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শেরপারা বেরিয়ে আসে বাইরে। আমরা উৎকর্ণ। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করি। যদি আর একবার শব্দটা শুনতে পাই। পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কেউ আমাদের ডাকছে--পা—সা—ঙ...প্রা—ণে—শ—সা---ব।

আমরা অধীর আগ্রহে শব্দটা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তারা আরো কি যেন বলছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না।

তবে কি আমার অনুমান সত্য? সত্যিই কি ওদের কোন বিপদ হয়েছে? ওরা কি তুষার ধসের কবলে পড়েছে?

অজানা আশঙ্কায় বুকটা কাঁপতে থাকে। আজ ছ'দিন হল আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পঞ্চম শিবিরে রয়েছি। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নিচের শিবিরে নেমে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ। দড়ি লাগিয়ে ধাপ কেটে আরোহণ-অবরোহণের জন্য যে নিরাপদ পথ তৈরি করা হয়েছিল, তা তুষারপাতে চাপা পড়ে গেছে। আলগা নরম তুষার জমে সে পথ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সুতরাং নিচে নামতে হলে এখন জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

আবার সেই শব্দ। এবারে আরো স্পষ্ট। কিন্তু আমি চমকে উঠি। এ যে করুণ আর্তচিৎকার! মৃত্যুপথযাত্রীর আকুল আহ্বান কি?

আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শেরপাদের এগিয়ে যেতে বলি। আমি ওদের অনুসরণ করি।

কুয়াশাচ্ছন্ন পথ। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত অব্যাহত। বাতাসের বেগও বেড়েছে। আমরা তুষারকাদা ভেঙে অগ্রসর হচ্ছি। জানি না কখন ওদের সঙ্গে দেখা হবে। জানি না ওরা কেমন আছে। এলোমেলো নানা দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়ছি। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।

চমকে উঠি। ছায়ার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। মানুষ কি? হ্যাঁ, তাই তো? মানুষ। আমার সহযাত্রী। কে? পাসাং ফুতার? কিন্তু সে একা কেন? আর সকলে কোথায়? আমার দেহের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভাবলাম ছুটে এগিয়ে যাই তার কাছে। জিজ্ঞেস করি সঙ্গীদের কথা। কিন্তু পারলুম না। না জানি কি শুনতে হবে!

ধীরে ধীরে পাসাং কাছে আসে। একদিনের ভেতর সে যেন শুকিয়ে গেছে। তাকে বড় বেশি রুগ্ন ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। জিজ্ঞেস করি—কি খবর পাসাং?

কোন জবাব দেয় না সে। বোধ করি পারে না। অস্ফুটস্বরে শুধু বলে—জল, একটু জল।

আমরা ফিরে আসি তাঁবুতে। পাসাং শুয়ে পড়ে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর। আমি তাকে জল এনে দিলুম। এক চুমুকে মগের জল নিঃশেষ করে সে আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে। তবে কি আর কেউ নেই?

না, না, তা হতে পারে না। পাসাং একটু সুস্থ হলে নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু কখন বলবে? কি বলবে? আমার মন মানছে না। আমার বুকের ভেতর তোলপাড় করছে—ওরা কোথায়? আমাদের নেতা বিশ্বদেব বিশ্বাস, সহযাত্রী তাপস ভট্টাচার্য। আর প্রিয় শেরপা শেরিং লাকপা ও গ্যালজেন।

কিন্তু কে সে প্রশ্নের জবাব দেবে? পাসাং ফুতার যে ঘুমিয়ে পড়ল! আমি একবার তাঁবুতে আসছি, একবার বাইরে বেরুচ্ছি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু কেউ আসে না, আসে না আমার সহযাত্রীরা। তা হলে নিশ্চয়ই মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি কি করব? কোথায় যাব? আমি যে একা!

মনে হচ্ছে মানুষের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকি। হ্যাঁ, শব্দটা বাড়ছে। ক্যাঁচ, ক্যাঁচ। নরম বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আসার শব্দ। এবারে দেখাও যাচ্ছে কয়েকটি বিন্দু। অদূরেই। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেদিকে ছুটে চলি। হ্যাঁ এসেছে। ওরা ফিরেছে।

—বিশ্বদেবদা, তাপসদা, শেরিং লাকপা আর গ্যালজেন। তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁরা এগিয়ে আসছেন।

কিছুক্ষণ পরে। গরম কফির মগে চুমুক দিতে দিতে শুনি ওদের কথা। বলেন বিশ্বদেবদা আর তাপসদা। বলেন তুষার ধসের কাহিনী। জাগ্রত যৌবনের স্বপ্নকে নিষ্ফল করার জন্য ছলনাময়ী মানা আঘাত হেনেছিল। শীর্ষারোহণ-শিবিরের উপর একটি তুষারধস্ নামিয়ে দিয়েছিল। সে আমাদের শক্তি পরীক্ষা করেছে। আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

বিশ্বদেবদা বলেন—গতকাল শিবির প্রতিষ্ঠার পরে আমরা সকলেই তাঁবুতে বসে চা খাচ্ছি আর শিখরের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হল শিখর যেন হাতের মুঠোয়। অকস্মাৎ গোধূলির ম্লান আলোতে একটি তুষার ধস্ ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে ধস্ তাঁবুকে স্পর্শ করতে পারে নি। উত্তর-গাত্রের ঠিক নিচেই গভীর খাদে পড়ে তা নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাবধানের মার নেই ভেবে আমরা কাল সারারাতই বসে বসে কাটিয়েছি। আশেপাশে কোথাও তুষার ধসের শব্দ শুনলেই ছুটে বেরিয়ে পড়েছি আত্মরক্ষার জন্য। এই ভাবে আমাদের রাত কেটেছে।

—রাত পোহালো। আমরা তখন তাঁবুতে। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শেরপারা চা তৈরি করছে। তাপস ক্লাইম্বিং সু পরছে। আমি ক্যামেরা নিয়েছি, আর ঠিক তখনই তাঁবুর ঠিক পাশে সমুদ্র গর্জনের মত বিপুল শব্দে ভেঙে পড়ল তুষার ধস্। আমরা হতবাক্, বিহ্বল, বিমূঢ়। ভগ্নতুষারস্তূপ খান খান করে ভেঙে আছড়ে পড়ছে তাঁবুর ওপর। মনে হল আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে পৃথিবী মুছে যাচ্ছে।

—শেরপাদের চিৎপার করে ডাকলাম। সাড়া নেই। ছিটকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। তাপসও কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে এল। তুষারচাপা পড়ল তাঁবু। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারকণা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

—তারপর কতগুলি চরম মুহূর্ত কেটেছে। আমার বুকে চোট লেগেছে। ওরাও সকলে তখন অল্পবিস্তর আঘাতে দিশেহারা। শেরপারা তুষারস্তূপের ভেতর থেকে মালপত্র বের করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তার জন্য আমাদের কোন ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ শুধু, মানার তুষারধবল শিখরে নতজানু হয়ে আমরা তাকে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারলাম না।

পাশেই বসেছিল গ্যালজেন। অত্যন্ত আমুদে ও অদ্ভুত প্রকৃতির এই মানুষটি এতক্ষণ একটি কথাও বলে দিন। সে-ও দুর্ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে তা একটুও বোঝার উপায় নেই। চুপচাপ বসে বসে সে সিগারেট টানছিল। সে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। বাংলা সে একদম বলতে পারে না, বোঝেও না। কিন্তু যেই না বিশ্বদেবদা থামলেন, অমনি সে ফস্ করে হাসতে হাসতে বলে উঠল—সাব হিমল মে এ্যাইসা হামেশা হোতা হ্যায়। ঘাবড়াও মৎ। দোসরা দিন ফির্ মওকা মিল যায়েগা।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে কথাগুলো বলেই সে আবার সিগারেটে মনোনিবেশ করে। তার এই নির্বিকার ভাব দেখে বিস্মিত হই।

তাপসদাও হাসতে হাসতে বলেন—ব্যাটা একেবারে বদ্ধ পাগল। ধস্ নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করছি, ও তখন তাঁবুতে বসে বসে স্টোভে পাম্প করছে। অনেক চিৎকার করে ডেকেও ওকে কিছুতেই বের করতে পারলাম না। অবশেষে তাঁবু যখন চাপা পড়বার উপক্রম তখন দেখি গর্ত থেকে শেয়াল বেরুনোর মত খাবলা খাবলা করে তুষার সরিয়ে বাবু পা দু'টি বের করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানিস, তাবু থেকে ও যখন বেরিয়ে এলো, তখনও ওর হাতের মুঠোয় সেই কেত্‌লি। আমরা তখন ভীষণ ক্লান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। ও কিন্তু ভস্ ভস্ শব্দ তুলে তুষারকাদা ভেঙে এগিয়ে এল কাছে। তারপর একগাল হেসে কেত্‌লিটা উপুড় করে বলে—গির গিয়া সাব। এক মিনিট টাইম মিলনেসে হম্ পুরা চায়ে নিকাল কে লে আনে সক্তা। ....

আজ সোমবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর। ঠিক একমাস হল আমরা কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। উন্মত্ত ঝড়, প্রমত্ত হিমপ্লাবন, নিষ্ঠুর তুষারপাত আমাদের অগ্রগতিকে যদি ব্যাহত না করত, তা হলে আমরা এতদিনে মানা আরোহণ করে এগিয়ে যেতে পারতাম কামেটের দিকে। কিন্তু বিধি বাম। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আমরা এক প্রবল নৈরাশ্যের মধ্যে দিনযাপন করছি। কবে যে এই দুর্যোগ কাটবে কে জানে!

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ শেরিং লাকপার ডাকে সম্বিত ফিরে পাই--গুড মর্নিং সাব...

—গুড মর্নিং সাব...

—গুড মর্নিং লাকপা।

—টি সাব...

শেরিং লাকপা হাত বাড়িয়ে চা দেয়। আমি মগ হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করি—আজ আবহাওয়া কেমন লাকপা?

—ভাল। খুব ভাল।

—আমি বিস্মিত। কিছুক্ষণ আগেও তো তুষার পড়ছিল। এরই মধ্যে কি করে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল! শেরিং লাকপা বোধহয় আমার সঙ্গে রসিকতা করছে। আমি তাকে বলি—ঠিক বলছ, না-কি...

—ঠিকই বলছি সাব। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আর এক মুহূর্তও তাঁবুর মধ্যে বসে থাকতে পারছি না। তাড়াতাড়ি কোনমতে 'ক্যাম্পসু' পায়ে লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম!

সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! রহস্যময়ী মানা তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে নিয়েছে। সে সূর্যালোকে হাসছে। আশপাশের গগনচুম্বী শ্বেতশুভ্র শিখরগুলির মাথায় মুঠো মুঠো সোনা। হিমালয় যেন নব সাজে নব রাগে উদ্ভাসিত। এ দৃশ্য আমি বহু দিন দেখি নি।

হঠাৎ কেন জানি মনে হল, এরকম সুন্দর ঝকঝকে দিন আমরা ভবিষ্যতে আর না-ও পেতে পারি। তা হলে যে আমাদের এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আজ একবার শিখর আরোহণের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

কিন্তু নেতা কি রাজি হবেন? তিনি কি অনুমতি দেবেন শিখরে যাবার? নিরবিচ্ছিন্ন তুষারপাতের পরে চারিদিক নরম তুষারে ঢেকে গেছে। এর মধ্যে নূতন করে পথের হদিশ করে শীর্ষারোহণ করা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ। তা ছাড়া রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নরম তুষার গলবে। স্বাভাবিকভাবেই চলার গতি ব্যাহত হবে। সর্বোপরি তুষারপাতের পরে ধস্ নামার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এসব কথা চিন্তা করে বিশ্বদেবদা যদি শিখর আরোহণের প্রস্তাব অনুমোদন না করেন?

তবু কেন জানি আমার জেদ চেপে যায়। যেমন করে হোক তাঁকে রাজি করাতেই হবে! উত্তেজনায় আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকে, এ সুযোগ আমাদের কিছুতেই হারানো চলবে না।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দুরু দুরু কম্পমান বক্ষে আমি তাঁবুতে এসে ঢুকি। তারপর কোন দ্বিধা না রেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে নেতাকে আমি সরাসরি শিখর আরোহণের প্রস্তাব দিই। বলি—আজ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়!

বিশ্বদেবদা রুকস্যাকে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। আমার কথা শুনে উঠে বসেন। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে।

চারিদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। হাতঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস তাঁবুর ওপর আছড়ে পড়ছে। আমি চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বিশ্বদেবদার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। কঠিন চরম মুহূর্ত।

—আমার কোন আপত্তি নেই। ধীর, স্থির, শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলেন বিশ্বদেবদা—তবে, কোনমতেই ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

—সে তো নিশ্চয়ই! আমি আনন্দে আর কোন কথা বলতে পারি না।

মুহূর্তের মধ্যে এত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ ভাবতেই পারি না!

বিশ্বদেবদা বলেন—নূতন করে রাস্তা খুলে 'সামিট' করা খুব শক্ত হবে প্রাণেশ! একদিনে অতখানি রাস্তা কভার করা...

—জানি বিশ্বদেবদা...তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি!...

—দেখো! বিশ্বদেবদা অস্ফুটস্বরে বলেন।

—কে কে যাবে আমার সঙ্গে?

—পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা আর পাসাং শেরিং।

সকাল ৮-৩৫ মিঃ। অবশেষে এল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণ। যাত্রা হল শুরু। আমরা আমাদের কামনা-বাসনার সুখ-দুঃখের স্বপ্ন-শিখরের দিকে এগিয়ে চললাম। পাসাং ফুতার আর আমি একটি দড়িতে। অপরটিতে শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং।

ইতিপূর্বে যে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তা তুষারপাতে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। তাই বিশ্বদেবদা আগেই নিমা থনডুপ, সোনা, ফু তেনজিং ও আঙরিতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওরা চারজন রাস্তা খুলতে খুলতে 'কল' পর্যন্ত যাবে। শুরুতেই রাস্তা খোলার কাজে যাতে আমরা পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়ি।

অত্যন্ত কাঁচা বরফ। বারে বারেই পা ঢুকে যাচ্ছে। তুষার গাঁইতি যাচ্ছে তলিয়ে। বেশ হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলতে হচ্ছে। আশেপাশের চোরা ফাটলগুলো আজ খুব বেশি নজরে পড়ছে না। পাতলা বরফের আস্তরণে সম্ভবত ঢাকা পড়ে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই। তুষার গাঁইতি দিয়ে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে পা ফেলছি। পাসাং ফুতার বিপজ্জনক স্থানগুলোতে বিলে করছে, কারণ ভুলক্রমে পা যদি সামান্য এদিক-ওদিক পড়ে তা হলে আর রক্ষে নেই। পতন অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর-গাত্রের খাড়াই পথে রাশি রাশি নরম তুষার জমে রয়েছে। আমরা তারই মধ্য দিয়ে বুটের ডগা দিয়ে 'কিক' করে করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাল তাল তুষার পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। আর উপর থেকে সর্ সর্ শব্দে স্তূপীকৃত আলগা তুষার সেই জায়গা দখল করছে। ফলে আমরা ভারসাম্য রাখতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম বরফের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা নরম তুষারকণা জুতো এবং পোশাকের ভেতরে ঢুকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করল। অকস্মাৎ হিমশীতল জলে পড়ে যাওয়ার মত আমরা প্রাণভয়ে সেই তুষার-সমুদ্রে সাঁতরাতে থাকি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম আমরা একই জায়গায় রয়েছি। এক পা-ও সামনে এগোতে পারি নি। অথচ ত্রিশ-বত্রিশ ফুট ওপরে উঠতে পারলেই ফিকসড রোপ পেয়ে যেতাম। দড়ি ধরে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে আরোহণ করতে পারতাম।

ঠিক করা হল, আগে আমাদের মধ্যে দু'জন কষ্টেসৃষ্টে উপরে উঠে যাক। তারা সেখানে পৌঁছে ফিকসড রোপের সঙ্গে আর খানিকটা দড়ি জুড়ে নিচে ঝুলিয়ে দেবে। তারপর আমরা সেই দড়ি ধরে উঠে যাব। তা হলেই আর এই তুষারকাদা ভাঙ্গার হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

নিমা থনডুপ আর শেরিং লাকপা বহু কসরৎ করে উপরে উঠে দেখল ফিকসড রোপ নেই। তারা রাশি রাশি আলগা নরম তুষার সরিয়ে দড়িটাকে খুঁজে বের করার জন্য গোটা অঞ্চল তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই দড়ি বের করতে পারল না।

আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। নূতন করে আবার যদি দড়ি লাগাতে হয়, তা হলেই হয়েছে।

হঠাৎ নিমা থনডুপ চিৎকার করে উঠল—পাওয়া গেছে।...পাওয়া গেছে।

অবশেষে সেই দড়ির সাহায্যে আমরা যখন মানার কাঁধে উঠে এলাম তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। প্রবল ঠাণ্ডায় আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এসেছে। ধুপপুক করে প্রচণ্ড বেগে হৃৎপিণ্ডটা কাঁপছে। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মনে হল, আমি বোধহয় আর যেতে পারব না।

নিমা থনডুপ, সোনা, ফু তেনজিং এবং আঙরিতা ফিরে গেল। যাবার সময় নিমা থনডুপ হাসতে হাসতে বলল—জরুর 'টপ্' চলনা চাহিয়ে।

কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। কি কঠিন পরিশ্রম করে ওরা আমাদের পথ তৈরি করে দিয়ে গেল। শিখরের এত কাছাকাছি এসেও ওরা আজ ফিরে যাচ্ছে! একবারও তার জন্য কেউ আক্ষেপ করল না!

বেশ খাড়াই খানিকটা পাথুরে অংশ। অনবরত বাতাসের ধাক্কা লাগে বলে এখানে বোধহয় তুষার জমতে পারে না। তার পরেই রয়েছে কঠিন বরফে আবৃত অংশ। রৌদ্রকিরণের জন্য সেখান থেকে নীলাভ দ্যুতি ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

শৈলারোহণ পর্বটা বেশ আস্থার সঙ্গে সারলাম। দড়ি লাগানোই ছিল। তার ওপরে পাসাং ফুতার বেশ শক্ত 'বিলে' দিল। ফলে এই পথটুকু পার হতে বিশেষ বেগ পেলাম না।

এবারে শুরু হল কঠিন আরোহণের পালা। নাক বরাবর উঠে গেছে মসৃণ দেওয়াল। তুষার গাঁইতির সাহায্যে ধাপ তৈরি করে সেই সমস্ত ধাপে পা রেখে রেখে অতি সন্তর্পণে উঠতে থাকি। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে 'বিলে' করি, যাতে কেউ পড়ে না যায়, উঠতে পারে আস্থার সঙ্গে।

কঠিন বরফের ওপর ক্র্যাম্পনের আঘাত লেগে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। পাসাং ফুতার উঠছে। মাঝে মাঝেই সে তুষার গাঁইতি দিয়ে ধাপ কাটছে। তার ঠুং ঠুং শব্দ ভেসে আসছে। বেশ মিষ্টি লাগছে শুনতে। আমি একটু একটু করে ঘুড়ির লাটাই থেকে সুতো ছাড়ার মত দড়ি ছেড়ে চলি।

হঠাৎ একটা ফাশ করে আওয়াজ হল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে যাই। সর্বনাশ, এটা পদস্খলনের আওয়াজ। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে আসে। হৃৎপিণ্ডটা দ্বিগুণ বেগে ধক্ ধক্ করে ওঠে। আমি কালবিলম্ব না করে মাথা নিচু করলাম। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে তুষার গাঁইতিটাকে বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রাখলাম। নির্ঘাৎ পতন থেকে যেমন করেই হোক্ পাসাং ফুতারকে রক্ষা করতে হবে। আমি কোমরে দড়ির টান অনুভব করার জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করি।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। লক্ষ্য করলাম, আমরা যে যেখানে ছিলাম, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আমি উপরের দিকে তাকালাম। না, কিছু দেখছি না তো। সব ঠিক আছে। তা হলে ওটা কিসের শব্দ? নিচ থেকে ওদের কেউ আবার পড়ে যায় নি তো!

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিচের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম। দেখি, পাসাং শেরিং আর শেরিং লাকপা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। শরীর গরম রাখার জন্য তারা মাঝে মাঝে বরফে পা ঘষছে। আর তাতেই ঐ বিশ্রী শব্দটা হচ্ছে।

কোমরের দড়িতে হঠাৎ টান পড়ে। ভেসে আসে পাসাং ফুতারের কণ্ঠস্বর—আইয়ে প্রাণেশ সাব।

আমি আবার আরোহণ শুরু করি। আমার পেছনে পেছনে পাসাং শেরিং আর শেরিং লাকপাও উঠে আসছে। পাসাং ফুতার উপর থেকে 'বিলে' করে আমাকে।

ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেল। আমরা উঠছি তো উঠছিই। পথের যেন আর শেষ নেই। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। পা দুটো আর আমাকে বইছে না। আঙুলগুলো নিঃসাড় হয়ে গেছে। নাকের ডগা অসম্ভব জ্বালা করছে। কপালের দু'পাশে রগ টন্ টন্ করছে। আমি বোধহয় এখনই মুখ থুবড়ে এখানে পড়ে যাব।

এখান থেকে মানার চূড়া আর কত দূরে? উপরের দিকে তাকালাম। কিন্তু দৃষ্টি ব্যাহত হল। আড়াআড়ি প্রকাণ্ড উঁচু মোটা একটা ভাঁজ রয়েছে, তার জন্য উপরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে কামেটের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। সামনে কোন বাধা নেই। সুতরাং কামেটকে দেখে অন্ততঃ কিছুটা আঁচ করা যাবে আমরা কতদূর উঠেছি।

কিন্তু কামেটের দিকে তাকাতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কামেট মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। উত্তরে বাতাসের তাড়া খেয়ে সারা আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কালো কুৎসিত এই মেঘগুলো আর একটু পরেই এক জায়গায় হবে। তারপর শুরু হবে তুষারপাত।

আমার ধারণা অমূলক নয়। শুরুতে ঝড়ো বাতাসের যে দাপট ছিল তা সহসা বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই মেঘ চিরে চিরে পড়তে লাগল তুষারকণা।

এই অভাবনীয় তুষারপাতের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কাজেই দিশেহারা হয়ে পড়ি। চারিদিক ঘষা কাঁচের মত ঝাপসা—এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে

না। আমরা উঠব কি নেমে যাব স্থির করতে পারলাম না। একটা প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাসাং ফুতার বেশ খানিকটা উপরে, যেখানে ফিকসড রোপ শেষ হয়েছে। সে চিৎকার করে বলল—তোমরা উঠে এসো। এখানে দাঁড়াবার জায়গা আছে।

অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে অতি কষ্টে উঠে এলাম। শেরিং আর লাকপাও উঠে এল। তারপর চারজন জড়াজড়ি করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুষারে শাদা হয়ে গেল। এমন কি নাকের ডগায়, দাড়ির ফাঁকে পর্যন্ত তুষারকণা জমে উঠেছে।

তাপমাত্রা নিশ্চয়ই হু হু করে নামছে। আমরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। মনে হচ্ছে হাড়ের উপর কেউ করাত চালাচ্ছে।

নানা অজানা আশঙ্কায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির কেন এই রুদ্ররোষ? মনে পড়ে, পাঁচ বছর আগেও ছলনাময়ী মানা ঠিক এমনিভাবেই পরম সমাদরে অভিযাত্রীদের কাছে টেনে নিয়ে অকস্মাৎ নির্মম কৌতুকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এবারেও কি তারই পুনরাবৃত্তি হবে? অ-ধরা মানা কি কিছুতেই ধরা দেবে না? হতাশার কালকূট পান করে এবারেও কি আমাদের ফিরে যেতে হবে? হিমালয়-নন্দিনী মানার যে দুর্জয় শিখর-চূড়ায় ইতিপূর্বে মানুষ একবার মাত্র পৌঁছতে পেরেছিল, সেখানে কি মানময়ী মানা দ্বিতীয়বার আর কাউকে যেতে দিতে নারাজ? এবারেও কি দূর থেকে শুধু মানার ভয়ঙ্কর সুন্দররূপ দেখেই ফিরে যাব আমরা?

কিন্তু এভাবে এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকাও কি খুব নিরাপদ? আজ সারাদিন সারারাত ধরে যদি এই তুষারপাত চলে তা হলে আমরা কি করব? এখানে দাঁড়িয়ে থাকব কী?

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমরা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। উপরে বা নিচে, যেখানেই আমরা যাবার চেষ্টা করি না কেন, মৃত্যুকে এড়ানো বড়ই কঠিন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সেই একই পরিণতি হবে।

সুতরাং মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন ভেবে আর কোন লাভ নেই। তা ছাড়া পাহাড়ে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক—একথা জেনেশুনেই তো আমরা পাহাড়ে এসেছি! এখন যেটা ভাবতে হবে তা হল এখানে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর জন্য আমরা অপেক্ষা করব, না, যতটা সম্ভব এগিয়ে যাব?

সামনে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যদি মৃত্যু হয়, হবে।

কিন্তু শেরপারা কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে এগিয়ে যেতে রাজি হবে? ওরা তিনজন বিবাহিত, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওদের সুখের সংসার আছে। আছে ওদের স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ। পাসাং শেরিং তো মাত্র ক'মাস আগে বিয়ে করেছে, ক'দিন আগেও ওর চিঠি এসেছে দার্জিলিং থেকে। আমি নিজে সেই চিঠি পড়ে শুনিয়েছি। জবানী লিখে দিয়েছি। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভীষণ ভালবাসে।

—প্রাণেশ সাব, কি করবে? পাসাং ফুতার হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে।

—তোমরা যা ভাল মনে কর তাই হবে।

—এ অবস্থায় কি তুমি ওপরে যেতে চাও?

—আমার কোন মতামত নেই পাসাং ফুতার!

এর পরেই সে নিজেদের ভাষায় শেরিং লাকপা আর পাসাং শেরিং-এর সঙ্গে কি যেন আলোচনা করল। তারপর বলল—এতখানি পথ এসে আমাদের কারোরই ফিরে যেতে মন চাইছে না। তোমার কি ইচ্ছে? বলেই পাসাং ফুতার এক টানে চোখের গগলসটা খুলে ফেলে আমার দিকে তাকাল। আমি দেখলাম তার গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ভরা দু'খানি চোখ। হেসে বলি—আমারও তাই ইচ্ছে।

আবার শুরু হল পথ চলা। একই মন্ত্রে দীক্ষিত আমরা এক মন এক প্রাণ চারটি মানুষ নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাই সামনে। পাসাং ফুতার যথারীতি আগে আগে চলেছে। তার অসীম ধৈর্য, গভীর নিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস ও অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে আমি বিস্মিত।

সূচীভেদ্য তুষারপাত সমানে চলেছে। আশেপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে সে ঠিক এগিয়ে চলেছে। বিপজ্জনক জায়গায় আগে থাকতে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে আমাদের।

প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। জিভটা বারে বারেই গলার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি বোধহয় শেষরক্ষা করতে পারব না।

পাসাং শেরিংকে ডেকে ওয়াটার বটলটা দিতে বললাম। একটু জল না খেতে পারলে আমি আর এক পা-ও চলতে পারব না।

শুনে সে নিঃশব্দে হাসল কেবল। আমার কথার কোন গুরুত্বই দিল না। ভীষণ রাগ হল আমার। তৃষ্ণার্তকে যে জল দিতে কার্পণ্য করে, তার মত পাষণ্ড খুব কমই আছে।

—কি হল পাসাং? আমি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলি।

—ওয়াটার বটল তো নিচে ছেড়ে এসেছি।

—সে কি?

—বড্ড ভারি যে! শুধু শুধু বয়ে লাভ কি? হাসতে হাসতে বলে পাসাং শেরিং।

—তার মানে? ভারি বলে ওয়াটার বটল ছেড়ে দিয়ে এলে? আমাকে বললে না কেন? আমি বইতে পারতাম।

—প্রাণেশ সাব, তুমি মিছিমিছি রেগে যাচ্ছ। ওতে জল থাকলে তো! জল যে জমে বরফ হয়ে গেছে।

তাই তো! আমি শুধু শুধু ওর ওপর রেগে গিয়েছি! কিন্তু এখন উপায়? তৃষ্ণায় যে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! চারিদিকে রাশি রাশি শ্বেতশুভ্র বরফ। কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক ফোঁটা জল নেই কোথাও!

এক ঘণ্টা হয়ে গেল আমরা সমানে উঠে চলেছি। উত্তুঙ্গ খাড়া চড়াই। আমরা যথাসম্ভব এঁকে বেঁকে উঠছি। তাতে বেশি পথ চলতে হচ্ছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট লাগছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে একবার চূড়াটাকে খুঁজলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না।

বোধহয় পথের বাইরে কোথাও আল্‌গা বরফে পা দিতেই, মুখ গুঁজে পড়ে যাচ্ছিলাম। টেনে হিঁচড়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম। ধরল পাসাং ফুতারও। বিলের দড়িটা শক্ত হাতে ধরে সে আমাকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করল।

দেহের পোশাকগুলো নিয়ে হয়েছে এক যন্ত্রণা। আণ্ডারঅয়্যার, উলেন ড্রয়ার, ক্লাইম্বিং ট্রাউজার, উইণ্ড প্রুফ ট্রাউজার ছাড়াও পায়ে দুই প্রস্থ মোজা, অতিকায় বিশাল ক্লাইম্বিং বুট, ক্র্যাম্পন এবং তার নিচে একদলা আটকে থাকা বরফ আমার সারা শরীরে এক অসহনীয় বোঝায় পরিণত হয়েছে। এর পরেও আছে মাথায় বালাক্লাভা, চোখে চশমা, গায়ে গেঞ্জি, উলেন ভেস্ট জামা, পুরু সোয়েটার, উইণ্ড প্রুফ জ্যাকেট, ফেদার কোট। হাতে দু'জোড়া দস্তানা। এগুলোর ভারও কম নয়। বরফে ভিজে ভিজে ওজন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে অসুবিধা করছে ক্যামেরাটা। উইণ্ড প্রুফ জ্যাকেটের বুক পকেটে ওটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত ঢল ঢল করছে। মনে হচ্ছে একটা একটা করে এগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে খানিকটা ভার লাঘব হত। কিন্তু উপায় নেই। ভারবাহী হয়েই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে ওদের সঙ্গে।

হাঁটুতে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিন্ ঝিন্ করছে। পায়ের তলায়, হাঁটুতে, পেটে, দেহের কোষে কোষে সুতীব্র যন্ত্রণা। গালে, নাকে, কপালে, দেহের অনাবৃত অংশে বরফের শীতল স্পর্শে সির সির করছে। এখন যদি আমার শ্রান্তক্লান্ত দেহটা চিরদিনের মত এখানে লুটিয়ে পড়ে, তা হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

হঠাৎ শুরু হল তীব্র বাতাস। কুচি কুচি বরফ উড়ে এসে চোখেমুখে আছড়ে পড়ল। মনে হল রাশি রাশি হিম শীতল সূচ বিঁধছে—চোখে, মুখে, কানে, নাকে, ঠোঁটের ডগায়, দেহের প্রতিটি অনাবৃত অংশে। উপায়ান্তর না দেখে আমরা আত্মরক্ষার জন্য ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়ি। অসহ্য অসহনীয় এই আক্রমণ।

বাতাস যখন থামল, তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে। আকাশ প্রায় পরিষ্কার। মেঘগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে ও নিচে দেখি। কিন্তু সোজা উপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম ছলনাময়ী রহস্যময়ী মানাকে। একেবারে আমাদের হাতের কাছে। আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি।

ছুরির ফলার মত অপ্রশস্ত শিরা। কাঁচের মত স্বচ্ছ কঠিন তার বরফ। তুষার গাঁইতি দিয়ে ধাপ কেটে, কখনও বা বুটের ডগা দিয়ে আঘাত করে করে আমরা এগিয়ে যাই। এক একটি পদক্ষেপ নিতে দু'মিনিট, তিন মিনিট কি তারও বেশি লাগছে। মাথার ওপর দিয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ দ্রুত আনাগোনা করছে। মানার শ্বেতশুভ্র গায়ে তার ছায়া পড়ছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিচিত্র সুন্দর এই আলো-আঁধারের খেলা, অনেকটা সিনেমার দৃশ্যপট পরিবর্তনের মত।

পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে। দু'পাশে অতল গহ্বর। উত্তর গাত্রের নিচে, বহুনিচে দেখা যাচ্ছে পূর্বি কামেট হিমবাহ। সরু শাদা একখণ্ড সুতোর মত। দক্ষিণ দিকে বাঙ্কে (Bankund gal) হিমবাহ। প্রায় চারহাজার ফুটের ঢল নেমেছে। এখানে বেশ ঘন কুয়াশা জমে আছে। আরো দূরে, বহু দূরে ধূসর বর্ণের একটি উপত্যকা। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ওই পথ ধরেই এসেছিলেন। দক্ষিণ গাত্র দিয়ে তিনি আরোহণ করেছিলেন মানা শিখরে।

এখানকার বরফ কঠিনতর। সহজে ক্র্যাম্পন ধরতে চায় না। বার কয়েক ধাপ কাটতে গিয়ে হাত ফসকে তুষার গাঁইতি ছিটকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল।

অবশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে টলতে টলতে অর্ধমৃত অবস্থায় আমরা চারটি মানুষ মানার শীর্ষদেশে এসে পৌঁছলাম। আমার ঘড়িতে এখন পাঁচটা বেজে তিন মিনিট। পাসাং ফুতারের ঘড়িতে পাঁচটা পাঁচ আর শেরিং লাকপার ঘড়িতে পাঁচটা বেজে এগার মিনিট। প্রকৃত সময় যা-ই হোক না কেন, এখানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহের সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে গেছে। এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছে মন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, আর আমাদের ওপরে উঠতে হবে না। স্বপ্নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। উত্তেজনায় আমার সারা দেহ কাঁপছে। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর উৎকণ্ঠার অবসান হল। আমাদের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সার্থক হয়েছে সতীর্থদের দুঃসহ ক্লেশভোগ। শৃঙ্গ আরোহণের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। এমন সুখকর স্মৃতি, মধুময় মুহূর্ত আর আসে নি আমার জীবনে।

প্রচণ্ড বেগে হিমশীতল ঝড়ো বাতাস বইছে। বরফের কুচি মেশানো এই বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দায় হল। বারে বারেই দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে। পঙ্গু করে দিচ্ছে দেহের শক্তি। গর্বোন্নত মানা—মানময়ী মানার এই আস্ফালন দুঃসহ। বেদনাদায়ক।

ফেদার কোটের হুডটাকে মাথার ওপর টেনে দিই। অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাই শিখরদেশ, বেশ চওড়া—ত্রিভুজাকৃতি। দশ বারো জন লোক অনায়াসে এখানে দাঁড়াতে পারে। মাঝখানের কয়েক ফুট জায়গা ছাড়া চারিপাশের, বিশেষ করে, উত্তর গাত্রের দিকের বরফ খুব মজবুত নয়। কার্নিশের মত পাতলা বরফের আচ্ছাদন ঝুলছে। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই আমরা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি।

এখন এখানে প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যমান। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। শীর্ষদেশে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা ও পর্বত অভিযাত্রী সংঘের পতাকা উড়িয়ে দিলাম। পাসাং ফুতার দস্তানা খুলে খালি হাতে ক্যামেরার সাটার টিপতে থাকে।

ইত্যবসরে আমরা প্রাথমিক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানগুলো সেরে ফেলি। মদনদা আমাকে একখানা কালীর ফটো দিয়েছিলেন। আর আমার নিজের রয়েছে হরপার্বতীর ফটো। একটা ছোট্ট পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে ফটো দু'খানা পুরে শীর্ষদেশে ছোট্ট একটি গর্ত খুঁড়ে ফটো দু'খানি সেখানে রেখে দিই। তারপর কাজুবাদাম, কিসমিস, আপেল, চকোলেট দিয়ে

করজোড়ে প্রণতি জানাই। প্রণতি জানাই সেই সর্বশক্তিমানকে, যাঁর আশীর্বাদ ভিন্ন এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং নেপালী প্রথামত তিনখানি স্কার্ফ দিয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে শিখর দেবীকে প্রণতি জানায়, স্মরণ করে ভগবান তথাগতকে।

মনে পড়ছে বন্ধুদের কথা। নিমাইদা, মদনদা, ধ্রুবদা, দিলীপদা, প্রদ্যোৎদা, তাপসদা, দীপক, সুজন, শিবশঙ্করদা, নারায়ণের কথা। মনে পড়ছে বিশ্বদেবদাকে, লকুল, শেরপা ও কুলীদের। আজকের সাফল্য তাঁদের চরম আত্মত্যাগ ও আন্তরিক নিষ্ঠার ফসল। তাঁদের কাঁধে পা দিয়েই আমরা আজ মানাশীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বহু জানা আর অজানা শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ, প্রীতি আর শুভেচ্ছা বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

দেখতে দেখতে দশমিনিট কেটে যায়। পাসাং ফুতার ফিরে যাবার জন্য তাড়া লাগায়। এখনই যদি রওনা হওয়া না যায়, তা হলে কিছুতেই সন্ধ্যের আগে আমরা শিবিরে ফিরতে পারব না। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলব। সারারাত মৃত্যু-শীতল দুর্গম শিখর শিরার উপর বসে থাকতে হবে। হয়তো সে কালরাত্রির আর কোনদিন অবসান হবে না।

কিন্তু এখন রওনা হলেও কি আমরা দিনের আলো থাকতে থাকতে শিবিরে পৌঁছতে পারব? সন্ধ্যে হতে আর বড়জোর ঘণ্টা দু'য়েক বাকি। দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই দুস্তর পথ পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবু কেন যেন আমি মোটেই বিচলিত হই না। অভিযান সফল হয়েছে। এখন ধীরে-সুস্থে ফিরলেই চলবে। তাতে যা হবার হবে।

তাই আমি ধপ্ করে বসে পড়ি। শরীরে যে আর কিছু নেই। একটুও দাঁড়াতে পারছি না। খালি পেট। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডায় আমার পা অবশ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা দুটো কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। ভিজে মোজা জোড়া পাল্টে নিতে পারলে ভাল হতো, অসাড় ভাবটা কেটে যেত। আমি জুতো খুলতে উদ্যত হই। কিন্তু পারি না। সামনের অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি ভুলে যাই স্থান, কাল, পাত্রের কথা। ভুলে যাই আপন সত্তা।

অদূরে পূর্ব দিকে অনামীশৃঙ্গ আর দেওবনকে বড় মোহময় দেখাচ্ছে। পাশাপাশি অন্তরঙ্গ দুই সখী। পাতলা কুয়াশার ওড়নায় মুখ ঢেকে কম্পিত বক্ষে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে আমাদের—মাটির মানুষদের। সহসা কোন সঙ্কেত পেয়ে যেন ওরা সহজ হল, মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নিল ওড়নাখানি। তার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন খসে পড়ল গলায়। দেখতে পেলাম লাজুক নম্র মুখ দুখানি। যেন সদ্যস্নাতা শীকরসিক্ত দু'টি হিমালয় দুহিতা। আর একটু দূরে দক্ষিণ দিকে মন্দির পর্বত। আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে সেও অসীম কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করছে আমাদের।

একেবারে চোখের সামনে—দৃষ্টি রোধ করে দৃপ্তময় কামেট—পাশে ডান দিকে অন্যতম

পার্শ্বচর আবিগামিন। বাঁ দিকে শ্বেতশুভ্র মুকুটপর্বত-হীরের মুকুট মাথায় দিয়ে সম্রাটের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেঘ নয়, যেন মুক্ত বিহঙ্গ। চপলমতি বালখিল্যদের মত ভাসতে ভাসতে ওরা যাচ্ছে কামেট, আবিগামিন, মুকুট পর্বতের কাছে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাড়া খেয়ে লুকিয়ে পড়ছে দিগন্ত বিস্তৃত শ্বেতশুভ্র পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। ওরা উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখে। তারপর যথারীতি আবার ছুটে বেরিয়ে আসে। আড়াল করে দেয় সবকিছু। এ এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা!

কামেট আর আবিগামিনের মাঝখান দিয়ে সুদূর উত্তরে দৃষ্টি মেলে ধরি। নীলাকাশে মেঘের পরে মেঘের প্রাসাদ। নিচে ধূসর বর্ণের তিব্বত উপত্যকা। অস্পষ্ট। সীমাহীন দিগন্তে আকাশের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। অনুপম সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করি সে সাধ্য আমার নেই। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

"...On a mountain-top time's sands are grains of pure gold ;...I remember clearly but one detail in all that enormous landscape, the plateau of Tibet. I saw it to the east of the Ibi Gamin, a yellow strand laid beyond the Himalayan snows, shadowed here and there with glowing clouds poised in a profound blue ocean like a fleet of white-sailed frigates. For the rest there were clouds and mountains ; clouds alight above, blue caverned below over the deeper blue of valleys, citadels of impermeable vapour spanning the distant foothills, and mountains innumerable-snow-mountains, rock-mountains, mountains serene and mountains uneasy with fanged, ragged crests, beautiful mountains and terrible mountains, from the ranges of Nepal to the snows of Badrinath and the far blue ridges of Kulu and Lahoul."

চারিদিকে অদ্ভুত নিশ্চিন্ত মহান এক শান্তিময় নীরবতা। এ নীরবতার সঙ্গে কবরখানা কিংবা শহরতলীর কোন গ্রামের নীরবতার সাদৃশ্য নেই। এ সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ধরনের নীরবতা। একমাত্র জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আত্মোপলব্ধির দ্বারাই এই নীরবতার স্বর্গীয় শান্তি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। সীমাহীন আকাশের বুকে শাশ্বত শান্তিকে বিনষ্ট করে পাসাং ফুতার বলে ওঠে—ফিরে চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

আমি লজ্জিত হই। সত্যিই, এভাবে অহেতুক দেরি করার কোন মানেই হয় না। ফিরতে যখন হবেই তখন তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল। সামনে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ।

মানাকে চুম্বন করে, সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করে আমরা নামতে শুরু করি। আজ আর কোন দুঃখ নেই, আমার মন-প্রাণ তৃপ্ত, চোখ সার্থক—'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।'*

লেখকের 'মানসী মানা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

হিমালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ, স্বামী

আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্বামীজী নিমন্ত্রিত হয়ে হিমালয়ের আলমোড়া শহরে যান। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হতে তাঁকে হিন্দীতে একটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ

আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে-স্বপনে যে-ভূমির বিষয় ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি। এই সেই পবিত্র ভূমি, ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু ব্যক্তি জীবন-সন্ধ্যায় যেখানে আসিয়া 'শেষ অধ্যায়' সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হন। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, গভীর গহ্বরে, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল--যে-তত্ত্বগুলির কণামাত্র বৈদেশিকগণের নিকট হইতেও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এবং যেগুলিকে যোগ্যতম বিচারকগণ অতুলনীয় বলিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি—অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি এবং তোমরা সকলেই জানো, আমি এখানে বাস করিবার জন্য কতবারই না চেষ্টা করিয়াছি, আর যদিও উপযুক্ত সময় না আসায় এবং আমার কর্ম থাকায় আমি এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি আমার প্রাণের বাসনা—ঋষিগণের প্রাচীন বাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইব। বন্ধুগণ, সম্ভবতঃ পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও বিফল-মনোরথ হইব, নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে অজ্ঞাতভাবে থাকা হয়তো আমার ঘটিবে না, কিন্তু আমি অকপটভাবে প্রার্থনা ও আশা করি, শুধু তাহাই নহে, একরূপ বিশ্বাসও করি যে, জগতের অন্য কোথাও নয়, এইখানেই আমার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিবে।

এই পবিত্রভূমির অধিবাসিগণ, পাশ্চাত্যদেশে আমার সামান্য কার্যের জন্য তোমরা কৃপা করিয়া আমার যে প্রশংসা করিয়াছ, সেই জন্য তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার মন—কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের কার্য-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছে না। যতই এই শৈলরাজের শিখরগুলি পর পর নয়নগোচর হইতে লাগিল, ততই আমার কর্মপ্রবৃত্তি—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমার মাথায় যে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা যেন শান্ত হইয়া আসিল, এবং আমি কি করিয়াছি, ভবিষ্যতেই বা আমার কি করিবার সঙ্কল্প আছে, ঐ-সকল বিষয়ের আলোচনায় না গিয়া এখন আমার মন-হিমালয় অনন্তকাল ধরিয়া যে এক সনাতন সত্য শিক্ষা দিতেছে, যে

এক সত্য এই স্থানের হাওয়াতে পর্যন্ত খেলিতেছে, ইহার-নদীসমূহের বেগশীল আবর্তে আমি যে এক তত্ত্বের অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছি—সেই ত্যাগের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—এই জগতে সকল জিনিসই ভয়-যুক্ত, কেবল বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

হ্যাঁ, সত্যই ইহা বৈরাগ্য-ভূমি। এখন আমার মনের ভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বলিবার সময় বা সুযোগ নাই। অতএব উপসংহারে বলিতেছি, এই হিমালয়পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান, আর মানবজাতিকে আমরা চিরদিন এই ত্যাগের মহৎ শিক্ষা দিতে থাকিব। যেমন আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের জীবনের শেষভাগে এই হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেন, সেইরূপ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ এই শৈলরাজের দিকে আকৃষ্ট হইবেন—যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও মতপার্থক্য লোকের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে, যখন তোমার ধর্মে ও আমার ধর্মে যে বিবাদ, তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইবে, যখন মানুষ বুঝিবে, একটি সনাতন ধর্মই বিদ্যমান—সেটি অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি, আর যাহা কিছু সব বৃথা। এইরূপ সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ 'সংসার মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর—শুধু ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত আর সবই বৃথা', ইহা জানিয়া এখানে আসিবেন।

বন্ধুগণ, তোমরা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটি সঙ্কল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ। আমার মাথায় এখনও হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে, আর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটি এই সার্বভৌম ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র রূপে কেন নির্বাচিত করিয়াছি, তাহাও সম্ভবতঃ তোমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে যদি হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র চাই-ই চাই, এই কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে, আর আমি আশা করি, একদিন না একদিন আমি ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিব। আরও আশা করি, আমি অন্য সময়ে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া এ-সকল বিষয় আলোচনা করিবার অধিকতর অবকাশ পাইব। এখন তোমরা আমার প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ, সেজন্য তোমাদিগকে আবার ধন্যবাদ দিতেছি, আর ইহা আমি কেবল আমার প্রতিই ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহাররূপে গ্রহণ করিতে চাই না; আমি মনে করি, আমাদের ধর্মের প্রতিনিধি বলিয়াই তোমরা আমার প্রতি এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছ। প্রার্থনা করি, এই ধর্মভাব তোমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করে। প্রার্থনা করি, এখন আমরা যেরূপ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, সর্বদা যেন সেই ভাবে থাকিতে পারি।

কয়েকটি চিঠির কিছু অংশ

(মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত)

আলমোড়া
২রা জুন, ১৮৯৭

স্নেহের মেরী,

আমার প্রতিশ্রুত খোশগল্পভরা বড় চিঠিখানি শুরু করছি—আকারে তা সত্যি বড় হয়ে উঠুক, এই সদিচ্ছা নিয়ে। তা যদি না হয়ে ওঠে, সে তোমার কর্মফল। তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল যাচ্ছে। আমার শরীর খুবই খারাপ, আজকাল কিছুটা উন্নতি বোধ করছি—আশা করি খুব শীঘ্রই সেরে উঠব। ....

ভারতে সমতলভূমিতে এখন দাবদাহ। তা সহ্য করতে না পেরে এখানে এই পাহাড়ে এসেছি—জায়গাটা সমতলের চেয়ে কিছু ঠাণ্ডা।

আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি—এর চারিদিকে বহু ক্রোশ পর্যন্ত পর্বত ও অরণ্য। পরশু রাত্রে একটি চিতাবাঘ এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। চাকরদের প্রাণপণ চেঁচামেচি ও পাহারাদার তিব্বতী কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ মিলে ভয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হবার মতো অবস্থা ঘটেছিল। আমি এখানে আসা অবধি রোজ রাত্রে এই কুকুরগুলিকে বেশ কিছুটা দূরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে, যাতে তাদের চেঁচামেচিতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। চিতাবাঘটি তাই সুযোগ বুঝে একটি বেশ ভাল আহার্য জুটিয়ে নিল, সম্ভবতঃ অনেক সপ্তাহ এ-রকম জোটেনি। এতে তার প্রভূত কল্যাণ হোক!

মিস মুলারকে তোমার মনে পড়ে কি? কয়েকদিন থাকবার জন্য তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু চিতাবাঘের বৃত্তান্তটি শুনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, লণ্ডনে পাকা চামড়ার চাহিদা খুব বেশি, আর অন্য কিছুর চেয়ে এই চাহিদাই আমাদের চিতা ও বাঘগুলির মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে এসেছে।

তোমাকে লিখতে লিখতে আমার সামনে সারি সারি দিগন্তবিস্তৃত বরফের চূড়াগুলির উপর অপরাহ্নের রক্তিমাভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেগুলি এখান থেকে সোজাসুজি কুড়ি মাইল,—আর আঁকাবাকা পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল। ....

তোমার কাজ কি রকম চলছে? আনন্দে না দুঃখে? তোমার কি ইচ্ছা হয় না বেশ কয়েক বছর কোন কাজকর্ম না করে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে? নিদ্রা আহার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম আহার নিদ্রা—আরও কয়েক মাস শুধু এই করে আমি কাটাতে যাচ্ছি। মিঃ গুডউইন আমার সঙ্গে আছেন। ভারতীয় পোশাকে তুমি যদি তাকে দেখতে! খুব শীঘ্রই মস্তক মুণ্ডন করিয়ে তাকে একটি পূর্ণ-বিকশিত সন্ন্যাসীতে পরিণত করতে যাচ্ছি।

তুমি এখনও কিছু কিছু যোগাভ্যাস করছ নাকি? তাতে কিছু উপকার পেয়েছ কি? খবর পেলাম—মিঃ মার্টিন মারা গিয়েছেন। মিসেস মার্টিন কেমন আছেন—তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যাও তো?

মিস নোব্‌ল্‌কে তুমি চেনো কি? তাঁকে তুমি কখনও দেখেছ? এখানেই আমার চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, কারণ বিরাট এক ধূলির ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, লেখা আর সম্ভব হচ্ছে না। এ-সবই তোমার কর্মফল, স্নেহের মেরী, কারণ আমার তো ইচ্ছা ছিল—তোমাকে কত না অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা লিখব ও মজার গল্প বলব; এখন সেগুলি আমাকে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখতে হবে, আর তোমাকেও অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ইতি

সতত প্রভুসমীপে তোমাদের
বিবেকানন্দ

আলমোড়া
৩রা জুন, ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল্‌,

...আমি নিজে তো বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আমার স্বদেশবাসীদের অনেককে জাগিয়েছি; আর আমি চেয়েছিলামও তাই। জগৎ আপন ধারায় চলুক এবং কর্মের গতি অপ্রতিরুদ্ধ হোক। এ জগতে আমার আর কোন বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, এর সবখানিই স্বার্থপ্রণোদিত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করিনি যা স্বার্থের জন্য,—এমন কি আমার কোন অপকর্মও স্বার্থপ্রণোদিত নয়; সুতরাং আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি; কিন্তু জগৎটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক্ হই, মনে মনে হাসি যে, যুক্তিপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেমন করে এই স্বার্থের—এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে!

এই হল খাঁটি কথা। আমরা একটা বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যত শীঘ্র কেউ বেরিয়ে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এখন দেহটা জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলুক—কে মাথা ঘামায়?

আমি এখন যেখানে আছি, সেটি পাহাড়ের ওপর এক সুন্দর বাগান। উত্তরে প্রায় সমস্ত দিক্‌চক্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গাবলী আর নিবিড় বনরাজি। এখানে তেমন শীত নেই, গরমও বেশী নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সারা গ্রীষ্মটা আমার এখানে থাকা উচিত, বর্ষা শুরু হলে সমতলে নেমে গিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা।

লোকালয় থেকে দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ; তবু সংস্কারের অনুবৃত্তি চলেছে। ইতি—

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(নৈনিতালের মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত)

আলমোড়া
১০ই জুন, ১৮৯৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্রের মর্ম বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম এবং ইহা জানিয়া যারপর-নাই আনন্দিত হইয়াছি যে, ভগবান্ সকলের অগোচরে আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব আয়োজন করিতেছেন।

ইহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা, কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে, কারণ তাহারা হিব্রু কিংবা আরব-জাতিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত (Practical Advaitism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কখনও যদি কোন ধর্মের লোক দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মের লোকেরাই আসিয়াছে; এইরূপ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিস্কার, এবং ইসলামপন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নয়।

এই জন্য আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমি মানস-চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।

ভগবান্ আপনাকে মানবজাতির, বিশেষ করিয়া আমাদের অতি হতভাগ্য জন্মভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান্ যন্ত্র-রূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা। ইতি—

ভবদীয় স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

কাশ্মীর
২৫শে অগস্ট, ১৮৯৮

কল্যাণীয়া মার্গট,

গত দু'মাস যাবৎ আমি অলসের মতো দিন কাটাচ্ছি। ভগবানের দুনিয়ায় জমকালো সৌন্দর্যের যা পরাকাষ্ঠা হতে পারে, তারই মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক উদ্যানে মনোরম ঝিলামের বুকে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি, এখানে পৃথিবী বায়ু ভূমি তৃণ গুল্মরাজি পাদপশ্রেণী পর্বতমালা তুষার-রাশি ও মানবদেহ—সবকিছুর অন্ততঃ বাহিরের দিকটায় ভগবানেরই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নৌকাটিই আমার ঘরবাড়ি; আর আমি প্রায় সম্পূর্ণ রিক্ত—এমন কি দোয়াত কলমও নেই বলা চলে; যখন যেমন জুটছে, খেয়ে নিচ্ছি—ঠিক যেন একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর ছাঁচে ঢালা তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন!...

কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। ওতে কোন লাভ নেই, সর্বদা মনে রাখবে, 'কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতো—তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে।' সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে, তার বেশী করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। (আমরা জগতের কাজে অংশ গ্রহণ করি আর নাই করি, জগৎ নিজের ভাবে চলে যাবেই। মোহের ঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলি মাত্র। এক-জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা আছে, যা চরম নিঃস্বার্থতার মুখোস প'রে দেখা দেয়; কিন্তু সব রকম অন্যায়ের কাছে যে মাথা নোয়ায়, সে চরমে অপরের অনিষ্টই করে। নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই। আছে কি?)

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(মিস মেরী হেলকে লিখিত)

শ্রীনগর, কাশ্মীর
২৮শে অগস্ট, ১৮৯৮

স্নেহের মেরী

তোমাকে চিঠি লেখার কোন সুযোগ ইতোমধ্যে করে উঠতে পারিনি, আর তোমারও চিঠি পাবার কোন তাগিদ ছিল না, তাই বাজে অজুহাত দেখাব না। শুনলাম মিসেস লেগেটকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের চিঠি থেকে তুমি কাশ্মীর ও আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ জানতে পারছ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

কাশ্মীরে হাইন্‌স্‌হোল্ড (Heinsholdt)-এর 'মহাত্মা'-সন্ধান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, প্রথমেই প্রতিপন্ন করতে হবে যে, সমগ্র ব্যাপারটা একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আসছে, প্রচেষ্টা খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা হয়েছে। মাদার চার্চ ও ফাদার পোপ কেমন আছেন? তোমরা কেমন আছ? একজন দল থেকে সরে পড়াতে পুরনো খেলা আরও

উৎসাহ সহকারে চলছে কি? ফ্লোরেন্সের কোন প্রতিমূর্তির মতো যার চেহারা, সে কেমন আছে (নামটা ভুলে গিয়েছি)?

কয়েকদিনের জন্য আমি দূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি মহিলাদের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। তারপর যাত্রিদলটি যাচ্ছে কোন পাহাড়ের পিছনে এক বনের মধ্যে একটি সুন্দর শান্ত পরিবেশে, যেখানে কুলকুল করে ছোট নদী বয়ে চলেছে। সেখানে তারা দেবদারু গাছের নীচে বুদ্ধের মতো আসন করে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকবে।

এ-রকম প্রায় মাসখানেক চলবে; তারপর যখন আমাদের সৎকর্মের ফলভোগ শেষ হবে, তখন আবার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পতন হবে। তারপর কয়েক মাস কর্মফল সঞ্চয় করব ও দুষ্কর্মের জন্য আবার নরকে যেতে হবে—চীনে, এবং আমাদের কুকর্ম ক্যাণ্টন ও অন্যান্য নগরের দুর্গন্ধের মধ্যে আমাদের নিমজ্জিত করবে। তারপর জাপানের নরকে। তারপর আবার যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গলোকে।

কত না সুন্দর সুন্দর জিনিস তোমাকে পাঠাতে আমার ইচ্ছা, কিন্তু হায়! শুল্ক-তালিকার কথা ভাবলে আমার আকাঙ্ক্ষা 'মেয়েদের যৌবন ও ভিখারীদের স্বপ্নের মতো' মিলিয়ে যায়।

কথা প্রসঙ্গে বলছি, আমি খুশী যে, দিনদিন আমার চুল পাকছে। তোমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ-বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মতো হবে।

আহা! মেরী, যদি তুমি কাশ্মীর দেখতে—শুধুই কাশ্মীর। পদ্ম ও হাঁসে ভরা চমৎকার হ্রদগুলি (হাঁস নেই, রাজহংসী আছে—এটুকু কবির স্বাধীনতা) এবং বায়ু-সঞ্চালিত সেই পদ্মগুলিতে বড় বড় কালো কালো ভ্রমর বসবার চেষ্টা করছে (আমি বলতে চাই যে পদ্মগুলি মাথা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে—ইতি কবিতা)—এ দৃশ্য যদি দেখতে, তা হলে মৃত্যুশয্যাতেও তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকত। যেহেতু এটা ভূস্বর্গ এবং যেহেতু তর্কশাস্ত্র বলে—হাতের একটি পাখি বনের দুটির সমান, অতএব এই (ভূস্বর্গের) ক্ষণিক দর্শনও লাভজনক, কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে অপরটি (অর্থাৎ না-দেখাই) শ্রেয়। কোন কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই, কোন খরচপত্র নেই, ছেলেমানুষি ভাবপূর্ণ অতি সহজ জীবন এবং তারপর সেইটুকুই সব।

আমার চিঠিটা তোমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে.....সুতরাং এখানে শেষ করছি (এ হল নিছক আলস্য)। বিদায়।*

আমার স্থায়ী ঠিকানা
মঠ, বেলুড়
হাওড়া জেলা, বাংলা, ভারতবর্ষ

সতত প্রভুসমীপে তোমার
বিবেকানন্দ

* *স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে সংগৃহীত*

চৌংরিকিয়াং (১৪,২৮১')

বিশ্বদেব বিশ্বাস

□ *মূল শিবির, ২৪শে মার্চ :*

গত ৯ দিন ধরে আমরা দার্জিলিং থেকে ৭০ মাইল উত্তরে, ১৪,২৮১ ফুট উচ্চে, পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে হেঁটে এসেছি। আজ সকালে উঠেই দেখি প্রত্যেকেরই অবস্থা কাহিল,—মাথা তুলবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই, এত বেশী মাথাধরা। চোখ মুখ ফুলেছে, চাহনি দেখলে ভয় হয়;—মেজর, তেনজিং, ওস্তাদ, শিক্ষার্থী সকলেরই। বসে বসেই হাঁপ ধরছে, অথচ উঠে দেখতেও ইচ্ছা করে; সুতরাং চলাফেরা করতে হচ্ছে অতি ধীরে এবং অতি কষ্টে। কথা একটু জোরে বা তাড়াতাড়ি বা একসঙ্গে বেশী বলা যাচ্ছে না। হৃৎপিণ্ড আর বক্ষপঞ্জরে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ভিতর থেকে তার কবাট ভেঙে ফেলবার জন্যই যেন যত জোরে পারে দমাদ্দম্ ধাক্কা মারছে। নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত। নাক-মুখ দিয়ে অল্পাধিক রক্তপাত প্রায় সকলেরই। একজন ক্যাডেট্ এবং মিলিটারী অফিসার যশবীর সিং-এর অবস্থা ভাল নয়, বমি করছেন,—রক্তবমি।

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এমন যে, মনে হচ্ছে —এ কোথায় এলাম! কেন এলাম, বাংলার মাটিতে কি মরবার মত জায়গাটুকুও ছিল না আমাদের! (লিখতে লজ্জা হয়) মনে হচ্ছে ফিরতে পারলে বেঁচে যাই, অন্ততঃ দার্জিলিং। সকলেরই ব্যবস্থা হলো ব্রেক্ফাস্টের সময় কফি ও ভিটামিন 'সি' পাইকারীভাবে। ঔষধ আর কিছু বোধ হয় নেই!

এখানেই এখন আমাদের থাকতে হবে দু'সপ্তাহ। এই-ই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র।

অবসন্ন দেহে ও মনে এ কয়দিনের যোগফল মনের মধ্যে আলোচনা করে দেখছি যে, আমাদের এতদিনকার কল্পনাতেও আসেনি—এত কষ্টে মানুষ পড়তে পারে, তাও আবার নিজের ইচ্ছায় সখ করে! কষ্ট তো রোজ আছেই. নিত্য নূতন কষ্টে পড়ে মনে হয়েছে—আজই সব চেয়ে বেশী, কালকের কষ্ট ও পরিশ্রম এর চেয়ে কম ছিল। প্রতিদিন যে কষ্ট, পরিশ্রম ও বিপদের অভিজ্ঞতা লাভ করি, পরদিন সেইটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ও লঘু মনে হয়।

দার্জিলিংএ এরা যে রাজকীয় আরাম ও আহার দিয়েছে এবং কলকাতা থেকে যেটুকু শারীরিক মূলধন এনেছিলাম, এ সবই পিষে নিংড়ে বার করে নিয়েছে এই কয়দিনের পাহাড়ের পাথরের চাপে। তবে যারা এতেও টিকে থাকবে, অন্ততঃ যাতে তাদের পৈতৃক প্রাণটা থাকে, তার চেষ্টার ক্রটি করবে না। প্রায় প্রত্যহই মাংস (কিছুই এখানে নিষিদ্ধ নয়), ভাত, ডাল, রুটি, চাপাটি, ডিম, মাখন, লেবু, কলায়, লজেন্স, বিস্কুট, চা, কফি, জ্যাম, জেলি, চিনি, টিনে সংরক্ষিত দুধ ও অন্যান্য খাদ্য সবই দিচ্ছে, অজস্র অপরিমিত অর্থব্যয় করে। জিনিসগুলিও সবই ভাল। কিন্তু হলে কি হবে! এদের রান্নার দোষেই

এগুলিকে এরা করে তুলেছে অনুপাদেয়, অরুচিকর, অখ্যাদ্য। এই পাহাড়ের চাপে হজম হয়ে গেলেও এত অত্যধিক পরিশ্রমজনিত শারীরিক ক্ষয় পূরণে কোন সাহায্যই করছে না আমাদের খাদ্য। সাতদিন ধরে এই অবস্থায় যত্র তত্র শোয়া, বসা, খাদ্য-অখাদ্য খাওয়া, সময়ে কিছুই না খাওয়া, অকল্পনীয় হাঁটা, অমানুষিক পরিশ্রম সব মিলে এমন সহ্য হয়ে গেছে যে, মনে হচ্ছে ফিরে গিয়ে সাংসারিক জীবনে চরম কষ্টের মধ্যে পড়লেও অম্লান বদনে তা সহ্য করে সহজভাবে মানিয়ে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। কোন রকম অসুবিধার জন্যে আমরা অনুযোগ অভিযোগ করতে ভুলে গেছি। একদিন কোন ছাত্র এক অসুবিধার জন্যে একটু অভিযোগের সুরে কথা বলতেই মেজর সহাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন,—Be acclaimatised with all the difficulties. You are under mountaineering training. This will otherwise help you to overcome all the mountain-like difficulties appearing in your daily life.''—আমরা সব মানিয়ে নিচ্ছি। সবকিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হচ্ছি। বন্ধু বিনায়ক বলল, যদি হঠাৎ মৃত্যুর মুখে পড়ি তাহলেও হয়তো মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলতে হবে—দাঁড়াও, তোমাতেও অভ্যস্ত হচ্ছি!

আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বেশ রৌদ্র উঠেছে, কে বলবে যে গত দু'তিন দিন ধরে অনবরত তুষারপাত আর ঝড় গেছে! বাইরে চমৎকার দেখাচ্ছে,—ধূ ধূ করছে সাদা বরফরাশি, তারই উপর এক জায়গায় কতকটা সমতল দেখে খাটানো হয়েছে আমাদের তাঁবু। ভিতরে ও বাইরে বিস্তৃত ধবধবে বরফের যেন কার্পেট। পাশেই এক দিকে নীচে নদী, জল তার জমা বরফ। আর এক দিকে আমাদের তাঁবুগুলোকে আড়াল করে আছে তুষার পর্বতপ্রাচীর। পিছনে অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে 'ফ্রে' চূড়া।

আবহাওয়া ভাল দেখে ফোটোগ্রাফ তুলবার হিড়িক লেগে গেছে। মাথাধরা, বমি, রক্তপাত—কোন কিছুই এই ক্যামেরাধারীদের কাবু করতে পারেনি।

তাঁবুর উপরকার ও আশপাশের বরফ ঝেড়ে ফেলে পোষাক বিছানাপত্র সব রৌদ্রে দিলাম। রৌদ্রটা খুবই ভাল লাগছে, তবে ঝড়ের মত ক্ষিপ্ত বাতাস ভাল লাগছে না। মেজর অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষক। আমরা জল থেকে ওঠা কুমীরের মত রৌদ্র পোহাচ্ছি, সেই ফাঁকে তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে অধ্যাপনা সেরে নিচ্ছেন। চিনিয়ে দিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার দ্বাররক্ষীরূপে দণ্ডায়মান কোন্ শৃঙ্গটির কি নাম, কত উচ্চতা, বিভিন্ন বরফের প্রকার ভেদ, কোন্‌টি এবং কাকে বলে গ্লেসিয়ার বা হিমশিলা, 'হ্যাঙ্গিং গ্লেসিয়ার', 'কর্নিস', 'কল', 'রিজ', 'আইস ফল' ইত্যাদি। কোন্ কোন্ জায়গা থেকে বরফের ধস নেমে হিমপ্রপাতের সৃষ্টি হয়; কিছুটা বুঝিয়ে দিলেন কি এর কারণ।

হঠাৎ মেঘ গর্জনের আওয়াজ,—সমানে চলছে।—আকাশ তো বেশ পরিষ্কার! মেজর চকিতে স্প্রিংএর মত ছুটে গিয়ে দূরবীণ নিয়ে এলেন,—বললেন, হিমপ্রপাত বা অ্যাভালান্স পড়ছে কাছেই কোথাও।

শ্রীতেনজিং ও ওস্তাদরা এ পাহাড় ও পাহাড় ঘুরে দেখতে গেলেন আমাদের শিক্ষা দেবার স্থান ঠিক আছে কি না!

আমাদের সামনে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'ফ্রে'-চূড়া (১৯,১৩০ ফুট), ঐ একই গিরিশিলার শেষ পশ্চিম প্রান্তে 'কোক্‌তাং' (২০,১৬৬ ফুট), সোজা পূর্বদিকে র‍্যাটং (২১,৯১১ ফুট), তার দক্ষিণে 'কাবরু' (২৪,০৭৫ ফুট) ও 'কাবরুডোম' (২১,৬৫০ ফুট)। কাবরু শীর্ষে সফল অভিযান করেছিলেন 'কুক পার্টি' (১৯৩৫), আমাদের একজন ওস্তাদ শ্রীআংথারকে ছিলেন ঐ দলে একজন শেরপা। এখান থেকে আরও তিনটি ক্যাম্প তাঁদের করতে হয়েছিল। কুক্ ১৮ই নভেম্বর শেষ ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে একা শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। এই শীতকালে আরোহণের মূলে কুকের যুক্তি ছিল যে, বর্ষার আগে এই অঞ্চলের আবহাওয়া খুব অনিশ্চিত থাকে। আরোহণের জন্য সময় পাওয়া যায় খুব কম। কুক্ ছাড়াও W. W. Graham বলে আর এক বৃটিশ পর্বতারোহী দাবী করেছিলেন যে, তিনি ১৮৮৩ সালে ৮ই অক্টোবর কাবরু আরোহণ করেছেন। পরে অনেক বড় বড় পর্বতারোহী গ্রাহামের এই আরোহণ বিশ্বাস করার কোন প্রমাণ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁর কাবরু আরোহণের দাবী নাকচ হয়ে যায়।

আমাদের পাশে যে তুষার নদী, তার নাম 'রতনচু'। আর দু-তিন সপ্তাহ পরেই আশপাশের বরফ গলে এটি দিয়ে বয়ে যাবে। এই নদীই নেমে গিয়ে 'রংগীল' বা রংগীত নাম নিয়ে পরে তিস্তার সঙ্গে মিশেছে।

সূর্য উঠলে নীচে চকচকে সাদা বরফের উপর রৌদ্র প্রতিফলিত হয়ে তার তির্যক ও ঊর্ধ্বমুখী বিপরীত কিরণে পাছে চোখ ঝলসে যায়, সে জন্য আমরা রঙীন গগল্‌স্ পরেছি; না হলে তুষারান্ধতা (Snow Blind) হয়ে যেতে পারে। আমাদের এক বাহকের চোখ এখনই কতকটা এ রকম হয়েছে, যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। স্নো ব্লাইণ্ডে চোখে ভীষণ যন্ত্রণা হলেও, শুনেছি—চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে যায় না। অন্ধতা সাময়িক। চিকিৎসা হিসাবে চোখে তুলো দিয়ে কাপড় বেঁধে অন্ধকারে বা তাঁবুর ভিতরে বসে থাকলে দু'-তিন দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসে।

শুনছি এখানে আর এক ভয় 'ফ্রস্ট ব্রাইট'; শরীরের যে অঙ্গে হয়, তা ঠাণ্ডায় হয় অসাড় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ঐ অবস্থায় আরও পরে ঐ অংশের জীবন-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তা হয় মৃতদেহের অঙ্গের মত। তখন সেই অঙ্গ পচতে থাকে। বাড়াবাড়ি হলে একমাত্র চিকিৎসা—সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া, (amputation)। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডগা থেকে তুষার-ক্ষত সাধারণত শুরু হয়, যেমন—হাতের ও পায়ের আঙ্গুলেব ডগা, নাকের ডগা, কানের পাতার ডগা। পায়ে তুষার-ক্ষত ধরার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী। পায়ে বুট যদি টাইট হয় কিংবা বুটে ক্রাম্পন বাঁধার সময় ফিতে কষে বাঁধলে পায়ে রক্ত চলাচল ভালভাবে হয় না। তাছাড়া পা সর্বাধিকক্ষণ ঠাণ্ডা বরফের উপর থাকে,

সেজন্য পায়ের ভয় সবচেয়ে বেশী। পূর্ববর্তী হিমালয়-অভিযানকারীদের মধ্যে ফ্রস্ট বাইটের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কারও পায়ের আঙ্গুল, কারও পায়ের পাতা, কারও গোড়ালি, কারও বা জানু পর্যন্ত, আবার কারও বা হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এইভাবে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় মেজর গল্পের মধ্য দিয়ে শিখিয়ে দিলেন, অথচ এইগুলি দার্জিলিংএ ক্লাসে কি নীরস বলেই বোধ হতো। কলেজের পাঠও যদি এইভাবে প্রত্যক্ষ উদাহরণ সহ শিক্ষা দেওয়া হতো, তা হলে হয়তো আমরা এভাবে সার্টিফিকেট-সর্বস্ব বিদ্যাবাচস্পতি হতাম না।

আরও একটা বাস্তব উদাহরণ ঃ আজ সকাল থেকে চমৎকার একটা মৃদুমন্দ সুগন্ধ পাচ্ছি। কিসের গন্ধ, কোথা থেকে আসছে পরস্পর জিজ্ঞাসা করতে করতে ওস্তাদজীর কাছে জানা গেল, এ 'ধূপে'র গন্ধ। মৃদু সুগন্ধ হ্রস্ব এক জাতীয় গাছ, সংস্কৃত নাম 'দেবদারু'? স্থানীয় নাম 'ধূপ'। উদ্ভিদ-বিরল এই উলঙ্গ তুষার অঞ্চলে অন্য কোন গাছ নেই নীচের দিকটায়। আছে এখানে ওখানে এই ধূপ গাছ। বরফ গলতে আরম্ভ হতেই নূতন পাতা বার হচ্ছে। মনে পড়ে গেল আচার্য জগদীশচন্দ্র তুষারক্ষেত্রের উপর পেয়েছিলেন—"দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ ক্ষীণ বায়ু।" স্কুলে আমরা ও শিক্ষক মহাশয় কেহই আগে এ জানতাম না।

আজ ছুটির দিন, সকাল সকাল মধ্যাহ্নভোজন—রান্না চলন-সই, তবে গরম এবং পদও অনেক; তার মধ্যে একটি হচ্ছে তাজা ছাগমাংস। গেজিং বাজারে কেনা হয়েছিল বেশ বড় দেখে কয়েকটি,—এদের প্রথমে টানতে টানতে, পরে টানের সঙ্গে ঠেলতে ঠেলতে, তোলা হয়েছে এতদূর পর্যন্ত, এই কনকনে ঠাণ্ডায়। এদের খোরাক—ঘাস-পাতা কিছুই নেই। এই আবহাওয়ায় বাঁচিয়ে রাখা যাবে না অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, এদের উপর দয়া করে কর্তৃপক্ষ এদের কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। অতিরিক্ত ক'টিকেও জবাই করে উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়েছে, ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে অবিকৃতই থাকবে। লোভ করে টেনে নিয়ে যাবার মত বিড়াল, কুকুর, শিয়াল, কাক, চিল-শকুন বা অন্য কোন জন্তু এমনকি পিঁপড়ের ভয় পর্যন্ত এখানে নেই। সুতরাং সাবধান হবার কোন দরকার নেই।

খাবার জায়গা নিয়মিত রান্না-তাঁবুর পাশেই। রান্না-তাঁবুর ভিতরকার বরফ কেটে চেঁচে তুলে পাথর বার করে ফেলা হয়েছে। তিন-চারখানা করে আলগা পাথর সাজিয়ে হয়েছে উনান, এতেই হয় রান্না। ইন্ধন দেবার জন্য আছে কাঁচা ধূপ গাছ, আগুনে দিলেই জ্বলতে থাকে। দুটি উনানে আরও বসানো আছে ক্যানেস্তারা ভর্তি জল। দিনরাত সদাসর্বদা জ্বলবে এই দুই রাবণের চুল্লী, তবেই দরকার হলে সময়মত মিলবে আমাদের তরল জল। আঁচানো, বাসন ধোয়া ইত্যাদি অন্য সব কাজের জল যোগাবে এই দুটি চুল্লী।

বরফের উপর শিক্ষা চলাকালীন পৃথক পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, বদলে সেখানে আমরা পাব 'চা' বা 'কফি'; তাঁর জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে—কয়েকটি 'মেটা-স্টোভ'। রকমারী নাম দেওয়া যে সব ষ্টীম কুকার কিনতে পাওয়া যায়, প্রায় একই রকম। তলায়

যে ইন্ধন দেওয়া হয়, তার নাম 'মেটা'। হয়তো সুইটজারল্যাণ্ড থেকেই আমদানী,—লম্বা, চৌপল, খেলার পাশার মত; তবে আকারে আরও ছোট, খুব হাল্কা, অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। ধোঁয়া হয় না, ফুটন্ত জলে কোন অবাঞ্ছিত গন্ধও হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অধ্যক্ষের তাঁবু থেকে পরবর্তী ক'দিনের রুটিন এসে গেল। কাল কাছাকাছি অঞ্চলেই হবে 'রোপ ওয়ার্ক'।

বৈকালে সূর্য গেল হেলে পশ্চিমে। দেখি—সূর্য একটু একটু করে ক্রমশঃ যেমন সরে যাচ্ছে, তুষার পর্বতের গায়ে তার আলোক পড়ে বিভিন্ন কোণে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন প্রভা ও শোভা। নীচে অনেক দূরে দুটি পর্বতের মাঝের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল-সবুজ আভামণ্ডিত বহু দূরবর্তী আকাশ, আর উপরের আকাশ সমুদ্রে সাদা মেঘের ঢেউ। সন্ধ্যা পর্যন্ত চরম অবস্থার রোগী দু'জনের কোন উন্নতি বোঝা যাচ্ছে না, তবে বাড়েনি। বোতলের ঔষধের গুণে তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। যে বাহকটির চোখ জখম হয়েছে, তার দু'চোখে জলপটি দিয়ে তাঁবুর মধ্যে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। জ্বালা যন্ত্রণা কমেছে। তবু ভয় হচ্ছে—চোখের দৃষ্টি আবার হবে তো?

□ *২৫শে মার্চ ঃ*

'চা—চা'-এর ডাকে ঘুম ভাঙতেই মনে এল যে, আজ আর বিশ্রাম নয়, কর্ম্মময় দিন বিরক্তি বোধ হলো, এই অসহ্য শীতে বিছানা ছাড়তে হবে। শুধু তাই নয়, এখনই তৈরী হয়ে বেরুতে হবে। শরীর কারও কিছুমাত্র ভাল নয়, ঘুম হচ্ছে না একটুও; কিন্তু উপায় নেই।—এ আমার বাড়ি নয়, আমার ইচ্ছায় চলবে না এরা। এদের মতানুসারে আমিই চলে এসেছি লিখিত প্রতিজ্ঞা করে। শিক্ষার্থীরূপে আমি আছি সামরিক শিবিরে, একটি সামরিক প্রতিষ্ঠানে, তার সব কিছু নিয়মের অধীন,—যার প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে দ্বিধাহীন আজ্ঞানুবর্তিতা।

> "Their's not to make reply,
> Their's not to reason why,
> Their's but to do and die."

তবু 'ধৌম্য উপমন্যু' সংস্কৃত উপাখ্যানটির কথা মনে করে এবং শ্রীতেনজিং ও মেজরের মুণ্ডপাত করতে করতে চা খেয়ে নিলাম। ওঁদের কঠোরতাকে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম নির্যাতনকারী..., পর পর অনেক গালাগালি দিলাম মনে মনে। উত্তেজক গুরুনিন্দায় বেশ একটু গরম হয়ে গেলাম। ৭ টায় পি, টি, শুরু—হবে আধ ঘণ্টা; কিন্তু কষ্টসাধ্য হলেও বেশ বলকারক ফল হলো। পরিশ্রম করে শীত কমে গেল, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষুধা বোধ হতে লাগল। ৭টা ৩০ মিনিটের পর প্রাত্যহিক অন্যান্য কাজ সমাধা করে নিয়ে ব্রেকফাষ্ট মিলল হাড়ের মত শক্ত মোটা চাপাটি, তার সঙ্গে মাখন ঠাণ্ডায় জমে যেন ইটের খোয়া, জ্যাম কিন্তু জমে তত শক্ত হয়নি।

৯টা ৩০ মিনিট থেকে শিক্ষা আরম্ভ.—দার্জিলিং-এ যা শিখেছি তারই পর থেকে উন্নততর দড়ির কাজ, তার ব্যবহার, অভ্যাস ও পরীক্ষা।

এই দড়িই হচ্ছে পর্বতারোহীদের গ্রন্থিবদ্ধ জীবন-সূত্র। সাহিত্যের রূপকে 'জীবনসূত্র' কথাটি ব্যবহার বেখাপ্পা লাগত, দুর্বোধ্য বোধ হতো। নবদম্পতির গাঁটছড়া বাঁধার মধুরতা কল্পনা করে খাপ খাওয়ান যায় বটে, কিন্তু কথাটির সত্যকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলো আজ এখানে তার বাস্তবে ব্যবহার দেখে। মাধ্যাকর্ষণ-রূপী মৃত্যুর টানে হাত-পা ফস্কে পড়ে গেলেও রজ্জুতে গ্রন্থিবদ্ধ অন্যের সাহায্যে জীবন-রক্ষা হয়. এই জন্যই রজ্জুটি হচ্ছে 'জীবন-সূত্র'। পর্বত আরোহণের এবং অবরোহণের প্রায় প্রত্যেক অবস্থাতেই এই গাঁটছড়া বাঁধা অপরিহার্য। আরোহণের সময়ে পা ফস্কে নীচে অথবা কোথাও ফাটল থাকলে তার মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রতি পদে পদে। এটা সহজেই বুঝা যায় যে, পতন শুধু বিপজ্জনকই নয়, মারাত্মকও। এই অবস্থায় দড়ির সাহায্যে আত্মরক্ষা করা অথবা অন্যকে উদ্ধার করাও অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই রকম এক মারাত্মক রোমহর্ষক ঘটনার কাহিনী পড়েছি। স্মাইথ নামে এক বিখ্যাত পর্বতারোহী তাঁর কিশোর বয়সের এক অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেছেন।

দুই অজানা বন্ধুর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি ডলোমাইট পাথরের পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিলেন এক রবিবারের ছুটির দিন। ওঁদের দেশে পাহাড়ে চড়ায় একটা বেশ সুবিধা আছে। বাড়ির কাছেই পাহাড়। এক দিনেই সেখানে পৌছে যাওয়া যায়। তাই পাশ্চাত্য দেশে পাহাড়ে ওঠা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা 'Holiday Sport' হিসাবে চালু হয়েছে।

পাহাড়ে ওঠার নিমন্ত্রণ পেলে পর্বতারোহীরা চিরকাল খুসী হয়, আর একটু গর্ববোধও করে। কারণ তার মধ্যে নিজেদের দক্ষতা যাচাই-এর মধ্য দিয়ে সম্মান বৃদ্ধির একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার থাকে।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে স্মাইথ দুই বন্ধুর সঙ্গে পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিলেন। ডলোমাইট পাথরের একটা ১৫০০ শত ফুট উঁচু পাঁচিল। বন্ধু দু'জন বললেন তারা পাঁচিলটায় সোজা উঠবে। স্মাইথের মত ছিল ভিন্ন, কারণ ওপথে বিপদ অনেক। তবু তিনি কিছু বলেননি। কেননা বন্ধু দু'জন ভাবতে পারে তিনি ভয় পেয়েছেন।

প্রথমে তিনজন উঠতে থাকলেন সহজ, সুন্দর সাবলীলভাবে সানন্দে। উঠছেন তো উঠছেনই। বিভিন্ন ধরণের পাথরের গা, কোথাও সামনে ঝুঁকে পড়েছে, কোথাও বিরাট ফাটল, কোথাও বা গর্ত। পাঁচিলের শেষটা দেখে মনে হয়—বিরাট একখানা লোহার চাদর কে যেন সোজা উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

প্রায় সাত-আট শত ফুট ওঠার পর ওঁরা একটা খাঁজে বসে বিশ্রাম নিলেন, চকলেট খেলেন। টিনের মাছ, ফ্লাস্কের কফি খেয়ে আবার উঠতে লাগলেন। এবার পাঁচিলটা আরও খারাপ, আরও তেলা। খুব বিপজ্জনক। যে কোন সময় হাত-পা ফস্কে যেতে পারে। কথা হলো তিনজনে পরস্পর কোমরে দড়ি বাঁধবেন। কিন্তু এক বন্ধু বললেন—না, আমি একাই

উঠব, বলে তিনি একলাই আগে আগে অনেকখানি উঠে গেলেন। এঁরা দু'জন একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হতাশভাবে বললেন,—ও শুধু শুধু গোঁয়ারতমি করছে।

স্মাইথরা দু'জনে কোমরে দড়ি বেঁধে উঠতে উঠতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন, আগের বন্ধুটি একটা পাথরের খাঁজে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হাত পা কেটে ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে। পাথরে ঠোকাঠুকি লেগে লেগে তার মাথা কপাল ফুলে গেছে। তবে একথা ঠিক এই রকম একটা পাথরের পাঁচিলে একা একা ওঠা সত্যই কৃতিত্বের। স্মাইথ আবারও তাঁকে বললেন, এস দড়ি বাঁধি। তখনও তিনি প্রত্যাখ্যান করে বললেন,—শক্ত জায়গাটা উঠে এসেছি,—বাকিটাও উঠে যাব,—বলেই আবারও আগে আগে উঠে গেলেন। স্মাইথরাও উঠে চললেন পিছনে।

একটা রীতিমত শক্ত জায়গা দিয়ে উঠছেন, স্মাইথ আগে, দড়িতে বাঁধা বন্ধুটি পিছনে। স্মাইথ তাঁকে আস্তে আস্তে 'বিলে' করে টেনে তুলছেন। টিকটিকির মত অবস্থা। সহসা পাহাড়ের গায়ে একটা ঠকাঠক্ আওয়াজে ওঁরা চমকে উঠলেন। স্মাইথ চীৎকার করে নিচের বন্ধুকে বললেন,—সাবধান, পাথর পড়ছে। নিজে সেঁটে গেলেন পাহাড়ের গায়ে,—মাথায় না পড়ে।

পাথর পড়ল না। তার বদলে ওঁরা দেখলেন—কালো, ভারী, লম্বাটে মত একটা জিনিস ঠোকাঠুকি খেতে খেতে পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। একটা মানুষের দেহ। এক পলকেই চেনা গেল,—সেই বন্ধুটি, যিনি কোমরে দড়ি না বেঁধে উঠছিলেন। আঁতকে উঠলেন স্মাইথ। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। প্রাণপণ শক্তিতে কোমরের দড়িটা চেপে ধরলেন, দেখতে পেলেন নিচের বন্ধুটি বিপজ্জনক জায়গায় ঝুলছেন। দেহটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে তাঁর উপর পড়বে। ঐ বন্ধুটিকেও নিচে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে, আর তার টানে একই দড়িতে বাঁধা স্মাইথও পড়বেন। এঁরা বুঝলেন, আর রক্ষা নেই। স্মাইথ আর তাকিয়ে থাকতে না পেরে চোখ বুঁজে ফেলে নিচের বন্ধুকে চীৎকার করে 'হুঁসিয়ার'—বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ বার হলো।

দেহটা ঘাড়ের উপর এসে পড়ছে দেখে নিচের বন্ধুটি কোন রকমে পাশে একটু হেলে গেলেন,—তারপর একহাতে কোমরের দড়ি চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে পড়ন্ত দেহটাকে একটু পাশে ঠেলে দিতেই সেটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিজে বেঁচে গেলেন। স্মাইথকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণপণ শক্তিতে দড়ি টেনে ধরে স্মাইথ বসে পড়লেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবলেন, এ কি হলো?—কেন এমন হলো? দেহটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল সে শব্দও ওঁরা শুনতে পেলেন। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন পাহাড়ের স্থানে স্থানে রক্ত ছিটিয়ে পড়ে আছে। দেহটা পড়ে রইল নিচে। মুস্কিল ওঁদেরও হলো। নামতে পারছেন না। ভয়ে এত ঘাবড়ে গেছেন, এত কাঁপছেন যে দাঁড়াতে পারছেন না। নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এই অবস্থায় নামতে গেলে ওঁরাও পড়ে যাবেন। মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু নামতে ওঁদের হবেই।

অনেকক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে অনেক কষ্টে, রীতিমত সাবধান হয়ে এক-পা এক-পা করে নেমে এলেন। মৃত বন্ধুকে খুঁজে বার করে দেখতে পেয়েই আঁতকে চীৎকার করে উঠলেন। এ যেন তাঁদের বন্ধু নয়। কোন মানুষও নয়। একটা মানুষের থেঁতলানো দলা পাকানো মাংসপিণ্ড। রক্তে মাখামাখি। কিছুমাত্র চেনা যাচ্ছে না। বন্ধু মরে গেছে। যে লোকটার সঙ্গে তাঁরা কাল সারারাত্রি কাটালেন, কত হাসি ঠাট্টা করলেন, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কত কথা বললেন, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন, সে কিরকম টুক করে মরে গেল। সেই থেকেই স্মাইথ ঠেকে শিখেছিলেন—পাহাড়ে দড়ি না বেঁধে এককভাবে কখনও ওঠা উচিৎ নয়। তাছাড়া দড়ির সাহায্যে একজন আরোহী অপর একজন আরোহীকে দুরূহ স্থানে উঠতে সাহায্য করে। কোমরে দড়ি বাঁধা থাকলে আরোহী নির্ভয়ে তার শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

পা ফস্কে যাওয়া মাত্রই মানুষ হয়ে যায় হতবুদ্ধি। যে কাছে থেকে দেখে সেও তাই। শিক্ষা ও বারংবার অভ্যাসে এই হতবুদ্ধিতা দূর হয় এবং রক্ষাশক্তিও আয়ত্তে আসে ক্রমশঃ সরল ও স্বাভাবিক হয়ে।

দড়ি ব্যবহারে তার বিপরীত ফলের কথাটাও খেয়াল রাখতে হবে। দড়িতে একজন কম অভিজ্ঞ আরোহী বাঁধা থাকলে সে সমস্ত দলের ক্ষতি করতে পারে। "জীবনে মরণে একই বাঁধনে"—একজনের পতনে অন্যের সাহায্যে যেমন জীবন রক্ষা পায়, তেমনি একজনের দুর্ভাগ্যে গ্রন্থিবদ্ধ অন্যেরও পতন ও সহমরণ সম্ভাবনা আসতে পারে। শুনেছি, ১৯২২ সালে এভারেস্ট অভিযানে অকৃতকার্য হয়ে অত্যন্ত শ্রান্ত পর্যুদস্ত অবস্থায় ম্যালরী নামছিলেন ২৭ হাজার ফুট উঁচু থেকে। অক্সিজেনের অভাবে তাঁদের শরীরে তখন প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দেহের সবকিছু অসাড় হয়ে আসছে। ভালভাবে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারছেন না। একই দড়িতে পরস্পর কোমরে চারজন বাঁধা ছিলেন। সহসা একজন পা ফস্কে পড়ে গেলেন। দ্বিতীয়জন তাঁকে রুখতে পারলেন না। ফলে তাঁরই ভারের টানে এক এক করে সবাইকে টেনে ফেলতে লাগল মৃত্যুখাদে। ম্যালরী ছিলেন দড়ির শেষ প্রান্তে। দ্রুত বরফে গাঁইতি ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের কোমরের দড়ি জড়িয়ে দিলেন তাতে। তিনজন লোকের ভারের টান এসে লাগল ম্যালরীর গাঁইতিতে। তাঁর কোমরে নয়। ফলে ম্যালরী নিজে রক্ষা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাকি ৩ জনেরও পতন রোধ হলো। ম্যালরীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্ষিপ্রতার গুণে মৃত্যুর মুখ থেকে সেদিন চারজন বেঁচে ফিরে এলেন সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়। এতেই বোঝা যায়, পাহাড়ে দড়ি যুগপৎ "জীবনরজ্জু" ও "মৃত্যুফাঁস"! তবে সবসময় সবকিছু অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয় বিবিধ রক্ষা-ব্যবস্থা শিখে নিয়ে এবং অভ্যাস করে।

জীবনের ভার ভরসা করে যে দড়ির উপর নিঃশঙ্কচিত্তে সমর্পণ করতে হবে, তার সম্বন্ধে প্রথমেই নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। সুতরাং এই দড়ি চাই মজবুত, ভারসহ এবং টানসহ। প্রত্যেকটি দড়িকে পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় প্রতিদিন। দড়ির এক প্রান্ত আটকে দেওয়া হয় একটা পাথরের খাঁজে, 'টিম্বার হিচ্' ফাঁস লাগিয়ে। অন্য

প্রান্ত ধরে পাঁচ-ছয় জন মিলে বারকতক হেঁচকা টান দিয়ে দেখতে হয়। প্রথম টানে টিকে গেলে, তারপর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ করে পুনরায় টান দিতে হয়। এইভাবে দুই বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, তবেই দড়িকে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

সাধারণতঃ পাহাড়ে ওঠার দু'রকমের দড়ি ব্যবহার হয় বেশি,—'নাইলন' ও 'ম্যানিলা'। নাইলনের দড়িটাই ব্যবহার হয় বেশি। নাইলনের দড়ির অনেকগুলো সুবিধা আছে—খুব শক্ত, হালকা ও অনেকদিন টেকে। এমন কি বরফে ভিজে গেলেও ভারী হয় না। ৪রকম মাপের নাইলন দড়ির সঙ্গে পর্বত আরোহীরা পরিচিত। (ক) Extra Full—-মাপ ১ ৩/৮ ইঞ্চি ব্যাস, ওজন আন্দাজ ৫·৫০ পাউণ্ড। (খ) Full--১ ১/৪ ইঞ্চি ব্যাস, ওজন ৪.২৫ পাউণ্ড। (গ) Medium— ৭/৮ ইঞ্চি ব্যাস, ওজন ২.৫৬ পাউণ্ড। (ঘ) Quarter বা String—ব্যাস ৫/৮ ইঞ্চি, ওজন ১.১৪ পাউণ্ড। মিডিয়াম দড়ির Breaking Strain হচ্ছে ২০০০ পাউণ্ডের মত। অর্থাৎ ২০০০ পাউণ্ড ভার পড়লে তবেই দড়িটা ছিঁড়ে যেতে পারে। রীতিমত শক্ত। একটা মানুষকে অনায়াসে ঝুলিয়ে রাখতে পারে। ছিঁড়বে না। তবুও আরোহণের জন্যে মিডিয়াম দড়ি ব্যবহার করা হয় না। Full মাপের দড়িটাই ব্যবহার হয় বেশি। মিডিয়াম দড়ি সরু বলে ভালভাবে 'গ্রিপ্' পাওয়া যায় না। মেজর জয়াল অবশ্য আরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন। মিডিয়াম থেকে Full সাইজের দড়ির আঁশ বা সুতো অনেকগুণ বেশি থাকে। তাই পাথরের ঘষা লেগে বা কোনক্রমে তুষার গাঁইতির ঘা লেগে Full সাইজের দড়ি ছিঁড়তে হলে মিডিয়ামের থেকে অনেক দেরি লাগে।

Climbing Rope অর্থাৎ আরোহণ করার দড়ি সাধারণতঃ লম্বায় থাকে ১০০ ফুট। এই দড়িতে বাঁধবার জন্য বাঁধনের আবার নানা মতলব, প্রক্রিয়া ও প্রকারভেদ আছে, যাতে করে কয়েকজনের জীবন এক সূত্রে গ্রথিত করা যায়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার 'ডব্‌ল নট্' ও 'প্রুসিক নট্' বাঁধনের। তবে আরও কয়েক প্রকার 'নট্' ব্যবহার হয়, যেমন— 'Ordinary Overhand Knot', 'Turbuck Knot', 'Reef Knot', 'Bowline on the bight', 'Middleman's Knot' ইত্যাদি।

ইংরেজি N, M, অথবা W অক্ষরের মত ভাঁজ করে দড়ির প্রত্যেকটি ভাঁজের মাথায় একজন করে বাঁধা থাকে। N এর বাঁ দিকে উচ্চে এবং ডান দিকে নীচে যে দুটি ভাঁজ তাতে থাকে ২জন। Mএর মাথায় দুই পাশে দুই ভাঁজে ২ জন এবং তার নীচে মাঝখানে একটি মাত্র ভাঁজে ১জন— মোট ৩জন। Wএর উপরের মাঝখানে একটি মাত্র ভাঁজে ১জন এবং নীচের দুই ভাঁজে ২জন, —এই ভাবে বাঁধনের সময় 'ডব্‌ল নট্' ব্যবহার হয়। 'ডব্‌ল নট্' পদ্ধতিতে প্রত্যেকেরই কাছে থাকে দুটি করে দড়ি। শেষের দুইজনেরই কাছে এক দিকের দড়ি থাকে খালি, এর নাম 'রিজার্ভ রোপ' বা বাড়তি দড়ি। এটি সে গুটিয়ে রাখে পিঠে।

আর একটা নতুন দড়ি ব্যবহার হয়। তার দুমুখ জোড়া,—নাম 'সিলিং রোপ'। সিলিং রোপটাকে নানা কাজে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে প্রধান—কোমরের দড়ির

সঙ্গে হাতের কাছে প্রুসিক নটের সাহায্যে সিলিং রোপটাকে বেঁধে একটি ফাঁস করে রাখা। র‍্যাপেল করার সময়, বিলে করার সময় সিলিং রোপ অপরিহার্য।

ধরা যাক—গাঁটছড়া বেঁধে চলেছে তিন জন। যে বেশি অভিজ্ঞ সে-ই থাকে প্রথমে, সে-ই নেতা। পরবর্তী দু'জন,—মধ্য ও শেষ,—নেতার পিছনে চলে। তারা নেতার পায়ের দাগে নিজের পা মিলিয়ে পা ফেলবে। পথের যা কিছু বিপদ সবই নেতার।

হঠাৎ নেতার পা গেল ফস্কে, হতবুদ্ধি না হয়ে মনে করতে হবে খেলার ছলে সরসরিয়ে নামছি। তখনই পরমুহূর্তে দৃঢ়চিত্তে তড়িৎ গতিতে ঘুরে উপুড় হয়ে সে আইস্-অ্যাক্সের মাথার সূচাল দিকটা (pick) গেঁথে দেবে সজোরে বরফের মধ্যে। তার নীচে পড়া রোধ হবে। আইস্-অ্যাক্সের অপর দিক (point) সাবধানে পেটের বাঁ পাশ দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বার করে দিতে হয়,—পেটে গেঁথে যাওয়ার ভয়। আরও সাবধান থাকতে হয় তাকে, যাতে দেহের কোথাও ধাক্কা না লাগে, পা দিয়ে তা সামলাতে হয়। পরবর্তী মধ্যম ব্যক্তিও নেতার পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে দৃক্‌পাত না করে, নিজের আইস্-অ্যাক্স প্রুসিক নটের ভিতর দিয়ে বরফে গেঁথে ধরবে। নেতা যদি উপরোক্ত পন্থায় নিজের পতন রোধ করতে না-ই পারে, তবে তার ভার পড়বে বা ঝুলবে এখন মধ্যমের আইস্-অ্যাক্স এবং সিলিং দড়ির উপর। নেতার পড়া বন্ধ হলেই, মধ্যমের সেই টানে পড়বার আর ভয় থাকে না।

মুহূর্ত মধ্যে পদস্থলিত পতনশীল নেতার পক্ষে স্বয়ং এতগুলি কাজ করা যদি সম্ভব না-ই হয়, অপেক্ষাকৃত সামান্য কিছু সময় বেশী পেয়ে স্বপদে দণ্ডায়মান মধ্যম ব্যক্তি তার পন্থায় নেতার পতন রোধ করবে। তৃতীয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে এগিয়ে যাবে। তার কাছে আছে বাড়তি দড়ি রিজার্ভ রোপ, সে তা নামিয়ে দেবে পতনশীল লোকটির কাছে। সে তখন রিজার্ভ রোপ পেয়ে তার ফাঁস লাগাবে নিজের ডান পায়ে, আর নিজের দড়ির প্রুসিক নট্ লাগাবে বাঁ পায়ে। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরবে এখন দুটি দড়ি, দু'পায়েও তার ফাঁস আছে। তার নির্দেশে তার সুবিধা অনুযায়ী উপরিস্থিত দু'জন পালা করে টেনে টেনে ক্রমশঃ তাকে তুলবে উপরে।

দড়ির বাঁধনের উপদেশমুলক শিক্ষা দার্জিলিংএ হয়েছিল, এখানে হলো তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রথমে অল্প উঁচু থেকে পড়ে, পরে ক্রমশঃ একটু বেশি উঁচু থেকে পড়ে, বার বার এই অভ্যাসই হলো ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

এ কাজের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন সাহস ও অভ্যাস। উঁচু ছাদের কার্নিশ থেকে বিড়ালের নীচে পড়া এবং বেমালুম অক্ষত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ হেঁটে চলে যাওয়া, অনেকে লক্ষ করেছেন। এ শিক্ষাও হচ্ছে তাই। পড়ে যাওয়াকে লোমহর্ষক দুর্ঘটনা মনে করে, হতবুদ্ধি হলে চলবে না, আরোহণের একটি স্বাভাবিক ও সাধারণ বাধা মনে করে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া বা উদ্ধার করা শিখতে এবং অভ্যাস করে নিতে হয়।

এত বেশি ক্লান্তি বোধ হয়েছে, তবুও মন্দ লাগছিল না। কোথাও গিয়ে পৌঁছতে হবে সেই তাড়া ও উদ্বেগ তো আজ ছিল না।

দুপুরে ফিরে বেশ তৃপ্তিতে খেয়েছি। আজ ব্যবস্থা ছিল তাম্রচূড় অর্থাৎ মুরগীর মাংস, তরকারী, চাটনী আর মধুরেণ সমাপ্তি—প্রুনের পুডিং। বিশ্রাম একটু নিয়ে ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কাজ—পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো দড়ির বন্ধনে বাঁধা হয়ে , মাঝে কয়েক জনকে নিয়ে। এতে কোন বাড়তি দড়ি থাকে না, এবং এর দরকার হয় পাথরের উপর চলবার কালে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ে পিছল হওয়ায়, ওখানে চা খেয়েই আমরা ফিরলাম। শিবিরে এসে জটলা বেঁধে গল্প-গুজব করে বেশ আরামে কাটল।

রোগীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, আমরাও মানসিক ও শারীরিক ক্রমোন্নতি ও উৎসাহ বোধ করছি।

আশ্চর্য আজকার অনুভূতি! দুপুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরছি, মাত্র দুই দিনের অস্থায়ী বাস এই তাঁবুগুলি দূর থেকে নজরে আসতেই মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা ঠিক যেন সেই পিতৃপুরুষ-পরম্পরা চিরপরিচিত আবাল্যের বাসভূমি শান্তিপুরের বাড়িতে ফিরে আসার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। যেন সেই নিরাপদ আশ্রয়ের চিরাভ্যস্ত শান্ত স্নিগ্ধ সুখময় বিশ্রাম অপেক্ষা করছে আমার জন্য,—আঃ, বাঁচলাম!*

লেখকের 'কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
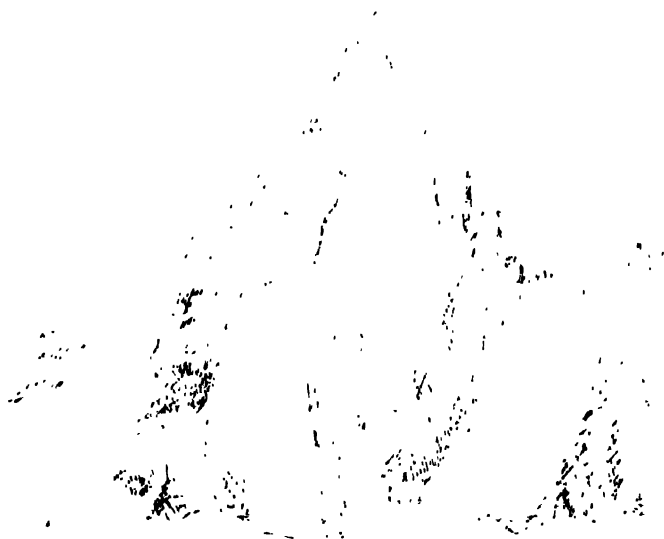
রূপকুণ্ড (১৬,৫০০)

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

রূপকুণ্ডের তীরে নরকঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে ১৯৫৫ সনের অনেক আগে থেকেই বেশ একটা গুজব মান্দোলী, ওয়ান, কুনোল ও সুতোল, এবং কুমায়ুন-গাড়োয়ালের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৯৮ সনে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী এই হ্রদকে জানত ভূতুড়ে হ্রদ বলে। এই অঞ্চলে বার বার পর্যটন করেছিলেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী ডাঃ লঙস্টাফ। তিনি নন্দাদেবীর সানুদেশে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে বের করছিলেন। ১৯০৫ সনে আকস্মিকভাবে তিনি রূপকুণ্ডে হাজির হন। বরফাবৃত হ্রদের তীরে এসে তিনি থমকে যান। সার্ভে ম্যাপে হ্রদের কোন উল্লেখমাত্র নেই। তবে ডিপ্রেসনের মত আছে। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি বুঝি বিভ্রান্ত হয় মানুষের কঙ্কাল ও চপ্পল দেখে। কিন্তু তাঁর মনে তখন নন্দাদেবীর সানুদেশে এগিয়ে যাবার চিন্তা। তাই এই মৃত মানুষের দেহাবশেষ গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। ১৯২৭ সনে লঙস্টাফ সাহেব আবার আসেন এ অঞ্চলে, তবে এ পথে নয়। তিনি নন্দাকিনী উপত্যকা দিয়ে হুকুমগালা বা হোমকুণ্ড গলি পর্যন্ত এগিয়ে যান। ফিরবার পথে কোথা দিয়ে এসেছিলেন জানা যায়নি। তবে নিশ্চয়ই রূপকুণ্ডের পথ দিয়ে নয়। তাহলে সাহেবের চোখে অন্তত আর-একবার পড়ত ওই বীভৎস দৃশ্যগুলো। ১৯২৫ সনে একজন সাহসী ফরেস্ট গার্ড গিয়েছিলেন বড়ি নন্দজাত তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে। রূপকুণ্ড সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ ছিল অফুরন্ত, আগ্রহ ছিল তীব্র। বহু নৈসর্গিক বিপর্যয় তাঁকে সইতে হয় সারা পথে। তুষার-ঝড় আর অ্যাভালান্সে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রায় দশ-বারো জন প্রাণ হারায় নির্জন পাহাড়ের কোলে। চোখ মেলে দেখতে হয় ফরেস্টার সাহেবকে এই মর্মান্তিক দৃশ্য। অবশেষে অর্ধমৃত অবস্থায় তিনি রূপকুণ্ড পৌঁছন। তাঁর দৃষ্টিতে বরফে-ঢাকা রূপকুণ্ড আর সৌন্দর্যময় নয়। বীভৎস ও ভয়াবহ মূর্তি। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান ফরেস্টার সাহেব। তবু তখন রূপকুণ্ড বরফে আবৃত ছিল, বরফের উপরে হয়তো-বা বেরিয়ে ছিল কয়েক টুকরো হাড়।

এদিকে রূপকুণ্ড সম্বন্ধে অনেক সত্য-মিথ্যা সংবাদ দিনের পর দিন পল্লবিত হয়ে চলেছে। এই পল্লবিত সংবাদ হঠাৎ মাধোয়াল সিং নামে এক দুঃসাহসী ফরেস্টার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৯৪২ সনে মিঃ মাধোয়াল সিং সন্দেহ নিরসনকল্পে রূপকুণ্ড অভিযান করলেন। পাহাড়-পর্বতে বেড়ানোর তীব্র নেশা মাধোয়াল সিংয়ের। তাই পাহাড়ের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর। কিন্তু রূপকুণ্ডের যাত্রাপথ তাঁকে কাহিল করে ফেলল। বহু কষ্টে জীবন বিপন্ন করে সেখানে পৌঁছলেন। ভয়ে বিস্ময়ে মূক হয়ে গেলেন কুণ্ডের তীরে বীভৎস দৃশ্য দেখে। ফিরে এসে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করলেন মিঃ ভার্নিডের কাছে। মিঃ ভার্নিড আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার। পাহাড়-পর্বতে আর দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। রহস্যময় রূপকুণ্ড তাঁর মনকে অধিকার করে বসল। তাই তিনি স্কটল্যাণ্ড থেকে

বিখ্যাত রক-ক্লাইম্বার মিঃ হ্যামিল্টনকে নিয়ে এলেন খবর দিয়ে। ১৯৪২ সনেই হ্যামিল্টন সাহেব শেরপা কুলি আর পর্বতারোহণের উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে রূপকুণ্ড অভিযান করলেন। বরফাচ্ছন্ন কুণ্ডের তীরে থেকে চপ্পল ও ছতোলীর ভগ্ন অংশ নিয়ে এলেন হ্যামিল্টন। রূপকুণ্ড সভ্যজগতের সামনে এসে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ--পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হল। দীর্ঘ তেরো বছর তাই রূপকুণ্ডের প্রসঙ্গ রইল চাপা পড়ে। ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছে। রহস্যময় রূপকুণ্ড অভিযাত্রীদের মন থেকে মুছে যায়নি। মিঃ মাধোয়াল সিংয়ের সংগৃহীত তথ্য ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে তথ্যানুসন্ধানীদের মধ্যে। ১৯৫৫ সনে উত্তর প্রদেশের বন-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় জগমোহন নেগীর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষতায় মিঃ মাধোয়াল সিং দ্বিতীয়বার রূপকুণ্ড অভিযান করলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর কুণ্ডের তীরে পৌঁছে কিছু কিছু নিদর্শন নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। ১৯৫৫ সনের অভিযাত্রী দলের সংগৃহীত নিদর্শনগুলি জমা দেওয়া হল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় ডি.এন.মজুমদারের কাছে। কিছু কিছু নিদর্শন পাঠানো হল আমেরিকায় মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনেসোটা বীক্ষণাগারে। ১৯৫৫ সনে ৭ই অক্টোবর অধ্যাপক মজুমদার, ডি. কে. সেন, আর. ডি. সিং, বি. ভার্মা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি রিপোর্টে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মোটামুটি ফলাফল প্রকাশিত হল। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া জাগিয়ে দিল এই রিপোর্ট। ঐতিহাসিক, তথ্যবিদ্ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। সকলের মনেই প্রশ্ন আর আগ্রহ। কী করে এল এত নরকঙ্কাল? কী করে এত মানুষের মৃত্যু হল? কোথাকার মানুষ এরা? কেনই-বা এসেছিল এখানে? প্রশ্নের পর প্রশ্নের ভিড় জমে যায় সকলের মনে। প্রশ্নের জটিলতায় রূপকুণ্ডের অনুদ্ঘাটিত ইতিহাস জটিলতর হয়ে চলে। রূপকুণ্ড আজও রহস্যময়।

রূপকুণ্ডের অনুদ্ঘাটিত বেদনাময় ইতিহাস আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল ১৯৫৯ সনে। রূপকুণ্ড সম্বন্ধে প্রকাশিত স্বামী প্রণবানন্দজীর একটি প্রবন্ধ আমার প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তুলল। বার বার পড়লাম প্রবন্ধটি। ছবি দেখলাম বার বার। মনের ভিতরে যেন গেঁথে নিলাম। দিনের পর দিন যায়, কী এক অদ্ভুত চিন্তা আমার মনকে পেয়ে বসল। কী করে যাওয়া যায় রূপকুণ্ড!.....

হঠাৎ একদিন স্থির করে ফেললাম। পোষাক-পরিচ্ছদ নেই, প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। স্বামীজীকে লিখে দিলাম, আমি একাই আসছি রূপকুণ্ডে!

অনেকেই আমাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। দুর্গম পথে একা যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করলেন বার বার। কিন্তু আমার সঙ্কল্প রইল অটুট। মন আমি স্থির করে ফেলেছি। যাত্রার প্রায় সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ একজন সঙ্গী জুটে গেল। কী তার খেয়াল হল, সে আমার সঙ্গে যাবে; একবার দেখে আসবে। কোথায় সে রূপকুণ্ড, কেমন

পথ, কোন কিছু জানবার আগ্রহ নেই তার। সে অসম্ভব আয়েশী ও ভোজনবিলাসী। অথচ এই দুর্গম পদযাত্রায় তার তীব্র আগ্রহ জেগে উঠল আকস্মিক।

রূপকুণ্ড যাবার আগে কলকাতায় নৃতত্ত্ব-বিভাগে গিয়েছিলাম খোঁজ নিতে। ১৯৫৬ সনে নৃতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয় এন. দত্ত মজুমদার বিরাট দল নিয়ে রূপকুণ্ড অভিযান করেন পর পর দুইবার। তাঁর প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হয়। রূপকুণ্ডের চার মাইল আগে থাকতেই শুরু হয় তুষারপাত। তুষারপাতে অভিযাত্রী দল বিপর্যস্ত হন। সৌভাগ্যের বিষয়, অভিযাত্রী দল সুস্থ দেহ নিয়ে ফিরে আসতে সমর্থ হন। শ্রদ্ধেয় মজুমদারকে তাই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার অভিযান চালাতে হয় রূপকুণ্ডে। গাইড আর কুলি নিয়ে তাঁর দলে ছিল প্রায় ত্রিশজন। রূপকুণ্ডের কাছে হুনিয়া থরে তাঁরা ক্যাম্প করে রাত কাটান। ভোরে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা মারাত্মক চড়াই অতিক্রম করে পৌছান রূপকুণ্ডে। রূপকুণ্ড তখন বরফে ঢাকা। বরফ আর পাথর সরিয়ে কুলির দল নরকঙ্কাল সংগ্রহ করে। বরফ খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ে মাংস সমেত নারীদেহের অংশ। কুলির দল ভীত হয়ে পড়ে এই বিকৃত দেহাবশেষ দেখে। ঠিক সেই সময়ই শুরু হয় তুষারপাত। কুলির দল পালাতে শুরু করে। অনন্যোপায় হয়ে অভিযাত্রী দলের ফোটোগ্রাফার সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কয়েকজন কুলিকে আটকে রাখেন। তাদের দিয়েই বইয়ে আনেন মাংসসুদ্ধ দেহাবশেষ। কলকাতার নৃতত্ত্ব-বিভাগের সংগৃহীত নিদর্শনগুলির ভেতর এইটেই বোধ হয় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।....

১৯৫৬ সনের পর সরকারীভাবে আর কোন অভিযান হয়নি। কিন্তু বেসরকারীভাবে প্রতি বৎসর একাধিকবার অভিযান হয়েছে। রয়াল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটির সদস্য স্বামী প্রণবানন্দের অভিযান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সন থেকেই তিনি রূপকুণ্ডের তথ্যানুসন্ধানী। ১৯৫৬ সনের অভিযানগুলোর প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যর্থতা তাঁর কৌতূহলকে করে তোলে তীব্রতর। ১৯৫৬ সনেই এলাহাবাদ মাউন্টেইনীয়ারিং ক্লাব রূপকুণ্ড অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সেই সঙ্গে ছিলেন—এস. পি. অগ্রবাল। ১৯৫৭-১৯৫৮ সনের অভিযানে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন এস. পি. অগ্রবাল। এই বছর কোন এক বাঙালী ভদ্রলোক গিয়েছিলেন রূপকুণ্ড। (সম্ভবত মিঃ কর্মকার)। কুণ্ড তখন বরফাবৃত। ১৯৬০ সনে আমরা ছাড়া ফ্রান্স থেকে এক দল এসেছিল। সুতোল হয়ে তারা রূপকুণ্ড পৌছবার চেষ্টা করে। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।.........

প্রায় চতুর্দশ শতকের শেষভাগ হবে। হোমকুণ্ড তীর্থযাত্রা তখনও নরনারীর জীবনে শ্রেষ্ঠ কামনা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষকে বহুবিধ দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। সে দুঃখ-দুর্দশা অবর্ণনীয়। ফলে ঐহিক জীবনের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা স্তূপীকৃত হয়ে জমতে থাকে। একদিন হঠাৎ মানুষকে দেখা যায় পারলৌকিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হতে। মন তৈরি হয়ে যায়। তাই দেহ হয় গৌণ। দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য জীবনের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে না। চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-ব্যসনের ভেতর লালিত কনৌজের রাজার হঠাৎ একদিন খেয়াল হল হোমকুণ্ড তীর্থযাত্রার। দুর্গম তীর্থ, এ তীর্থপথে মৃত্যুও অক্ষয় স্বর্গবাস।

যশোদয়াল সিং ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিরূপ। রাজকর্মপালনে বহুবিধ অনাচার ও পাপাচরণ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। দিন ঠিক হয়ে গেল। রাজার সঙ্গে রাজপরিবারের অনেকেই সাজল, অনেক লোকলস্কর, অনেক পাত্রমিত্র। তাদের জীবনেও এক অপূর্ব সুযোগ এসেছে। একা সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এই তীর্থযাত্রা সম্ভব নয়। রাজা কাউকেই নিরস্ত করতে পারলেন না। সবচাইতে বিপদ হল রাজমহিষী বল্লভাকে নিয়ে। বল্লভা ছিলেন গাড়োয়ালের অন্তর্গত চাঁদপুরগড়ির কন্যা। শৈশব কেটেছে তাঁর ধর্মাচরণে। নন্দাষ্টমীতে তিনি নন্দজাত উৎসব দেখেছেন। তখন থেকেই হয়তো এক অদ্ভুত স্বপ্ন রয়েছে মনে। সে স্বপ্ন হোমকুণ্ড যাবার স্বপ্ন। রাজার সঙ্গে তিনিও সাজলেন তীর্থযাত্রায়। বিষম বিপদে পড়লেন যশোদয়াল সিং। হয়তো আপত্তি হত না, কিন্তু রাণী বল্লভা আসন্নপ্রসবা। কী করে তাঁকে নিয়ে যাবেন এই দুস্তর পথ আর দুর্লঙ্ঘ পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে! বহু অনুরোধ করলেন, বিপদ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন প্রিয়তমা মহিষীকে। কিন্তু রাণী বল্লভা টললেন না।

তীর্থযাত্রায় তিনি সঙ্গিনী হবেনই। তাতে দেহ যায় ক্ষতি নেই। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যসঞ্চয়ের ফল এই মনুষ্যজন্ম। বহু জন্ম পুণ্যাচরণের ফল এই তীর্থদর্শন। এই তীর্থপথে মৃত্যুতে চিরমোক্ষলাভ, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর বেদনা আর সইতে হবে না। রাজা যশোদয়াল সিং বাধ্য হলেন প্রিয়তমা মহিষীকে সঙ্গে নিতে। তীর্থযাত্রীদল বেশ ভারী হল। তাঁবু নিলেন, মালবাহক নিলেন কাছাকাছি গ্রাম থেকে। এক শুভদিনে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

দীর্ঘ পথ, দুর্লঙ্ঘ চড়াই পেরিয়ে রাজকীয় তীর্থযাত্রীদল এসে পৌঁছল বৈদিনী। বৈদিনীকুণ্ডের তীরে বিশ্রাম নিয়ে বিবিধ বিধানে নন্দাভগবতীর পুজো দিলেন। তারপর সেখান থেকে এগুতে শুরু করলেন আরও দুর্গম পথে। মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রীদলকে থামতে হল। আসন্নপ্রসবা রাণী বল্লভা দু-চার পা এগিয়েই ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়তে লাগলেন। ব্যাকুল হয়ে পড়লেন রাজা যশোদয়াল সিং। কী করে আরও অগ্রসর হবেন! পথের তো এই শুরু। ফিরে যাবারও উপায় নেই। আর কীই-বা হবে ফিরে গিয়ে! যে পথে এসেছেন, জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। দুঃখ-কষ্টে আর বিকার নেই। প্রেম-ভালোবাসা পার্থিব জগতের সমস্ত সম্পর্ক অসার। তুচ্ছ মায়ার বন্ধন যেন ছেদ হতে চলেছে। রাজা যশোদয়াল সিং উঠিয়ে বসালেন তাঁর প্রিয়তমা মহিষীকে। আবার নিয়ে চললেন এগিয়ে। পাথরনাচুনি পেরিয়ে গেলেন। কৈলুবিনায়কে গণেশের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন রাণী বল্লভা। পুণ্য অর্জনের পথে তাঁর দেহ বাদ সাধছে। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আর তো তিনি এক পাও এগুতে পারছেন না। এ কী মর্মান্তিক অভিশাপ তার জীবনে! এ কি কোন মহাপাপের ফল?

সিদ্ধিদাতার কাছে তাঁর সমস্ত আর্জি পৌঁছল কি না কে জানে? তাঁর চোখের জলে বিনায়কের আসন বোধ হয় টলেছিল ক্ষণিকের জন্য। হঠাৎ যেন মনে বল ফিরে এল বল্লভার। তাঁকে যেতেই হবে। ভয় কিসের, মৃত্যু ছাড়া আর ভয় কিসের? সমস্ত ভয়

মন থেকে মুছে ফেললেন। আবার যাত্রা শুরু হল। বগুয়াবাসা ছাড়িয়ে চললেন যশোদয়াল সিং ও রাণী বল্লভা। পা আর চলে না। দু-পা এগিয়েই বসে পড়েন পাথরের ওপর। হৃৎপিণ্ড দ্রুত তালে নাচতে থাকে। চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে অমানিশার অন্ধকার। কিন্তু আর বেশী নয়। ওই তো সামনেই গর্বোন্নত শির নিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশূল। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মহা অস্ত্র। ওই তো নন্দাঘুন্টি, ওইখানে নন্দাভগবতী পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য। ওর পাদদেশেই হোমকুণ্ড। চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয়ে যায় সব-কিছু। রাণী বল্লভা বার বার চোখ মুছে তাকিয়ে দেখেন এক দুর্দমনীয় তৃষ্ণা নিয়ে। মন যেন কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে চলে যেতে চায়। আবার পা দুটোয় বল ফিরে আসে। এগিয়ে চলেন সামনের দিকে। কিন্তু মাত্র কয়েক পা, পথ দীর্ঘতর হতে থাকে। দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে এক পা এগিয়ে যেতে হয়। এমনি করেই কখন যেন গিমতলি এসে পড়েন। রাজার সঙ্গীরা অনেকেই আগে আগে এসেছিল এগিয়ে। রাজা ও রাণীর পৌঁছনোর আগেই গিমতলিতে তাঁবু পড়েছিল। একদল রূপকুণ্ডে পৌঁছে গিয়েছে। তারা কুণ্ডের তীরে বিবিধ বিধানে নন্দাভগবতী ও লাটুদেবতার পুজো সমাপ্ত করে এগিয়ে যায় জিউন্‌রাগলি। আরও এগিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকলেও বাধ্য হয়ে তাঁবু খাটাতে হয়। রাজার তাঁবু পড়েছে গিমতলি।

ধীরে ধীরে দিনের সূর্য অস্তাচলে এগিয়ে চলল। সূর্যাস্তের সোনালী আভা পড়ল তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গে। রাণী বল্লভার চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন, আর এক পাও এগিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই তাঁর। অথচ এখানে থাকাও আর চলবে না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যেন সকলের তীর্থযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক। সকলের পুণ্যার্জনের প্রতিবন্ধক। মহা পাপের কাজ করছেন তিনি। দুঃখে বেদনায় ভেঙে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল বেদনা যেন তার সর্বদেহের রক্তকণায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কী অসহ্য বেদনা, রাণী বল্লভার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল অব্যক্ত আর্তনাদ। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। ত্রিশূলের শীর্ষে যেন রক্তের ছোপ। হিমপ্রবাহ বইতে শুরু করল। দুর্যোগ যেন অপেক্ষা করছিল। রাজা যশোদয়াল সিং দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, অসাধারণ পথশ্রমে রাণীর প্রসববেদনা শুরু হয়েছে। লোকজন যারা ছিল, মুহূর্তের মধ্যে তারা কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর থেকে শ্লেটপাথর কুড়িয়ে নিয়ে এল। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রসবগৃহ নির্মিত হল কাছেই। গভীর রাতে সেইখানে রাণী বল্লভা সন্তান প্রসব করলেন। আকাশে তখন অনেক তারা। ধীরে ধীরে গাঢ় কুয়াসা নেমে এল পাহাড়ের বুকে। তারা ঢেকে গেল। বাতাসে এক বিপদের আভাস উঠল ফুটে। দেবভূমি কলুষিত করেছেন রাজা যশোদয়াল সিং। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল সমস্ত আকাশ। বিদ্যুৎ, বজ্রপাত আর সেই সঙ্গে শুরু হল শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাত। ক্রুদ্ধ হয়েছেন নন্দাভগবতী, ক্রুদ্ধ হয়েছেন লাটুদেবতা। পবিত্র স্থান কলুষিত করেছেন রাজা যশোদয়াল সিং। জিউন্‌রাগলিতে যে দল তাঁবু খাটিয়েছিল নিশ্চিন্তে, তারা হঠাৎ চমকে

উঠল আকস্মিক বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতে। চার দিক থেকে ছুটে আসছে অদ্ভুত গর্জন। বধির হয়ে গেল তারা মুহূর্তের মধ্যে। তারা বুঝতে পারল না কোন-কিছুই। জানতে পারল না, আকস্মিক কেন এই শান্তসমাহিত পাহাড় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল? কেন নন্দাভগবতী এই দুর্যোগ এনে দিলেন, কী কসুর তাদের?

প্রচণ্ড তুষারঝড়ে তাদের তাঁবু উড়ে গিয়ে পড়ল রূপকুণ্ডের ধারে প্রায় ৩০০ ফুট নীচে। ছতোলী উড়ে গেল। উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রচন্ড তুষারপাতে হিম হয়ে এল হতভাগ্যের দল। বাঁচবার জন্যে অনেকেই ছুটোছুটি করল। গভীর অন্ধকারে ঢাকা গহ্বরের মত রূপকুণ্ড। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ৩০০ ফুট নীচে। তাদের ওপর গড়িয়ে পড়ল বড় বড় পাথর আলগা হয়ে। মহাপ্রলয়ের শব্দে সে রাতের মর্মস্পর্শী আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল চিরদিনের জন্য। অন্যদিকে গিমতলিতে রাজা ও রাণী তুষারের তলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম আর তাঁদের কোনদিনই ভাঙল না। যে নতুন প্রাণটি এসেছিল পৃথিবীতে, নিষ্ঠুর পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখবারও সুযোগ পেল না সে মুহূর্তের জন্য।

যশোদয়াল-কা রাস্যায় এই তীর্থযাত্রার বর্ণনার সঙ্গে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার উল্লেখ আছে। লাটুদেবতার জাগারেও আছে। তীর্থযাত্রীদের অর্ধেক মারা গেল গিমতলিতে। অর্ধেকের মত প্রাণ হারাল জিউন্‌রাগলিতে। রূপকুণ্ডের তথ্যানুসন্ধানীরা রাণী বল্লভার সম্বন্ধে এক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন কেউ কেউ। রাণী বল্লভা ছিলেন নন্দাদেবীর ভগিনী। দীর্ঘকাল ধরেই দুই ভগিনীর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড কলহ। কিন্তু বল্লভাকে কোন উপায়েই নন্দাদেবী শাস্তি দিতে পারেননি। তাই রাণী বল্লভা যখন গিমতলিতে সন্তান প্রসব করেন, দেবস্থান অপবিত্র করার অজুহাতে ঈর্ষাকাতর নন্দাদেবী তাঁর উদ্ধতা ভগিনীকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন প্রচণ্ড তুষারঝড়। নন্দাদেবীর সঙ্গে বল্লভার সম্পর্ক সম্বন্ধে এরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যশোদয়াল-কা রাস্যায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তাই এ কাহিনীকে তথ্য হিসেবে মেনে নেওয়ার যুক্তি কোথায়?

গিমতলিতে আজও রাণী বল্লভার প্রসবগৃহের চিহ্ন রয়েছে। ১৯৫৭ সনে স্বামী প্রণবানন্দ এখান থেকে অনেকগুলি অলঙ্কারের টুকরো সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রসবগৃহের নাম অনুসারে জায়গার নামও হয়েছে। গিমতলি থেকে মাত্র ২০০ গজ এগিয়ে হুনিয়া থর। সমস্ত জায়গাটি তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি। এই মসৃণ-ঘাসে-ছাওয়া স্থানটি জুড়ে অসংখ্য ব্রহ্মকমল ফুটে আছে। মাঝে মাঝে একোনাইটের ফিকে বেগুনী রঙের ফুল। এখানে প্রায় ছ-সাতটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। অস্পষ্ট চিহ্ন পর্যন্ত রয়েছে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডের। হুনিয়া থর শব্দের অর্থ তিব্বতীয়দের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। নাম শুনে স্বভাবতই মনে হবে এখানে তিব্বতীয়রা আসত বাণিজ্য করতে। তাই তারা অস্থায়ীভাবে এখানে তাঁবু ফেলেছিল। ১৯৫৭ সনে এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলো স্বামী প্রণবানন্দের নজরে পড়ে। এগুলোর কাছেই ১৭×১৪ ফুট পরিমিত জমির দু-ফুট নীচে কাঠকয়লার গুঁড়ো বের করেছিলেন।

রাজা যশোদয়াল সিংয়ের দলে সংখ্যায় ছিল অনেক লোক। তাই তাদের তাঁবু শুধু গিমতলিতেই খাটানো হয়েছিল, এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। হুনিয়া থরে এই সাতটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড রাজা যশোদয়াল সিংয়ের লোকজনদেরই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে অনুমান করা যেতে

পারে। তাহলে এ জায়গার নাম হুনিয়া থর হল কেন? বাল্‌পা সুলেড়া আর হুনিয়া থর পর্যন্তই তৃণগুল্মের সীমানা। তারপরেই আবার শুরু হয়েছে পাথর আর বরফ। এই তৃণভূমির মধ্যে ছড়িয়ে আছে অজস্র একোনাইট গাছ। একোনাইট ছাড়াও অনেক পাহাড়ী নাম-না জানা ওষুধের গাছও রয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনেকেরই জীবিকা এই ওষুধ সংগ্রহ করা। এখান থেকে কাছাকাছি কোন গ্রাম না থাকায় ভেষজ গাছ সংগ্রহের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁবু নিয়ে এসেছিল, এ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ ভুটিয়া বা তিব্বতীয়, যারা বাণিজ্য করতে এসেছিল ভারতবর্ষে বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে। তিব্বত থেকে ভারতে বার বার যাতায়াতে তারা হয়তো-বা স্থানীয় গ্রামবাসীদের মেয়ে বিবাহ করেছিল। কালক্রমে ঘর বেঁধেছিল ভারতেই। তাদেরই বংশধর হয়তো-বা এদিকে এসেছিল, একরাত্রির জন্য বাস করেছিল এই নির্জন পাহাড়ের কোলে। তাদের নাম অনুসারেই এস্থানের এরূপ নাম হওয়া স্বাভাবিক।

হুনিয়া থরের পরেই শুরু হয়েছে মারাত্মক চড়াই ও উৎরাই। অ্যাভালান্সে ধসে গিয়েছে পাহাড়ের গা। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে বড় বড় পাথর। তাই অজস্র নুড়িপাথর আর তার মধ্যে বরফ। তুষারপাত হলে এই অংশটি পেরিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৯৫৬ সনে শ্রদ্ধেয় দত্ত মজুমদার হুনিয়া থর থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন প্রথমবারের অভিযানে। এ পথের সম্পূর্ণ অংশে প্রচণ্ড তুষারপাত হয়েছিল। হুনিয়া থর থেকে রূপকুণ্ডের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা নিয়েই তাঁকে ফিরে যেতে হয় ব্যর্থ হয়ে। ওই বছরেই দ্বিতীয়বারের অভিযানে যখন হুনিয়া থরে ক্যাম্প স্থাপন করেন তখন তুষারাচ্ছাদিত ছিল না এই দুর্গম অংশ। তবু এই মারাত্মক চড়াই পেরিয়ে যেতে তাঁদের সময় লেগেছিল ছ ঘণ্টারও বেশী। অথচ দূরত্ব মাত্র দুই মাইল।....

প্রায় আটশো ফুট খাড়া পাঁচিলের ওপর আমাদের যাত্রাস্থল। ওইখানে পৌছতে হবে। কী করে পৌছতে হবে? আদৌ পারব কি না পৌছতে জানি না। জানবার আগ্রহটাও যেন নিষ্ফল। শুধু একটি চিন্তা—পৌছতে হবে। যে পথগুলো পেরিয়ে এসেছি দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে হেঁটে, সে পথের স্মৃতি টেনে নিয়ে আসতে ভাল লাগে না।

যে-দিনগুলো কেটে গিয়েছে শুকরি-বাগচোতে ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাতে—সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। সে দিনগুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি। রাইচাঁদ চিৎকার করে হুঁশিয়ারি করেছে কতবার। পাথরের গা হড়কে পড়তে পড়তে আটকে গিয়েছি, সামলে নিয়েছি নিজেকে। এই আটশো ফুট পাঁচিলের নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য সব স্মৃতি বুঝি উঁকি দিয়ে গেল। রাইচাঁদ হাসল—এই পথ দেখছ, মালুম হচ্ছে বহুৎ বিকট। দেখবে উঠে গিয়েছ দিব্বি। রথীন গুপ্ত দেখছিল তাকিয়ে। উপরে চনোনিয়াকোট পর্বতমালার সানুদেশে গহ্বরের কিনারা। জিউন্‌রাগলিতে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে। পেছনেই ত্রিশূল সূর্যতেজে উদ্দীপ্ত, ভাস্বর। হুনিয়া থর থেকে এইটুকু পথ আসতে সময় লেগেছে সোয়া দু-ঘণ্টা।

ওঠবার শুরুতেই সবার মুখে গ্লুকোজের গুঁড়ো ঢেলে দিলাম। হাতে দিলাম টক লজেন্স।

প্রাণপণে চিৎকার করে রাইচাঁদ নন্দাদেবী ও লাটুদেবতার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ওঠা শুরু হল। সর্বশেষ চড়াই, সর্বশেষ আরোহণ। এক পা কোন রকমে ফেলে আর-এক পা ফেলবার জায়গা তৈরি করতে হয়। তবু অদ্ভুত ব্যাপার—অক্লেশে উঠে যাচ্ছি তর তর করে। রথীন আর রতন সিং সকলের আগে আগে। মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত হলেই চিৎকার করে সাহস জোগাচ্ছে রতন সিং। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দম নেবার উপায় নেই। বেশ খানিকটা এগুতে হচ্ছে চার হাত-পা দিয়ে বেয়ে বেয়ে। একবার দেখে নিলাম আর সামান্য একটু বাকী। হয়তো চল্লিশ ফুট মাত্র। কিন্তু সামান্য পথই অসামান্য হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। তবু মনের ভেতর অদম্য উৎসাহ। নিশ্বাস ছোট হয়ে আসছে। দরদর করে ঘাম বেয়ে পড়ছে। তবু ক্লান্তির কষ্ট নেই। বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য যেন নেই। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চার ধারে। আকাশে মেঘ নেই। আশেপশে কোথাও নেই কুয়াসা। ত্রিশূলের দ্বিতীয় শৃঙ্গ থেকে নেমে আসা হিমবাহ যেন এগিয়ে আসছে ডানদিক থেকে। বেশ পুরু করে ঢালা রূপো-গলানো। ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ থেকে আসা হিমবাহের বরফ যেন উপচে পড়ছে ফোয়ারার মত। তন্ময় হয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। চোখের সামনে সব যেন মুছে একাকার হয়ে গেল। উঠে চলেছি বুঝি অনন্তকালের জন্য। এ পথচলা শেষ না হলেও যে ক্ষতি নেই। হঠাৎ রাইচাঁদের চিৎকারে থমকে গেলাম—আ গিয়া বাবুজী।

চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিচ্ছে রথীন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। তার সঙ্গে চেঁচাচ্ছে রতন সিংহ আর রাইচাঁদ সিং। সে এক অদ্ভুত অব্যক্ত আনন্দ।

নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম। হ্যাঁ, সত্যি, সত্যি এসেছি রূপকুণ্ড। সম্বিৎ ফিরে পেলাম যেন। প্রায় একশো ফুট নীচে নীলাভ জল। চার পাশে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত চনোনিয়াকোট পর্বতমালার পাদদেশ। তার তলদেশে রহস্যময় রূপকুণ্ড। ১৯৫৯ সনে অনেক স্বপ্ন আর কল্পনায় ঘেরা। দিনের পর দিন কত ভেবেছি। সে ভাবনার, সে আগ্রহ-ভরা দিনগুলোকে যেন ফিরে পেয়েছি এই মুহূর্তে। খাড়া একশো ফুট ছুটতে ছুটতে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে বেশ না সামলালে হয়তো-বা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে হত জলে। ওপর থেকে যা দেখেছিলাম ঠিক তা নয়। জল নীলাভ নয়, ফিকে সবুজ। তার ওপর সরের মত পাতলা বরফের চাদর। এই হ্রদের নাম রূপকুণ্ড।

দেহে যেন অসম্ভব শক্তি ফিরে এল। কে বলবে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি—কত চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে! ক্লান্তি নেই একটুও। দক্ষিণ পূর্ব দিকে ছুটে গেলাম পাগলের মত পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে। হঠাৎ থমকে গেলাম। নীচু হয়ে ঝুঁকে দেখলাম।

ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। কপাল বেয়ে টস টস করে ঘাম ঝরছে। অদ্ভুত উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে থর থর করে। সে এক অব্যক্ত বেদনাবোধ। ছ'শো বছর অতীতের একটি দিনের মর্মান্তিক বেদনা। এই বেদনাই বুঝি আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। দীর্ঘপথের ক্লান্তি আর বিপদকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখেছে সারা পথ। কিন্তু রূপকুণ্ডের তীরে এসে এ উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি হল না। আরও নতুন করে জেগে উঠছে যেন।

১৯৫৯ সনের কথা আবার মনে পড়ল। রূপকুণ্ড আমার কৌতূহল জাগিয়েছিল। দিনের পর দিন শুধু স্বপ্ন দেখে যেতাম। হিমালয়ের নিভৃতে ছোট্ট হ্রদ, বারো মাস বরফের অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে রাখে নিজেকে, সেই রহস্যময় স্বপ্ন। চোখের সামনে ঢলঢলে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে যেন। দেখছে, সমতল থেকে কে এক আগন্তুক এসেছে! ১৯৫৫ সনের পর এই উৎকণ্ঠা-ভরা দৃষ্টি, এই অবগুণ্ঠন উন্মোচন। তবু আমার মনে আনন্দ কোথায়! প্রথম দর্শনের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি যা দীর্ঘ এক বছর ধরে নানা কল্পনায় ভরিয়ে রেখেছি, সে মুহূর্তটি থমকে গিয়েছে কখন যেন। কোথায় কোন্ ফাঁকে লুকিয়ে পড়েছে সে উত্তেজনা আর কৌতূহল।

অতীতে কোন এক দুঃসাহসী পথ ভুল করে এখানে হয়তে এসেছিল। পাহাড়ের নেশায় বিভ্রান্ত হয়ে সে পেরিয়ে এসেছিল এই দুর্গম পথ। কাছাকাছি এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে ও বিস্ময়ে। তার বোবা দৃষ্টির সামনে রুদ্ধ বেদনার ইতিহাস রয়েছে আত্মপ্রকাশের অধীর আগ্রহ নিয়ে। সভ্য জগতে এ আগ্রহের বার্তা পৌঁছেছিল। তাই বিংশ শতাব্দীর মানুষ এসেছিল দল বেঁধে। তাদের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিও বুঝি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সব-কিছু।

অজস্র বিক্ষিপ্ত পাথর। জিউন্‌রাগলি থেকে গড়িয়ে পড়েছে রূপকুণ্ডের চার পাশে। ধূসর পাথর আর তার মাঝে মাঝে সদ্য তুষারপাতের চিহ্ন। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা হাড়। দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যায়। এত হাড় কেন? সত্যি কি এগুলো মানুষের হাড়? শিরদাঁড়া, দাঁতশুদ্ধ চোয়াল, মাথার খুলি, হাত আর পায়ের অংশ, বক্ষঃপঞ্জর। একটা দুটো নয়—অজস্র। পাথরের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মানুষের পায়ের সাড়া পেয়ে যেন পাথরের স্তূপ ঠেলে চাইছে বেরিয়ে আসতে। কী এক মর্মান্তিক দিনের কাহিনী বলবে বুঝি?

টপ্‌টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। চমকে উঠলাম। রূপকুণ্ডের তীর থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঠে-আসা হিমবাহ! তার তলা দিয়ে জল ঝরছে। টপ্ টপ্ করে সোজাসুজি জল পড়ছে রূপকুণ্ডের ভেতরে। সন্তর্পণে হিমবাহের উপরে দাঁড়ালাম। রবারের জুতো। সন্তর্পণে পা রাখলুম হিমবাহের উপরে।

পা হড়কে গেলেই পড়তে হবে কুণ্ডের ভিতরে। হিমবাহের কাছেই এলোমেলো বিক্ষিপ্ত পাথর। দু-চারটে পাথরের খণ্ড সরানো হল। বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে তোলা হল বরফের চাপ। চমকে উঠলাম। বরফের তলায় মানুষের কোমর থেকে পায়ের কিছু অংশ মাংসশুদ্ধ। চামড়া উঠে গিয়েছে মাঝে মাঝে। ফ্যাকাসে সাদা রঙ। পাগলের মত এলোপাতাড়ি বরফ খুঁড়তে শুরু করেছি আমি আর রথীন। দু-হাত দিয়ে বড় বড় পাথরের টুকরো টেনে সরিয়ে ফেলেছি! আরও বেরিয়ে পড়েছে মাংসশুদ্ধ হাত-পা। মাংসের তন্তুগুলো জলে ভেজা সুতোর মত ঝুলছে। রাইচাঁদ আর রতন সিং তাকিয়ে রয়েছে বিমূঢ়ের মত। কেমন যেন আনমনা হয়ে গিয়েছি সবাই। হঠাৎ কী একটা শব্দ হতেই অস্ফুট চিৎকার করে রাইচাঁদ আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিল। রতন সিং আর রথীন লাফ দিয়ে সরে গেল হিমবাহের ওপর। জিউন্‌রাগলি থেকে গড়িয়ে পড়ল বড় বড়

পাথরের ডেলা। সমস্ত মুখটা ঘামে ভিজে গিয়েছে। সরে না এলে পাথরের ডেলায় চাপা পড়তাম আমরা। আবার হয়তো কখন অতর্কিতে গড়িয়ে পড়বে ডেলাগুলো। তবু মনের ভেতর অদ্ভুত লোভ এসে বাসা বেঁধেছে। আবার ওখানে যেতে হবে। বরফ খুঁড়ে দেখতে হবে অনেক নীচে। ছ'শো বছরের অতীতের ইতিহাস, আর কী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে!

জিউন্‌রাগলির ওপাশ থেকে মেঘ উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। গাঢ় মেঘ। রূপকুণ্ডের ফিকে সবুজ জলের ওপর ভেসে-বেড়ানো পদ্মপাতার মত পাতলা বরফের আস্তরণ। শান্ত স্তব্ধ হ্রদ। মাঝে মাঝে পাতলা কুয়াসায় ঝাপসা হতে চায় হ্রদের চার পাশের বিক্ষিপ্ত পাথরগুলো। ধোঁয়াটে হয়ে যায় বৃত্তাকারে ঘিরে থাকা খাড়া পাঁচিলের ধূসর রঙ। চোখের পলক পড়তে চায় না। আর দৃষ্টি ফেরাতেই মন চলে যায় অতীতে। প্রায় ছ'শো বছর আগের এই মৃত মানুষের দেহাবশেষ! বরফের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে, তাই আছে অবিকৃত। কাছেই পাথর-চাপা-পড়া ভূর্জপত্রের ছতোলী (ছাতা), চপ্পল, তাঁবুর খুঁটি। কারা মরেছিল এখানে? জানবার প্রয়োজন নেই আপাতত। মানুষ মরেছিল। সুস্থ ও সবল একদল নরনারী ও শিশু। তারা যে মরবে এ কথা ভাবেনি। এই দীর্ঘ দুর্গম পথে মৃত্যুর চোখে ধূলি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল। জিউন্‌রাগলি পৌঁছেই নিশ্চিন্ত হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর বুঝি ভয় নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু সরে গিয়েছে বহুদূরে। মাঝে মাঝে গাঢ় কুয়াসায় ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। সূচীভেদ্য অন্ধকার আর তুহিনশীতল বায়ুপ্রবাহ। কারও মনে সন্দেহের রেখাপাতও করেনি। এমন তো পথে অনেক জায়গাই হয়েছে। কতবার গাঢ় মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, ঝোড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত হতে হয়েছে হয়তো। তার জন্য ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যায়নি কেউই। কিন্তু কখন যেন এই কুয়াসা গাঢ় হয়ে ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত আকাশ। বাতাসে কী এক অদ্ভুত রহস্য! তার পর শোঁ-শোঁ শব্দ। তুষারঝড় আর শিলাবৃষ্টি। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় উড়ে গিয়েছিল তাঁবু।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে অসহায় নরনারীর দল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, মৃত্যু বীভৎস রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সবাই বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা করে। তারাও করেছিল। অপ্রশস্ত জিউন্‌রাগলিতে ছুটোছুটি করেছিল। মৃত্যুভয়ভীত নরনারীদের আর্তস্বর চাপা পড়ে গিয়েছিল তুষারঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে। সামনে অন্ধকার, তিন শো ফুট গভীর গহ্বর আর তার তলদেশে অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপকুণ্ড মৃত্যুর বীভৎস রূপের সামনে এই গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা-রূপকুণ্ডকেই ভেবেছিল সমতলভূমি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নীচে, একজন আর একজনের ওপর। তার উপরে পাথর ও শিলাবৃষ্টি। পাথর আর বরফের তলায় চাপা পড়েও অনেকেই শেষবারের মত পাঞ্জা লড়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে। তার পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনন্তকালের জন্য।

ছ'শো বছর আগের কঙ্কালগুলো আত্মগোপন করেছিল বরফের তলায়। এই শতাব্দীর মানুষ একদিন খবর পেয়ে ছুটে এল। তারপর এক দলের পর দল। সভ্য জগতকে আমন্ত্রণ জানাল রূপকুণ্ড। এই হতভাগ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে সভ্য জগতের। সেই অতীতের দিনটির সঙ্গে। যোগসূত্র স্থাপন করবে আজকের জগতের। তথ্যের পর তথ্যের

স্তূপ। যারা জনমানবশূন্য হিমালয়ের নিভৃতে নিরুপদ্রবে আত্মগোপন করে ছিল, তাদের নিয়ে যাওয়া হল বীক্ষণাগারে। অনেক পরীক্ষা আর নিরীক্ষার নিক্তিতে ওজন করা হল। চুল-চেরা হিসবে করা হল দিনের পর দিন। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। সন্ধানীর দৃষ্টিতে আড়াল হয়ে গেল রূপকুণ্ড। মানুষের মৃতদেহ নিয়ে ইতিহাস রচনা শুরু হয়ে গেল। শেষ হয়নি আজও।

রূপকুণ্ডের ইতিহাস ঘাঁটব বলে আসিনি। তথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াবার মত সামর্থ্য আমার নেই। রূপকুণ্ড আমায় প্রলুব্ধ করেছিল। মৃত্যুর দৃষ্টি এড়িয়ে মানুষ কেন যায় রূপকুণ্ডের পথে? কী এমন সৌন্দর্য রূপকুণ্ডের যার কাছে বেঁচে থাকবার লোভও ফিকে হয়ে যায়! তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম এপথে। সঙ্গতির অভাব, অভাব ছিল সামর্থ্যের। তবু নিরস্ত হইনি। দীর্ঘ একবছর ধরে রূপকুণ্ড আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

কিছু কিছু নিদর্শন কুড়িয়ে নিলাম। বাহাদুর শাহ্ আমলের তাম্রমুদ্রা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমসাময়িক তাম্রমুদ্রা। দাঁতশুদ্ধ নীচের চোয়াল। পাথর সরিয়ে ভূর্জপত্রের ছতোলী বের করেছিলাম। তোলবার চেষ্টা করতেই ভেঙে গেল। বরফ খুঁড়ে বের করেছিলাম একপাটি চপ্পল। পরিমাপ নয় থেকে দশ ইঞ্চি। এগুলো সঙ্গে করে আনবার ইচ্ছে থাকলেও আনা সম্ভব হল না রাইচাঁদ আর রতন সিংয়ের আপত্তিতে। ওয়ান গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার। তাই এগুলো নিয়ে গেলে গ্রামে রাত কাটানো অসুবিধে হবে। রাইচাঁদ ও রতন সিংও ভূতের ভয় পায়। তাদের মত অনেকেই ভয় পায়।

১৯৫৬ সনে মে মাসে অধ্যাপক মজুমদার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে রূপকুণ্ড অভিযান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথমবারের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ওই বৎসরই ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁরা রূপকুণ্ড পৌছন। বরফে-ঢাকা কুণ্ডের তীর থেকে বহু পরিশ্রম করে শতাধিক মাথার খুলি, পরিচ্ছদের অংশ, তাঁবু ও ছতোলীর অংশ, মেয়েদের রৌপ্যনির্মিত অলঙ্কার নিদর্শনস্বরূপ নিয়ে আসেন। অধ্যাপক মজুমদার কুণ্ডের তীর থেকে বাহাদুর শাহ্ আলমের রৌপ্যমুদ্রাও সংগ্রহ করেছিলেন। রূপকুণ্ডে এই প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিযান। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য এই অভিযাত্রীদলের পথের শেষ অংশ তুষারাচ্ছাদিত ছিল। কুণ্ডের ওপরও বরফ ছিল। ফলে সংগৃহীত নিদর্শনগুলি কুণ্ডের তীর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। কুণ্ডের উপরে জমানো বরফের পরিমাণ জেনে অনুমান করা যেতে পারে, এই অভিযাত্রীদলের সংগৃহীত নিদর্শন কুণ্ডের তীর থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট উপরের অংশ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছিল।

ওই বৎসরই ভারতের নৃতত্ত্ব-বিভাগের তরফ থেকে শ্রদ্ধেয় এন. দত্ত মজুমদার পর পর দুইবার রূপকুণ্ড অভিযান করেন। প্রথবারের অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বারের অভিযানে শ্রদ্ধেয় মজুমদার রূপকুণ্ডে পৌছন। কুণ্ড তখনও বরফাচ্ছাদিত। তবু তাঁর সংগৃহীত নিদর্শন প্রচুর। সমস্ত নিদর্শন কলিকাতায় মিউজিয়ামে নৃতত্ত্ব-বিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রয়্যাল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সভ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রণবানন্দও ১৯৫৬ সনেই রূপকুণ্ড অভিযান করেন। জীবনের অনেকাংশই ইনি কাটিয়েছেন হিমালয়ে। তাই হিমালয়ের রহস্য তাঁর মনকে সর্বদাই প্রলুব্ধ করে। তিনিও রূপকুণ্ডে গিয়ে প্রচুর নিদর্শন সংগ্রহ করেন। রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের টোপোগ্রাফি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা তাঁর মনকে রূপকুণ্ডের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে ১৯৫৬ সালের পরও ১৯৬০ সন পর্যন্ত একাধিকবার রূপকুণ্ড-অভিযান করে প্রতিবারই প্রচুর নিদর্শন নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। ওয়ান গ্রামে একাদিক্রমে দু-তিন মাস থেকে রূপকুণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যালাড সংগ্রহ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ—মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি পাত্র; অল্পবয়স্কা মেয়েদের চুল ও জটা, রুদ্রাক্ষ, মেয়েদের অলঙ্কার, বাহাদুর শাহ্ আলমের রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা।

রূপকুণ্ডের তীর থেকে এ পর্যন্ত কোন অভিযাত্রীই অস্ত্র, বর্ম বা শিরস্ত্রাণ কিছুই পারেননি সংগ্রহ করতে। এপর্যন্ত প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির অনেক কিছুই ধর্মাচরণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। ১৯৫৯ সনে উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণানন্দের সহায়তায় স্বামীজী রূপকুণ্ড-অভিযান করেছিলেন। কুণ্ডের ওপরকার পাতলা বরফের স্তর ভেঙ্গে নৌকো নামিয়েছিলেন গভীরতা মাপবার জন্য। এই বৎসর আমারও রূপকুণ্ডে যাবার কথা ছিল, তাই স্বামীজী ওয়ান গ্রাম থেকে আমার কাছে পত্রলেখেন রূপকুণ্ড থেকে ফিরে এসে। পরে আলমোড়া থেকে তিনি তাঁর রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। তাঁর রিপোর্টে রূপকুণ্ডের আকৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

রূপকুণ্ডের আকৃতি অনেকটা অণ্ডাকার। তার চাপা অংশের ব্যাস ১৫০ ফুট ও দীর্ঘ অংশের ব্যাস ২৫০ ফুট। কুণ্ডের ডানদিকে জিউন্‌রাগলি কল্ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত বরফমুক্ত গিরিবর্ত্ম। নন্দাকিনী উপত্যকায় নামবার পক্ষে উপযুক্ত এদিকের একমাত্র গিরিপথ। এই গিরিপথ থেকে কুণ্ড খাড়া ৩০০ ফুট নীচে জিউন্‌রাগলি থেকে সর্বদা পাথর গড়িয়ে পড়ছে কুণ্ডের তীরে। তাই অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতে কুণ্ডের পরিমাপ হয়তোবা অনেক বড় ছিল। তীর থেকে কুণ্ডের মধ্যস্থলের কিছু দূর পর্যন্ত সমতল। কেন্দ্রের দিকটা ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে গিয়েছে। সবচাইতে ঢালু অংশের গভীরতা ছ' ফুট। কুণ্ডের তীরে প্রায় দু-তিনশ বর্গফুট পরিমিত স্থান চিরতুষারাবৃত। অনেক অভিযাত্রী এইটিকে হিমবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। উপকূলবর্তী চনোনিয়াকোট পর্বতমালার সবচাইতে উঁচু শৃঙ্গ ১৬৫৮৬ ফুট। এ শৃঙ্গও তুষারাবৃত নয়। রূপকুণ্ডের দক্ষিণ-পূর্বে জিউন্‌রাগলি, সেখান থেকে ত্রিশূল পর্বতের দ্বিতীয় শৃঙ্গের হিমবাহ অনেক দূর। তার সঙ্গে রূপকুণ্ডের এই হিমবাহের কোন সংযোগ নেই। রূপকুণ্ডের তলদেশে যদি অবিরাম প্রস্রবণের উৎস থেকেও থাকে, তাহলেও এই হিমবাহও কুণ্ডের জলের অন্যতম উৎস। সার্ভে ম্যাপে চনোনিয়াকোট পর্বতকে ত্রিভুজ বলে উল্লেখ করা আছে। এই ত্রিভুজের কাছে বেশ একটা ডিপ্রেসন। এই ডিপ্রেসন রূপকুণ্ড। ডিপ্রেসনের কিছুটা দূর থেকে রূপগঙ্গার উৎপত্তি। রূপকুণ্ড রূপগঙ্গার উৎস। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই জলধারা সরাসরি কুণ্ড থেকে বের হয়নি। রূপগঙ্গার জলধারা রূপকুণ্ডের হাজার দেড়েক ফুট নীচে পাথরের

ভেতর থেকে বেরিয়েছে। কুণ্ডই যদি রূপগঙ্গার উৎস হয়ে থাকে তাহলে কুণ্ডের তলদেশের কিছু অংশে প্রবেশ্য শিলাস্তর রয়েছে। যে শিলাস্তর দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়তে পারে এত নিচুতে। জিউন্‌রাগলিকে ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলা চলে না। কারণ এই অংশ ত্রিশূল ও নন্দাঘুণ্টির সামনের গিরিশিরার ওপর অবস্থিত। অপ্রশস্ত গিরিপথ। এছাড়া ত্রিশূলের দ্বিতীয় শৃঙ্গ থেকে নেমে-আসা হিমবাহ এই গিরিশিরার উপরে। জিউন্‌রাগলি থেকে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে সেই হিমবাহ এগিয়ে এসেছে খানিকটা। কিন্তু নৈসর্গিক দুর্যোগে বরফের ধস নেমে গড়িয়ে জিউন্‌রাগলির দিকে না আসাই সম্ভব। তবু এই গিরিপথের উভয় পার্শ্বই অসম্ভব ঢালু, যার জন্য এই অপ্রশস্ত অংশ কুয়াসায় আচ্ছন্ন হলে উভয় পাশের যে কোন দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র নয়। আর এ পতনের অর্থ মৃত্যু।

চারঘণ্টারও বেশী রূপকুণ্ডে কাটিয়েছি। কুণ্ড পরিক্রমা দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। কুণ্ডের তীরে-পড়ে-থাকা নরকঙ্কালের মধ্যে তাঁবুর বাঁশ তুলে নিয়ে কুণ্ডের জলের ভেতর খুঁচিয়ে দেখেছি। জিউন্‌রাগলি থেকে গড়িয়ে-পড়া অনেক পাথর জমা আছে কুণ্ডের জলে। কুণ্ডের জলের ভেতর থেকে কোন অভিযাত্রীরই নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, পূর্ববর্তী অভিযাত্রীদের কেউই কুণ্ড বরফমুক্ত অবস্থায় দেখেননি। জিউন্‌রাগলিতে উঠে দেখেছি। মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে শৈলসমুদ্র হিমবাহ, তার কাছেই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড। শৈলসমুদ্র হিমবাহ থেকে আরও পাঁচ মাইল দূরে হোমকুণ্ড, বড়ি নন্দজাত তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্যস্থল। পরিষ্কার দেখা যায় আবহাওয়া ভাল থাকলে। ত্রিশূল আর নন্দাঘুটির পাদদেশে হোমকুণ্ড। স্বামীজীর কাছে শুনেছি, হোমকুণ্ডে হোম করবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি শুরু হয়। তার অবশ্য কারণ, নন্দাঘুটি ও ত্রিশূলের খাঁজে জমা থাকে অনেক মেঘ। হোম করলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয় দহনের ফলে। এই গ্যাস মেঘের সরাসরি সংস্পর্শে আসে যার জন্য মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি হয়। তীর্থযাত্রীরা কিন্তু একেই স্থানমাহাত্ম্য বলে মেনে নেয়।

জিউন্‌রাগলি থেকে রূপকুণ্ডের দিকে তাকালে সাড়ে তিনশো ফুট নীচে কুণ্ডকে অপরূপ দেখায়। জিউন্‌রাগলির ওপর গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর। সন্তর্পণে না হাঁটলে পা হড়কে যাওয়াব সম্ভাবনা। আর, একবার পা হড়কে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে রূপকুণ্ডের গহ্বরে। গহ্বরের ধার খাড়া। তাই জিউন্‌রাগলি থেকে অবতরণ অসম্ভব। এ ছাড়া, বড় বড় পাথরের ডেলা যখন-তখন গড়িয়ে পড়ে। তাই অবতরণ বিপজ্জনক। কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ এই জিউন্‌রাগলির নীচেই। কঙ্কালের পরিপূর্ণ এলাকার পাশেই ছতোলী, তাঁবুর খুঁটি। সেখানে মৃতদেহাবশেষের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। ঝড়ে ছতোলী ও তাঁবু উড়ে গিয়ে ঠিক নীচে গিয়ে না পড়ে একটু দূরে পড়েছে। সে এলাকায় তাই কঙ্কালের চিহ্নমাত্র নেই। খুব গভীরভাবে জিউন্‌রাগলি থেকে এই বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করলে এ ধারণা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। সাধারণত ঝড়বৃষ্টিতে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা জিনিসগুলো বাতাসে উড়ে দূরে চলে যায়।

অধ্যাপক ডি. এন. মজুমদার রূপকুণ্ড থেকে সংগৃহীত নিদর্শনগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা এই রূপকুণ্ড- রহস্যের ওপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায়

বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে সমস্ত নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো শুধু ভারতের বীক্ষণাগারেই পরীক্ষা করে তৃপ্ত হননি। কিছু কিছু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বিভিন্ন বীক্ষণাগারেও পাঠিয়েছিলেন।

ফ্লোরিন কন্‌টেন্টস্ পরীক্ষায় তিনি সিদ্ধান্ত করেন, মৃত নরনারীদের প্রত্যেকেই একই শ্রেণীভুক্ত নয়। রেসিয়্যাল অ্যাফিনিটি পরীক্ষায় তিনি ৬০/৭০টি মানুষের crania bone সংগ্রহ করে স্থির করেছিলেন—রূপকুণ্ডের তীরে মৃত মানুষদের সকলেই একই জাতীয় মানুষ নয়। Radio carbon dating এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নরকঙ্কালের বয়স নির্ণয় করেছে। শ্রদ্ধেয় মজুমদারের সিদ্ধান্ত যথার্থই মূল্যবান।......

সমস্ত অভিযাত্রীদের রিপোর্ট এবং তথ্য থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ছ'শো বছর পূর্বের মানুষগুলোর মৃত্যুর কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু এ মানুষগুলোর পরিচয় কী? এরা যদি তিব্বতীয় ব্যবসায়ীর দল হয়ে থাকে?

বহু প্রাচীনকাল থেকেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল। তিব্বতীয়রা হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করত জুন-জুলাই মাসেই, আর অক্টোবর-নভেম্বরে তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ পেরিয়ে চলে যেত দেশে। কিন্তু খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কৈলুবিনায়কের পর থেকে হোমকুণ্ড পর্যন্ত কোন পথ নেই। এ পর্যন্ত কেউ হোমকুণ্ড থেকে আরও এগিয়ে উত্তর দিকে হোমকুণ্ডগলি কল্ পেরিয়ে যেতে পারেনি। ১৯০৭ সনে ডঃ লঙস্টাফ মাউণ্টেইনীয়ারিংয়ের উপযোগী সাজসরঞ্জাম নিয়ে হোমকুণ্ডগলি কল্ পর্যন্তই পৌঁছতে পেরেছিলেন। হোমকুণ্ডগলি কল্ পেরিয়ে ঋষিগঙ্গা উপত্যকায় অবতরণ সম্ভব হয়নি। ১৯২৭ সনে আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার মিঃ রাটলেজও সম্ভাব্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে হোমকুণ্ডগলি কল্ পেরিয়ে যেতে পারেননি। মিঃ রাটলেজ ছিলেন প্রখ্যাত পর্বতারোহী। তিনি এভারেস্টে আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। জিউন্‌রাগলি কল্ ও হোমকুণ্ডগলি কলে বৎসরে একবার অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই যাওয়া সম্ভব। হোম কুণ্ডগলির পরে চম্বাখড়্খ, অপর পার্শ্বে রণ্টিগড়। এই সমস্ত পথের কোথাও ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড নেই বা গুহা নেই, অন্তত যেখানে রাত্রি কাটানো যেতে পারে। জ্বালাবার কাঠ সংগ্রহও সম্ভব নয়। কারণ কাছাকাছি গ্রাম নেই। আর এই স্থানগুলির উচ্চতা তেরো থেকে চোদ্দ হাজার ফুটের কাছাকাছি বলে বরফ, পাথর, বড় জোর ঘাস মিলবে।

তিব্বতীয়রা যোশীমঠ তপোবন ও নিতি দিয়েই সবচাইতে বেশী যাতায়াত করে। রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড দিয়ে কোন পথ নেই তিব্বত যাবার।

রূপকুণ্ডের নিকটবর্তী হুনিয়া থর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। হুনিয়া থরে সব মিলিয়ে প্রায় ছ-সাতটি ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড রয়েছে। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলোকে তিব্বতীয়দের ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে ভুল হতে পারে। অর্থ অনুযায়ী এ ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এ ধারণার সমর্থনযোগ্য কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলো দু ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে শুধু কয়লার গুঁড়ো পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ছাগল বা ভেড়ার মল পাওয়া যায়নি। স্বামীজী বলেছেন, "Huniya or Bhotia camping spots

are semicircular in shape bounded by loose stone walls on the curving side and they are invariably covered with droppings of sheep. The fire place is also an essential feature.''

দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর স্বামীজী কৈলাস-মানসসরোবরের তীরে কাটিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিব্বতীয়দের সঙ্গে তিনি গভীরভাবে মিশেছিলেন। তিব্বতীয়দের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রাপ্রণালী তাঁর বিশেষভাবে পরিচিত। তাই তাঁর এ যুক্তি সমর্থনযোগ্য।

এ ছাড়া রূপকুণ্ড থেকে সংগৃহীত চপ্পল এবং অন্যান্য নিদর্শনের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী বা ভুটিয়াদের ব্যবহৃত চপ্পলের বা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মিল নেই আদৌ। তিব্বতীয়রা যদি রূপকুণ্ডের পথে আসত, তাহলে এই মৃতদেহাবশেষের সঙ্গে পাওয়া যেত তাদের পথের সম্বল ও নিত্য সঙ্গী ভেড়া বা ইয়াকের কঙ্কাল।.....

১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত স্বামী প্রণবানন্দ প্রতি বৎসরই একাধিকবার রূপকুণ্ড অভিযান করেছেন। রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড সম্পর্কিত ব্যালাড সংগ্রহ করেছেন ওয়ান, সুতোল এবং গাড়োয়ালের নুটিয়াল পল্লী থেকে। তাঁর সংগৃহীত নিদর্শন অন্যান্য যে-কোন অভিযাত্রীদলের সংগৃহীত নিদর্শনের তুলনায় ঢের বেশী। বার বার রূপকুণ্ড অভিযানের ফলে রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ডের টোপোগ্রাফি সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। দীর্ঘ চার বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁর মতবাদকে সমর্থন যোগ্য করতে। তাই তাঁর মতবাদে যুক্তি যেমন প্রচুর, তেমনি রয়েছে গ্রহণযোগ্য বহুল তথ্য। মনে হয় তাঁর মতবাদের আলোকেই রূপকুণ্ডের রহস্য উদঘাটিত হবে। স্বামীজীর ধারণা, রূপকুণ্ডের তীরে মৃতদেহাবশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে হত তীর্থযাত্রীদলের। আর এই তীর্থযাত্রীদল যশোদয়াল-কা রাস্যায় বর্ণিত কনৌজের রাজা যশোদয়ালের।

তীর্থস্থান হিসাবে রূপকুণ্ডের প্রসিদ্ধি তেমন নেই। প্রকৃত পক্ষে তীর্থস্থান—হোমকুণ্ড। তাই বড়ি নন্দজাত তীর্থযাত্রীদের প্রধান উদ্দেশ্য হোমকুণ্ড তীর্থদর্শন এবং সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা। এই হোমকুণ্ড তীর্থের পথেই রূপকুণ্ড। তাই হোমকুণ্ড তীর্থযাত্রাপথে জিউন্‌রাগলিতে অবস্থান এবং তুষারঝড়ে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানো খুবই স্বাভাবিক। রূপকুণ্ড ও জিউন্‌রাগলির অবস্থান ভাল করে লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। রূপকুণ্ড থেকে প্রাপ্ত জটা, কোঁকড়ানো চুল, রুদ্রাক্ষ, কাঠের পাত্র এবং অন্যান্য উপকরণগুলি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হয়। নদী বা কুণ্ডের জলে টাকাপয়সা নিক্ষেপ করে দেবতার নামে উৎসর্গ করা, দেবতার স্তবস্তুতি করার রীতি এখনও প্রচলিত। দেবতার নামে কুণ্ডের জলে চুল ও জটা নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রূপকুণ্ডের তীর থেকে সংগৃহীত মুদ্রা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীরা মাঝে মাঝেই আসে, এ অনুমান করা অবাস্তব নয়। রূপকুণ্ডের তীর থেকে আমাদের সংগৃহীত দুইটি ভিন্ন সময়ের মুদ্রা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায়, এই মুদ্রাগুলো ভিন্ন ভিন্ন তীর্থযাত্রীদল কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। স্বামীজী কর্তৃক সংগৃহীত চুল ও জটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, এগুলো কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছিল। রূপকুণ্ডে ধারালো অস্ত্র দিয়ে

কাটা জটা ও চুল পাওয়ার একমাত্র কারণ, এই চুল ও জটাগুলি তীর্থযাত্রীদলের কেউ নিশ্চয়ই দেবতার নামে উৎসর্গ করে নিক্ষেপ করেছিল কুণ্ডের ভিতরে। হোমকুণ্ড তীর্থ আজও লুপ্ত হয়নি। ১৯৫১ সনের শেষ বড়ি নন্দজাতই তার প্রমাণ। এ ছাড়া ছোটি নন্দজাত উৎসব প্রতি বৎসরই পালিত হয়। সে উৎসবে নন্দাদেবীর জাগার গাওয়া হয়ে থাকে। সে জাগারে রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। তাই রূপকুণ্ডের তীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষের কঙ্কাল সম্বন্ধে একমাত্র তীর্থযাত্রীদের কথাই ভাবা যায়। সংগৃহীত তথ্যগুলিই এই মতবাদের সহায়ক। কিন্তু এই তীর্থযাত্রীদের পরিচয় কী?

আজ থেকে ছ শো বছর পূর্বে বড়ি নন্দজাত উৎসব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলিত হয়েছিল। সুতরাং তীর্থযাত্রীদল এই পথে হোমকুণ্ড যাত্রা করেছেন ছ শো বছর পূর্ব থেকেই।

হোমকুণ্ড তীর্থের পথ সম্বন্ধে নন্দাদেবীর জাগার বা ব্যালাডে পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। হোমকুণ্ড ও রূপকুণ্ড সম্পর্কিত যশোদয়াল-কা রাস্যায় কনৌজের রাজা যশোদয়ালের তীর্থযাত্রার বর্ণনা রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে রাজা যশোদয়াল-রাণী বল্লভা ও তাঁদের সহযাত্রীদের জিউন্‌রাগলিতে শোচনীয় পরিণতির উল্লেখ। যশোদয়ালের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন স্বামীজী গাড়োয়াল-রাজপুরোহিত নুটিয়ালদের কাছ থেকে। নন্দজাতে নন্দাদেবীর পাল্কীর পূজারী পণ্ডিত গাড়োয়ালের কুড়ুড গ্রামের ব্রাহ্মণেরা। এই পূজারীদের কাছে রয়েছে তাম্রলিপি। তাতে উল্লেখ রয়েছে রাজা যশোদয়ালের তীর্থযাত্রীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা। বড়ি নন্দজাত উৎসব প্রবর্তনের পরেই রাজা যশোদয়াল তার গাড়োয়ালী রাণী বল্লভাকে নিয়ে বিরাট তীর্থযাত্রীসহ হোমকুণ্ড যাত্রা করেছিলেন চতুর্দশ শতকের শেষভাগে। রাজা এই তীর্থপথের নিয়ম লঙ্ঘন করে চর্ম পাদুকা পরিধান করেন এবং রমণী নিয়ে এসেছিলেন। তার ওপর রাণী বল্লভা সন্তান প্রসব করে তীর্থস্থান কলুষিত করেন। তাই নন্দাভগবতীর অভিশাপে তাঁরা বিনষ্ট হন। যশোদয়াল-কা রাস্যা গাড়োয়ালী ভাষায় রচিত গাথা। রচয়িতা যদি কিছু কিছু অতিরঞ্জিতও করে থাকেন, তবু এক কনৌজরাজের তীর্থযাত্রা ও তাঁর শোচনীয় পরিণতির নির্ভরযোগ্য বিবরণ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ এই গাথার সঙ্গে কুড়ুড গ্রামে পূজারী-ব্রাহ্মণদের কাছে প্রাপ্ত তাম্রলিপির সঙ্গতি রয়েছে। রূপকুণ্ডের তীর থেকে স্বামীজী মেয়েদের পায়ের অঙ্গুরীয় সংগ্রহ করেছেন। এ ধরনের অঙ্গুরীয় কনৌজের রমণীরা ব্যবহার করে থাকেন। ১৯৫৬ সনের অভিযাত্রীদল এবং স্বামীজী ভূর্জপত্রের ছতোলী সংগ্রহ করেছিলেন রূপকুণ্ড থেকে। বড়ি নন্দজাত উৎসবে ভূর্জপত্রে ছাওয়া এই ধরনের ছতোলীর প্রচলন রয়েছে। এই ছতোলীতে লোহার ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। এরকম ঘণ্টাও স্বামীজী সংগ্রহ করেছেন। একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগতে পারে—ব্যালাড অনুসারে রাজা যশোদয়াল, রাণী বল্লভা কিছু কিছু লোকজনসহ গিমতলিতেই বিনষ্ট হন; অথচ গিমতলি বা বাল্‌পা সুলেড়ায় কোন মৃতদেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। বাল্‌পা সুলেড়ার ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড পাহাড়ের কোলে। তার পরেই জমি হঠাৎ অসম্ভব ঢালু হয়ে গিয়েছে, যার জন্য তুষারপাত হলে তুষার জমা হতে পারে না সহজে। তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজা ও রাণী এবং অন্যান্য লোকজনের তুষারের সঙ্গে সঙ্গে নীচে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

হুনিয়া থর ও বাল্‌পা সুলেড়া থেকে স্বামীজী কর্তৃক সংগৃহীত পাত্র, মেয়েদের অলঙ্কারের সঙ্গে ওয়ান গ্রামের মেয়েদের অলঙ্কারের মিল আছে। ত্রয়োদশ শতকে কুমায়ুনের শেষ কাত্যুরিরাজা বীরদেবের সময় ওয়ান গ্রামে ২০০০ পরিবারের বসবাস ছিল। রূপকুণ্ডে প্রাপ্ত কাঠের পাত্র, বোঝা-না-নামিয়ে-ঠেকিয়ে-রাখবার দণ্ড, ডুলি বা পাল্কী ঠেস দিয়ে রাখবার কাঠের দণ্ড দেখে অনুমান করা যেতে পারে, রাজা যশোদয়াল পোর্টার নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ান গ্রাম থেকে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগে হত মানুষদের মধ্যে two ethnic groups বলতে দুটো দল বিভিন্ন সময়ে মারা গিয়েছে এ ধারণা সত্য নয়। এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন. "The wooden vessels, the mata, and the doli supporting poles found at Rupkund go to prove that some of the victims were from the Wan region, possibly local porters and attendants of Jasdhaul and his Rani." তাই দুই রকম খুলি হয়তো যশোদয়ালের সহযাত্রী ও স্থানীয় পোর্টারদের।

রূপকুণ্ড-রহস্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতবাদকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব-বিভাগ। কলকাতা নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে ১৯৬০ সনের ২৮শে জুলাইয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে রূপকুণ্ড-ট্র্যাজেডির অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। রূপকুণ্ড থেকে ১৯৫৬ সনে সংগৃহীত cultural remains এবং skeletal remains পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, রূপকুণ্ডের তীরে মৃতদেহাবশেষগুলি তীর্থযাত্রীদলের।.....

ওয়ানে স্বামীজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। হোমকুণ্ড তীর্থে চর্মপাদুকা নিয়ে যাওয়া তীর্থযাত্রার রীতিবিরুদ্ধ। রাজা যশোদয়াল তীর্থযাত্রার নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন চর্মপাদুকা ও মেয়েদের নিয়ে এসে। রাণী বল্লভা সন্তান প্রসব করে তীর্থপথের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। যশোদয়াল-কা রাস্যায় এই তীর্থযাত্রীদের এইগুলিই ধ্বংসের কারণ বলে উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৮৬, ১৯০৫, ১৯২৫, ১৯৩১, ১৯৫১ সনের বড়ি নন্দজাতগুলোর সবই হোমকুণ্ড পৌঁছতে পারেনি। এই নন্দজাতগুলিতে কিছু সংখ্যক যাত্রী তুষারঝড়ে বিনষ্ট হয়েছিল। ১৯৫১ সনের বড়ি নন্দজাত উৎসব হোমকুণ্ডে না পৌঁছবার কারণ, তীর্থযাত্রার প্রচলিত নিয়ম অমান্য করা। এ সম্বন্ধে কুড়ুড় গ্রামের পূজারী ও নুটিয়ালদের কাছে অনেক তথ্যের সন্ধান মিলবে।

তীর্থযাত্রীরা পশমী পোশাক পরিধান করবে, এমন কোন নিয়ম নেই। ১৯৫৬ সনে রূপকুণ্ড থেকে অভিযাত্রীদল সামান্যই পোশাক-পরিচ্ছদের টুকরো সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৬ সনের দলের-বক্তব্য পেশ করছি, "The site was under 12ft. of snow. No digging was possible." ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বরে "Kund was covered with snow, digging was difficult." অথচ ১৯৫৬ সনের সংগৃহীত নিদর্শনের ভিত্তিতেই অধ্যাপক মজুমদারের মন্তব্য। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বরে নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ, অভিযাত্রীদলের সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জন পোর্টার ছিল। এই অভিযাত্রীদলগুলির ভিতরে কেউই বরফমুক্ত রূপকুণ্ড দেখেননি। এঁদের সংগৃহীত সমস্ত নিদর্শন রূপকুণ্ডের উপকূলের অনেক উঁচু থেকে। তাই বরফমুক্ত কুণ্ডের তীর থেকে বা

ভেতর থেকে আরও হয়তো বিচিত্র নিদর্শন সংগৃহীত হতে পারে। Hair test-এর রিপোর্ট অনুযায়ী অধ্যাপক মজুমদার নিজেই মেনে নিয়েছেন---রূপকুণ্ড থেকে সংগৃহীত চুল ও জটাগুলো কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ধর্মাচরণের বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

রূপকুণ্ড-রহস্য সম্বন্ধে কোন মতবাদের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত হতে পারেননি। তার মূল কারণ, এঁরা শুধু তথ্য আহরণ করেই রূপকুণ্ড-রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গবেষণা চালিয়েছেন। রূপকুণ্ডের টোপোগ্রাফি সম্বন্ধে খুব অস্পষ্ট ধারণা থাকায়, তাদের মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। তাই মতবাদগুলি অসার প্রমাণ করবার পক্ষে যুক্তি রয়েছে প্রচুর।

আমি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে রূপকুণ্ড দেখেছি। রূপকুণ্ডের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। তেমনি তীরে অজস্র নরকঙ্কাল দেখে অনুভব করেছি অদ্ভুত বেদনা। রূপকুণ্ডের পথ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রূপকুণ্ড সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প, গাথা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওয়ান ও মান্দোলীর গ্রামবাসীদের কাছে আগ্রহভরে শুনেছি রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ডের বিবরণ। বৈদিনীর মহিষাসুর-মর্দিনীর মূর্তি, কৈলুবিনায়কের গণেশমূর্তি আমাকে শুধু বার বার সুদূর অতীতের তীর্থযাত্রীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রূপকুণ্ড থেকে ফেরবার পথে বগুয়াবাসায় রাত জেগে রাইচাঁদের কাছে শুনেছি রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড সম্পর্কিত জাগারগুলো।···

১৯৫৯ সনে রূপকুণ্ডের নাম প্রথম শুনি। রূপকুণ্ডের তীরে একদল নরনারী ও শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে বরফ ও পাথরের তলায়। কোথাকার মানুষ এরা? কেন গিয়েছিল রূপকুণ্ডে? এ চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর দায়িত্ব তথ্যানুসন্ধানীদের। সে দায়িত্ব নিয়ে রূপকুণ্ড যাবার মত সামর্থ্য আমার নেই। সন্ধানী দৃষ্টি শুধু কার্যকারণের পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়। প্রকৃতির অপরূপ রূপসম্ভার সে দৃষ্টির আড়ালে পড়ে থাকে। তাই তথ্যানুসন্ধানীর দৃষ্টিতে রূপকুণ্ড একটি সাধারণ হ্রদ। এই হ্রদের তীরের স্তূপীকৃত নরকঙ্কালের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলেই তথ্যানুসন্ধানীরা ভুলতে শুরু করবে রূপকুণ্ডকে।

আমার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি। লোকালয়ের কোলাহলে আমার দৃষ্টি ক্লান্ত, অভাব-অভিযোগ আর হতাশায় জর্জরিত। তাই হিমালয়ের নিভৃতে এই হ্রদ আমার দৃষ্টিতে রহস্যময়। এ রহস্য রূপকুণ্ডের তীরের ওই বীভৎস দৃশ্যের জন্য নয়। তীর থেকে ওই বীভৎস দৃশ্যের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেললেও রূপকুণ্ড তার রহস্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবে। চিরকাল ডাকবে হাতছানি দিয়ে। প্রলুব্ধ করবে নতুন নতুন রূপে। আমি শুধু রূপকুণ্ড দেখতে গিয়েছিলাম। তাই রূপকুণ্ড দেখে এলাম। "Time which antiquates Antiquities, and hath an art to make dust of all things, hath yet spared these minor Monuments".*

*লেখকের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

গুলমার্গ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জাঁহাপনাকে সেলাম। হাজার কুর্নিশ ইউসুফ শাহ চককে। খুঁজে-পেতে জবর জায়গাটি বের করেছিলেন তিনি।

আজ থেকে কয়েকশ বছর আগেকার কথা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার কাহিনী। কাশ্মীরে চকদের শাসন চলছে তখন। দেড় বছরের নির্বাসন থেকে ইউসুফ শাহ চক সবে ফিরে এসেছেন। শাহজাদার মন ভালো নেই। নির্বাসনের গ্লানিকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি। পারিষদরা পরামর্শ দিলেন, বদলা নিন। দুশমনদের শায়েস্তা করুন।

শাহজাদা বললেন, থাক ওসব। মন ভালো নেই।

—কি উপায় তবে? পারিষদরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শাহজাদা জানালেন, উপায় একটা আছে। ভাবছি, বিশ্রাম নেব কয়েকদিন। পীর-পাঞ্জালের ফুলবাগিচা গুলমার্গে গিয়ে কিছুদিন থাকব।

কথা শুনে অবাক হলেন নবীন পারিষদরা। মাথা হেঁট করে দাঁড়ালেন সব। কিন্তু যাঁরা প্রবীণ, জাঁহাপনার মর্জি বুঝে নিতে তাঁদের এতটুকু কষ্ট হল না। ওঁরা ঠিক বুঝলেন, হারানো জায়দাদে নয়, কুঞ্জবনে মন পড়ে আছে জাঁহাপনার। প্রতাপ নয়, প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিরালায় বেগমসাহেবার আশনাই চাইছেন।

সবাই ভুলতে পারেন গুলমার্গকে। কিন্তু ইউসুফ শাহ পারেন না। তাঁর যৌবনের অনেক সুখস্বপ্ন জড়িয়ে আছে ওখানে। ওখানকার মাঠ-ময়দান আর বন-পর্বত তাঁর অনেক প্রেম-মদির মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে আছে। তা'ছাড়া গুলমার্গ নামটিও তাঁরই দেওয়া। আগে ও জায়গাটির নাম ছিল গৌরীমার্গ। লোকে বলত, শিব-জায়া গৌরী এই মার্গ বা মাঠ ধরেই স্বামী সন্দর্শনে যান।

ইউসুফ শাহ বললেন, অনেক ফুল ফোটে এই পথে। এই মাঠে হাজার ফুলের জেল্লা। তাই এর নাম দিলাম, 'ফুলের ময়দান'—গুলমার্গ।

প্রেয়সী হব্বা খাতুন পাশেই ছিলেন। নামটি মনে ধরল তাঁর। বললেন, হক কথা খোদাবন্দ্। এমন ফুলবাগিচা আর নেই কোথাও। পীর-পাঞ্জালের আর কোথাও এমন ময়দান নেই। গুলমার্গ নামেই ডাকব একে।

সেই থেকে নাম হল গুলমার্গ। আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু করে নফর-বাঁদী অবধি সবাই এই একই নামে ডাকল।

প্রতি গ্রীষ্মে গুলমার্গে ছুটে আসতেন ইউসুফ শাহ। পাশে থাকতেন হব্বা খাতুন। এর পর থেকে কত গ্রীষ্ম পেরিয়ে গেছে। ইউসুফ শাহের পথ ধরে কত যে সৌন্দর্য-রসিক এসেছেন এখানে, সীমা-সংখ্যা নেই তার। কত যুগের কত যে প্রেমিক এখানকার আনন্দমদিরায় মাতাল হয়েছেন, কেউ তার হিসেব রাখে নি। শুধুমাত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের

কথা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার নয়। নুরজাহানের স্মৃতি আজও গুলমার্গের পথে-পথে আলো ছড়ায়। মুঘল বাদশাহের কাহিনী অনেকেরই মুখে-মুখে ফেরে। কিন্তু গুলমার্গের ঝরনাধারার কথা অনেকেই হয়ত জানেন না। হয়ত অনেকেই ভাবেন না, ওই ঝরনাধারার পাশেই বেগম-সাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে জাঁহাপনা চড়ুইভাতি করতেন। জল আসত ঝরনা থেকে। কাঠ আসত সামনের ওই বন থেকে। পাহাড়ীয়ারা জাফরান দিয়ে যেত। কোপ্তা-কাবাব আর কালিয়া-কোর্মার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত এখানকার বাতাসে।

এর পর কেটে গেছে বহু যুগ। রাজ্যের হাত-বদল হয়েছে। পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে কাশ্মীরের ওপর দিয়ে। অনেক কিছুর কথাই ভুলে গেছে মানুষ; কিন্তু গুলমার্গকে ভুলতে পারে নি। তাই আজও ওখানে আনন্দের তুফান ওঠে। ইউসুফ শাহ আর জাহাঙ্গীরের পথ ধরে আজও শত-শত লোক যায় ওখানে।

গিয়েছি আমরাও। দেখেছি বাদশাহী প্রেমের স্মৃতি-জড়ান ময়দানটিকে।

মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। বাতাসে পপলার গাছ থেকে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ সৌরভ। ভূস্বর্গের চারদিকে তুষারে-ঢাকা পাহাড় ঝকমক করছে। চলেছি গুলমার্গের পথে, পপলার অ্যাভিন্যুর ভিতর দিয়ে।

বড় মনোরম সেই অ্যাভিন্যু। ঘন সবুজ পপলারগুলো বেড়ে উঠেছে; অগুনতি তোরণ রচনা করেছে পথে-পথে। আলোতে-ছায়াতে মিলে পথটি হয়ে উঠেছে অপরূপ। পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে ভূস্বর্গের মাঠ-ঘাট দেখতে পাচ্ছি।

জাঁহাপনাকে আবার মনে পড়ল; সেলাম জানালাম আবার। ইউসুফ শাহকে জানালাম হাজার কুর্নিশ। তিনি ছিলেন বলেই গুলমার্গের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার দুঃখ-শোকের মধ্যেও দিন-গুজরান করার সুযোগ পেয়েছে অনেক লোক।

আজও গুলমার্গের পথ ধরে চলেছে ওরা। আমরাও চলেছি। হয়তো সেই একই পথ ধরে চলেছি, যে পথে জাঁহাপনারা যেতেন। কয়েকশো বছরে পথের চেহারা হয়তো বদলেছে; যা' ছিল অপ্রশস্ত ও এবড়োখেবড়ো, তা এখন চওড়া ও মসৃণ হয়েছে। আশে-পাশের পাইন গাছগুলোও বুড়ো হয়েছে নিশ্চয়। নিশ্চয় অনেক নবীন গাছ প্রাচীনদের স্থান দখল করেছে। কিন্তু আর সবই ঠিক তেমনি আছে। সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, সেই প্রাণান্তকর চড়াই, সেই ছায়াঘন নিবিড় অরণ্য এতটুকু বদলায় নি।

চলেছি সেই অরণ্যের গা ঘেঁষে। আমাদের এক পাশে পাইন আর ফারের সমারোহ। অপর পাশে গভীর খাদ। খানিকটা দূরেই বরফে-ঢাকা পাহাড়। সূর্যের আলোকে ঝলমল করছে তার শ্বেত-শীর্ষ। তুষারকিরীটের চকমকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টিকে তাই সরিয়ে আনছি এক-একবার। দূরের পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ পাইনগাছগুলোর দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু এত সুন্দর ওই পরিবেশ যে, কোন একটা বিশেষ জায়গায় চোখ থাকছে না। নীচের উপত্যকার শ্যামলিমা মন ভোলাচ্ছে কখনও, কখনও আবার নীল আকাশের গায়ে শুভ্র যবনিকা টেনে দিয়ে তুষারধবল পাহাড় সৌন্দর্যের মায়াজাল বুনছে। পথের পাশের বনভূমির দিকে তাকাচ্ছি কখনও, আবার রঙবেরঙের বুনো ফুলের মহোৎসব দেখছি।

পাশের পাইন আর ফার বন থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছে। ঝরনার কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি থেকে-থেকে। আশে-পাশে অনেক প্রস্রবণ নজরে পড়ছে। অপরূপ এই পথ। মনে হল, ঠিক এই রকম না হলে জাঁহাপনার ফুলবাগিচার মর্যাদা অটুট থাকত না বুঝি। বুঝি রাজকীয় মহিমায় আঘাত লাগত। কিন্তু সে সুযোগ বিন্দুমাত্র নেই এখানে। রহস্যময় হিমালয় এখানে তার সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন এমনভাবে খুলে ধরেছে, যা' দেখে অতি বড় বস্তুবাদীও থমকে দাঁড়াবে। অন্তত একটি মুহূর্তের জন্যেও কবি হয়ে উঠবে সে। ক্ষণিকের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। জগতের কেউ জানবে না একথা। সংসারচক্রের বিচিত্র জমা-খরচ কষতে গিয়ে সে নিজেও কালক্রমে হয়ত ঠিক আগের মতই নিশ্ছিদ্র বস্তুবাদীতে পরিণত হবে। কিন্তু তবু একটি বিশেষ মুহূর্তে তার বন্ধ ঘরে যে আলোক ছড়িয়ে পড়েছিল সেকথা কোনোদিন সে অস্বীকার করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে অনেক দূর এলাম। আমরা কয়েকজন মাত্র পায়ে হেঁটে পথ চলছি। বাকী প্রায় সবাই পনিতে, কেউ কেউ ডাণ্ডি চেপে চলেছেন, হেলানো এক-একটি চেয়ারে বসে আছেন দু-একজন। চারজন করে কুলি ওদের বইছে। কুলি আমাদের সঙ্গেও রয়েছে। আর রয়েছে 'পনি'। কিন্তু 'পনি'তে চাপবার প্রয়োজন বোধ করি নি এখনও। এখনও নিজের ভারটা অপর কারও ওপর চাপিয়ে দেবার মতো অবসন্ন হই নি।

অথচ পথ সহজ নয় মোটেই। বরং বেশ খাড়াই। টানমার্গ থেকে গুলমার্গ যাওয়া মানে, চার মাইল পাহাড়ী পথে প্রায় দু-হাজার ফুট উঠে আসা। গুলমার্গ দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৭০০ ফুট উঁচুতে। আর টানমার্গের উচ্চতা ৭,০০০ ফুটের চেয়ে কিছু কম।

লক্ষ্য করলাম, কুলিদের অনেকেই কোনাকুনি পথ ধরে যায়। চলতে চলতে পাশের বনে অদৃশ্য হয় হঠাৎ। খানিকক্ষণ পরে আবার পথের গা বেয়ে উঠে আসে। এইভাবে চলে পথের দূরত্বকে অনেকখানি কমাতে পারে ওরা। সেই সঙ্গে বাড়াতে পারে বিশ্রামের সময়টুকু।

আমরাও বিশ্রাম নিচ্ছি মাঝে মাঝে। পথের পাশে বসে পড়ছি কখনও। কখনও আবার কোনো পাহাড়ী ঝরনার জল পান করছি। এক-একবার ঝরনার তিরতিরে প্রবাহকে দেখে ভাবছি, এর সমস্তটুকু আত্মসাৎ করলেও তৃষ্ণা মিটবে না। কিন্তু সে জল এত ঠাণ্ডা যে, হাত দিয়েই মনে হচ্ছে, অর্ধেক তৃষ্ণা মিটে গেল।

এইভাবে থেমে থেমে পথ চলছি আমরা। হিমশীতল হাওয়া আমাদের সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, এই পথের যেন শেষ নেই। যেন অনাদি-অনন্তকাল ধরে চলেছি আমরা। চলতে চলতে থামবো গিয়ে দূরের ওই আকাশের গায়ে।

আকাশ আশ্চর্য এক দাক্ষিণ্য নিয়ে আমাদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। তার এখানে-সেখানে দু-এক খণ্ড মেঘ চোখে পড়ছে। সে মেঘ থেকে-থেকে স্পর্শ করছে আমাদের চারপাশের বনভূমিকে। দূরের পাহাড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেঘ ও রৌদ্রের আনাগোনা।

আকাশ আমাদের মাথার ওপরেই নেই শুধু। আমাদের পাশের পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাতালের দিকে নেমে গেছে।

একবার মনে হল, স্বর্গলোক ছাড়িয়ে চলে আসি নি তো? ভূলোককে পেছনে ফেলে নতুন কোন নক্ষত্রলোকের পথে যাত্রা করি নি তো?

হঠাৎ সুন্দর একটি ঝরনা চোখে পড়ল। মাটির পৃথিবীর স্পন্দন কানে এল আবার। পাইন বন থেকে ভেসে-আসা মিষ্ট সুবাস মধুগন্ধ ভরা ধরিত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ঝরনাটি বড় অপরূপ। পাশের বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পথের ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে এগিয়ে গেছে। যেন কোন চঞ্চল শিশু। নিষেধের গণ্ডিটুকু মাড়াতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করছে না।

ঝরনাটি পেরিয়ে এলাম আমরা। আবার একটা বাঁক ফিরে উন্মুক্ত একফালি জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি, অনেকেই বিশ্রাম নিচ্ছে ওখানে। যাত্রীদের কেউ কেউ হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কুলিরা বসে বসে ধুঁকছে। পনিগুলো দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান এক-একটি অসহায়ের মত। দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্রাম নেবার এই হল একটি চিরস্থায়ী জায়গা। শুনেছি, এখানে এসে পনি আপনার থেকেই থমকে দাঁড়ায়; খানিক্ষণ জিরিয়ে না নিয়ে কিছুতেই নড়তে চায় না।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার পা বাড়াই আমরা। আবার নতুন করে পথ চলি। সিডার বন চোখে পড়ে এবার। আর চোখে পড়ে রাশি-রাশি বুনো ফুল। বসন্তের বরফ-গলা জল আরণ্যক হিমালয়ে ফোটা-ফুলের মহোৎসব লাগিয়েছে। মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে রাশি-রাশি ইন্দ্রধনু।

ইন্দ্রধনুর দু-এক জায়গায় মেঘের মতো সাদা-সাদা কী যেন চোখে পড়ছে। ভাল করে তাকাতেই দেখি, জমাট তুষার। বোঝা গেল, ছায়াচ্ছন্ন কোনো কোনো আশ্রয়ে শীত এখনও স্তব্ধ। যাই যাই করেও যাওয়া হয় নি তার। তার জমান সঞ্চয়টুকু এখনও নিঃশেষিত হয় নি।

আর মাত্র কয়েকদিন। তার পরেই ঋতুরাজের একাধিপত্য চলবে এখানে। শীতের শেষ চিহ্নটুকুও থাকবে না। বসন্তের একটানা বন্দনায় প্রকৃতি মুখর হবে। গ্রীষ্মের দহন ও বর্ষার ধারাবর্ষণের মধ্যেও এই মুখর প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তার রঙবদল শুরু হবে সেই শরতে। ফোটা-ফুলের মহোৎসব বন্ধ হবে তখন। আসবে ঝরা-ফুলের দিন। তখন পাতা-ঝরাবার গান গাইবে এই উঁচু পাহাড়ের বার্চ, ফার আর সিডার। নীচের উপত্যকায় সবুজ পপলার ধূসর রঙ ধরবে।

এখন এই বসন্তে সব সবুজ, সব রঙীন। পথের জায়গায় জায়গায় অবধি সবুজ বাসা বেঁধেছে। রঙ ধরেছে বনভূমি। দেখতে দেখতে ওই রঙীন পথ বেয়ে আরও খানিকটা দূর উঠে এলাম। হঠাৎ একটা বাঁক ফিরতেই দেখি. ঢেউ-খেলান ঘন সবজ ঘাসে-ঢাকা অপরূপ এক প্রান্তর। এই হল গুলমার্গ।

গুলমার্গ ঠিক সার্থকনামা নয়। গুল অর্থাৎ গোলাপ ফুল ফোটে না এ ময়দানে। ফোটে হাজার রকমের বাহারী ফুল। তা হোক। এই ফুলবাগিচাকে গুলমার্গ নাম দিয়ে জাঁহাপনা অন্যায় কিছু করেন নি। গুল বলতে সাধারণভাবে সবরকম ফুলকেও বোঝান হয়ে থাকে।

তাই বলে শুধুমাত্র ফুলের মেলা দেখবার বাসনা নিয়ে কেউ ওখানে যায় না। বসন্তের গুলমার্গে রঙের খেলা নয় শুধু, রসেরও প্রস্রবণ চোখে পড়ে। সবুজ মাঠ, দেবদারু আর পাইনে ঢাকা অরণ্য, ফুলবাগিচা, ঝরনাধারা সব কিছুর মধ্য থেকেই রস উচ্ছ্বসিত হয়। গুলমার্গকে দেখে রঙে-রসে ভরা জাঁহাপনার কথাই মনে আসে বারবার। মনে হয়, এ যেন জাঁহাপনার এক কুঞ্জবন। সবুজ ঘাসের বিরাট একটি গালিচা পাতা আছে এখানে। গালিচার এখানে-ওখানে ছড়ান রাশি-রাশি ফুল। অনেক প্রহরী আশে-পাশে। পাইন আর দেবদারু-বন অতন্দ্র। খানিকটা দূরেই খিলানমার্গ ও আফরবত। প্রাসাদ-শীর্ষের মণিমাণিক্য ঝলঝল করছে ওখানে। রাজা আসছেন।

সুন্দর, বড় সুন্দর ওই রাজকুঞ্জ। তার ঢেউ-খেলান প্রান্তরে অহরহ সৌন্দর্যের ঢেউ উঠছে। ফুলবাগিচা রঙ ছড়াচ্ছে সেই কবে থেকে। সৌন্দর্যের এ এক রঙমহল। এখানে এলে স্থবিরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অক্ষমেরও প্রাণে জাগে ক্রীড়া-কৌতুকের উন্মাদনা। বুঝি এই উন্মাদনা থেকেই গুলমার্গে খেলার আসর জমে উঠেছে। একটি পোলো ময়দান আছে এখানে। আর আছে দুটি গল্‌ফ্ খেলার মাঠ।

বারো-মেসে খেলার আসর কাশ্মীরের একটি ময়দানেই বসে শুধু। আর সে ময়দান আছে গুলমার্গে। বসন্তে যেমন বর্ষায়ও তেমনি গুলমার্গ চঞ্চল। শরতে যেমন শীতেও তেমনি ওখানে পর্যটকের আনাগোনা। গুলমার্গের গল্‌ফ্ ময়দান বছরে একটি দিনের জন্যেও ছুটি পায় না। যে-কোন দিন যে-কোন মুহূর্তে ওখানে খেলা জমে উঠতে পারে।

শুনেছি এত উঁচুতে পৃথিবীর আর কোথাও এমন গল্‌ফ্ খেলার মাঠ নেই। কথাটা কতটুকু সত্যি তা' জানি নে, তবে এটা বলতে পারি, এমন মাঠ সচরাচর দেখা যায় না। বন-পাহাড়ের কোলেও এমন অপরূপ ক্রীড়াঙ্গন চোখে পড়ে না বড় একটা। গুলমার্গ তাই পর্বত-অভিযাত্রীদের কাছেও প্রিয়। দুরবগাহ পর্বতের রহস্যময় গিরিকন্দরে পা দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও এর মহিমার কথা ভেবে বিস্মিত হন।

বিস্ময়ের কারণ হল, গুলমার্গে হিমালয় তার বৈচিত্র্যের অনেকখানি একসঙ্গে তুলে ধরেছে। ছড়ান অনির্বচনীয়কে মেলে ধরেছে এমন একটি সীমানার মধ্যেও, দুর্লঙ্ঘ্য নয় যা', ইচ্ছে করলেই আমরা যার স্পর্শ পেতে পারি। আবার স্পর্শ অনেক আয়াসে পেতে হয়, অল্পায়াসেই এখানে তা' মেলে বলে দূর-পাহাড়ের যাত্রীরা এর প্রশংসায় মুখর। আর কাছের গণ্ডিটুকুর মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রাখতে যারা অভ্যস্ত, এখানে এসে তারা খোলস থেকে বেরিয়ে আসার ডাক শুনতে পায়। কাছের এই সবুজ মাঠ, পাশের অরণ্য আর দূরের ওই বরফ-ঢাকা পর্বত থেকে অহরহ দূরের বাঁশী বেজে ওঠে। সব যেন এক সুরে বলে ওঠে, আর কেন, বেরিয়ে এসো এবার। চেনা-জানা পথের নিশ্চিন্ত নির্ভরটুকু ছেড়ে

অচেনার পথে এবার পা বাড়াও। অন্তত একটি বারের জন্যও নিরুদ্দেশ হও তুমি। তোমার অতি-পরিচিত আশ্রয় থেকে একবারের জন্যেই হারিয়ে যাও।

কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কী এত সহজ! নিরুদ্দেশ হওয়া কী সোজা কথা! লোভ-ক্ষোভ, লাভ-লোকসান, জমা-খরচ সব সময় পিছু নেয় যে! ঘর ছাড়া মনটাকে বন্দী করে এনে গার্জেনী করে।

গুলমার্গ চিরকাল মানুষকে ভুলিয়ে রাখার গান গাইছে। রূপে ভুলছে কেউ, কেউ ভুলছে রসে। রঙ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে কারও। কারও আবার রূপতীর্থের নিরুদ্দেশ-সঙ্গীত শুনে ঘর-ছাড়া হতে মন চাইছে।

বসন্তের গুলমার্গে সবুজের সমুদ্র, শ্যামলের অভিসার। তার পাইন-বনে আদ্যিকালের শ্যামলিমা বাসা বাঁধে তখন। দেবদারু বন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘাসের রাজ্যে জীবন স্পন্দিত হতে থাকে; ফুলবাগিচায় উচ্ছ্বসিত হয় রঙের ঝরনাধারা। বসন্তের গুলমার্গকে আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়ে, এক স্তব্ধ দুপুর। গুলমার্গের পথ ধরে চলেছি। আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু পথ। মাঝে মাঝে দু-একজন পর্যটক চোখে পড়ছে। ঘোড়ার চেপে চলেছেন কেউ। কেউ চলেছেন পায়ে হেঁটে। সূর্য আমাদের ঠিক মাথার ওপরে। কিন্তু অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে না তা থেকে। মিঠে রোদ আশীর্বাদের মত নেমে আসছে। চারদিক আলোয় আলোয় ভরা। গুলমার্গ ঝলমল করছে। পথের দু' পাশে রাশি-রাশি ফুল। ঘন লাল কোনটি কোনটি হলুদ, কোনটি আবার নীলে-সাদায় মেশান।

পথের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঝরনাধারা। সে ধারা পথটিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওপর থেকে নীচে নেমেছে। মৃদু একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে তা থেকে। অনেক দূরের অস্পষ্ট কোন সঙ্গীতের মত শোনাচ্ছে।

বসন্তের গুলমার্গে সর্বত্র এই সঙ্গীত। সর্বত্র এমন পথের গা-ঘেঁষে এগিয়ে-চলা ঝরনাধারা। পথ ঝরনার পিছু নিয়েছে, না ঝরনা এগিয়েছে পথের পিছু-পিছু, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক ধরা যায় না।

গুলমার্গের ঘর-বাড়িগুলোও কেমন যেন রহস্যময়। পথের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ওদের; সম্পর্ক অরণ্যের সঙ্গে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অরণ্যের গাছপালার মতই ওরা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর সে মাটি সমতল নয় মোটেই; কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। বাড়িগুলো ঠিক তেমনি! কোনটি যেন পাতালে নেমে গিয়েছে। কোনটি আবার বিনা আড়ম্বরেই হয়ে উঠেছে স্কাইস্ক্র্যাপার। বাড়িগুলোর প্রায় সবই কাঠ দিয়ে তৈরী। বুঝতে কষ্ট হয় না, এদের মাল-মশলার পনেরো আনাই এসেছে স্থানীয় বন থেকে। গৃহ নির্মাণে গুলমার্গ বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুনের চেয়ে প্রাকৃত রসদের উপরেই অধিকতর বিশ্বাসী। অর্থাৎ প্রয়োজনের খাতিরে হয়ে ওঠাই সেখানে বড় নয়, কী হল এবং কতটুকু সুন্দর হল, তা নিয়েও ভাববার অবকাশ আছে। মনে হয়, পথের বেলায় যেমন, ঘরের বেলায়ও তেমনি গুলমার্গ অকৃত্রিম হবার সাধনা করছে। আদ্যিকালের প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে প্রাকৃত হবার আয়োজন চলেছে ওখানে। বলতে পারি, আধুনিক যুগের নগর-পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামান যাঁরা, এ জায়গাটি তাঁদের হয়তো মনে ধরবে না। গুলমার্গের আঁকাবাঁকা

পথ ও অদ্ভুতদর্শন সব বাড়ি দেখে তাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করবেন। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রকৃতির রঙমহলে রসসৃষ্টির কাজটা সব সময় পরিকল্পনা-মাফিক চলে না, এই রমণীয় জায়গাটি সহজেই আকর্ষণ করবে তাঁদের।

চলতে চলতে অনেক দূর উঠে এসেছি। পাইনের আড়াল থেকে গুলমার্গের ঢেউখেলানো ময়দানটি চোখে পড়ছে। দেখতে পাচ্ছি, ময়দানের এককোণে কুলিরা বসে। ঘোড়াগুলো আহার-সংগ্রহে ব্যস্ত। অনেক মেষ চরে বেড়াচ্ছে মাঝ-মাঠে; সবুজ প্রান্তরে আশ্চর্য এক রমণীয়তা, অদ্ভুত এক জীবন-স্পন্দন ছড়িয়ে দিচ্ছে। ছবি ছাড়া এমন একটা দৃশ্য দেখা যায় না বড় একটা। বোধ করি, ছবিতেও ঠিক এমনটি খুব কমই নজরে পড়ে।

গুলমার্গের ভিতরে ছবি, বাইরেও ছবি। উপত্যকাটিকে বাইরে থেকে একে মালার মতো ঘিরে রেখেছে যে-পথটি, তা'-ও যেন একসঙ্গে অনেক ছবির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সে-পথে পা বাড়াতেই স্পষ্ট মনে হয় এ-কথা। মনে হয়, অগুনতি চিত্রকর নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে এদের এঁকেছে।

বৃত্তাকার ওই পথটির এক পাশে দাঁড়াতেই রাশি-রাশি ছোট-বড় পাহাড় চোখে পড়ে। মনে হয়, এ এক নিশ্চল সাগর। মন্ত্রবলে অসংখ্য ঢেউ এখানে চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে। আর সেই স্তব্ধ ও নিশ্চল পর্বত-সমুদ্রের মাঝখানে বাতি-ঘরের মতো সোজা খাড়া উঠে গেছে নন্দা দেবী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ-পর্বতটির উচ্চতা ছাব্বিশ হাজার ফুটের বেশী। পৃথিবীর পর্বত-সমাজে নন্দা দেবীর কৌলীন্য অবিসংবাদিত। উচ্চতার দিক দিয়েই নয় শুধু, গাম্ভীর্যে এবং মহিমায়ও এর সমগোত্র গিরিশৃঙ্গ খুব অল্পই আছে।

এছাড়া হরমুখ, মহাদেও এবং আফরবতকেও ও-পথ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। নন্দা দেবী গুলমার্গ থেকে ৯৬ মাইল দূরে। কিন্তু সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু আফরবত উপত্যকাটির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যেন। যেন কয়েক পা এগোলেই তার তুষারধবল শৃঙ্গটিতে পৌছন যাবে।

আশ্চর্য সুন্দর গুলমার্গের ওই চক্রাকার পথ। তার প্রতিটি বিন্দুতে বিচিত্রের সিংহদ্বার খোলা আছে যেন। যেখানে খুশি, যখন খুশি একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিলেই হল। সে-পথে চলতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি অনেকবার; দেখেছিও অনেক। বুঝেছি, গুলমার্গ শুধু নিজে সুন্দর নয়, আরও অনেক কিছুকে সুন্দর করে দেখাবার এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চ।

এই রকম আর একটি মঞ্চ হল খিলানমার্গ। গুলমার্গ থেকে আরও প্রায় হাজার-দুয়েক ফুট উঁচুতে, মাইল-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওই উপত্যকা। বসন্তে ও গ্রীষ্মে লোক-সমাগম ওখানে লেগেই থাকে। গুলমার্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিশেষ একটি সরু আঁকাবাঁকা পথ সকলেরই প্রিয় হয়ে ওঠে তখন; সবাই খিলানমার্গের দিকে এগোয়।

মনে পড়ে, আমরাও এগিয়েছি একদিন। বসন্তের এক মনোরম প্রভাতে সে-পথ ধরে চলেছি। অপ্রশস্ত অমসৃণ পথ। বরফ জমে আছে তার আশেপাশে। পাইনের ছায়ায় ছায়ায় জমাট বরফের স্তূপ চোখে পড়ছে। ফুলের সমারোহ শুরু হয়েছে সে-পথে। গুলমার্গের স্পর্শে খিলানমার্গের পথও শ্যামল হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আমরা। খুব সাবধানে চলছি। খাড়াই পথ। টানমার্গ-গুলমার্গ পথের তুলনায় এ-পথ অনেক দুর্গম। অনুমতি মিললে গুলমার্গের পথে জীপ চলতে পারে। কিন্তু এখানে সে-প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এমনকি ওস্তাদ ঘোড়াও এ-পথ ধরে পা টিপে টিপে এগোয়। আর আমাদের মতো অনভিজ্ঞরা নিজেদের পায়ের ওপর বিশ্বাস রাখাই অধিকতর নিরাপদ মনে করে। লক্ষ্য করলাম, খিলানমার্গ-যাত্রীদের অনেকেই পায়ে হেঁটে চলেছেন। হাঁটছি আমরাও। অপরিসীম ক্লান্তি এক এক সময় আমাদের ঘিরে ধরছে। এই দারুণ শীতেও ঘাম ঝরছে দেহ থেকে। পা দু'টো অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু তবু হার মানছি না আমরা। কী এক অনাস্বাদিতপূর্ব নেশায় মাতালের মতো টলতে টলতে এগোচ্ছি।

ঘন পাইন-অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ। এদিকে দেখতে দেখতে পথ খাটো হয়ে এল। গাছের সংখ্যা কমে এল ক্রমশ। যত ওপর উঠলাম, ততই জমাট তুষারপুরীর নিস্তব্ধ আতিথেয়তা চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

খিলানমার্গ পৌঁছে দেখি, সাদার রাজ্যে সবুজ অনধিকার প্রবেশ করেছে। ওখানকার মাঠে মাঠে অনেক ঘাস। মেষ চরে বেড়াচ্ছে সে-মাঠে। মনে হল, খিলানমার্গ নামটি সার্থক। শীতের শাসনের পর বসন্তের দাক্ষিণ্য খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে ওখানে। জায়গাটি মেষ চরাবার উপযোগীই বটে।

লক্ষ্য করলাম, ১০,৫০০ ফুট উঁচু ওই অপরূপ ময়দান চারদিকে শীতের-চিহ্নকে ধরে রেখে সৌন্দর্যের সাধনা করছে। জমাট তুষার-স্তূপে খিলানমার্গ পরিবেষ্টিত। ঘর-বাড়ি নেই ওখানে। গুলমার্গের মতো পথ-ঘাট নেই। অনেক উঁচুতে আছে বলে স্থায়িভাবে বসবাসের কোনো প্রশ্ন ওঠে না খিলানমার্গে। কখনো হয়তো ওখানে ট্যুরিস্টদের একটা-দুটো তাঁবু চোখে পড়ে। কিন্তু সে-তাঁবু অস্থায়ী। কোনোটিরই মেয়াদ দু'চার দিনের বেশি নয়। সবুজের সন্ধানে মেষপালকরাও এগিয়ে আসে এদিকে। বসন্তের শুরু থেকে শরতের শেষ অবধি এখানকার প্রান্তর ওদের আনাগোনায় মুখরিত হয়।

শরতে অন্য এক চেহারা খিলানমার্গের। ওখানকার তুষার-ভাণ্ডার তখন নিঃশেষিত হয়ে যায়। আশেপাশের পাহাড়গুলো ধূসর রঙ ধরে। লোকজনের আসা-যাওয়া কমে আসে। আর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে-থেকে জানিয়ে দেয়, শীত এলো বলে। মেষ পালকেরা সময় থাকতেই সাবধান হয়। দল বেঁধে নীচে নেমে আসে। আর পরিত্যক্ত খিলানমার্গ অদ্ভুত এক শূন্যতা নিয়ে শীতের প্রতীক্ষা করে।

বসন্তে অন্য এক প্রতীক্ষা খিলানমার্গের। ওখানকার প্রান্তর তখন রসের মহোৎসবে সকলকে আহ্বান জানায়। আনন্দিত অতিথি-সমাগমের প্রতীক্ষা করে।

খিলানমার্গের মার্গ বা ময়দানটি আয়তনে গুলমার্গের চেয়ে ছোট; কিন্তু আড়ম্বরে ও মহিমায় ছোট নয় মোটেই। ওখানে দাঁড়ালে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাটি নজরে পড়ে। মনে হয়, অপরূপ এক দেশের একটা পুরো ছবি কে যেন চোখের সামনে মেলে ধরল। কিন্তু মেলে-ধরা সেই সৌন্দর্যকে তারিয়ে ভোগ করার সময় ছিল না। খিলানমার্গে থাকবার প্রশ্নও ওঠেনি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল।

ফিরে এলাম আবার সেই গুলমার্গে। সন্ধ্যের আগেই ফিরলাম। ফিরে এসে পিছনের কথা মনে হল একবার। তাকালাম ফেলে-আসা পাহাড়পুরীর দিকে। দেখি, খিলানমার্গের পাহাড় রক্তিম রঙ ধরেছে। অস্তগামী সূর্যের বন্দনা গাইছে ওই রূপতীর্থ।

সন্ধ্যের অস্পষ্টতায় গুলমার্গের আকাশে-বাতাসে এই একই বন্দনা-গান। রক্তিম রঙ-ধরা গুলমার্গ উপত্যকায়ও সূর্য-প্রণামের ঘনঘটা।

গুলমার্গে ছিলাম মাত্র তিন দিন। প্রতিদিনই এই সূর্য-প্রণাম দেখেছি। দেখেছি, প্রসন্ন উপত্যকাটিতে কেমন করে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। কেমন করে ধীরে ধীরে বিষন্ন হয়ে ওঠে চারদিক। অন্ধকারের মধ্যে গুলমার্গের সমস্ত অতীত ইতিহাস স্পন্দিত হতে থাকে। ইউসুফ শাহ, হব্বা খাতুন, জাহাঙ্গীর, নুরজাহান—সকলের স্মৃতি একসঙ্গে আবর্তিত হয়। মনে হয়, এখানকার ঝরনাধারায়, বনে, পাহাড়ে সর্বত্র খুঁজে পাবো ওঁদের। কত আশনাই, কত সোহাগ, কত পুলক, কত উল্লাস! ফুলজান, বিবিজান, খোদাবন্দ, শাহানশাহ—কত নামে কতদিন ডাকা! সব কি এত সহজেই হারিয়ে যায়?

গুলমার্গ থেকে ফিরে আসার সময়েও এ-কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল, সব কি এত সহজেই হারিয়ে যায়? এত আশনাই, এত সোহাগ, এত পুলক, এত উল্লাস—সব?

জানি নে।

এইটুকু শুধু জানি, জাঁহাপনারা রসিক ছিলেন। অপরূপা বিবিজানকে যেমন খুবসুরতী ফুলবাগিচাটিকেও ঠিক তেমনি চিনেছিলেন ওঁরা।

চিনতে ভুল হয়না পহলগাঁওকেও। নগাধিরাজের অন্দরমহলে জন্ম নিয়ে জায়গাটি পুরোপুরি পাহাড়ীয়া হয়ে উঠেছে বলেই ভুল হয় না।*

**লেখকের 'ভূস্বর্গ কাশ্মীর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত*

লাদাখে

মালবী গুপ্ত

১৯৮১-র ৪ঠা অক্টোবর সকাল নটায় আমাদের বাস শ্রীনগর শহর ছাড়িয়ে লাদাখের পথে এগিয়ে চলল। উঁচু নীচু পাহাড়ী পথের ধারে কোথাও দোকানপাট, কোথাও বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে আপেল বাগান। প্রচণ্ড রকমের উত্তেজনা মনের মধ্যে চেপে চোখ দুটো কাচের জানলার বাইরে মেলে রেখেছিলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল লাদাখের রাজধানী লেহ্ শহর। শ্রীনগর থেকে ৪৩৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে তিব্বত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এই লেহ্ ক্রমশই বিদেশী পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠছে। লাদাখ মূলত কারাকোরম পর্বতমালার মধ্যেই পড়ে। লাদাখের দুর্গম পাহাড়ী পথে বাস চলাচল করে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। কারণ প্রচণ্ড তুষারপাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় ওখানকার হিমাঙ্ক নেমে যায় মাইনাস চল্লিশ-পঞ্চাশ ডিগ্রিতে। বিমান যোগাযোগই তখন একমাত্র ভরসা। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের জন্যই অক্টোবরের প্রথম দিকেই প্রায় পর্যটনের সময়কাল শেষ হয়ে আসে।

আপেল বাগান থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে বাসের ভেতরের দৃশ্য দেখে বেশ অবাক হলাম। আমরাই একমাত্র বাঙালী পর্যটক। দু একজন স্থানীয় অর্থাৎ শ্রীনগরের বাসিন্দা, আর সব যাত্রী বিদেশী ও বিদেশিনী। তাঁদের কেউ সাংবাদিকতার জন্য, কেউ অনুসন্ধানের কাজে, আবার কেউ নিছক দেশ-দর্শনের কৌতূহলে চলেছেন। ১৯৭৪ সাল থেকেই প্রথম একটু একটু করে পর্যটকরা লাদাখে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তার আগে একমাত্র অনুসন্ধানকারী ছাড়া সাধারণ মানুষ সেখানে যাওয়ার অনুমতি পেত না। মাত্র কয়েক বছর হল লাদাখ তার রাস্তা খুলে দিয়েছে সকলের জন্য। কিন্তু, তার আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালিনী রুক্ষ সৌন্দর্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি বেশি। ফলে লাদাখ খুব দ্রুত বিশেষত বিদেশী পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় এবং মোহময় এক দ্রষ্টব্য স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। বলা বাহুল্য আমরাও তার রুক্ষ সৌন্দর্য এবং দুর্গম রহস্যময়তার কথা শুনেই লেহ্‌র পথে পা বাড়িয়ে ছিলাম।

লাদাখের সুদীর্ঘ পাহাড়ী পথ পেরুতে সময় লাগে প্রায় দুদিন। মাঝপথে কারগিল শহরে এক রাত কাটাতে হয়। দুপাশে আপেল বাগানের মাঝখান দিয়ে সার্পিল পাহাড়ী পথ ধরে বাস চলতে চলতে প্রথম গিয়ে থামে সোনমার্গ উপত্যকায়। যাত্রীরা হাত পায়ের জট ছাড়িয়ে নিয়ে এখানে কিছু খেয়ে টেয়ে নেয়। অনেকে পাঁচ দশ মিনিটের জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ার শখ মেটায়। শ্রীনগর থেকে বেশ কয়েকটি টুরিস্ট বাস এক সঙ্গে ছাড়ে পাঁচ দশ মিনিট সময়ের ব্যবধানে। আমাদের বাস সোনমার্গে পৌঁছতেই দেখলাম আরো বেশ কয়েকটি বাস আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে, পর্যটকরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাস থেকে নামতে না নামতেই দূরের তুষারশৃঙ্গগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটে আসা ঠাণ্ডা ঝোড়ো

হাওয়ারা প্রায় অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। চারদিকে সবুজ পাহাড়। মাঝখানে সিন্ধু নদীর পাশে এই সোনমার্গ উপত্যকা। পাহাড়ের কোল জুড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে তুষারশৃঙ্গ। সিন্ধু নদীর নীল জলরাশি এখানে কিছুটা বা গম্ভীর। ইতস্তত অজস্র ঘোড়া, কাছে-দূরে পাহাড়ের গায়ে ভিন্ন-দর্শন গরু, ভেড়া, ছাগল চোখে পড়ে। রাস্তার দুপাশেই ছোটবড় হোটেলের সঙ্গে লাগোয়া দোকান নানান সুন্দর জিনিসে সাজানো। এই সোনমার্গ পর্যন্তই সবুজ পাহাড় চোখে পড়ে। তারপরই শুরু হয়ে যায় গাছপালাহীন রুক্ষ পাহাড়। শেষ নেই, সীমা নেই, অসীম সমুদ্রের মত যেন থমকে আছে তার পাথুরে শরীর নিয়ে।

সোনমার্গ থেকে বাস যতই এগোতে থাকে, চারপাশে পাহাড়ের চেহারাও ততই বদলাতে থাকে। এবড়ো খেবড়ো পাথরের বোল্ডার, হাম্প্স ডিঙিয়ে বাস ঘন্টায় চার পাঁচ কিলোমিটার বেগে উঁচুতে উঠতে থাকে। বেশ কিছুদুর খাড়াই পথে ওঠার পর বাস এসে পড়ে একটু সমতলে 'যোজিলা পাস'-এ। এখান থেকেই শুরু হয় বরফ। এই যোজিলা পাসই একমাত্র শ্রীনগর এবং লেহ্‌র যানবাহনের রাস্তাকে সংযুক্ত করেছে। এই রাস্তা দিয়েই লেহ্ শহরের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস শ্রীনগর থেকে যায়। অন্তত গ্রীষ্মের সময় চেষ্টা করা হয় এই 'যোজিলা পাস' এর রাস্তাকে তুষারমুক্ত রাখার। যোজিলা পাস অতিক্রম করে আমাদের বাস একসময়ে দ্রাসে এসে পড়ে। দ্রাসের সমস্ত পাহাড়ই ঘন তুষারে ঢাকা। সব জায়গাতেই সে-তুষারের বয়স দু তিন বছর। তুষার-গলা জলেই কোথাও দু চারটে সবুজ বার্চ বা পপলার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গাঢ় নীল আকাশ, ঝকঝকে সোনালি, কখনও রুপোলি সূর্যের আলো, কোথাও রঙিন, কোথাও তুষারশুভ্র পাহাড়, কোথাও বা সফেন নীল জলরাশির নিরবধি গতিশীলতা, তারই পাশাপাশি গজিয়ে ওঠা এক দল তন্বী শ্যামাঙ্গীর মর্মরধ্বনি—এ সব নিয়ে উজ্জ্বল অবর্ণনীয় দিন এক সময়ে শেষ হয়ে আসে। বিদায়ী সূর্য তার সাত রঙের বিলোল কটাক্ষ হেনে চলে যায় পাহাড়পুরের অগম পারে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। বাস এসে থামে কারগিলে।

লেহ্ যাওয়ার পথে কারগিলে সবাই এক রাতের অতিথি হয়ে আসে। আমাদের বাস যখন কারগিল শহরে এসে থামল, তখন চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। ছোট বড় হোটেলের দূতেরা বাস স্ট্যাণ্ডে ভিড় করে দশ, কুড়ি, চল্লিশ করে ডাকাডাকি করছিল। আমরা যে সময় লাদাখ রওনা হয়েছিলাম, পর্যটনের মরশুম সে সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাই অল্প দক্ষিণাতেই সব জায়গায় খাওয়া-থাকার সুবিধেটুকু পেয়েছিলাম। পরদিন সূর্য ওঠার আগে ভোর পাঁচটার সময় আবার আমাদের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু হল। মনে পড়ে, আমরা নিদিষ্ট বাসে উঠে অধীর আগ্রহে ছাড়ার অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু বাস আর ছাড়ে না। সেদিন প্রায় আধ ঘন্টা লেগেছিল আগুন জ্বালিয়ে বাসের জমে যাওয়া ইঞ্জিনকে গরম করে তুলতে। এক সময়ে নড়ে চড়ে বাস আবার পথে চলতে শুরু করে।

কারগিল থেকে লেহ যাওয়ার পথে মূলবেখ, নামিকালা, হেমিসকূট, ফতুলা, লামায়ারু, খালসে, সাসপল, নেমু ইত্যাদি বেশ কয়েকটি জায়গা পড়ে। লেহ্ যাওয়ার পথে ফতুলাই সব থেকে উঁচু জায়গা, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চোদ্দো হাজার ফিট। বাসের মধ্যে বসে

থাকলেও এই ফতুলা দিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় একটু চাপ অনুভূত হয়, নিশ্বাস নিতে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিও। রাস্তার একদিকে কঠিন পাথুরে দেওয়াল, আর একদিকে বুক হিম-করা কয়েক হাজার ফুট গভীর খাদ। যেদিকেই তাকাও পাহাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। রুক্ষ পাহাড়ের কী আশ্চর্য রঙ। সূর্যের সাত রঙ যেন এক একটা পাহাড়ে নেমে এসেছে। পুব দিক ছেড়ে সূর্য যত মধ্য গগনে উঠতে থাকে পাহাড়ে পাহাড়ে তার সাত রঙ ততই গলে গলে পড়ে। কখনও একই পাহাড়ে নীল, সবুজ, বেগুনি, সোনালি, বাদামি রং পাশাপাশি শুয়ে থাকে, প্রকৃতির এ কী অপূর্ব শিল্পকাজ! সমস্ত পাহাড়ী শরীর জুড়ে হাজারো রঙের খেলা। মাঝে মাঝেই যেন খোদাই করা অদ্ভুত সব রোমান স্থাপত্য। প্রকৃতিই যার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। কোথাও দীর্ঘ প্রান্তর জুড়ে সোনালি ঢেউ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে, কোথাও মনে হয়েছে ঊষর মরুভূমির বুকে বিশালাকৃতি পিরামিডেরা উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত লাদাখ জুড়ে ইনডাসের কলোচ্ছ্বাস। হ্যাঁ, সেই ইনডাস, যার অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সিন্ধু সভ্যতা। ইনডাসকে দেখে কেবলই মনে হয়েছে যেন একদল ঘোড়সওয়ার টগবগিয়ে ছুটছে যুদ্ধক্ষেত্রে। কেবলই ছুটছে, অনলস অবিরাম সে গতিশীলতা। যে থমকে দাঁড়ায় না কখনই, ছোট বড় বাধা ভেঙে ভেঙে কেবলই ছুটে চলে। কত হাজার বছর ধরে সে মানুষকে দিয়েছে জল ও জীবন। আবার মানুষেরই রক্ত বয়ে নিয়ে গেছে সে আরব সাগরে। অনেক ইতিহাস সযত্নে গড়ে তুলেছে, অনেক ইতিহাস দিয়েছে ধ্বংস করে স্বেচ্ছাচারে। কারো কাছে কোন জবাবদিহি নেই, আপন ছন্দে আত্মমগ্ন স্বাধীন ইনডাস। লেহ্'র পথে যেতে যেতে সব থেকে অবাক হয়েছি যখন দেখেছি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঘোড়ার পিঠে, কিংবা একপাল ভেড়ার পেছনে পেছনে চলেছে সুন্দর লাদাখী মেয়ে-পুরুষ। মাথায় তাদের অদ্ভুত চামড়ার টুপি, পায়ে তেমনই অদ্ভুত জুতো, লম্বা পোশাকের ওপর পিঠে ঝোলানো ছাগলের চামড়া—সব মিলিয়ে মন হাজার হাজার বছর পেছনে হাঁটছিল। নিজেদের মনে হচ্ছিল অন্য কোন দূর দেশের মানুষ। হঠাৎই এসে পড়েছি আর্য অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে।

৫ই অক্টোবর আমরা বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ লেহ্ শহরে পৌঁছোই। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেহ্'র রাজকীয় শীতের অভ্যর্থনায় দাঁতে আর হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে যায়। মাত্র কুড়ি টাকায় আমাদের জায়গা জুটে গেল ইয়াকটেল হোটেলে। লেহ্ শহরের আকৃতি অনেকটা ঘোড়ার খুরের মত। চারপাশে পাহাড়, আর এক দিক দিয়ে শহরে ঢোকার রাস্তা। এই লেহ্ শহরই হল লাদাখের রাজধানী। একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে লাদাখে তিন ধরনের মানুষ এসে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করেছিল। তার আগে লাদাখে সাধারণত তিব্বতী যাযাবররাই ইতস্তত ঘুরে বেড়াত। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে একদল মানুষ এসে লাদাখে প্রথম বসতি স্থাপন করে—এরা 'মন' (Mons) নামে পরিচিত ছিল। এরা লাদাখে এসে গ্রাম তৈরি করে, গুম্ফা তৈরি করে। এই 'মন'-রাই লাদাখে প্রথম নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যায়। 'মন'-এর পর পশ্চিম থেকে আসে দর্দরা (Dards)। এরা ইনডাসের তীরে তীরে বসতি গড়ে তোলে। দর্দরাই লাদাখে প্রথম পোলো খেলা চালু করে। লড়াকু হিসেবেও দর্দরা বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রাচীন পাথুরে খোদাই

থেকে জানা যায় দর্দরা শিকার করতেও বেশ ভালবাসত। তবে দর্দ এবং মনরা উভয়ই ছিল বৌদ্ধ। লাদাখের যে সব জায়গা চাষের যোগ্য ছিল, সেখানে দর্দ ও মনরা সেচের ব্যবস্থা করে চাষ-আবাদ করত। এরা পাথরের ওপর নানা ছবি খোদাই করে রঙ দিয়ে ভরিয়ে তুলত। শেষে আসে মোঙ্গলরা, দশম শতাব্দীতে।

বর্তমানে লাদাখ ভারতের অন্তর্গত হলেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে দীর্ঘকাল সে তার স্বাধীনতা বজায় রেখে চলেছিল। বিভিন্ন সময়ে লাদাখ জম্মু-তিব্বত-চীন-মধ্য এশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু লাদাখীরা সে আক্রমণকে প্রতিহতও করেছিল। পনেরো শতকে থেকেই লাদাখে মুসলমানদের আগমন ঘটেছে বারবার, কখনও শান্তিবাণী প্রচারকের ভূমিকায়, কখনও বিধ্বংসীর ভূমিকায়। মোঘল শাসনকালে শ্রীনগর এবং দিল্লীর মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যে মোঘলরা লাদাখ বার বার আক্রমণ করবে না, যদি সেখানে সুন্নী সম্প্রদায়ের মসজিদ গড়তে দেওয়া হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সতেরো শতকের শেষের দিকে লাদাখের রাজধানী লেহ্ শহরে সুন্নীদের মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। পঞ্চম দালাইলামার আমলে তিব্বত থেকেও মাঝে মাঝেই আক্রমণ চলেছে লাদাখের ওপর। এবং সেই সময় থেকেই লাদাখের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। লাদাখ লাসা প্রশাসনের কাছেই শুধু হেরে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যের অনবরত হানাদারিতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। জম্মুর শাসনকর্তা গুলাব সিং-এর আমলে ১৮৪৬-এ লাদাখ তার স্বাধীনতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্গত হয়ে যায়।

মধ্যপ্রাচ্য ও তিব্বতের মধ্যে যে সুপ্রাচীন ব্যবসাপথ ছিল, যে পথ দিয়ে ঘোড়া, খচ্চর আর ইয়াকের পিঠে চড়ে সভ্যতা-বিনিময় হয়েছিল কয়েক হাজার বছর ধরে, সেই পথের ধারে তিব্বতের তলদেশে লেহ্ ছিল সর্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি যদিও লেহ্ তখনও আত্মস্থ করেনি। প্রকৃত অর্থে লেহ্ ছিল একটি বড় ধরনের গ্রামবিশেষ। তবুও এশিয়ার যে কোন মানচিত্রে লেহ্ নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। এই শহরের দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে ইনডাসের দুরন্ত জলোচ্ছ্বাস। শহরের আর একদিকে প্রায় তার মাথার ওপর পাহাড়ের গায়ে বেশ কয়েক'শ বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ। তিব্বতের রাজধানী লাসার বিখ্যাত প্রাসাদ পোতালার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য এই লেহ্র রাজপ্রাসাদের। একশ দেড়শ বছর আগে লেহ্ শহরের চেহারাটা যেমন ছিল, আজও মনে হয় প্রায় তেমনই রয়ে গেছে। মানুষজনের পোষাক-পরিচ্ছদে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। ইন্‌ডাস নদীর দুপাশে সবুজ শস্যক্ষেত আর পুরনো শহরের বাড়িগুলো বদলায়নি একটুও।

দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে আধুনিক সভ্যতার দূতেরা যে লেহ্তে এসে পৌঁছায়নি তা নয়। শহরে বাজারের মাঝখানে পোস্ট অফিস এসেছে, টেলিগ্রাফের তার বসেছে, পুরনো শহরকে একপাশে রেখে উপত্যকার অপর প্রান্তে গড়ে উঠেছে সৈন্যবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট, কয়েকটি উচ্চমানের হোটেল, বাড়ি আর একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র। যার যান্ত্রিক শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যায় বহু দূরে। আর যার উৎপাদনে প্রতি সন্ধ্যায় বিজলি আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে লেহ্ শহর। কিন্তু শহরের

প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক সভ্যতা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। শহরে আধুনিক কালের নিদর্শন খুবই বিরল। একালের পর্যটকদের কাছে লেহ্ শহরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাই এক প্রাচীন জগতকে হঠাৎই আবিষ্কার করার মত রোমাঞ্চকর।

সীমান্ত শহর বলেই বোধহয় লেহ্'র চারপাশে মিলিটারি ব্যারাক। এবং সারাদিনই পাহাড়ী রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে হাজারও মিলিটারি কনভয়ের গমনাগমন চোখে পড়ে। শহরের ঘরবাড়ি, হোটেল, দোকানপাট সবই পাহাড়ের কোলে কোলে ছড়ানো ছেটানো। শহরের সমস্ত পথই তাই উঁচু নীচু। আমাদের ইয়াক্‌টেল হোটেলের বারান্দায় দাঁড়ালেই দুচোখ জুড়ে বাদামী পাহাড়। হোটেলের গা দিয়েই এক ক্ষীণ জলধারা পাথরে পাথরে শব্দ তুলে নিয়ত প্রবহমান। হোটেলে আমাদের তদারকিতে ছিল সতেরো আঠারো বছরের এক লাদাখী যুবক, গোলাম নবী, দুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগে তেজী ঘোড়ার মতই যার চলাফেরা। সন্ধ্যের পর গোলাম নবী আমাদের 'হিলটপ্' রেস্টুরেন্টে পৌঁছে দেয় খাওয়াদাওয়ার জন্য। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে আসি। আব্‌ছা আলোয় ঘরের ভেতরের সব কিছু অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। দেওয়াল জুড়ে ড্রাগনের নানান ছোট বড় স্ক্রোল, কাঠের মেঝেয় ড্রাগন আঁকা লাল কার্পেট। টেবিলে মোমের আলো। কাচের জানলার বাইরে সাদা জ্যোৎস্নায় বিধৌত লেহ্ শহর যে ক্রমেই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড রহস্যময়ী। হিলটপ্ ছেড়ে পথে নেমে দেখলাম রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যই দোকানপত্র তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই লেহ্ শহরে গভীর রাত নেমে আসে। ঝোড়ো হাওয়া আর কাছে দূরে জলপ্রবাহের দ্বৈতসঙ্গীত লেহ্ শহরের ঘুমপাড়ানি গান হয়ে তখন পাহাড়ে পাহাড়ে টহল দিয়ে ফিরতে থাকে।

পরদিন খুব সকালেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। হোটেলের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি পাহাড়ের ঘুম তখনও ভাঙেনি। চারপাশে যেন হাল্কা ধোঁওয়ার মত অস্পষ্ট কুয়াশার চাদর বিছানো। ধীরে ধীরে সূর্য উঠল। তার সোনালি রং পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশ নামতে লাগল নীচের দিকে। পরিষ্কার নীল আকাশ ধীরে ধীরে চোখ খুলল। সকাল হল। শীতকে কব্জা করার জন্য পোশাকে-আশাকে আমরা আরো কিছু ওজন বাড়িয়ে লেহ্ শহরকে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম পথে। ইন্‌ডাস উপত্যকার তৃণহীন ধূসর রুক্ষ প্রান্তরে লেহ্ হল এক মাত্র জীবন্ত মরূদ্যান। যেখানে তুষার গলা স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারার মতই প্রাণের কলরোল ছড়িয়ে পড়ে সহস্র হাজার বছরের নিষ্প্রাণ কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর তামাটে, সোনালি কিংবা তুষারশুভ্র পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে।

পঁচিশ কিলোমিটার দূরের কৈলাস থেকে নেমেছে ইন্‌ডাস নদী। ইন্‌ডাস উপত্যকার পাহাড়গুলির গায়ে এমনকি ইন্‌ডাসের কোল ঘেঁসে পাহাড়ের যে ঢাল নেমে এসেছে সেখানেও কোনও গাছের চিহ্ন নেই। ঝোপঝাড় এমনকি ঈষৎ শ্যাওলাও চোখে পড়ে না কোথাও। খরস্রোতা নদীর জলের আঘাতে আঘাতে পাথর গুঁড়ো হয়ে তৈরি হয় বালি। তীব্র ঝোড়ো হাওয়ায় সে বালি উড়ে গিয়ে নানা জায়গায় সৃষ্টি করে বালিয়াড়ি। প্রবহমান ইন্‌ডাসের দু-পাশের বিস্তীর্ণ ঐ অঞ্চলকে তাই বলা হয় 'ইন্‌ডাস মরু।'

শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম অজস্র দোকানপাট। রকমারি উলেন পোশাক, ছোট বড় নানা নক্সার হাতে-তৈরি কার্পেট, রুপো এবং নানান রঙিন পাথরের সুন্দর অলঙ্কার, উজ্জ্বল রঙের সুন্দর ছবি আঁকা সিল্কের স্ক্রোল (স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলে টঙ্কা), বিভিন্ন ধাতুর মুখোস ইত্যাদি হাজারো জিনিসে সাজানো। কার্পেটে দেখলাম ফুল, লতাপাতার তুলনায় ড্রাগনের নক্সাই বেশি। রাস্তার দুপাশে ফুটপাত জুড়ে রোজই ছোটোখাটো বাজার বসে কপি, গাজর, মুলো, আলু, শালগম, শাক এবং আপেল নিয়ে। মাছ বা ডিমের তেমন চল নেই। ডিম আসে শ্রীনগর থেকে। তাই দামও বেশ বেশি। ভেড়া বা ছাগলের মাংসই প্রধান। শহরের মধ্যে খাওয়ার জল তত সহজলভ্য নয়। সবাইকেই এক দেড় কিলোমিটার নেমে গিয়ে দূরে মিলিটারি ব্যারাকের কাছাকাছি থেকে জল সংগ্রহ করে আনতে হয়। সবাই জল আনে পিঠে করে টিনের পাত্রে। রাস্তাঘাটে এই জল আনার দৃশ্য সারাদিনই চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে অবাক হয়েছি ওরকম ভারি জলের পাত্র পিঠে নিয়ে অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েরাও কথা বলতে বলতে অবলীলায় পথ হেঁটে চলেছে।

শহরের একদিকে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যার বেশির ভাগই ভবিষ্যতে হোটেল ইত্যাদি তৈরি হবে। পুরনো শহরের বাড়িগুলো সবই প্রায় পাথর মাটি এবং কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠ সস্তা বলে তার ব্যবহারও বেশি। ইঁটের ব্যবহার তেমন নেই। কাঁকুরে মাটি দিয়ে লোকেরা হাতে হাতে ইঁট কিছু বানায় এবং রোদে শুকিয়ে নেয়। পুরনো শহরের ঘরবাড়িগুলো প্রায় একশ দেড়শ বছরের পুরনো এবং খুবই ঘিঞ্জি। দেখতে অদ্ভুত রহস্যময়। কোন কোন বাড়ির প্রবেশ পথ কেমন অন্ধকার গুহার মত যার মাটি থেকেই হঠাৎ যেন সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। জানলার ব্যবহারও কম। বাইরে থেকে ঘরের ভেতর তাই প্রায় অন্ধকার মনে হয়। সরু সরু গলি, ঠিক গলি বললেও ভুল হয়। উঁচু-নীচু পাথরের পায়ে চলা পথ। যেন খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। হঠাৎ হঠাৎই সে পথের ওপর দিয়ে ক্ষীণ কোন জলধারা ছলছল করতে করতে বয়ে চলেছে। সব মিলিয়ে মধ্যযুগীয় কোন আরব শহরের দৃশ্যপট মনে ভেসে উঠছিল। শহরের অলিগলিতে ব্যস্তসমস্ত লাদাখী মেয়ে-পুরুষ, প্রকৃতির মতই সুন্দর চেহারা তাদের। আর অদ্ভুত প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল হাসিখুশি। মেয়েদের হাত সব সময়ই কোন না কোন উল বোনায় ব্যস্ত। খুব অল্পবয়েসী মেয়েদের হাতেও কাঁটা আর উল চোখে পড়ছিল। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে রোদে পিঠ দিয়ে বয়স্কারা হাতে হাতে উল তৈরি করছিলেন।

সকাল থেকে বিকেল অবধি লেহ্ শহরের রাস্তায় রাস্তায় যেন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। ছোট পাহাড়ী ঘোড়ার পিঠে, বোঝাই হয়ে জ্বালানি চলেছে এদিক ওদিক। মেয়েরা শুকনো কাঠ মাথায় করে নিয়ে চলেছে। হাঁক ডাক তুলে ভেড়িয়ালরা ভিড় ঠেলে ঠেলে তাড়িয়ে নিচ্ছে ভেড়া আর বিশাল লোমওয়ালা ছাগলের পাল। বেলা তিনটে পর্যন্ত জোরালো রোদ থাকে। তারপর থেকেই সূর্য যত পশ্চিমে হেলে, বাতাস তত তীক্ষ্ণ ও ঝোড়ো হয়ে ওঠে। শহরের বাজারে সারাদিনের কেনা বেচার পর বেশ খুশির মেজাজ নিয়ে সবাই বাড়ির দিকে রওনা হয়। বড় বড় বোতল ভর্তি 'ছাঙ' (স্থানীয় মদ) হাতে ফেরে ছেলেরা। মেয়েরা মাথায়

পরে নেয় রঙবেরঙের পাথরখচিত চওড়া ঝুলন্ত চামড়ার টুপি—যাকে ওরা বলে 'পরাখ'। পথ চলতে চলতে মেয়েরা উচ্চ স্বরে কথা বলে। কারণ তাদের কান পর্যন্ত ঢাকা টুপি শ্রবণশক্তির বিঘ্ন ঘটায়। দিনের শেষ বাস কয়েকটিতে ভিড় হয় খুব। দূরের গ্রামগুলি থেকে যারা উপার্জনের তাগিদে লেহ্‌তে এসেছিল তারা ভিড় করে বাসগুলিতে। পায়ে দড়ি-বাঁধা সঙ্গের ভেড়া বা ছাগলগুলোকে তুলে দেয় বাসের মাথায়। তারপর সূর্য পশ্চিমের পর্বতমালার আড়ালে চলে গেলে, এই প্রাচীন শহরে প্রাচীনতর জীবন-প্রবাহে ক্রমে ভাঁটা পড়ে আসে।

লেহ্ শহরের চারপাশে যে সমতলভূমি রয়েছে, সেখানে সবুজের বেশ সমারোহ। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরনার জলকে চাষের কাজে লাগানো হয়। লাদাখে বৃষ্টির তেমন বালাই নেই। সারা বছরে তিন চার ইঞ্চির বেশি নয়। তাই বরফ গলা নদীর জলই একমাত্র ভরসা। তাও গ্রীষ্মের কয়েকটা মাসের জন্য। তারপর শীত এলে তাপমাত্রা নামতে নামতে -৫০° তেও গিয়ে পৌঁছয়। তখন ঐ খরস্রোতা ইন্‌ডাসও জমাট বরফ হয়ে নিশ্চল হয়ে যায়।

শহরের বাজার থেকে কিছু আপেল কিনে নিয়ে আমরা শহর ছাড়িয়ে গ্রামের সন্ধানে হাঁটা দিলাম। সকাল তখন একটু করে দুপুরের দিকে ঝুঁকছে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখে আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দোকানের মালিক আমাদের ব্ল্যাক টি তৈরি করে দিলেন। তিনি প্রথমে আমাদের 'বাটার টি' অফার করেছিলেন। কিন্তু এমন নাম আগে কখনো শুনিনি। এবং মাখন নিয়ে চায়ের ব্যাপারে জিভের আস্বাদন ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ায় শেষ অবধি 'বাটার টি'তে আর রাজি হওয়া যায়নি। তবে তাঁর মুখে শুনলাম লাদাখে 'বাটার টি' অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে দোকানের মালিক আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দোকানে চা, বিস্কুট, লজেন্স থেকে ডিম, টকদই, চাপাটি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। দোকান থেকে ওঠার আগে আমরা তাঁর কাছে জেনে নিলাম জলতেষ্টা পেলে লাদাখী ভাষায় কী বলব। বলা বাহুল্য কিছু দূর এগোতে না এগোতেই অনায়াসে সেই শব্দ ভুলে গেলাম। প্রকৃত যখন জল তেষ্টা পেল তখন মুখ থেকে পানি ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি।

গ্রামের বাড়িগুলো একটু দূরে দূরে। বাড়ির সঙ্গেই লাগোয়া খামার। আমরা যে সময় গেছি সে সময়ে ফসল কাটা হয়ে গেছে। খামারে খামারে মাড়াইয়ের কাজ চলেছে। বেশির ভাগ জায়গায় দেখলাম মাড়াইয়ের কাজ হচ্ছে গাধা বা জো দিয়ে। বলদ ও ইয়াকের সঙ্করই হল জো। জো দেখতে অনেকটা গরুর মতই। তবে গায়ে বড় বড় লোম আর লম্বা চুলওয়ালা লেজ। কোন কোন খামারে মহিলাদেরও কাজ করতে দেখলাম। মাড়াই করা শস্যের খোসা হাওয়ায় উড়িয়ে পরিষ্কার করছেন। মহিলারা একটানা সুরে গান গেয়ে গেয়ে খামারের কাজ করেন সারাদিন। পথ চলতে চলতে বহুদূর থেকেও আমরা সেই প্রলম্বিত গানের সুর শুনতে পাচ্ছিলাম। দীর্ঘ ছ'সাত মাস লাদাখ বরফের চাদরের নীচে ঢাকা পড়ে থাকে। নভেম্বর থেকে শীত শুরু হয়ে যায়। জমাট বরফের নীচে সমস্ত লাদাখ যেন তখন ঘুমিয়ে থাকে। মে মাস থেকে ঐ বরফ গলতে শুরু করে। দীর্ঘ একটানা ঘুমের পর যেন একটু একটু করে জেগে ওঠে সে। ইয়াক্ বা জো নিয়ে লাদাখী চাষীরা

মাঠে নেমে পড়ে। গম আর যবই ওখানে প্রধান ফসল। তার সঙ্গে নানা শাক সবজি। চাষের জন্য যখন ওরা মাঠে কাজ করে তখনও সারাদিন ধরে ওরা গান গেয়ে চলে। লাদাখী পুরুষ মহিলা উভয়ই এক সঙ্গে চাষের কাজ করে। ছেলে মেয়েরা সেখানে খাবার পৌঁছে দেয়। সারা দিনের পর সন্ধ্যে নামার আগেই বাজারে মানুষজনেরা ভিড় করে টুকিটাকি প্রয়েজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। সন্ধ্যের পর তারা বেশিক্ষণ জেগেও থাকে না, অত্যধিক ঠাণ্ডা এবং কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানির অভাবে।

লেহ্ শহরেয় যত্রতত্র মন্দিরের মত দেখতে অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ বা চৈত্য চোখে পড়ছিল। স্থানীয় ভাষায় এই স্তূপকে বলে 'চোটেন'। চোটেনগুলির গায়ে নানা রঙের জীবজন্তুর ছবি আঁকা কোথাও বা খোদাই করা। বৌদ্ধ ধর্মে পুজোর সমর্থনেই ঐ চৈত্য বা স্তূপ তৈরি হয়েছিল। এই চোটেনকে বৌদ্ধ ধর্মে অবতার কল্পের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই চোটেনের গঠন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণেরই এক প্রতীকী অর্থের সাযুজ্যের কথা বলা হয়। স্থানীয় লোকদের মতে, রাজার আমলে কেউ অন্যায় কাজ করলে শাস্তি হিসেবে অপরাধীদের গায়েগতরে খেটে ঐ স্তূপ তৈরি করে দিতে হত। বছরের বিশেষ সময় ঐ সব স্তূপে পুজোও হয়ে থাকে।

ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার জন্যই প্রচণ্ড রোদেও হাঁটতে কোন ক্লান্তি বোধ হয় না। তবে উঁচু নীঁচু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে শ্রীচরণদ্বয় একটু কাহিল হয়ে পড়ে। আমরা তাদের একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসলাম। হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি তিন সুন্দরী লাদাখী বালিকা। প্রত্যের সঙ্গে একটি করে ঝুড়ি ছিল। আমাদের কাঁধে ক্যামেরা দেখে ছবি তুলে দেবার আবেদন জানালো। কথায় কথায় জানালো ওরা আমাদের বাজারে আপেল কিনতে দেখেছে। আমরা কোথা থেকে গিয়েছি শুনে তারা বলল—কলকাতার নাম তারা শুনেছে। কথায় কথায় তাদের অজস্র হাসি ঝরে পড়ছিল। অবশ্য লেহ্-র সমস্ত মানুষজনকেই সব সময়ে হাসি মুখ দেখেছি। ঝকঝকে নির্মল হাসি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্যে সবাই যেন টগবগ করছে। দেখে মনে হয় দুঃখের সৈনিকরা লাদাখে পরাজিত।

লেহ্ শহরের সবচেয়ে দ্রষ্টব্য স্থাপত্যটি হলো সেখানকার চারশো বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে শহরের শিয়রে যেন অতন্দ্র প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশাল রাজপুরী। রাজকীয় জাঁকজমকে এক সময় এই প্রাসাদের ঘরগুলি গমগম করত। ভিনদেশ থেকে আসতো নানান রাজা মহারাজার দূত, আসতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। প্রাসাদের চূড়োর ওপর লাদাখ সাম্রাজ্যের পতাকা ঝড়ো হাওয়ায় উড়ত পতপত করে। প্রাসাদের সেই জৌলুস এখন বিলুপ্ত। ফাটল ধরেছে প্রাসাদের প্রাচীরে। ছাদ ধসে পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক ঘর। দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে দুর্মূল্য সব ফ্রেস্কো, জ্বালানি হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দারুশিল্পের কত বিরল নিদর্শন। এই প্রাসাদ এখনও রাজ-পরিবারেরই সম্পত্তি। এমন কি রাজতন্ত্রের শেষ পরিচিত উত্তরাধিকারী, রাজা কুংসাঙ নামগেয়াল বেঁচে থাকাকালেও রাজপরিবার ঐ প্রাসাদেই বসবাস করে গেছে। দেশ বিদেশে একসময় লেহ্র এই রাজপ্রাসাদ প্রচুর খ্যাতি লাভ করলেও, বর্তমানে তার ঐ ভগ্নদশার

জন্যই পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আর কারো প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অসংখ্য চোটেনকে পাশ কাটিয়ে যখন ঐ রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে ওপরে উঠছিলাম, তখন 'হ্যালো' 'হ্যালো' শুনে এদিক ওদিক তাকাতেই এক এক জায়গায় তিন চারটি করে লাদাখী শিশুকে খেলতে দেখছিলাম। নুড়ি মাটি নিয়ে আপন মনে খেলছে, আর বিদেশী পর্যটক দেখলেই কচি কচি গলায় হাসি মুখে 'হ্যালো' বলে মিষ্টি সম্বোধন করছে। বাস্তবিকই উভয় পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও ঐ 'হ্যালো' আর হাসি ছাড়া অন্য কিছুই বিনিময় করা যায় না। এক হাজার খ্রীস্টাব্দেই তিব্বতী ভাষা-সংস্কৃতি লাদাখেরও ভাষা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই থেকেই পশ্চিমী উপভাষা হিসেবে তিব্বতী ভাষা লাদাখীদের কথ্য ভাষার রূপ নিল যা আজও লাদাখী ভাষা বলে প্রচলিত। তবে লাদাখী ভাষা বলে কোন দিনই কোনও স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। লাদাখের সমস্ত সাহিত্যই তিব্বতী ভাষাতেই লেখা হয়েছে এবং আজও হয়। ভাষা সম্পর্কিত সরকারী মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। আরা লাদাখী ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই বেশি আগ্রহী। অপর পক্ষে তিব্বতী ভাষার সঙ্গে লাদাখী ভাষার মিল নিতান্তই যৎসামান্য বলে মনে করা হয়। এমন কি মনেস্টারিতে যে সমস্ত তিব্বতী বই বা পাণ্ডুলিপি আছে, সেগুলোকেও ভারতীয় অফিসারেরা লাদাখী বই বলেই উল্লেখ করেন। স্কুলগুলোতেও হিন্দি এবং উর্দু ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। তিব্বতীকে ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করার মাত্র সুযোগ থাকে এবং তিব্বতী নামের বদলে সেই ভাষার নাম হয়ে যায় 'বোধিক'। যে ভাষায় লাদাখীরা কথা বলে তার প্রতি অকারণ এই সরকারী অবহেলা পরোক্ষে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

অল্পবয়েসী লাদাখীদের সঙ্গে, যারা বিশেষ করে স্কুলের মুখ একটু আধটু দেখেছে, হিন্দিতে দু-চার কথা চালানো যায়। কিন্তু বয়স্ক বা খুব বাচ্চাদের সঙ্গে মোটেই কথা বলা যায় না। ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সারাদিনের ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তবে একটা জিনিস লক্ষ করেছি। অত ঠাণ্ডা এবং বিশুদ্ধ বাতাসের জন্যই বোধহয় ক্লান্তি বেশিক্ষণ থাকে না। হোটেলে গোলাম নবী আমাদের প্রয়োজনমত গরম জল জুগিয়ে গেছে। কিন্তু সে জল দ্রুত ঠাণ্ডা হতেও সময় লাগেনি। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল গোলাম নবীর বাড়ি আসলে দ্রাসে। সে এই হোটেলের ট্যাকসি চালাতো। কিন্তু কিছু দিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করায় নিজেও বেশ জখম হয়েছিল, আর গাড়িও। গাড়ি তখনও হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। তাই ও এখন প্রায় বেকার। পর্যটনের মরশুমও শেষ হয়ে এসেছে। হোটেলগুলো সব প্রায় ফাঁকা। ঐ অসময়ে আমাদের পেয়ে সে বেশ একটু কাজ পেয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার রাস্তায় নেমে এলাম। উল্টো দিকে অর্থাৎ হোটেলের বাঁ-হাতি ঢালু পথে চলতে শুরু করলাম। সূর্য তখন দ্রুত চলে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপারে। তার লালচে আভা ক্ষণিকের জন্য মুকুটের মত পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে থাকছে। তারপর দ্রুতই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে সে দৃশ্য দেখে নিচ্ছি। হঠাৎই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন আমরা বাঙালী

কিনা। আমাদের উত্তর শুনে নিজের পরিচয় দিলেন, 'আমার নাম রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আর একটু এগিয়েই আমার 'সোনাম' হোটেল। চলুন না আলাপ করা যাবে কিছুক্ষণ। হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা খাওয়ালেন। আর নিজের জীবনের অজস্র গল্প বলে চললেন। আগে উনি মিলিটারিতে চাকরি করতেন। পরে কোনও কারণে চাকরি ছেড়ে হোটেলের ব্যবসা করেন। এবং লাদাখী মেয়ে বিয়ে করেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বড় মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। দারুণ সুন্দরী সে মেয়ে, নাম তার 'সোনাম' (তার নামেই হোটেল)। আদর করে রবীন্দ্রনাথবাবু তাকে ডাকেন 'সোনার পুতলী' বলে। নাম তার সত্যিই সার্থক। দীর্ঘকাল তিনি, এই লেহ্‌তে আছেন। লাদাখী ভাষায় অনর্গল কথা বলে যান ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথবাবুকে দেখে তাঁর কথা শুনে খুবই অবাক হচ্ছিলাম। ঐ প্রচণ্ড দুর্গম পথ পেরিয়ে চারপাশে তুষারের রাজ্যে, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় যেখানে বাঙালীরা এক সপ্তাহের জন্যও বেড়াতে আসার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, লেহ্‌র টুরিস্ট বাসে যেখানে আমরা একজনও ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর সাক্ষাৎ পাই না, সেখানে কোন্ সুদূরের রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, লাদাখী মেয়ে বিয়ে করে ঘর বিছিয়ে সংসার পেতেছেন, ব্যবসা ফেঁদেছেন হোটেলের। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

তাঁর হোটেলের ব্যবসা কেমন চলে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—মরশুমের সময় খুবই ভালো চলে। আমরা যে ঘরে বসেছিলাম, সেই ঘর উনি বিদেশীদের কাছে একশ কুড়ি টাকা ভাড়ায় দেন। বাঙালী পেলে অবশ্যই কিছু কম করেন। অন্তত কয়েক দিনের জন্য নিজের দেশের মানুষের সঙ্গ পাওয়ার আনন্দে, মাতৃভাষা বলতে পারার সুখে, তাঁর এই বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নিশ্চয়ই ক্ষমা করা যায়। হোটেলের ঘরগুলির ভেতরের চেহারা প্রায় একই রকম। কাঠের মেঝে আপাদমস্তক মোটা কার্পেটে ঢাকা। কাচের জানালায় ভারী পর্দা, একবার সরালেই বাইরে দূরের বাদামি, সোনালি পাহাড়শ্রেণী চোখের পলকে ঘরের মধ্যে চলে আসে। ঘরের এক কোণে 'ফায়ার প্লেস'। দুটি করে খাট, ছোট্ট টেবিল চেয়ার, ড্রেসিং টেবিলে সাজানো সুন্দর ঘর। খাবার দাবারের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই আছে, কারণ দোতলায় উঠতেই বিরাট ডাইনিং টেবিল চোখে পড়েছিল। এই হোটেলেই ওঁর ঘর সংসার। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী নিয়ে এখানেই থাকেন। রবীন্দ্রনাথবাবু লাদাখীদের নিয়ে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথাও বলতে লাগলেন। যেমন, লাদাখীরা ভীষণ শান্তিপ্রিয়। সব ধর্মের লোক মিলেমিশে থাকে। জাতপাতের গণ্ডগোল নেই। রাজনীতির তেমন লড়াই নেই। একজনের বিপদে অন্যজন প্রাণ দিয়ে করে। সবচেয়ে বড় কথা, চুরি, ডাকাতি এবং অন্যান্য অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে লেহ্ প্রায় মুক্ত। প্রত্যেকে খুবই বিশ্বাসী। ভাবা যায় এমন দেশ আজও পৃথিবীতে আছে।

রবীন্দ্রনাথবাবু জানালেন—এ বছরই তাঁরা প্রথম দুর্গাপুজো করছেন লেহ্‌তে। শুনে অবাক হবারই কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এগারো বারো হাজার ফুট উঁচুতে যেই কিছু বাঙালী একত্র হয়েছে, অমনি তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব পালনের আনন্দে মেতে উঠেছে। জানালেন, বহু লাদাখী লোকজনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে চাঁদা দিয়েছেন। ঠাকুর দেখার জন্য খুব ভিড়ও হচ্ছে। গান বাজনাও চলছে। সে নাকি এক দারুণ ব্যাপার।

আমাদের প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে চললেন। লেহ্‌তে তখন সন্ধ্যে নেমেছে। অলিগলি রাস্তায় যেখানে বিজলি আলো পৌঁছয় না, অন্ধকার সেখানে ঘনিয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারির পথ হাতড়ে প্রায় জ'মে যাওয়ার মত ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঝোড়ো হাওয়া আর ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি ঝোরার গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথবাবুকে অনুসরণ করে একসময়ে পুজোর জায়গায় পৌঁছে যাই। ধূপ-ধুনোর গন্ধ, পুরোহিতের উচ্চ স্বরে মন্ত্রপাঠ আর একদিকে কাওয়ালীর জমাটি আসর, সব নিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। আশপাশ থেকে বহু লাদাখী লোকজন ভিড় করে সেই পুজো দেখতে এসেছেন। কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে নবমীর আরতি চলছে তখন।

মি. সেনগুপ্ত বিভিন্ন ধরনের জীবিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই প্রায় বাঙালী আর কলকাতার লোক। কর্মসূত্রে সবাই এই দূরদেশে আছেন। অনেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। অনেকে পারেননি। গ্র্যাণ্ড ওবেরয়-এর ম্যানেজার মি. চৌধুরী, মিলিটারির মি. চক্রবর্তী, ক্যাপ্টেন আচারিয়ার মত বহু লোকের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল। আমাদের সঙ্গে কথায় বার্তায় অনেকেই বহুদিন পর যেন স্বজন-সঙ্গলাভের আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন। কেউ কেউ ফেলে আসা বাড়ি-ঘর আত্মীয়-পরিজনের কথায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন।

সীমান্ত শহর হলেও মিলিটারিদের যত্রতত্র যাতায়াত লেহ্‌র সরল জীবনযাত্রায় কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, কী মানুষের অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে এমন দেশ বোধহয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তবে অনেকেরই আশঙ্কা লেহ্ ক্রমশ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে, তাই হয়তো আগামী দশ বছর পরই এর চেহারা অনেক বদলে যাবে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের রূপও বদলাতে থাকবে।

সুন্দরী কুমারী লেহ্ যেন দিনের শেষে রোজ ইন্ডাসের নীল জলে মুখ দেখে—তার সযত্ন লালিত কৌমার্যকে আর কতদিন সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কে জানে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ে পাহাড়ে যেন ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে ওঠে সুন্দরী লেহ্। তার অতুল ঐশ্বর্যের খবর পৌঁছেছে পৃথিবীতে, তাই তো দূর দেশ থেকে মানুষ আসছে তারই ঐশ্বর্য-সন্ধানে।

বহু যুগ আগেই বেশির ভাগ লাদাখী যাযাবর-জীবন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসে মনোযোগী হয়েছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আড়াই হাজার, চার হাজার মিটার উচ্চতায় লাদাখীরা অনায়াসে বাস করতে পারে। আর পশুপালকদের কুঁড়ে দেখা যায় পাঁচ হাজার মিটারেরও ওপরে। তবে চার হাজার মিটার উচ্চতার পর থেকে অক্সিজেনের একটু অভাব ঘটে। সাধারণভাবে দেখা গেছে লাদাখীরা দীর্ঘায়ু হয়। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সাহেব বেশ কিছুকাল লাদাখে কাটিয়েছিলেন অনুসন্ধানের কাজে। একশ বছর বয়সেরও বেশি অনেক লাদাখীদের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন।

লাদাখের জনসংখ্যা এতই কম, দেখা গেছে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দুজন লাদাখী বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানবিদের মতে বিগত একশ কুড়ি বছরের মধ্যে লাদাখের জনসংখ্যায় বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনি অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়েওনি, কমেওনি। দীর্ঘ

কয়েক যুগ ধরে লাদাখে জন্ম মৃত্যুর সমান হার বজায় থেকেছে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রান্তে জনসংখ্যা যখন হু হু করে বেড়ে চলেছে, এমন কি সমস্ত তৃতীয় বিশ্বও যখন ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির চাপে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন লাদাখের জনসংখ্যার এই স্থিতাবস্থা আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে। অবশ্য-এর পেছেনে লাদাখী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-কাজ করে।

প্রথম দেখা যায় লাদাখীদের জীবনের ওপর ধর্মের একটা গভীর প্রভাব রয়েছে। ফলে বহু নরনারী স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বুদ্ধের উপাসনা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-কাজই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আজীবন অবিবাহিত থেকে যান। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার একটা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তার থেকেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে লাদাখী সমাজের বিবাহ ব্যবস্থা। পঞ্চস্বামী গ্রহণ মহাভারতে দ্রৌপদীর জীবনেই থেমে থাকেনি। মহাকাব্যের যুগ ছেড়ে এই রীতি পদ্ধতি আজও ভারবর্ষের দু-একটি প্রদেশে টিকে আছে। উত্তরপ্রদেশের কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে আজও এই প্রথা চালু আছে। লাদাখী মেয়েদেরও একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। একটি পরিবারের বড় ছেলের স্ত্রী, লাদাখী সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তার অন্য ভাইদেরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ সেই মেয়েটিকে দেওরদেরও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। আমাদের জিপ ড্রাইভার হুসেনের মুখেও এই অদ্ভুত বিবাহ রীতির কথা শুনেছিলাম। হুসেন বলেছিল, এখন অবশ্য এই রীতি কিছুটা শিথিল হয়ে আসছে। লাদাখে এই পলিয়্যান্‌ড্রি বা বহুবল্লভ প্রথা চালু হওয়ার পিছনে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। আবহাওয়ার জন্য চাষ আবাদের কাজ বেশ কঠিন ছিল। তাই পরিবারগুলোও ছোট ও সীমিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির এই প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে লাদাখীরা চালু করেছিল এই বিবাহ প্রথা। যার ফলে পরিবারের আয়তন স্বাভাবিক ভাবেই ছোট হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথাতেই সম্পত্তিরও বিভাজন ঘটত না অর্থাৎ পরিবারটি যৌথ থেকে গেলে, জমি জমা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগাভাগি হত না। লাদাখের ঐ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে পরিবারের সব জমিজমা ভাগ করে আলাদাভাবে চাষ-আবাদ-করে জীবন ধারণ করা প্রায় তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে সম্প্রতি এই রীতি ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। কারণ লাদাখী যুবক যুবতীরা মনোগেমাস বা একস্বামী গ্রহণরীতির প্রতিই আকৃষ্ট হচ্ছে। তার কারণ পরিবারগুলো আর আগের মত শুধুই জমি নির্ভর নয়। শ্রীনগর লেহ্‌র প্রধান সড়ক খুলে যাওয়ায় লাদাখের অর্থনীতিতে কিঞ্চিৎ গতির সঞ্চার ঘটেছে।

দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই লাদাখে ইয়াক্ আর লাঙ্গলের আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং তারপর কয়েক'শ বছরের মধ্যেই তারা সেচের ব্যবস্থাকে মোটামুটি উপযোগী করে তুলেছিল। প্রথম দিকে লাদাখীরা শুধুই চাষ আবাদ করত। পরে তারা ব্যবসার ক্ষেত্রেও মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু অত উঁচু উপত্যকার লোকজন বিনিময়ের ক্ষেত্রে টাকার ব্যবহার করত না। জিনিস দিয়েই ব্যবসার বিনিময় চলত। যেমন চাষীরা উল দিয়ে বীজ, কাপড়, মসলা ও চিনি জোগাড় করত। নুনের ব্যবসাও তারা শিখেছিল পরে। আর পশুপালকরা মাখন দুধের পরিবর্তে নীচের উপত্যকা থেকে কিনে নিয়ে যেত, চা

এখনও লাদাখীদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী। কিছু লোক হস্তশিল্পী, আর কিছু সংখ্যক হলো পশুপালক সম্প্রদায়ভুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন চার পাঁচ হাজার মিটার ওপরে পাহাড়ী উপত্যকাগুলোতে লাদাখীরা কঠিন শ্রমে, দীর্ঘ অধ্যবসায়ে গড়ে তুলেছে ছোট ছোট গ্রাম এবং লেহ্‌র মত শহর। গ্রীষ্মকালে সমতলের ভারতবর্ষ যখন প্রচণ্ড দাবদাহে ঝলসে যায়, সূর্যের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির নীচে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে বিহারে, উত্তর-প্রদেশে, তখন লাদাখের পাহাড়ে পাহাড়ে একটু একটু করে গলতে শুরু করে সাদা বরফ। তখনই ভেড়া ছাগল আর ইয়াকের পাল নিয়ে পশুপালকের দল দুর্গম গিরিপথ পেরিয়ে উঠে যায় সদ্য তুষার মুক্ত মালভুমির দিকে। প্রতি বছরই শীতের সময় তারা নেমে আসে নীচে। শীত-শেষে উঠে যায় ওপরে। খুঁজে নেয় চারণভূমি আর নীচের লাদাখীরা অপেক্ষা করে থাকে আরো বেশি মাখন এবং পশমের আশায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিমালয় ও কারাকোরমের মধ্যের এই সব উপত্যকাগুলি খুবই উর্বর। অবশ্য যত উঁচুতে ওঠা যায় জমির উর্বরতা ততই বাড়ে। কিন্তু চার হাজার সাড়ে চার হাজার মিটারের ওপরে গেলে নিশ্বাসের অসুবিধে হয় অক্সিজেনের অভাবে।

চাষের কাজে লাদাখীরা সাধারণত ইয়াকই ব্যবহার করে। ইয়াক্ মাখন ও দুধের প্রয়োজনও মেটায়। লাদাখীদের ঘর তৈরির কাজে ইয়াকের গোবর প্রায় অপরিহার্য। এর মাংসও খাওয়া যায়। শিঙ্ দিয়ে তৈরি করা হয় পানীয় পাত্র। লাদাখীদের জীবনযাত্রায় ইয়াকের গুরুত্ব তাই সব থেকে বেশি। লেহ্‌র পথেঘাটে, খামারে মাঝে মাঝেই এই ইয়াকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। চেহারায় আকৃতিতে ভয় পাওয়ার মতই। কিন্তু স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছিলাম ইয়াক্ এমনিতে খুবই শান্ত প্রাণী। সব থেকে খাড়াই পথেও প্রচুর বোঝা পিঠে নিয়ে ইয়াক অবলীলায় হেঁটে যেতে পারে। একশ কেজি ওজন এরা অনায়াসে বহন করে। মজার কথা, জল না পেলে বরফ চিবিয়ে এরা তেষ্টা মেটায়। লাদাখে ইয়াক, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর, জো, এসব ছাড়াও নেকড়ে, হরিণ, তুষারচিতা এবং বুনো ভেড়াও দেখা যায়।

পাহাড়ী রাস্তা যানবাহনের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়। তবে ঘোড়ায় করে যাতায়াতের খুবই চল আছে দেখলাম। চাষ-আবাদ লাদাখে কোন কালেই খুব একটা বেশি কিছু হত না। এক সময়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্রিক। বাণিজ্যপথ ছিল তিব্বতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভারত-তিব্বত সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই বাণিজ্যপথও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে লাদাখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি সবই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে এর গভীর প্রভাব পড়ে। লাদাখীরা ভেড়া, ছাগল, গরু, গাধা, ইয়াক সবই পালন করে। ভেড়া এবং ছাগলের পালন প্রচুর, মূলত মাংস এবং উলের জন্য। উল তৈরি করা ও বোনায় লাদাখীরা খুবই পারদর্শী। ঘরে বসে এ কাজ প্রায় সবাই করে। লেহ্ শহরের সর্বত্রই আমরা দেখেছি রোদে বসে বয়স্কা মহিলারা উল তৈরি করছেন। এক জায়গায় বসে বা পথ হাঁটতে হাঁটতে ছোট বড় মেয়েরা দ্রুত উল বুনে চলেছে।

লাদাখীরা শীতের জন্যই অনেকগুলো পোশাক এক সঙ্গে পরে। সবচেয়ে ভালো পোশাকটি তারা সব পোশাকের নীচে পরে এবং সব থেকে পুরনো পোশাকটি পরে ওপরে

গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লাদাখীদের পোশাকে ঢাকা থাকে। মাথায় থাকে ভেড়ার চামড়ার টুপি। পায়ে থাকে অদ্ভুত ধরনের জুতো। ছাগল বা ভেড়ার চামড়া, রঙিন কাপড়ের টুকরো, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে নিজেরাই সেই সব জুতো তৈরি করে নেয়। লাদাখীদের পোশাকের ব্যবহারটাও আশ্চর্য ঠেকে। হাতের লম্বা হাতা অনেক সময় তাৎক্ষণিক রুমালের কাজ করে। শার্ট ট্রাউজার বা কোটে কোনদিন জল পড়ে না। কিন্তু কোন উৎসব অনুষ্ঠানে ভালো পোশাক পরতে হলে সাধারণভাবে পোশাক পরার রীতিটাকে বদলে নেয়। অর্থাৎ ভেতরের পোশাকটাকে বাইরে পরে নেয় ওপরেরটাকে ভেতরে। প্রধান লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে গেলেও তারা কখনো কখনো পোশাক ভাড়া করে নেয়। লাদাখীদের মধ্যে স্নান করার প্রচলন খুব কম। সাধারণত প্রচণ্ড ঠাণ্ডাই এই ব্যবস্থা চালু রেখেছে। বৃদ্ধরা কোনদিনই স্নান করে না। অল্পবয়েসীরা করে কদাচিৎ। লাদাখী মেয়েরা সাধারণত নানা রঙিন পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর অলঙ্কার ব্যবহার করে। লেহ্ শহরের প্রধান রাস্তার পাশে বহু দোকানে খুব সুন্দর সেই সব অলঙ্কার সাজানো আছে দেখেছি। কিন্তু অলঙ্কারের গায়ে আঁটা লেবেলে দামের গুরুগম্ভীর সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকিয়ে বেশি এগনোর সাহস হয়নি আর।

লাদাখীদের চেহারায় মোঙ্গলদের প্রভাব খুব বেশি। গালের হাড়গুলো একটু উঁচু, থুতনিটা ছোট, নাক ঈষৎ চ্যাপ্টা। এবং চোখগুলো হয় সরু ও তির্যক। গায়ের রং হলদেটে ফর্সা। সাধারণ উচ্চতার শক্তপোক্ত চেহারা এদের। তবে লাদাখে বহু জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই চেহারাতেও তাদের বৈচিত্র্য আছে। অনেকের আবার খুব কাটাকাটা নাক চোখ মুখ দেখা যায়। চোখ কারো নীল, কারো বাদামি আবার কারো বা কালো। এক কথায় সুন্দর দেখতে লাদাখের প্রকৃতির মতই যেন তাদের সৌন্দর্য।

বার্লি লাদাখীদের প্রধান খাদ্য হলেও নুডলস তাদের খুব প্রিয় খাবার। তবে নিজেদের জন্যই তারা বাড়িতে নুডলস তৈরি করে। কখনই বাইরে বিক্রি করে না। তাই বোধহয় লেহ্ শহরের 'হিলটপ্' রেস্টুরেন্টে খাদ্যের তালিকায় কখনই নুডলসকে অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়নি। আমরা দুপুর বা রাতের খাওয়া রুটি-মাংস দিয়ে চালাতাম। লাদাখীরা প্রচুর পরিমাণে চা পান করে। তবে আমাদের মত দুধ চিনি সহযোগে নয়। চায়ের সঙ্গে মাখন, সোডা, নুন ইত্যাদি মিশিয়ে খায়, কদাচিৎ দুধও। উৎসব অনুযানে নানারকম মাংস খাওয়ার রেওয়াজ আছে। পানীয় হিসাবে ছাঙ্ তাদের সব থেকে প্রিয়। বার্লি থেকে এই ছাঙ্ তৈরি হয়। লাদাখে ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, ইয়াক্, জো-র সঙ্গে সঙ্গে কুকুর বেড়ালকেও গৃহপালিত হিসেবে দেখা যায়। তবে মুরগির প্রচলন একদম ছিল না। কারণ বৌদ্ধধর্মে এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল মুরগির ডিম খেলে মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এখন এ ধারণা কিছু শিথিল হয়েছে। হোটেল রেস্টুরেন্টে পর্যটকদের প্রাতরাশে পাউরুটি মাখনের সঙ্গে ডিমের কোন অভাব হয় না এখন। *

** লেখিকার 'লাদাখের পথে' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত*

পর্বতারোহণ ও সিকিম হিমালয়

রমেন মজুমদার

অনেকের প্রশ্ন, পাহাড়ে ওঠার দরকার কী? কেন মানুষ পাহাড়ে ওঠে?

এই ধরনের কোনো প্রশ্নের কোনো সদুত্তর এখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি।

ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন—

"Such a question as, 'Why do you climb mountains?' is only answerable in terms of concrete experience and the expressible thoughts that permeate such experience; and when that experience is transcendental and made up of many parts, just as white light is made up of many colours, the task of translating into words more than a tithe of its beauty becomes impossible."

গোটা সৃষ্টির পিছনে 'Divine Love and purpose' আছে, এই সত্য যারা মানতে রাজী আছে তারাই একথার মর্ম বুঝবে।

এমন মানুষ অনেক আছে যাদের কাছে পাহাড়ের কোনো আকর্ষণ নেই। তাদের কাছে ঐ উঁচু উঁচু পাহাড়ে টন টন মাটি পাথর বরফ তুষার আর কোথাও কোথাও কিছু গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

আবার, এমন মানুষও আছে যাদের কাছে পাহাড়ের আকর্ষণ আছে সীমিত অর্থে বা স্থূল প্রয়োজনের অর্থে। গ্রীকরা প্রকৃতিকে দেখেছে প্রধানত প্রয়োজনের অর্থে, পাহাড় কতখানি তাদের কাজে লাগে সেই দিক থেকে তারা পাহাড়কে দেখেছে।

এমন মানুষও নেহাত কম নেই যারা বলে, কেবল নির্বোধেরাই পাহাড়ে ওঠে আনন্দ পেতে কিন্তু যে জীবন ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন সে জীবন বিপন্ন করার কোনো অধিকার তাদের নেই। পাহাড়কে দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট, পাহাড়ে ওঠার কোনো প্রয়োজনই নেই। যারা পাহাড়ে ওঠে তাদের দূর-পূর্বপুরুষরা একসময় পাহাড়ে উঠত বলেই ওঠে। তাদের চরিত্রে ঐ দূর-পূর্বপুরুষদের গুণ ফিরে এসেছে। পাহাড়ে ওঠা অনেকটা অ্যাট্যাভিস্টিক।

এমন মানুষদের মত ও মন্তব্য নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তর্ক করতে যাওয়াও মূর্খতা। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, পাহাড়ে ওঠার আসল উদ্দেশ্য কখনও পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ পাহাড়ে ওঠা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তবু অনেক অসুবিধা, অনেক কষ্ট আর অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যারা পাহাড়ে ওঠে তারা নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওঠে। কী সেই উদ্দেশ্য? এককথায় বলা শক্ত। অশক্তভাবে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সেই উদ্দেশ্য অনেকটাই দুর্বোধ্য। একটা দূর পর্যন্ত বোঝানো যেতে পারে তার পরে আর নয়।

যতটা দূর পর্যন্ত বোঝানো যেতে পারে তা হল সৌন্দর্য। পাহাড়ে ওঠা অনেকটা সৌন্দর্যের আকর্ষণে ওঠা। সে সৌন্দর্য কেবল বাইরের সৌন্দর্য নয়, ভিতরেরও সৌন্দর্য।

আমাদের সবার ভিতরে সৌন্দর্য আছে, আমাদের চারপাশের সবকিছুর ভিতরে সৌন্দর্য আছে, আমাদের দৃষ্টি যত উন্নত হয় ততই সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। পাহাড়ে উঠলে দৃষ্টি উন্নত হয়। তাই বোধ হয় উইলিয়াম ব্লেক বলেছেন—

"Great things are done when men and mountains meet:
This is not done by jostling in the street."

কোনো মানুষের জীবনে সৌন্দর্য ঠিক ততখানি দরকারী যতখানি দরকারী অন্নজল। আর, তার মনে যদি তেমন আধ্যাত্মিক ভাব থাকে তাহলে সৌন্দর্য ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। কোনো-না-কোনো আকারে তার মধ্যে সৌন্দর্য থাকতেই হবে—তা সে সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য দর্শন অথবা ধর্ম, যে আকারেই হোক।

পাহাড়ে সৌন্দর্য আছে। সে সৌন্দর্য লাইনে, ফর্মে, কালারে—অর্থাৎ, রঙে। সে সৌন্দর্য বিশুদ্ধতায়, সরলতায়, স্বাধীনতায়। পাহাড় মানুষের মনে শান্তি আর পরিতৃপ্তি এনে দেয়, দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করে।

যাঁরা পাহাড়ে উঠেছেন তাঁরা জানেন, পাহাড়ে ওঠার মতো ব্যায়াম আর নেই। স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্যই হোক কি স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যই হোক, পাহাড় তার দুয়ার খুলে রেখেছে। পাহাড়ে উঁচুতে উঠতে না পারলে শুধু নিচু দিয়ে হেঁটে বেড়ালেও ইংরেজীতে যাকে ফিজিক্যাল ফিটনেস বলে তা অর্জন করা যায়। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা।

এই প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের অভিজ্ঞতার কথাও বলা যায়। ১৯৪৫ সালে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন—

"I have tried most sports, but I know of none in which so many muscles are exercised as in mountaineering. When I was young I was a chronic invalid, and had every disease under the sun, including pneumonia twice. Then I began to climb hills and went from strength to strength. I have now been six times to the Himalayas, and there was certainly no fitter man than I on any of those expeditions."

কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যের জন্য কেউ পাহাড়ে ওঠে, এমনটা বড়ো শোনা যায় না।

যদি বলি, পাহাড়ে ওঠা একটা অ্যাডভেঞ্চার তাহলে বোধ হয় অনেকখানি ঠিক বলা হয়। প্রত্যেক মানুষেরই মনে কিছু-না-কিছু অ্যাডভেঞ্চার থাকে। যারা দুঃসাহসিক, যারা প্রাণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তাদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের শিকড় থাকে অনেক গভীরে। মানুষ তার অস্তিত্বের একেবারে আদি থেকেই অ্যাডভেঞ্চারে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে সে বাঁচতেই পারত না, কারণ এই অ্যাডভেঞ্চারের জন্যই মানুষ তার পরিবেশকে বশে আনতে পেরেছে। যদি কোনোদিন মানুষের মন থেকে অ্যাডভেঞ্চার চলে যায় তাহলে গোটা মানবজাতি পিছন দিকে চলতে শুরু করবে।

অ্যাডভেঞ্চার মানে প্রাণের ঝুঁকি নয় সবসময়। মনের যে কোনো নতুন চিন্তা কিংবা আবিষ্কারও অ্যাডভেঞ্চার। তবে শারীরিক অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে মানসিক অ্যাডভেঞ্চার

মিশে যে অ্যাডভেঞ্চার সেই অ্যাডভেঞ্চারই সবচেয়ে বড়ো অ্যাডভেঞ্চার। নিরাপদ ঘরের মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসে কোনো নতুন আবিষ্কারের কথা চিন্তা করা মানসিক অ্যাডভেঞ্চার হতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার হল সেই অ্যাডভেঞ্চার যাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কিছু-না-কিছু সাফল্য লাভ করা যায়। এইভাবে প্রাণের যে ঝুঁকি নেওয়া হয় তা কখনও বৃথা যায় না। এখানে ধনদৌলতের হিসাবে আত্মত্যাগের পরিমাপ হয় না।

তবু বেশির ভাগ মানুষই পাহাড়কে ভয় করে।

পাহাড়ের প্রতি মানুষের ভয় আজন্ম, সৃষ্টির প্রায় ঊষাকাল থেকে। মানুষ যখন অরণ্যে গিরিকন্দরে বাস করেছে তখন পাহাড়ের পাদদেশেই করেছে, পাহাড়ের খুব বেশি উপরে ওঠে নি।

পাহাড়ের প্রতি মানুষের ভয় আসলে অজানার প্রতি ভয়। পাহাড়ের নিষ্পথ আদিম অরণ্যে হিংস্র গুহাবাসীরা সভয়ে সন্তর্পণে পথ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই আদিম ভয়

মাত্র দু শ বছর আগেও মানুষ পাহাড়কে মনে করেছে হিংস্র, অপ্রয়োজনীয়,অসুবিধাজনক মনে করেছে, দুজ্ঞেয় দুর্বোধ্য ঈশ্বর মানুষের কষ্টসাধ্য চলার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর বুকে স্থানে স্থানে অকারণে কিছু উপাঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়কে সে চিত্রিত করেছে ভয় আর বিষণ্ণতায় ভরা কোণাকার দৈত্য হিসাবে।

গ্রীকদের কাছে পাহাড় ছিল ভয়ঙ্কর স্থান, কেবল দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট, যে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য ঘনঘন তাদের প্রার্থনা করতে হত, পশুবলি দিতে হত।

পাহাড়ে দু ধরনের ভয় আছে। প্রথম, পাহাড়ের ঐ বিশাল উপস্থিতিটাই একটা ভয় এই ভয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে কুসংস্কার, অপরিচিতি নির্জনতা, লোককাহিনী আর হিংস্র ও আদিম প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের বংশানুক্রমিক ভয়

দ্বিতীয় ভয় সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এই ভয় পাহাড় থেকে পড়ে যাবার ভয় হিমানীসম্প্রপাত, ঝড় আর শৈত্যের ভয়, পরিশ্রান্তিতে পরিচ্ছিন্ন হবার ভয়।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রথম ভয় জয় করা যায়, অন্তত ধর্মীয় বিশ্বাসে মহিমান্বিত করে অথবা ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ এই দার্শনিক মত গ্রহণ করে এই ভয়কে বশে আনা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ভয় দূর করার বা বশে আনার কোনো উপায় নেই। এই ভয় স্পোর্টের এক অপরিহার্য পটভূমি। এই ভয় কেউ ইচ্ছা করে সৃষ্টি বা বিনাশ করতে পারে না এই ভয় থাকেই। এই ভয় মেনে নিয়েই পাহাড়ে উঠতে হয়। পাহাড়ে ওঠার মতো এব আনন্দঘন স্পোর্টে এই ভয় কাটানোর জন্য বাহাদুরি করা চলে না।

আধুনিক পর্বতারোহীরাও পাহাড়কে ভয় করে—যদিও সেই ভয়কে জয় করার চেষ্ট সবসময়েই আছে, জ্ঞান আর কলাকৌশল দিয়ে সেই ভয়কে যুক্তিসহ করার চেষ্টাও আছে কিন্তু ভয় আছেই। সে ভয় সবসময় দুর্ঘটনার ভয় নয়, মৃত্যুর ভয় নয়। অন্য ভয়

মানুষ যখন জেনেছে, পাহাড় আসলে কী, কীভাবে পাহাড়ের সৃষ্টি, কী আছে পাহাড়ে তখন তার ভয় অনেকখানি কেটেছে। তখন নতুন ভাবনার উদয় হয়েছে। পাহাড় তখন

কেবল সাধুসন্তের সাধনস্থল হিসাবে নয়, আরও গভীর ও আরও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হিসাবে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে।

তখন কিছু মানুষ শুধু পাহাড়ে ওঠার জন্যই পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে; আবার, কিছু মানুষ একটা অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা লাভ করে শুধু সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

প্রকৃতির মধ্যে এই সৌন্দর্য আবিষ্কার একেবারে হঠাৎ হয় নি, হয়েছে ধীরে ধীরে। কারণ, প্রকৃতির নখ আর দাঁত এখনও লাল।

প্রত্যেক যুগেই এমনকিছু মানুষ জন্মায় যাদের দর্শনশক্তি থাকে, কল্পনাশক্তি থাকে। তারা কবি, তারা দার্শনিক, তারা স্বপ্নদ্রষ্টা। পাহাড়ে তারা যেমন সৌন্দর্য দেখতে পায় তেমনি শান্তিও দেখতে পায়।

মানুষ আর তাই প্রশ্ন করে না, পাহাড়ে কী এমন আছে যা মানুষের মনে রোমান্টিকতা সৃষ্টি করে? মানুষকে কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করে? কারণ, সে জেনেছে, যে মানুষ রোমান্টিক নয়, যে মানুষ কাব্যরসে বঞ্চিত তার কাছে ঐ উঁচু উঁচু পাহাড়ে টন টন মাটি পাথর বরফ তুষার আর কোথাও কোথাও কিছু গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু যে মানুষের মনে শান্তি আছে অথবা যে মানুষ মনে শান্তি খোঁজে তার কাছে পাহাড়ে এমনকিছু আছে যা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

যিশু খৃষ্ট যখন প্রার্থনা করতে কি ধ্যান করতে চাইতেন তখন তিনি পাহাড়ে উঠে যেতেন। পাহাড়ে তিনি একটা আশ্চর্য শান্ত সমাচ্ছন্ন ভাব পেতেন। নীচতা সঙ্কীর্ণতা দীনতা স্বার্থপরতা লোভ ইত্যাদিতে ভরা যে পৃথিবীতে তাঁর বাস, পাহাড় থেকে সেই পৃথিবীর দিকে তিনি তাকাতেন। জীবন সম্বন্ধে তাঁর নতুন ধারণা হত।

আমাদের সাধুসন্তরা পাহাড়ে উঠে সেই যে ধ্যানে বসতেন, আর সহজে নামতেন না। কতকাল যে তাঁদের সেই ধ্যানের আসনে কেটে যেত, খেয়াল থাকত না। এখনও অনেক পাহাড়ে অনেক দূর দুর্গম স্থানে অনেক সাধুসন্ত ধ্যানে বসে আছেন। কতকাল থেকে আছেন, কেউ জানে না।

সেই আদি শঙ্করাচার্যের কাল থেকেই আমাদের সাধুসন্তরা হিমালয়ের প্রতি বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছেন। আদি শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের প্রসার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ভারতের বদরীনাথ থেকে নেপালের পশুপতিনাথ মন্দির পর্যন্ত গেছেন হিমালয়ের উপর দিয়ে, গভীর অরণ্য অতিক্রম করে। আদি শঙ্করাচার্যই পৃথিবীর প্রথম পর্বতারোহী যাঁর দৃষ্টান্তে অনেকে পর্বতারোহণে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তীর্থযাত্রীরাও পর্বতারোহণের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের মন্দিরে মন্দিরে গেছেন পুণ্যার্জনের আকাঙ্ক্ষায়। যে মন্দির হিমালয়ের যত উঁচুতে সেই মন্দিরই তাঁদের তত বেশি আকর্ষণ করেছে। হিমালয়ের যত উঁচুতে তাঁরা গেছেন, ঈশ্বরের তত কাছাকাছি যেন তাঁরা পৌঁছেছেন। পথে যত কষ্ট তাঁরা সহ্য করেছেন তত বেশি যেন তাঁরা পুণ্যার্জন করেছেন।

হিমালয় শুধু হিমের আলয় নয়, সাধুসন্তদেরও আলয়—তীর্থযাত্রীদেরও আশ্রয়।

হিমালয় ভারতবাসীর জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিমালয়কে বাদ দিয়ে ভারতকে, ভারতবাসীকে ভাবা যায় না। সভ্যতার প্রত্যূষেই হিমালয় ভারতবাসীর মন প্রাণ জীবন অধিকার করে নিয়েছে। ভারতবাসীর ধর্মীয় জীবনেই শুধু নয়, তার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রোমান্টিক, এমন কি অর্থনৈতিক জীবনেও হিমালয়ের প্রভাব অপরিমেয়।

কিন্তু ভারতের বাইরের মানুষ হিমালয়কে চিনেছে খুব বেশিদিন নয়। চিনেছে খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে, আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পর। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পরই ইউরোপের মানুষ হিমালয় সম্বন্ধে প্রথম জানতে পেরেছে। সিন্ধু উপত্যকায় এয়রনসের যুদ্ধের পর আলেকজান্দারের সৈন্যরা হিমালয়ে প্রবেশ করেছিল কিনা কোনো ইতিহাসে তা লেখে না। কিন্তু পুরুষানুক্রমিকভাবে মুখে মুখে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে মানতে হয়, এয়রনসের যুদ্ধের পর ব্যাকট্রিয়া থেকে আগত কয়েকজন দুঃসাহসিক গ্রীক পামির অঞ্চলে অভিযানে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে হুনজার মীর সার্ভে অভ ইণ্ডিয়ার সুপারইনটেনডেন্ট কেনেথ মেসনকে বলেছিলেন, স্বয়ং আলেকজান্দারের প্রত্যক্ষ বংশধর তিনি, তাঁর মা ছিলেন হিন্দুকুশের এক সুন্দরী রমণী। মীরের কথা যে অসত্য নয় তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, হুনজা উপত্যকায় সেকেন্দারাবাদ নামে এখনও ছোট্ট একটি গ্রাম আছে এবং আলেকজান্দারকে সেকেন্দারও বলা হয়ে থাকে।

যতদূর জানা যায়, ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম হিমালয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং প্রস্থের দিক থেকে গোটা হিমালয় অতিক্রম করেছিলেন দুই নির্ভীক অভিযাত্রী। তাঁদের একজন ফরাসী, নাম আঁতোনিও দ্য আন্দ্রাদ ; আর-একজন বৃটিশ, নাম ম্যানুয়েল মারকোয়েস। তাঁরা খবর পেয়েছিলেন, তিব্বতে এক খৃষ্টানসম্প্রদায় আছে। সেই খৃষ্টানসম্প্রদায়ের সন্ধানে তাঁরা ১৬২৪ সালের ৩০ মার্চ আগ্রা থেকে রওনা হয়েছিলেন। তাঁদের পথ ছিল শ্রীনগর হয়ে। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের শ্রীনগর নয়, অলকানন্দার কাছাকাছি আর-এক শ্রীনগর। তাঁরা শ্রীনগর ও বদরীনাথ হয়ে উত্তর হিমালয়ের জাস্কর পর্বতশ্রেণীর মাথায় ১৮,৪০০ ফুট উঁচু মানা গিরিদ্বারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

জুন মাসের গোড়ায় দুজন ভারতীয় খৃষ্টানকে নিয়ে আন্দ্রাদের মানা গিরিদ্বার অতিক্রম করার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রবল হিমঝঞ্ঝায় তাঁরা এগোতে পারেন নি, তাছাড়া তুষারস্পর্শে তাঁদের দেহ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত জুলাই মাসের শেষাশেষি আন্দ্রাদ আর মারকোয়েস কয়েকজন তিব্বতী পথপ্রদর্শকের সাহায্যে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় মানা গিরিদ্বার অতিক্রম করেন। তাঁরা শতদ্রুর উত্তরভাগে গুজের রাজধানী সাপারাংয়ে গিয়ে পৌঁছন। সেখানে 'রাজা' তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান।

হিমালয়ের যে অংশ সবচেয়ে বেশি মানুষের চেনা, হিমালয়ের যে অংশে সবচেয়ে বেশি সহজে যাওয়া যায় সে হচ্ছে সিকিম হিমালয়। সিকিম হিমালয়ের সৌন্দর্যের জন্যই সিকিম হিমালয়কে মানুষ চিনেছে বেশি—সে শুধু প্রাচ্যের মানুষ নয়, পাশ্চাত্যেরও মানুষ। পাশ্চাত্যের মানুষের চোখের সামনে প্রথম যিনি সিকিম হিমালয়ের সৌন্দর্য তুলে ধরেন

তাঁর নাম জোসেফ হুকার। বিখ্যাত এই বৃটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী উনিশ শতকের মধ্যভাগে সিকিম হিমালয়ের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

উনিশ শতকের শেষে ১৮৯৯ সালে ডগলাস ফ্রেশফিল্ড যখন সিকিম হিমালয়ের অনেক উঁচুতে অভিযান চালিয়ে ফিরে আসেন তখন কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের চিন্তা দেখা দেয়। ফ্রেশফিল্ডই প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন। তারপর ডাঃ এ. এম. কেলাস বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছরে অনেকগুলি গিরিশৃঙ্গ আর গিরিদ্বার জয় করে আধুনিক পর্বতারোহীদের হিমালয় অভিযানে আকৃষ্ট করেন। ডঃ কেলাসের পরই হিমালয় অভিযানে প্রকৃত আগ্রহ দেখা যায়।

পূর্ব হিমালয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যটক সার জোসেফ হুকার। সিকিমে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণে কী যে আনন্দ তা তিনিই প্রথম দেখান। ১৮৪৮-৪৯ সালের অধিকাংশ সময় সিকিম হিমালয়ের বহু বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তার যে বিবরণ তিনি তাঁর 'হিমালয়ান জার্নল্‌স্‌'-এ রেখে গেছেন তার জুড়ি আজও পাওয়া যায় নি। তাঁর বিবরণ যেমন প্রাণবন্ত তেমনি মনোমুগ্ধকর।

সার জোসেফকে যেমন অনেক রাজনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তেমনি পথের কষ্টও ভোগ করতে হয়েছিল অনেক। কিন্তু কিছুতেই তিনি দমেন নি। অনেক বিঘ্নই তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তবে শেষে যা ঘটেছিল তাতে এই অঞ্চলের ইতিহাস বদলে গিয়েছিল।

সার জোসেফের সঙ্গী ছিলেন দার্জিলিঙের সুপারইনটেনডেন্ট ডঃ ক্যাম্বেল। সিকিমের দেওয়ান নামগুয়ের আদেশে তাঁদের দুজনকে তুমলঙে বন্দী করে রাখা হয়। একজন বৃটিশ অফিসারের এই অপমানে বৃটিশরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রঙ্গিত নদীর দক্ষিণে সিকিমের গোটা অংশ অধিকার করে নেয়। এই অংশে মেচি থেকে তিস্তার তরাই অঞ্চলও ছিল। এই অঞ্চল পরে চা-বাগানে পরিণত হয়।

অঞ্চলটি নেপালীরা সিকিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ১৮১৪-১৬ সালের নেপাল-যুদ্ধের পর বৃটিশদের চাপে নেপালীরা এই অঞ্চলটি সিকিমকে ফিরিয়ে দেয়। পরে সিকিম বৃটিশদের হাতে দার্জিলিং সমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

সার জোসেফ সার্ভেয়র ছিলেন না, জরিপের কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু এই অঞ্চলের যে ছোট্ট স্কেচ মানচিত্র তিনি এঁকেছিলেন, ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৬১ সালে এই অঞ্চলের একটা নির্ভরযোগ্য মানচিত্র তৈরি করেন কর্নেল জে. সি. গলারের বাহিনীর একজন তরুণ এঞ্জিনীয়ার লেফটেন্যান্ট টি. টি. কার্টার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিমালয় অভিযানের একটা যুগের অবসান ঘটে। বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রীদের মধ্যে 'পার্বত্য ভ্রাতৃত্ব' বলে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, এই যুদ্ধে তা ভেঙে খানখান হয়ে যায়। পৃথিবীর নানা পাহাড়ে যাঁরা একদিন মিলিত হয়েছিলেন, এই যুদ্ধে তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রু হিসাবে লড়াই করেছেন, পরস্পরকে ঘৃণা করতে শিখেছেন।

এই শতকের তিরিশের দশকে সিকিম হিমালয় 'মাউন্টিন প্যারাডাইস অভ বেঙ্গল' নামে আখ্যাত হয়। সিকিম হিমালয়ে তখন দারুণ তৎপরতা। এই দশকে এমন একটা বছরও বোধ হয় যায় নি যে বছরে এখানে কোনো-না-কোনো অভিযান হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে কুড়ি বছরে হিমালয় অভিযানে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম দিকে অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর মানচিত্র প্রণয়ন। তিরিশের দশকের শেষভাবে অভিযাত্রীদের অনেকেরই লক্ষ্য হয় উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ।...........

রাত সাড়ে তিনটেয় শঙ্কু মহারাজের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। কাল সারা দিনের ধকলের পর বেশ একটু ঘুমিয়েছিলাম। কাঁচা ঘুমে উঠতে ইচ্ছা করছে না। একটু যে আলসেমি করব তার জো নেই, শঙ্কু মহারাজ জনে জনে গিয়ে ডাকছেন। ব্যস্তবাগীশ মানুষ। পাছে দেরি হয়ে যায়, গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক সময়ে গ্যাংটক পৌঁছনো না যায়—তাঁর সেই চিন্তা। দলের নেতা না হয়েও তিনি সকলের নেতা হয়ে গেছেন। সে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে, মনের সারল্যে, অকপট আন্তরিকতায় আর সকলের প্রতি শুভকামনায়।

না, শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল। দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। সামনের দু-একটা বাড়ি থেকে উনোনের ধোঁয়া উঠছে।

এখন এক কাপ চা পেলে ভালো হত। কিন্তু চায়ের দোকানে কি উনোন ধরেছে?

পূব আকাশে সোনা ছড়িয়ে সূর্য উঠছে। আমার পাশে সুশান্তবাবু এসে দাঁড়ালেন। তারপর এক-এক করে আরও দু-চারজন। সুশান্তবাবু বললেন, "চলুন, চা খেয়ে আসা যাক।"

হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তার ধারে এলাম। দোকানে দোকানে লুচি সিঙাড়া কচুরি ভাজা হচ্ছে। পাশের উনোনে কালো কালো কেটলি।

লুচি রসগোল্লা চা—জলযোগটা মন্দ হল না। তখন আমি দুটো-চারটে সিগারেট খেতাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়ে পায়ে ডাকবাংলোর দিকে এগোলাম।

গাড়ি এসে গেছে। দুখানা বিরাট বিরাট শক্তিমান ট্রাক। একখানার ড্রাইভার সিপাই যশবীর সিং, আর-একখানার বেদ রাম। যশবীরের বয়স সাতাশ, বাড়ি লুধিয়ানায়। একাত্তরের যুদ্ধে রাজস্থানের জয়সলমিরে ছিল। বেদ রামের বাড়ি আগ্রার কাছে মৈনপুরীতে। বয়স চৌত্রিশ। সাড়ে চোদ্দ বছর সেনাবাহিনীতে ড্রাইভারি করছে, কিন্তু কখনও যুদ্ধে যায় নি।

যশবীর তার ঠিকানা দিয়ে বলল, "সার, যদি কখনও লুধিয়ানা যান, আমার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবেন। আমার তো ছেলেমেয়ে নেই, মা বউ আর তিন ভাই নিয়ে সংসার। মা আপনার কাছে আমার কথা শুনতে পেলে খুব খুশি হবেন।"

আমি বললাম, "লুধিয়ানা নয়, আম্বালা গিয়েছিলাম সাত বছর আগে, এমনি এক এক্সপিডিশনের পথে।"

যশবীর বলল, "আম্বালা থেকে আমার বাড়ি অনেক দূর।"

আমরা যারা সিনিয়র মেম্বার—সুশান্তবাবু, শঙ্কু মহারাজ, বীরেন সরকার, অসিত বসু, অমূল্য আর আমি—তারা সিপাই বেদ রামের গাড়িতে উঠলাম। বাকি সকলে গেল যশবীর সিংয়ের গাড়িতে। হ্যাপ চারজন ভাগাভাগি করে উঠল।

পৌনে আটটায় গাড়ি ছাড়ল। সামনে জুনিয়রদের আর পিছনে সিনিয়রদের গাড়ি। গাড়ি ছাড়তেই শঙ্কু মহারাজ আনন্দে চিৎকার করে গান ধরলেন, "মন দিল না বঁধু, মন নিল যে শুধু—আমি কী নিয়ে থাকি।"

শঙ্কু মহারাজ সাধুসন্ত কেউ নন, আর-দশজনের মতোই সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। ছদ্মনামে লেখেন। চাকরিবাকরি করেন, দারাপুত্রপরিবার নিয়ে সংসারধর্ম করেন। সুতরাং এ গান তিনি গাইতেই পারেন, কিন্তু এ সময়ে এ গান কেন?

শালবনের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে এগিয়ে। রাস্তা অনেকখানি সমতল ও সোজা। পাহাড়ে ওঠার আগে এমন সমতল ও সোজা রাস্তা বড়ো দেখা যায় না। আজ থেকে বছর পঁয়তাল্লিশ আগে এই রাস্তা দিয়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়েছিলেন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ। ফিরে এসে লিখেছিলেন, "The road from Siliguri is flat and straight, as straight as a Roman road..."

রোমের রাস্তা আমি দেখি নি, তবে গ্রীসের রাস্তা আমি দেখেছি। গ্রীসের রাস্তার সঙ্গে এ রাস্তার তুলনা হয় না। এ রাস্তা যেন শুধু এখানেই মানায়। রাস্তার দু ধারে নিঃশব্দ, ঘন জঙ্গল—মাঝে মাঝে দু-একটা পাখির ডাক। পাখি দেখা দেয় না, শুধু আস্তে করে ডেকে থেমে যায়। আস্তে করে, যেন জঙ্গলের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ না হয়।

একটু পরে যেন একেবারে হঠাৎই পাহাড়ে এসে গেলাম। এইরকম পাহাড়ের ঢালে জঙ্গলের মধ্যে ইতস্তত অবস্থিত দু-চারটে কুড়েঘর আর জনাকয়েক পাহাড়ী মানুষ সম্বল করে একটা ছবি করি, এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথেরও কি এমন ইচ্ছা হয়েছিল? তিনি লেখেন নি। তিনি লিখেছেন—

"As we chugged and exploded through the silent forest, dim, unsubstantial shapes far overhead began to loom through the haze, the Himalayas. In no other mountain range that I have seen is the transition from plain to mountain so abrupt. One minute we were on the Plain of Bengal, as flat as a golfing green, the next the wooded jaws of the great Teesta Valley had enclosed us.

The Teesta Valley is one of the most superb valleys in the world. Though no snow peaks are visible from its lower portion, the traveller realises that he has entered the Himalayas. Above him the valley sides rise for thousands

of feet at such a steep angle, it seems almost impossible that the dense tropical vegetation can cling to them ; below, in a rocky bed of giant boulders carried down by the turbulence of the monsoon rains, thunder the melted snow waters of Kangchenjunga, and the glaciers of Northern Sikkim."

ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ ছবি করেন নি, ছবি এঁকেছেন। প্রথম হিমালয় দেখার ছবি।

শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক একশ চোদ্দ কিলোমিটার। তিপ্পান্ন কিলোমিটার আসতেই তিস্তা বাজার পড়ল। পথের ডান দিকে অনেকটা নিচে তিস্তা নদী।

তিস্তা বাজারে আমাদের একটা পুল পার হতে হবে। পুলের ওপারে দুদিকে দুটি পথ। একটি পথ গেছে কালিম্পং আর একটি গ্যাংটক।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কালিম্পং যাচ্ছেন। সিকিউরিটি পুলের ভার নিয়েছে। দেখে দেখে গাড়ি ছাড়ছে। সময় লাগছে। ফলে, পুলের দু ধারে গাড়ির মিছিল জমে গেছে। কতক্ষণে রাজ্যপাল আসবেন, গাড়ির মিছিল ভাঙবে, আমরা এগোতে পারব—কে জানে!

বেলা মন্দ হয় নি। সকালের লুচি আর রসগোল্লা অনেকক্ষণ আগেই হজম হয়ে গেছে। একা আমরাই কি?

শঙ্কু মহারাজকে বললাম, "মহারাজ, পাশের দোকানে পাকোড়া ভাজছে।"

অসিত বসু বললেন, "চলুন, নামা যাক। যা দেখছি, গাড়ি ছাড়তে এখনও অনেক দেরি।"

চা-পাকোড়া খেয়ে সবে আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি, এমন সময় পিছনে হন্তদন্ত হয়ে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। বছর তিরিশেক বয়স। মাজা রং, ছিপছিপে গড়ন, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় সাদা টুপি। বেশ উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনারা কি সিনিয়লচু যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কাল যুগান্তরে একটা খবর দেখলাম, কলকাতা থেকে একটা দল গ্যাংটক হয়ে সিনিয়লচু যাচ্ছে। আপনাদের দেখে মনে হল, আপনারাই সেই দল।"

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।"

"আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে শঙ্কু মহারাজ কে?"

"এই যে ইনি।"

"নমস্কার, দাদা। আমার নাম কমল চৌধুরী। আমি গ্যাংটক হাই কোর্টে চাকরি করি। আপনার 'মধু-বৃন্দাবনে' পড়ে আপনাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। আপনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন।"

শঙ্কু মহারাজ হাসলেন। তারপর একটু সময় নিয়ে আস্তে করে বললেন, "আপনাকে আমি আর-একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, আমাদের এক্সপিডিশন ঠিক হবার পর।"

কমল বলল, "সে চিঠি আমি পাই নি, দাদা। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়ে আড়াই মাস পরে আজ এই গ্যাংটক ফিরছি।"

লক্ষ্য করে দেখলাম, কমলের ন্যাড়া মাথা ঢাকতেই টুপি।

কমল বলল, "দাদা, আপনাদের গাড়িতে কি একটু জায়গা হবে? বাস থেকে আমার ব্যাগটা কি নিয়ে আসব?"

"নিশ্চয়। আপনাকে যে আমাদেরও দরকার। গ্যাংটকে আপনার সাহায্য চাই বলেই তো আপনাকে চিঠি দিয়েছিলাম।"

কমল ছুটে গিয়ে পিছনের বাস থেকে ব্যাগটা নিয়ে এসে লাফিয়ে উঠল আমাদের গাড়িতে। তারপর বলল, "আমার একটা অনুরোধ আছে, আপনারা যাঁরা বয়সে আমার চেয়ে বড়ো তাঁরা আমাকে 'তুমি' বলবেন।"

আমরা সানন্দে কমলের অনুরোধ মেনে নিলাম।

এর মধ্যে রাজ্যপালের গাড়ি বোধ হয় চলে গেছে। রাস্তা হালকা হয়েছে। আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িতে বসে বসেই শুনলাম, কমলের আদি বাড়ি চট্টগ্রাম। সাত পুরুষ বৌদ্ধ। ছেলেবেলা কেটেছে আসামে। বাবা রেলের চাকুরে। সেই সুবাদে বাবার সঙ্গে সারা আসাম ঘুরেছে। ১৯৬৮ সালে বাবা আলিপুরদুয়ারে বদলি হলে সে-ই প্রথম বাংলা দেখা। বছর তিনেক আগে গ্যাংটকে সিকিম হাই কোর্টে অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাকরি নিয়ে এসেছে।

"কিন্তু দাদা, চাকরি আমার একদম ভালো লাগে না। আমার ভালো লাগে সাহিত্য অভিনয় আবৃত্তি। আর ভালো লাগে চিঠি লিখতে আর চিঠি পেতে। আর, সময় নেই অসময় নেই, ঝোলা কাঁধে অজানা পথে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু পারি কই? সংসার আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। সংসারের বাঁধন যেদিন কাটাতে পারব সেদিন বেরিয়ে পড়ব পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে অরণ্যে নদীর ধারে—।"

কমল তার উদাস দুটি চোখ মেলে দিল দূরে, পাহাড়ের মাথায়, যেখানে গাছগাছালির সবুজে আর মেঘের সাদায় মাখামাখি। তারপর হঠাৎ জোর দিয়ে বলল, "দাদা, আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন ভগবানের কাছে, সেই দিনটা যাতে তাড়াতাড়ি আসে?"

কমল আমাদের সবাইকে ক্ষণকালের জন্য একেবারে স্তব্ধ করে দিল।

শক্তিমান চলেছে অশক্তের মতো। ভেবেছিলাম, মিলিটারি ট্রাক, তাজা ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটবে। কিন্তু পারছে না। পদে পদে চেকপোস্ট।

এরই মধ্যে এক জায়গায় একটা বোর্ড দেখতে পেলাম—WELCOME YOU TO SIKKIM.

এই তাহলে সিকিম!

বিপ প্যারেসের কথা মনে পড়ল—

"This, then, is the country to which we have come for peace ; here, where for 30 million years these mountains and rivers have held sway, among a

people whose scattered homes are dominated by the wonders in their midst—a people whose lives have made no impression on the great forces of Nature of which they themselves have become a part."

বিপ প্যারেস বলেছেন, "From a scenic point of view, Sikkim is one of the loveliest countries on this earth."

শিলিগুড়ি থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার, সিকিমের সীমান্তবর্তী শহর রংপো। রংপো ছোটো শহর। ছোটো হলেও, যতদূর মনে পড়ছে, গ্যাংটকের পরেই তার স্থান। অর্থাৎ, ইংরেজী ধাঁচে বললে, সিকিমের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর রংপো।

রংপো শহরে বাঙালী আছে কিছু। বাঙালীর হোটেলও আছে দেখলাম একটা। আরও থাকতে পারে কিন্তু চোখে পড়ল একটা অন্নপূর্ণা হোটেল। বাইরে বোর্ডে লেখা আছে, ভাত ডাল তরকারি মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সময় নেই। বেলা একটা বাজে। এখনও উনচল্লিশ কিলোমিটার পথ বাকি। অফিস ছুটি হবার আগেই আমাদের গ্যাংটকে পৌঁছতে হবে। নানা অফিসে নানা কাজ। আজ শেষ করতে না পারলে একটা দিন নষ্ট। পাহাড়ে আবার তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হয়, আমাদের মতো পাঁচটায় নয়।

আমরা তাড়াতাড়ি একটা দোকানে ঢুকে চা-বিস্কুট খেয়ে আবার গাড়িতে এসে উঠলাম।

রংপোর পর সিংটাম। শিলিগুড়ি থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। রংপোর চেয়ে ছোটো শহর। ছোটো হলেও শহর তো। পাহাড়ে বড়ো শহর আর ক'টা হয়!

সিংটাম থেকে সতের কিলোমিটার এগিয়ে রানীপুল। রানীপুলও ছোটো জনপদ। তবে রানীপুল নামের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। অথবা, বলা যায় মধুরতা। কোন্ রানীর পুল? কেমন সে রানী?

তাছাড়া সত্যিই কি রানীপুলে কোনো পুল আছে? আমরা পেরিয়েছিলাম? মনে করতে পারছি না।

রানীপুল থেকে বার কিলোমিটার চড়াই ভেঙে গ্যাংটক। আমরা যখন গ্যাংটক পৌঁছলাম তখন বেলা তিনটে।

কমল বলল, শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক বাসে আসতে সময় লাগে ছ ঘণ্টা। আমাদের লাগল সওয়া সাত ঘণ্টা। তার জন্য অবশ্য শক্তিমান দুটোকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজ্যপালই তো পথে অনেকটা সময় নিয়ে নিলেন। তার উপর পদে পদে চেক। মিলিটারি গাড়ি বলে ছাড়ান নেই। বরং বেশিই বোধ হয় চেক, মিলিটারি গাড়িতে সিভিলিয়ানরা কেন?

বাস-স্ট্যাণ্ডে গাড়ি এসে থামতেই কমল তড়াক করে লাফিয়ে নামল। কমল তার নিজের সাম্রাজ্যে এসে গেছে। এখানে সে সম্রাট।

গ্যাংটকে নবাগত বাঙালীর ভরসা দুজন। একজন নবীন আর একজন প্রবীণ। নবীনের নাম কমল চৌধুরী, সিকিম হাই কোর্টের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ; প্রবীণের নাম সুধেন্দুশেখর সেন, সিকিম টেলিফোনের এস.ডি.ও.। গ্যাংটকের বাঙালীদের কাছে পরে শুনেছি, সুধেন্দুবাবুর

পরোপকারী মানুষ এখানে আর একজনও নেই। এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ তিনি। সরকারী আর বেসরকারী উভয় মহলেই তাঁর অসাধারণ প্রভাব। সে প্রভাব সরকারী পদমর্যাদার জন্য নয় সরকারী পদমর্যাদায় তাঁর চেয়ে বড়ো অফিসার এখানে আছেন অনেক। কিন্তু তাঁর মতো সম্মান তাঁর মতো ভালোবাসা আর একজনও পান নি। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষও তাঁকে মান্য করেন।

আমাদের এখানে আসার কথা যেমন কমলকে জানানো হয়েছিল তেমনি সুধেন্দুবাবুকেও জানানো হয়েছিল। সুধেন্দুবাবু চিঠি পেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন।

গাড়ি বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতেই সুশান্তবাবু, কেশব আর কমলকে সঙ্গে করে অমূল্য ছুটল টেলিফোন ভবনে। খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, "তোমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে। পাশেই শান্তিভবন। সেখানেই আজ রাত্রে আমরা থাকব। সনদা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

বলেই যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল ট্যাক্সি নিয়ে। এখনও অনেক কাজ বাকি। আই.জি. পুলিসের কাছে যেতে হবে, আই.বি. আর সেনাবাহিনীর অফিসেও যেতে হবে। ভারতীয় নাগরিকদের সিকিমে আসতে পারমিট লাগে না, কিন্তু জনপদহীন দুর্গম হিমালয়ে যেতে ইনারলাইন পারমিটের দরকার হয়। ক্যামেরা পারমিটেরও দরকার হয়। সবই দেশের নিরাপত্তার কারণে। সিকিম ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্য। পাশেই শত্রু-না-হলেও অমিত্র দেশ চীন। তাছাড়া দূরবর্তী অনিষ্টকারী দেশের চরও থাকতে পারে। সুতরাং গোটা সিকিমের উপর রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া নজর।

দুই শক্তিমানকে নিয়ে আমরা এগোলাম শান্তিভবনের দিকে। শান্তিভবনকে লোকে ঠাকুরবাড়িও বলে। দেবমন্দির আছে, তাই ঠাকুরবাড়ি। রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় দেবমন্দির আর অতিথিনিবাস নিয়ে শান্তিভবন। বিরাট বড়ো বড়ো ঘর। সারা মেঝে জুড়ে মোটা গদি পাতা। কেবল চাদর বালিশ আর কম্বল চাই। একসঙ্গে অনায়াসে আগের কালের বরযাত্রীদের মতো ঠাসাঠাসি করে দশজন শুতে পারে। ইচ্ছা হলে এখানেই রান্না করে খাওয়া যায় আর ইচ্ছা না হলে বাইরে গিয়ে হোটেল থেকেও খেয়ে আসা যায়। থাকার জন্য জনপ্রতি রোজ দু'টাকা ভাড়া। এক ঘরের ভাড়া কুড়ি টাকা। আমাদের বোধ হয় কনসেশন করেছিল, তিরিশ টাকায় তিনখানা ঘর।

আমরা তো দানখয়রাত আর কনসেশনের উপরই আছি, সেই গোড়া থেকেই। রেল 'সিঙ্গল ফেয়ার ডবল জার্নি' আর 'হাফ পার্সেল রেট' দিয়েছে, প্রতিরক্ষা দপ্তর দুখানা শক্তিমান দিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার নগদ টাকা দিয়েছে, বাটা কোম্পানি দিয়েছে জুতো, হরলিক্স কোম্পানি হরলিক্স, ব্রুকবণ্ড কোম্পানি চা, এ ছাড়া অন্যান্য খাবার কোম্পানি অন্যান্য খাবার। একটা দুটো কোম্পানি নাকি। নানা কোম্পানি নানা জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছে। এমনি করেই চলছে।

যাক, যেকথা বলছিলাম। ঐ টঙের মাথায় শান্তিভবনের তিনতলায় খাড়া সিঁড়ি দিয়ে গাড়ি থেকে এই পাহাড়প্রমাণ লটবহর নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া তার দরকারই-বা কী! কাল সকালেই তো আবার নামাতে হবে। তার চেয়ে বরং একান্ত দরকারী আর দামী জিনিসগুলো ছাড়া আর সব গাড়িতেই থাক। ড্রাইভার দুজন আর হ্যাপরা রাত্রে গাড়িতেই শোবে।

সাব্যস্ত হয়ে গেল। এর মধ্যে এক ফাঁকে আমরা কয়েকজন গিয়ে হোটেল থেকে খেয়ে এলাম। দামী হোটেল না হলেও দামী খাবার। এক প্লেট ভাত কত. মনে নেই। কিন্তু চায়ের ডিশের এক ডিশ পাতলা জলের মতো ডালের দাম স্পষ্ট মনে আছে দেড় টাকা। কলকাতায় অনেক ছোটো হোটেলে তা এমনিই দেয়।

হোটেল থেকে ঠাকুরবাড়ি ফিরতেই শুনি, দীপালি এসেছে দেখা করতে। সঙ্গে মেয়ে আর স্বামী। দীপালি বাংলার প্রথম মহিলা পর্বত অভিযানের নেত্রী। কত সালে, ঠিক মনে করতে পারছি না—১৯,৮৯৩ ফুট উঁচু রোন্টি শৃঙ্গ জয় করে পর্বতাভিযানের জগতে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এখন পর্বতাভিযান ছেড়ে দিয়েছে। গ্যাংটকে স্বামীর ঘর করছে, সেইসঙ্গে একটা স্কুলে শিক্ষকতা।

আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না। আমাকে কীকরে চিনল, কে জানে! আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেকক্ষণ এসেছি। এখন যেতে হবে, তাড়া আছে। কাল সকালে এসে আলাপ করব।"

দীপালিরা চলে যেতেই আবার নিচে নেমে এলাম। নিচে নেমে এসে দেখি অসিত বসু, বীরেন সরকার, শঙ্কু মহারাজ আর কে কে যেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। শুনলাম, উনিই সুধেন্দুশেখর সেন। আলাপ হল। সত্যিই চমৎকার মানুষ। ভারি অমায়িক। মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই। কথায় কথায় শঙ্কু মহারাজের সঙ্গে আত্মীয়তা বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যায় বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হল। যুগান্তর-অমৃতবাজারে খবর বার হওয়ায় সারা গ্যাংটক শহরের বাঙালীমহল জেনে গেছে, আমরা এসেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়েই সদ্য-আসা যুগান্তর দেখলাম। কালও সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছে

অমূল্যরা ফিরে এসেছে। কাজ বিশেষ হয় নি। সুধেন্দুবাবু পুলিসে আর মিলিটারিতে ফোন করে দিয়েছিলেন বলে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। আই.জি. গ্যাডগিল সাহেব চমৎকার ব্যবহার করেছেন।

সুশান্তবাবু জানালেন, "ভদ্রলোক মারাঠী। দেখে মনেই হয় না, পুলিসের লোক। মনে হয়, কোনো অধ্যাপক। স্ত্রী শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন।"

অমূল্য বলল, "আমরা ক্যামেরা পারমিটের দরখাস্ত করে ইনারলাইন পারমিটের ফর্ম নিয়ে এসেছি। প্রত্যেককে সই করে কাল সকাল দশটার মধ্যে পুলিস অফিসে জমা দিতে

হবে। এগারটার মধ্যে পারমিট পাওয়া যাবে, আই.জি. নিজে ফোন করে অফিসারদের বলে দিয়েছেন।"

ক্যামেরা পারমিটের ব্যাপারে সুশান্তবাবু বেশ চিন্তিত। কারণ, পারমিট দেবার ব্যাপারে একটা শর্ত থাকবে, এক্সপোজ করা সমস্ত ফিল্ম ফেরার সময় চুংথাং চেকপোস্টে জমা দিতে হবে। চুংথাং থেকে এখানে পাঠাবে। এখান থেকে যাবে দিল্লি। দিল্লির ডিফেন্স ল্যাবরেটরি ফিল্মগুলো ডেভেলপ করার পর দেওয়া হবে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের হাতে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের পরীক্ষার পর ছবিগুলো আমরা হাতে পাব।

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট স্টিল ছবিগুলোর ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ সমস্যা নেই, সমস্যা দেখা দিয়েছে রঙিন মুভির ব্যাপারে। ডিফেন্স ল্যাবরেটরি রঙিন ফিল্ম ঠিকমতো ডেভেলপ করতে পারবে, এমন ভরসা নেই। সে ফিল্ম আমাদের ডেভেলপ করানোর কথা হংকং কিংবা জার্মানি, নিদেনপক্ষে বোম্বাই। হাজার দশেক টাকা খরচ ধরা হয়েছে এই ছবির জন্য।

সুশান্তবাবুর চিন্তা, পুরো টাকাটাই জলে যাবে। সেইসঙ্গে তাঁর পরিশ্রম।

অমূল্য বলল, "আমরা এক কাজ করি, সুশান্তদা। এখন কণ্ডিশনাল পারমিট নিয়েই চলে যাই। ফেরার সময় চুংথাংয়ে আমরা ফিল্ম জমা দেব না। গ্যাংটকে ফিরে আই.জি. গ্যাডগিল সাহেবের কাছে সারেণ্ডার করব। তিনি ভালো লোক, নিশ্চয় একটা উপায় করে দেবেন।"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার সুধেন্দুবাবুর বাড়ি যেতে হয়। কমলই আমাদের নিয়ে চলল। বেচারা কমল। সেই থেকে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। আড়াই মাস পরে ফিরে এখনও ঘরে যাবার সুযোগ পায় নি। একবার সেকথা বলতেই বলল, "যাব'খন। ঢের সময় পাব। আপনাদের সঙ্গ লাভের সুযোগ যে আর পাব না! কালই তো আপনারা চলে যাচ্ছেন।"

এরপরে আর কথা চলে না। কমল রয়ে গেল আমাদের সঙ্গে আমাদের ক'জনকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল সুধেন্দুবাবুর বাড়ি।

সুধেন্দুবাবু অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। দেখেই বললেন, রাজ্যপাল তাঁকে তিনবার ফোন করেছেন আমাদের খোঁজ নিতে। মুখ্যমন্ত্রী কী একটা কাজে বাইরে যাচ্ছেন, নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন।

সুধেন্দুবাবুর বাড়িতেই আলাপ হল সিকিম টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সর্বময় কর্তা মিঃ মিত্রের সঙ্গে। মিঃ মিত্র প্রকৃত অর্থেই ভদ্রলোক। অনেক কাল সিকিমে আছেন, এবার বাংলায় যেতে চান।

সুধেন্দুবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "কে কে কলকাতায় ফোন করবেন বলুন।"

কিছুই না যেন ব্যাপারখানা। সত্যিই না। যে যে বাড়িতে ফোন করতে চাইল, সুধেন্দুবাবু ধরে দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

বেশ আড্ডা জমেছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু উপায় নেই। ন'টা বেজে গেছে। এরপর আর কোনো হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না। গ্যাংটকে দোকানপাট হোটেল সব সন্ধ্যা হতে-না-হতেই বন্ধ হয়ে যায়। মাতালের উৎপাত বড়ো বেশি। মদ খুব সস্তা এখানে।

রাস্তায় যখন নামলাম, রাত প্রায় দশটা। সারা শহর প্রায় নিঝুম। হোটেল সব বন্ধ হয়ে গেছে। ডাকাডাকি করে যদি-বা কয়েকটা হোটেল খুলল, কোনো হোটেলেই খাবার পাওয়া গেল না। সব শেষ। এক হোটেলে অনেক বলার পর হাঁড়ি কুড়িয়ে যে ভাত বেরোল তা এক প্লেট হল। কাঁটাকুঁটি আর গলা মাংসের টুকরোর সঙ্গে ঝোলও পাওয়া গেল একটু। তাই আমরা তিনজনে ভাগ করে খেলাম—শঙ্কু মহারাজ, অরুণ আর আমি। ভাগ্যিস অবেলায় খেয়ে আর কারও খিদে ছিল না!

শান্তিভবনে ফিরে দেখি, যারা সুধেন্দুবাবুর বাড়ি যায় নি তারা গদির উপর স্লিপিং-ব্যাগ খুলে শুয়ে পড়েছে। কেউ খেয়েছে, কেউ খায় নি। ঐ, খিদে নেই।

কাল সকাল থেকেই ঠাসা প্রোগ্রাম, আর রাত করা উচিত নয়। আমরা যারা পরে ফিরেছি, শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি।

কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। নতুন জায়গা বলে নয়, নতুন জায়গায় আমার ঘুম আসতে কসুর করে না। মনে আমার উত্তেজনা থাকলে ঘুম আসতে চায় না। শরীরের সমস্ত স্নায়ু আমার টনটন করছে। সারা শরীরে অস্বস্তি হচ্ছে।

আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। স্লিপিং-ব্যাগের চেনটা খুলে উঠে বসলাম। কী করব, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব? ঠাণ্ডায়, খোলা হাওয়ায় শরীরের স্নায়ুগুলো যদি একটু শান্ত হয়!

কিন্তু কেমন ঠাণ্ডা বাইরে? ঠাণ্ডা লেগে যাবে না তো? অসুখ করবে না তো? এখানে যদি অসুখ করে তাহলে বিপদ কেবল একা আমার নয়, দলের সকলের। অথবা, একা আমারই। আমাকে এরা এখানে কারও হেফাজতে ফেলে রেখে উপরে উঠে যাবে। কিন্তু যদি দু-একদিন অসুখ চাপা থাকে এবং উপরে ওঠার পর অসুখ করে তাহলে এরা কী করবে? আমাকে কোথায়, কার কাছে ফেলে রাখবে?

ভাবতে ভাবতে কখন যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল নেই। কী অন্ধকার বাইরে! কেবল নিচে, শহরের রাস্তায় গোটা কয়েক আলো জ্বলছে জোনাকির মতো। জোনাকি জ্বলে আর নেভে, কিন্তু এই ছোটো ছোটো আলোর বিন্দুগুলো জ্বলেই আছে। দূরে, মাথার উপরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। কোথাও ঝাপসাভাবেও একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না।

অথচ, পাহাড়িয়া দেশ সিকিম। পাহাড়িয়া দেশ না বলে পাহাড়ময় দেশ বললেই বোধ হয় ভালো হয়, যদিও অর্থের দিক থেকে কোনো হেরফের হয় না। পাহাড়ময় দেশে যে ব্যঞ্জনা ফোটে, পাহাড়িয়া দেশে তা ফোটে না।

সিকিম।

কাঞ্চনজঙ্ঘার নিচে ছোট্ট ছড়ানো দেশ সিকিম। তার উত্তরে তিব্বত, পূবে ভুটান, পশ্চিমে নেপাল আর দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৭৫ সালের আগে পর্যন্ত এই দেশ ভারতের আশ্রিত রাজ্য ছিল, এখন ভারতের অঙ্গরাজ্য। ১৯৭৫ সালের ২৩ এপ্রিল সিকিম পরিপূর্ণভাবে ভারতে যোগ দেবার পর এই দেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৩তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে গণ্য হয়।

সিকিমের আয়তন ২,৮১৮ বর্গমাইল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ৮০০ ফুট থেকে ২৮,০০০ ফুট।

সিকিমের ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। তার গোড়ার দিককার ইতিহাস প্রায় কিছুই জানা যায় না। যা জানা যায় তা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে।

কথিত আছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পদ্মসম্ভব সপ্তম শতাব্দীতে ভারত থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যাবার সময় পথে সিকিম আবিষ্কার করেন। তবে তার অনেক আগেই যে সিকিমে মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে প্রমাণ নিহিত আছে পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমনসব নবপ্রস্তরযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র আর যন্ত্রপাতির হঠাৎ আবিষ্কারে।

সিকিম নামটি কে দিয়েছিল, বলা শক্ত। শোনা যায়, দ্বিতীয় চোগিয়াল তেনসুং নামগিয়ালের রাজত্বকালের এই নামটি প্রচলিত হয়। তেনসুং নামগিয়ালের রাজত্বকালে সিকিমের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। চোগিয়াল নেপালের রাজার সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। নতুন রানী স্বামীর রাজ্য দেখে খুশি হয়ে বলে ওঠেন, "আমি তোমার রাজ্যের নতুন নাম দিলাম সু-হিম।"

সু-হিম মানে সুখের ঘর। সু-হিম থেকেই সিকিম শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। সিকিমও নেপালী শব্দ, মানে নতুন রাজ্য।

বিপ প্যারেস তাঁর 'হিমালয়ান হানিমুন' গ্রন্থে সু-হিম বলেন নি, বলেছেন সুখিম। সুখিমের অর্থ তিনি দিয়েছেন, নিউ হাউস অর্থাৎ নতুন ঘর বা নতুন আবাস।

বর্তমান সিকিম সরকারের কাগজপত্রেও দেখা যায়, সুখিম থেকেই সিকিম শব্দের উৎপত্তি। সুখিম মানে, শান্তি ও সুখ। আবার, নতুন প্রাসাদ মানেও পাওয়া যায়।

ডঃ ওয়াডেলের মতে হানাদার গোর্খারাই সিকিম নামটি দেয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, সংস্কৃত শিখিম থেকে সিকিম নামের উৎপত্তি। এই দেশ পর্বতের শিখায় শিখায় ভরা বলে শিখিম।

ইংরেজীতে এখন Sikkim লেখা হলেও একসময় Sikhim লেখা হত। আর্ল অভ রোনাল্ডশে লিখেছেন। ক্লড হোয়াইট লিখেছেন। আরও অনেকে লিখেছেন।

তিব্বতীরা এই দেশকে বলত দেনজং। মানে, ধানের দেশ। সিকিমের আদি অধিবাসী লেপচাদের কাছে এই দেশ নাই-মে এল অর্থাৎ স্বর্গ নামে পরিচিত ছিল।

লেপচারাই সিকিমের আদি অধিবাসী। লেপচারাই প্রথম সিকিমে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু কোথা থেকে তারা সিকিমে এসে বসতি স্থাপন করে, আজ আর তাদের কেউ বলতে পারে না। তারা নিজেদের বলে রংপা অর্থাৎ উপত্যকার অধিবাসী।

তাদের আদিস্থান কোথায়, স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে, তারা হিমালয়ের ওপার থেকে কিংবা তিব্বত থেকে সিকিমে আসে নি। খুব সম্ভব তারা আসাম আর আপার বার্মার দিক থেকে পাহাড়ের পাদদেশ ধরে ধরে সিকিমে আসে।

কোন্ সময় তারা সিকিমে আসে তা-ও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। অনেকের ধারণা, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে তারা সিকিমে আসে। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা যে সিকিমে শিকড় গেড়ে বসেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেপচা নাম নিয়েও নানা মত আছে। কেউ বলেন, নেপালী লাপচা থেকে লেপচা শব্দের উৎপত্তি। লাপচা অর্থ মন্দভাষী। নেপালীরা লেপচাদের কথা বুঝতে পারত না বা তাদের মিষ্টভাষী বলে মনে করত না বলেই সম্ভবত তাদের লেপচা বলত। কেউ কেউ বলেন, লাপচো নামে এক জায়গার অধিবাসী বলে তাদের লেপচা বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, নেপালে এক জাতের মাছ আছে, খুব শান্ত। সেই মাছকে বলে লাপচা। লেপচারা স্বভাবের দিক থেকে শান্ত বলে ঐ মাছের নামে তাদের লেপচা বলা হয়।

লেপচারা স্বভাবের দিক থেকে যে শান্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা শান্ত, ধীর, পরিশ্রমবিমুখ—এবং নির্জনতাপ্রিয়। তাদের চারপাশে যত গাছপালা কীটপতঙ্গ পশু-পাখি তা থেকেই তাদের নিজেদের নাম।

তিব্বতীদের সঙ্গে তাদের চেহারার সাদৃশ্য খুবই কম। তাদের আকৃতি ছোটোখাটো, মুখের গড়ন ধারাল। অনেকক্ষেত্রে তারা প্রায় ইহুদীদের মতো দেখতে।

তাদের ভাষাও স্বতন্ত্র, তিব্বতী ভাষার কোনো উপভাষা নয়। ভাষার নামও লেপচা। লেপচা ভাষায় তিব্বতী ও নেপালী ভাষার শব্দও পাওয়া যায়। লেপচা ভাষা অনেক প্রাচীন। লেপচা লিপিও অনেক উন্নত।

লেপচারা এখন বৌদ্ধ। আগে তারা পাহাড় পর্বত নদী ঝর্না বন ইত্যাদি যা-কিছু তাদের চারপাশে দেখত তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত।

লেপচাদের পরে সিকিমে আসে ভুটিয়ারা। যতদূর জানা যায়, সিকিমী রাজাদের সিংহাসনে আরোহণের অনেক আগেই তারা আসে, আজ থেকে প্রায় সাত শ বছর আগে। তারা আসে তিব্বত থেকে। তিব্বত থেকে তারা যখন সিকিমে আসে তখন ভুটানেও ছড়িয়ে পড়ে।

ভুটিয়াদের ভালো স্বাস্থ্য, বড়োসড়ো শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের গড়ন অনেকখানি মঙ্গোলীয়দের মতো। তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের ভাষা তিব্বতের এক উপভাষা।

ভুটিয়াদের পরে আসে নেপালীরা। সে শ দেড়েক বছর আগে। নেপালীদেরই এখন আধিপত্য সিকিমে।

সিকিমে দলে দলে নেপালীরা আসে বৃটিশের প্ররোচনায়। সিকিমে তিব্বতের প্রভাব খর্ব করার জন্যই তারা তিব্বতীদের জাতশত্রু নেপালীদের সিকিমে আসার পথ প্রশস্ত করে দেয়। সিকিমে তিব্বতী প্রভাব খর্ব করায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ ছিল। বৃটিশরা স্বার্থ ছাড়া কোনো কাজ করে না। তাদের মতো কুচক্রী জাত পৃথিবীতে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে লেপচারা সিকিমে এসে প্রথম কোথায় বসতি স্থাপন করে, স্পষ্ট করে জানা যায় না। কিন্তু একথা জানা যায় যে, প্রায় পাঁচ শ বছর ধরে তারা কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকার চারধারে বসবাস করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিকিমে তাদের বেশ বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়।

১৯৭৫ সালের আগে পর্যন্ত সিকিমে রাজত্ব করেছে যে পরিবার সেই পরিবার কিন্তু লেপচা পরিবার নয়। তারা মূলে তিব্বতী-চীনা বংশোদ্ভূত। সিকিমে তারা আসে খাম-মিনা-আন্দং নামে এক ক্ষুদ্র নৃপতি-রাজ্য থেকে। ১৭৩২ সাল নাগাদ চীনারা এই রাজ্যটি দখল করে নেয়।

এই পরিবারের এক পূর্বপুরুষ, তিব্বতের তিব্বতী রাজা তি-সন-দেসেনের প্র-প্রপৌত্র, ৭৩০ সালে এই ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে এই পরিবারের অনেকে তিব্বতে ফিরে যান এবং বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

১২৬৮ সালে তাঁদেরই এক বংশধর খাই-বুমসা তীর্থদর্শনে সিকিমে আসেন। তাঁর সঙ্গে লেপচা সর্দার থে-কং-টেকের বন্ধুত্ব হয়। পরে সেই বন্ধুত্ব গভীর হলে খাই-বুমসা আর দেশে ফিরে যেতে পারেন নি।

থে-কং-টেকের মৃত্যুর পর খাই-বুমসার পুত্র লেপচাদের সর্দার হন এবং তাঁরই বংশধরেরা প্রায় সাত শ বছর সিকিমে রাজত্ব করেন।

খাই-বুমসা মানে দশ হাজার মানুষের চেয়েও বলশালী মানুষ। খাই-বুমসা সত্যিই প্রচণ্ড বলশালী ছিলেন। তিনি এত বলশালী ছিলেন যে, কারও সাহায্য না নিয়ে একাই বিশাল শাক্য মঠের বিরাট বিরাট চারটি স্তম্ভ স্থাপন করেন।

খাই-বুমসা হা অঞ্চলে গিয়ে টাইটান দস্যুদের দমন করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তাঁর শক্তি ও সাহসের জন্য আজও তিনি পূজিত হন। তাঁরই সন্তানসন্ততিরা সিকিমে এসে গ্যাংটকে বসতি স্থাপন করেন।

১৬৪১ সালে লাসার লামা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অন্য দুজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে সিকিমে আসেন। সিকিমের অধিবাসীদের তাঁরা বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং খাই-বুমসার এক বংশধর পেঞ্চু নামগিয়ালকে প্রথম গিয়ালপো বা রাজা নিযুক্ত করেন।

তৃতীয় গিয়ালপো চাদোর নামগিয়াল লেপচা ভাষার লিপি রচনা করে লেখনপদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তাঁর আগে যে লিপি ছিল তাও তুচ্ছ করার মতো ছিল না। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য আধুনিক বর্ণমালার প্রয়োজন দেখা দেয়। চাদোর সেই বর্ণমালা তৈরি করেন।

গোড়ার দিকে সিকিম সম্পূর্ণভাবে তিব্বতের উপর নির্ভরশীল ছিল সিকিমের রাজা তিব্বত সীমান্তের অনেকটা ভিতরে চুম্বিতে থাকতেন। তাঁর পরিবারের পুরুষেরা তিব্বতী নারী বিবাহ করতেন। রাজার জীবনধারা ও ক্রিয়াকর্ম অনেকখানি তিব্বতী বৌদ্ধদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

নেপাল বহুকাল ধরে সিকিমের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালিয়েছে। শেষে ১৮১৭ সালে নেপাল-যুদ্ধের অবসানের পর ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত তরাই অঞ্চলটি উদ্ধার করে সিকিমকে ফিরিয়ে দেয়। সিকিমের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তির ফলে ভারত সরকার সিকিমে লর্ড প্যারামাউন্টের স্থিতি লাভ করে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে কিছু লেপচা সীমান্তের ওপারে চলে যায়। ১৮৩৪ সালে তারা আবার ফিরে আসে এবং দার্জিলিঙের পশ্চিমে এই তরাই অঞ্চলটি আক্রমণ করে। রাজা সাহায্যের জন্য বৃটিশদের কাছে আবেদন জানান। সেই সাহায্যের বিনিময়ে রাজা বৃটিশদের দার্জিলিং জেলা অর্পণ করতে বাধ্য হন। পরিবর্তে বছরে তিনি তিন হাজার টাকা করে পেনশন পেতে থাকেন।

কলকাতার কাছে কোনো শৈলাবাস না থাকায় গভর্নর-জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস হিসাবে এই অঞ্চলটি দিয়ে দেওয়া হয়।

এর প্রায় চোদ্দ বছর পরে বৃটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী সার জোসেফ ডল্টন হুকার আর দার্জিলিঙের পোলিটিক্যাল সুপারইনটেনডেন্ট ডঃ ক্যাম্বেল বৃটিশ রাজাধিকারের পারমিট নিয়ে সিকিমে এলে সিকিমের দেওয়ান নামগুয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করেন। দেওয়ান নামগুয়ে ছিলেন সিকিমের মহারাজার বৈমাত্র ভ্রাতা। মহারাজা এই গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

সেই সময় প্রতিবেশী দেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের জন্য তার প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করে আটকে রাখার রীতি তিব্বত, সিকিম ও ভুটান সীমান্তে খুবই প্রচলিত ছিল। এই ঘটনার মাত্র বছরখানেক আগে সিকিমের রাজা তিব্বত থেকে যখন দেশে ফিরছিলেন তখন ভুটান এই রীতি অনুসরণ করে তাঁকে বন্দী করে। সিকিমের সঙ্গে তখন ভুটানের সীমান্ত বিরোধ চলছিল এবং সেই বিরোধে কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য ভুটান তাঁকে দু মাস বন্দী করে রাখে। রাজা সাহায্যের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে। শেষপর্যন্ত তিব্বতী সেনাবাহিনী রাজাকে মুক্ত করে দেয়।

যা-ই হোক, দেওয়ান নামগুয়ে যে সার জোসেফ আর ডঃ ক্যাম্বেলকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল ডঃ ক্যাম্বেলের সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে তিব্বতীদের জন্য কিছু ব্যবসায়িক সুবিধা ও অধিকার আদায় করা। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর এই কাজের ফলে বৃটিশরা বিরক্ত হয়েছে। ওদিকে, রাজাও খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি

ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁর বৈমাত্র ভাইকে বোঝাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ হিসাবে বৃটিশরা ঐ তরাই অঞ্চলটি অধিকার করে নেয়। ১৮৫৬ সালে এই অঞ্চলে প্রথম চা-বাগান তৈরি করা হয়। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে অনেক চা উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম দিকে যে গোলযোগ দেখা দেয়, ১৮৬০-৬১ সালেই তা চূর্ণ করে দেওয়া হয়। একজন বৃটিশ দূত তুমলং যান এবং ভারত সরকারের সঙ্গে সিকিমের সম্পর্ক স্থির করে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। সেই চুক্তি অনুসারে মহারাজাকে সিকিমে বাস করতে রাজী হতে হয়, বৃটিশদের অবাধে সিকিমে চলাচল করার অনুমতি দিতে হয় এবং রাজ্যে দাসপ্রথা রদ করতে হয়।

সিকিমের পূর্বদিক থেকে তিব্বতীদের যে আক্রমণ চলছিল, বৃটিশ হস্তক্ষেপের দরুন শেষ পর্যন্ত তার অবসান ঘটে। সার বেসিল ব্রমহেডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সিকিম সীমান্তের অনেকটা ভিতরে লিংতুতে তিব্বতীদের তৈরি দুর্গটি অধিকার করে নেয় এবং আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ১৮৯০ সালে চীন সিকিমের উপর ভারত সরকারের সর্বোচ্চ অধিকার স্বীকার করে না নেওয়া পর্যন্ত সিকিমের সঙ্গে বৃটিশদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় নি। ১৮৯০ সালে চীন বৃটিশদের সঙ্গে এক চুক্তি করে, সেই চুক্তিতেই সিকিমের উপর বৃটিশ আধিপত্য স্বীকার করা হয়। ঐ সময়েই ভারত সরকার প্রথম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে একজন পোলিটিক্যাল অফিসার নিয়োগ করে। তিনিই সিকিমের বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন, দেশের আভ্যন্তরিক বিষয় মহারাজার হাতেই থাকে।

মানসসরোবর, সেকালে

রামানন্দ ভারতী, স্বামী

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে ; অদ্য কৈলাস যাত্রার দিন। আহারাদিও প্রস্তুত হইয়াছে, আমি প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া কৈলাস-গঙ্গাতে অবগাহন করিয়া পূজাপাঠ সমাপন করিলাম এবং যাত্রার জন্য একান্ত অধীর হইয়া উঠিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিল, "আজ এত অধীরতা কেন? ছয় মাইল পথ যাইয়াই বিশ্রাম করিতে হইবে ; আর অদ্যকার পথও ভাল, কোনও ভয় নাই। এ পথে ডাকাতেরও ভয় নাই। এই-দেশীয় ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গেই, কৈলাস-পরিক্রমাকারী কোনও যাত্রীকেই কিছু বলিবে না। ইহারা সব স্থানে ডাকাতি করে, মানসসরোবরও বাছে না, কিন্তু কৈলাসে ইহারা ডাকাতি করে না। ইহারা কৈলাসকে ও কৈলাসপতিকে বড় মানে, যাহা কিছু ভয় কেবল বরফের।"

আমি বলিলাম, "এখন আর ভয়ের ধার ধারি না, কৈলাসে আসিয়াছি, কৈলাসের প্রথম ও প্রধান মঠ দারচিনে অবস্থিতি করিতেছি, অগৌণে কৈলাস-ভ্রমণ করিতে বাহির হইব, আর বিলম্ব করিব না, চল এখনই চল।"

তাহারা আমার কথা শুনিয়া যাত্রার বন্দোবস্ত করিল। অতিরিক্ত যা কিছু খাদ্য ছিল, তাহা মঠে বাখিয়া দিল ; কেবল প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ও অতি অল্প আহারীয় সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি লামার কাছে বিদায় লইয়া কৈলাস-ভ্রমণে যাত্রা করিলাম।

নারোপা-প্রবর্তিত ফিবা সম্প্রদায়ের লোকেবা বামাবর্তে এবং জিপচূনের প্রবর্তিত নাংবা সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণাবর্তে কৈলাস পরিক্রম করিয়া থাকেন। কারণ মহাত্মা জিপচূন দক্ষিণাবর্তে যাইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারোপা বামাবর্তে যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি কৈলাস পরিক্রম করিতে পারেন নাই। বামাবর্তে ছয় মাইল গমন করিয়া পথিমধ্যে "জুগুলফু" নামক স্থানে উভয় লামার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জিপচূনের আবিষ্কৃত দক্ষিণাবর্ত পথে কৈলাস পরিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। কৈলাসে আরোহণ করিতেছি, মন আনন্দে পূর্ণ হইতেছে, এই আনন্দের বর্ণনা অসম্ভব। কিছু দূর যাইতেছি আর বিশ্রাম করিতেছি। এই বিশ্রাম ক্লান্তিজনক নহে। বসিয়া একবার হৃদয়পটে কৈলাসের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতেছি আর কৈলাসের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেছি, তাহা ঠিক হইল কিনা। যাইতে যাইতে একটি উচ্চ পর্বত দেখিতে পাইলাম। পর্বতটি কৈলাসের অন্তর্গত। এই পর্বতের নিম্নভাগে অতি উচ্চ একটি নিশান ঝুলিতেছে। নিশান-দণ্ডটি প্রায় ১০০ হস্তের কম নহে। আমি এই নিশান দেখিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কি আছে?"

আমার একজন সঙ্গী ও যাত্রী উত্তর করিল, "এই নিশানের ঊর্ধ্বে যে পর্বত দেখিতেছেন, এইটি শ্মশান।"

এই পর্বতটি নিম্ন হইতে প্রায় পাঁচ বা ছয় শত হস্ত উচ্চ, নিম্নে নদী। নদী হইতে পর্বত একেবারে সোজা উঠিয়াছে, পর্বতের সর্বোচ্চ স্থান সমতল, তথায় বৃক্ষ বা তৃণ কিছুই নাই ; সেখানে কতকগুলি কাক ও শকুনি বসিয়া আছে দেখিয়া মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইল। এমন সুন্দর স্থানে এ কি! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কি প্রকারে মানবদেহ সমাহিত হইয়া থাকে?" সঙ্গী উত্তর করিল, "যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন লামারা আসিয়া গণনা করিয়া দেখেন, ইহার ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া কিরূপ করিতে হইবে। শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, 'মৃত্যুচিহ্ন দেখিয়া সেইরূপ স্থির করা হয়।' সকলকেই প্রথমতঃ ঐ নিশানের উর্ধ্বদিগ্বর্তী পর্বতের উপরিভাগে উঠিতে হয়। কাহারও কাহারও দেহ ঐ পর্বতে অক্ষুণ্ণভাবে রাখা হয়। কাহারও হস্তপদ কাটিয়া অপর অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। কাহারও শরীরের মাংস পক্ষীদিগকে বিতরণ করা হয়। কাহারও কাহারও হস্ত পদ ও মাথা কাটিয়া মঠে রাখা হয় ; তারপর মাংসগুলি শুষ্ক হইলে নরকপাল দেবালয়ে স্থাপিত করা হয়। হস্ত ও পদের নলি পরিষ্কার করিয়া তাহা দ্বারা দেবালয়ে বাদ্য হইয়া থাকে। এই হস্ত ও পদের নলী শঙ্খের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার শব্দ শঙ্খ হইতেও গম্ভীর ও মধুর। যাহাদের অদৃষ্ট মন্দ, যাহারা পাপী, তাহাদের দেহকে কোন প্রকার বিকৃত করা হয় না। ঐ পাহাড়ের উপরেই রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কোনও পশু বা পক্ষী স্পর্শও করে না।"

নিম্নস্থ দেশের ন্যায় এই দেশে মৃতদেহ ভস্মীভূত অথবা সমাহিত হয় না। এই প্রকার মৃতদেহের পরিণাম ইহাদের পক্ষে বৈধ ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। নরকপাল দেবালয়ে রক্ষিত হয় এবং কেহ কেহ নরকপাল দ্বারা ডম্বরু প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

কৈলাসের উর্ধ্বে গৌরী-কুণ্ড। গৌরী-কুণ্ড হইতে দুইটি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। একটি উত্তর দিক দিয়া বামাবর্তে কৈলাসশিখরকে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণদিকবর্তী দারচিন মঠে উর্ধ্বদেশ ভেদ করিয়া পূর্বমুখী হইয়াছে। এই নদী পাঞ্জাবে যাইয়া সিন্ধু নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এ দেশের লোকেরা এই নদীর নাম সিঙ্গিখাম্বা বলিয়া থাকে ; সিংহের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান সিঙ্গিখাম্বা নামে অভিহিত। অপরটি পূর্ব দিক হইয়া কৈলাসশিখরকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টন করিয়া দারচিনের উর্ধ্বে যাইয়া পড়িয়াছে। এই নদীও রাবণহ্রদ বা রাক্ষসতাল ভেদ করিয়া নিম্নপ্রদেশে সরযূ বা ঘাগ্রা নামে খ্যাত হইয়াছে। সুতরাং আমি যে পথে যাইতেছি, সেই পথ নদীর তীরে তীরে কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া আবার দারচিনে উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে দোলমঞ্চ যেরূপ, কৈলাসেরও আকার সেইরূপ। দোলমঞ্চ পরিক্রম করিবার সময় যেরূপ চতুর্দিক পরিক্রম করিতে পারা যায়, সেইরূপ দারচিন হইতে আরম্ভ করিয়া কৈলাসের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আবার দারচিনে আসা যায়। কৈলাসের চতুর্দিক নদীবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে রাস্তাও কৈলাসকে বেষ্টন করিয়া দারচিনে আসিয়া মিশিয়াছে। গৌরী-কুণ্ড হইতে আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বদিকে যে বরফ-শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কৈলাসশিখর বলে। কৈলাস শিখরের আকার শিবলিঙ্গের অনুরূপ। এইরূপ

শতশত লিঙ্গবৎ বরফমণ্ডিত শিখর আছে। তাহা কৈলাসের অন্তর্গত হইলেও উচ্চ শিখরকেই কৈলাস বলিয়া থাকে। এই কৈলাসের একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলাম। সকল শৃঙ্গগুলিই লিঙ্গবৎ ; যেন শুভ্র শুভ্র লিঙ্গমূর্তিবৎ শিখর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কৈলাসপতি মহালিঙ্গের আকার ধারণ করিয়া কৈলাসে রাজসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অথবা অনন্ত লিঙ্গবৎ অনন্ত চক্ষে এই সর্বোচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে সসাগরা পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দর্শন করিতেছেন। হিমালয় অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয় ; কৈলাসও তদনুরূপ। ভাষাতে শব্দ নাই, ভাবে অনন্তত্ব নাই, বাক্যের অনন্ত স্ফূর্তি নাই, চক্ষুর বর্ণনাশক্তি নাই, বাক্যের দর্শনশক্তি নাই, সুতরাং কৈলাসের বর্ণনা হইল না।

এইস্থানে অনেকক্ষণ বসিয়া কৈলাস দর্শন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গীরা বলিলেন, "আর দিন নাই, চলুন, এখনও দুই মাইল না গেলে আড্ডা পাইব না।" অনিচ্ছায় আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। এইস্থানের নিম্নেই নদী, সুতরাং আমাকে একেবারে নদীতীরে অবতরণ করিতে হইল। এই নদীর নাম কৈলাসগঙ্গা। কৈলাসগঙ্গায় একটি সেতু আছে ; এই সেতুটি বড় বড় প্রস্তরের উপর বৃহৎ কাষ্ঠ স্থাপিত করিয়া নির্মিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেতুটি ভাসিয়াও যায়। আজ সেতুটি ভাসিয়া যায় নাই, সুতরাং নির্বিঘ্নে সেতু পার হইলাম। সেতুর পরপারেই চড়াই। চড়াইয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মঠ। দূর হইতে মঠের কোনও প্রকার চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল প্রস্তরস্তূপ বলিয়া বোধ হয়। একে কৈলাস, তাহার পর চড়াই। এই চড়াইটিতে সকলেই গলদঘর্ম হইলেন। তাহার উপর আবার পথিমধ্যে বৃষ্টি ও বাতাস আরম্ভ হইল। শীতে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। মঠ দেখিতে পাইতেছি ; ইচ্ছা হইতেছে, দৌড়িয়া মঠে প্রবেশ করি ; কিন্তু শরীর শক্তিহীন, পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, দ্রুত চলিবার উপায় নাই ; কি করি, বাতাস ও বৃষ্টি অসহ্য করিয়া ধীরে ধীরে মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠটি তেতলা। সর্বোচ্চ তলাতে দেবালয়। মধ্যতলায় লামার বাস ও অতিথিশালা, রন্ধনশালা। নিম্নতলে কতকগুলি গুহা ; এই সকল গুহায় পালিত পশু ও রন্ধনের উপযোগী কাষ্ঠ থাকে। আমি প্রথমে যাইয়া অতিথিশালায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে লাসার একজন লামা বসিয়া আছেন। আমি সেখানে যাইয়া আসন করিলাম। লামা বলিলেন, "আমিও অতিথি ; আমি আপনার কি সেবা করিব? আপনি এই মঠের লামার নিকট যান, তিনি বড় দয়ালু, আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি করিয়া দিবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ লামার নিকট গমন করিলাম। লামা একটি প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া আছেন ; চারিদিকেই শাক্যমুনির মূর্তি সুসজ্জিত ; মূর্তির সম্মুখে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে, আর লামাকে সম্মুখে করিয়া পনের-ষোলজন লামা ও ডাবা চা পান করিতেছে। লামা উচ্চ আসনে বেদীর উপর বসিয়া আছেন ; অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে পশমের গদীর উপর তাঁহার পারিপার্শ্বিকেরা বসিয়া আছেন ; সকলেরই সম্মুখে চা ও ছাতু। চা হইতে ধূম উদ্গত হইতেছে, আর সেই গরম চা তাঁহারা পান করিতেছেন। আমি একেবারে যাইয়া লামার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া লামা তাঁহার আসনপার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি চা পান করিয়া সুস্থ হউন, পরে কথাবার্তা হইবে।"

লামার ইঙ্গিত অনুসারে একজন ডাবা গরম চা ও ছাতু আনিয়া দিল। আমি দুই-তিন পেয়ালা চা পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম, আমার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমাকে সুস্থ দেখিয়া লামা মহাশয় বলিলেন, "এই মঠের লামা আমি নহি, দারচিনের লামাই এ মঠের লামা। আমি যাত্রী, ভগবানকে স্নান করাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। একজন ডাবার উপর মঠ পরিচর্যার ভার, সে এখনই আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে।" এই বলিয়া মন্দিরের কর্মচারীকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া অতিথিশালায় এক পশমের গদি পাতিয়া দিল, তাহার উপর আমার আসন পড়িল। এই কৈলাসে পশমের গদি ভিন্ন টিঁকিবার উপায় নাই। আমার সঙ্গীরাও লামার নিকট চা পান আর ছাতু আহার করিয়া সুস্থ হইল, এবং সান্ধ্যভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল। লামা আমার নিকট লোক পাঠাইলেন। লামার লোকের সঙ্গে যাইয়া দেখি, সম্মুখে একটি শ্বেতপ্রস্তরের শিবমূর্তি। লামা কুঙ্কুম ও কেশরের জল দ্বারা মূর্তিকে মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতেছেন, বাদ্যকরেরা শঙ্খ ও বাঁশী বাজাইতেছে, দর্শকেরা জোড়হস্তে স্নান-দর্শন করিতেছেন। ধূপের সুগন্ধে দেবালয় আমোদিত। ভগবান শঙ্করের স্নান হইয়া গেলে তাঁহাকে শীতবস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হইল। লামা শঙ্করকে আসনে স্থাপিত করিলেন। এই মন্দিরের পূর্বদিকে আর একটি মন্দির আছে ; সেই মন্দিরে কালীমূর্তি স্থাপিত। আদ্যার মূর্তি চতুর্ভুজা, বিকটবদনা ও লালজিহ্বা। চতুর্দিকে নানাবিধ অস্ত্র সুসজ্জিত, দেখিলে বোধ হয়, অসুরনাশিনী অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবসমীপে বিশ্রাম করিতেছেন। এই দেবীমূর্তির বাম ও দক্ষিণ খড়্গ, ঢাল, তলওয়ার, বন্দুক, বর্শা, শক্তি, শূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ইহা ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তিব্বতীয় অস্ত্র দেখিলাম ; তাহাদের নাম জানি না। এই দেবালয়ে দুই-তিনটি শঙ্খ দেখিলাম। শঙ্খগুলি খুব বৃহৎ, শব্দ গম্ভীর ও মধুর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই শঙ্খ তোমরা কোথায় পাইলে?"

একজন উত্তর করিল, "মহাসাগর হইতে এই শঙ্খ সংগৃহীত হইয়াছে।" দারচিন কৈলাসের প্রথম মঠ, নেন্দি দ্বিতীয় মঠ। এই মঠই মহাত্মা জিপচুনের আবিষ্কৃত প্রথম মঠ বা তীর্থ। এখানে তিনি কিছু দিন তপস্যা করিয়াছিলেন। এই মঠের ঊর্ধ্বদেশে পর্বতাঙ্গে তিন-চারিটি গুহা আছে। গুহাতে যোগীরা আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পূর্বে একটি যোগী ওই গুহা হইতে অদৃশ্য হইয়া যান। তাঁহার ডম্বরু-চিহ্ন পর্বতাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি উদ্দেশে সেই গুহাকে ও যোগীরাজকে প্রণাম করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

অদ্য ২৫শে আষাঢ়। নেন্দি গুহাতেই বাস করিলাম। এখানে যে লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বাসস্থান ডেরিফু মঠে। পরদিন প্রাতঃকালে লামা ডেরিফু অভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি ডেরিফু আসুন, আমি অগ্রে অগ্রে যাইতেছি ; আপনি যাইয়া আমার মঠে অতিথি হইবেন।"

আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অদ্য আমাদিগকে আট মাইল যাইতে হইবে। রাস্তা ভাল। বরাবর নদীর তীরে তীরে চলিয়া বেলা অনুমান বারোটার সময় ডেরিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। এই মঠটি প্রাচীরে আবৃত, একটি ছোটখাটো দুর্গের অনুরূপ। মঠের সাজসজ্জা, জাঁকজমক খুব ; অনেকগুলি লামা ও ডাবা এই মঠে বাস করেন। চামর গাই, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি এই মঠে যথেষ্ট আছে। লামা জ্ঞানবান, যোগী ও বুদ্ধিমান। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া লামার নিকট চলিয়া গেলাম। এই মঠটিও দ্বিতল। উভয় তলেই দেবালয় ও গ্রন্থ সুরক্ষিত। আমি তথায় যাইবামাত্র লামা আসন হইতে উঠিয়া আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন। আমিও তাঁহাকে একখণ্ড মিছরী ও একটি সিকি প্রণামী দিলাম। ইহাতে লামাও অতিশয় প্রীত হইলেন। তিব্বতদেশীয় প্রত্যেক মঠের দস্তুর এই যে, আগন্তুক লামা মঠের প্রধান লামাকে প্রণামী দেন। যে লামা প্রণামী না দেন, তিনি মঠপ্রণালীর অনভিজ্ঞ বলিয়া মঠের মধ্যে স্থান পান না। তাঁহার উপর মঠাধ্যক্ষের সন্দেহ হইয়া থাকে। তিব্বত-ভ্রমণকারী সাধুদিগের এই প্রণালী একান্ত অনুসরণীয়। সাধুও যা লামাও তা।

এতদ্দেশে আমি কাশীলামা বলিয়া পরিচিত হইতেছি। মঠাধ্যক্ষ লামার সহিত কিছু কথাবার্তার পর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় তলের দেবতা ও গ্রন্থ দর্শন করাইলেন। এই মঠে তিনটি শাক্যমুনির মূর্তি এবং হরগৌরী, মহাকালী ও বিষ্ণুমূর্তি সংস্থাপিত। আমি এই সব দর্শন করিয়া নিম্নতলে আসিলাম। ভাল স্থানেই বাসা পাইলাম ; কিন্তু এখানে একটা বিপদ ঘটিল। মঠের সূপকার লামা আমার সঙ্গী লোকদিগকে রন্ধনশালায় ঢুকিতে দিল না। সে বলিল, "তোমাদের লামা ইংরেজ, ইংরেজের লোকদিগকে আমরা মঠে প্রবেশ করিতে দিই না। তোমাদের লামাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দিব।" এই বলিয়া সে আমার বাসস্থানে আসিল। আসিয়া দেখে, আমি আমার বাসস্থানে দেবতা ও ত্রিশূল সংস্থাপিত করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছি। এই সব দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল, আর বলিল, "লামাজী, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনেক লোক এখানে আসিয়া থাকে। কৈলাস পবিত্র তীর্থ, এখানে অপরের প্রবেশের অধিকার নাই ; তাই না জানিয়া আপনাকে ইংরেজ মনে করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" আমি বলিলাম, "ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই ; এইরূপ না করিলে মঠের পবিত্রতা রক্ষা হয় না।" তাহার পর সেই লামাই আমার প্রধান সেবক হইয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং বলিল, "তুমি আমার হাতে খাইবে কিনা?" আমি বলিলাম, "তুমিও লামা, আমিও লামা, আর এই উত্তরখণ্ডে বিচার করিলে দেহরক্ষা হয় না, সুতরাং তোমার হাতে খাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই।"

ইহার অব্যবহিত পরেই লামা আমার নিকট আসিলেন ও আমার সঙ্গে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় অনেক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, ইনি নিজে শক্তি-উপাসক ও রাজযোগী। কিছু কথাবার্তার পর আমাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় তলস্থ দেবালয় দেখিতে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয় তল একটি প্রকাণ্ড গুহা। প্রস্তর খনন করিয়া

এই গুহা প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার মধ্যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি অত্যন্ত যত্নে সুরক্ষিত। সেবা-পূজার বন্দোবস্তও আছে। সহস্র সহস্র ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুহার বাম ও দক্ষিণে রাশি রাশি পুঁথি বস্ত্রাবরণে আবৃত। আমি লামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পুস্তক কি ও কোন্ ভাষায় লিখিত ও কোথা হইতে আনীত হইয়াছে?" লামা উত্তর করিলেন, "এই সমস্ত পুস্তকই কাশী হইতে আনীত, পুস্তকের অক্ষর তিব্বতীয়, ভাষা সংস্কৃত। এই সব পুস্তক অতি গোপনীয়, লামা ভিন্ন অন্যের দেখিবার অধিকার নাই। পাছে পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহার জন্যই পুস্তক অক্ষরান্তরিত হইয়াছে।" আমি এই সব দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

নেন্দিগুহাতে এইস্থানবাসী জনৈক লামার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, তাঁহার বাসস্থানে অতিথি হইব ; কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমি প্রধান মঠেই আসিয়া আড্ডা করিয়াছি। আমি বাসস্থানে আসিয়া দেখিলাম, সেই লামা ও তাঁহার তিন-চারিজন শিষ্য মাখন, চা, ছাতু, 'থুথু' নামক মিঠাই ও কৈলাসপতির প্রসাদ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাঁহার উপহার সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার আলয়ে না যাইবার কারণ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "এক স্থানে থাকিলেই হয়, তাহার জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না।" এই বলিয়া আমার সেবার জন্য তাঁহার একটি ব্রহ্মচারী শিষ্যকে আমার নিকট রাখিয়া বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময় বিষ্ণু সিং বলিল, একদল ডাকাত আসিয়াছে। এই কথা মঠে প্রচারিত হইল। মঠের অধিকারী সদর দরজা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া সকলে ছাদে উঠিলেন। কেবল দ্বিতলস্থ দেবালয়ের দ্বার খোলা রহিল। কারণ এই দ্বিতল এমন ভাবে নির্মিত যে, অন্য তলের সহিত কোন যোগ নাই, এবং এই তলে যে দেবতা আছেন, তাহা সাধারণের ও দেবালয় সাধারণের অর্থে নির্মিত, সর্বদা খোলা থাকে, এবং সকল সময় সাধারণের প্রবেশের অধিকার আছে। ডাকাতদের কথা শুনিয়া আমি দেবালয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, দশ-বারোজন ঘোড়সওয়ার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আপন আপন গাঁঠরি হইতে মাখন ও ছাতু খুলিল এবং পকেট হইতে টাকাকড়ি বাহির করিয়া দেবদর্শন করিতে চলিয়া গেল। তাহারা দেবদর্শন করিয়াই গৌরীকুণ্ডের দিকে চলিল। মঠবাসীরা নিরুদ্বেগ হইলেন, আমরাও বাঁচিলাম। এই রাত্রি এখানেই বাস করিতে হইল।

মহাভারতে সভাপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণবিষয়ে ময়দানব বলিতেছেন যে, "পূর্বে আমি কৈলাসের উত্তরে ও মৈনাক পর্বতের সন্নিধানে দানবদিগের যাগকালে একটি বিচিত্র মণিময় সভা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা দানবরাজ বৃষপর্বার সভা ছিল।" অন্য স্থানে লিখিত আছে, "বিন্দুসরোবরের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনের জন্য কতিপয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তথায় হিরণ্য পর্বত ; ঐ পর্বতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।" এই ডেডিফু হইতে আঠার-উনিশ দিনের পথ উত্তরে মানসসরোবরের ন্যায় এক সরোবর আছে ; তথায় স্বর্ণখনিও আছে। ডেডিফুতেই কতিপয়

স্বর্ণব্যবসায়ীর নিকট শুনিলাম, 'তাহারা ঐ কৈলাসের উত্তর হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তাহা বিক্রয় করিবার জন্য মণ্ডিতে যাইতেছে।' তাঁহারা ইহাও বলিল যে, "স্বর্ণখনির নিকটেই সরোবর আছে। তথায় তিব্বতবাসী ভিন্ন অন্যে যাইতে পারে না।" এই মঠ হইতে বরাবর উত্তর দিকে গেলেই বিন্দুসরোবর ও হিরণ্য পর্বত দর্শন করা যায়।

অদ্য গৌরীকুণ্ডে যাইব। মনে বড় আনন্দ, কিন্তু ভয়ও ততোধিক। এখান হইতে তের-চৌদ্দ মাইল না গেলে জনিংফু মঠ পাইব না। গৌরীকুণ্ডে মঠ নাই, বিশ্রামের স্থানও নাই। এখান হইতে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই ; তাহার মধ্যে আবার পাঁচ-ছয় মাইল চিরস্থায়ী বরফ। কৈলাসের ঊর্ধ্বশিখর বরফে সমাবৃত। যদিও কৈলাসের ঊর্ধ্বশিখরে উঠিব না, উঠিতে পারিব না, তথাপি গৌরীকুণ্ডের ঊর্ধ্বদিকস্থ শিখর অতিক্রম করিয়া গৌরীকুণ্ডে নামিতে হইবে। এই সব চিন্তায় নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনুমান দুইটার পর আমরা যাত্রা করিলাম। ঠাণ্ডার তো কথাই নাই, তার পর চড়াই। এক-একবার কিছু চলিতেছি—আর বিশ্রাম করিতেছি, এবং শীতনিবারণের জন্য মিছরী ও গোলমরিচ চিবাইতেছি। এইরূপ করিতে করিতে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে প্রস্তরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কৈলাসযাত্রীরা এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া যান। লোকপ্রবাদ এই যে, "পাপীরা কখনই এ সুড়ঙ্গ ভেদ করিতে পারে না।" আমি পাপী কি পুণ্যবান জানি না, তবে অনায়াসে এই ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ পথ ভেদ করিয়া চলিয়া গেলাম।

মেঘদূতে কৈলাসবর্ণনাকালে কালিদাস এক সুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, এই সুড়ঙ্গই সেই কালিদাসের উল্লিখিত সুড়ঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। ইহা কালিদাসের উল্লিখিত মেঘের গমনাগমনের সুড়ঙ্গ হউক আর নাই হউক, আমার গমনের সুড়ঙ্গ বটে। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ আমার অনুসরণ করিল, আর কেহ কেহ ভয়ে এদিক ওদিক দিয়া চলিয়া গেল। আমরা সুড়ঙ্গ পার হইয়া একটি নদীতে নামিলাম। নদী পার হইয়া কতক দূর ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেখি, বরফমণ্ডিত কৈলাস। এই বরফ অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। শরীরের বলে আর চলিতেছে না। মনই শরীরকে চালাইতেছে। শীতে হৃদয় গুরগুর করিতেছে, হস্তপদের সাড় নাই ; তাহার কথাও নাই। পদস্খলিত হইতেছে, পদ মনের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিতেছে না। উপর হইতেও বিন্দু বিন্দু বরফ পড়িতেছে ; এখানে তো জমাট বরফ ছিলই, তাহার উপর আবার বরফ বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে। এ যেন সোনায় সোহাগা। পর্বতের সানুদেশ ও পর্বতশিখর শুভ্র। বরফপাতে আমার বস্ত্র শুভ্র, মাথার উপরও বরফ পড়িয়াছে। মস্তকে বরফ পড়াতে বোধ হইতেছে, কৈলাস কৃপা করিয়া আমার মাথায় পুরস্কারস্বরূপ বরফের শিরোপা বাঁধিয়া দিয়াছেন।

এই পুরস্কারে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পথটি এত দুর্গম যে, পথের চিহ্নমাত্রও নাই। বরফ ভাঙ্গিয়া লোক গিয়াছে ; তাহাদের পদচিহ্নমাত্র আছে, সেই পদচিহ্নের অনুসরণে আমরা চলিতেছি। বৃহৎ ও খণ্ড খণ্ড প্রস্তর, তাহার উপর নূতন বরফ পড়িয়া পিচ্ছিল হইয়াছে। এক প্রস্তর হইতে অপর প্রস্তরে লম্ফপ্রদান করিয়া চলিতেছি। একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই সর্বনাশ! দুই হস্তে দুই লাঠি। এই দুই লাঠির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তর সকল

অতিক্রম করিতেছি। এইরূপ ভাবে অনুমান তিন মাইল যাইয়া দেখি, খুব উচ্চ একটি প্রস্তর। প্রস্তরটি নানাবিধ বর্ণের নিশান দ্বারায় অলঙ্কৃত। এই দেশীয় লোকেরা এই প্রস্তরকে বন্যজন্তুর শৃঙ্গ ও দন্ত দ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রস্তরখণ্ডটি দোলমা অর্থাৎ শক্তিমূর্তি বলিয়া পূজিত। মহাত্মা জিপচুন এই প্রস্তরখণ্ডেই শক্তিমূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। আমি প্রস্তরখণ্ডের সমীপে উপস্থিত হইলাম ; প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা করিলাম। মনের আনন্দে কৈলাসপতির কৃপায় শরীর ভুলিয়া গিয়াছি, এমন আত্মহারা হইলাম। মনপ্রাণ কৈলাসপতির শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল, কৈলাসপতির কৃপাও বুঝিতে পারিলাম। এস্থানে কতক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার পর সঙ্গীদের তাড়নায় আবার চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর চলিয়া নিম্নে দেখিলাম গৌরীকুণ্ড।

গৌরীকুণ্ড একটি হ্রদ। জলভাগ ও স্থলভাগ উভয়ই বরফ দ্বারা আবৃত, কেবল কুণ্ডের পশ্চিম দিকে দশ-বারো হাত নীল জল দৃষ্টিগোচর হইল। কুণ্ডটির পরিধি দুই-তিন মাইলের কম হইবে না। কুণ্ডের পশ্চিম তীর হইতে জলভাগকে আলিঙ্গন করিয়া একটি লিঙ্গবৎ শৃঙ্গ উর্ধ্ব দিকে উঠিয়াছে। এই শৃঙ্গের বামে দক্ষিণে অনেকগুলি শৃঙ্গ ভেদ করিয়া কৈলাসের উচ্চশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত শৃঙ্গগুলি বরফে আবৃত। এই বরফ কখনও গলে না, চিরস্থায়ী। আমি ধীরে ধীরে কুণ্ডের তীরে নামিলাম। অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম। যষ্টি দ্বারা বরফ ভাঙ্গিয়া কুণ্ডে স্নান করিলাম। "ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম" এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া স্নান শেষ করিলাম। সঙ্গীরা শুষ্কবস্ত্রে আমার শরীর মুছাইয়া দিলেন ; কারণ আমি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম। গা মুছিবার বা বস্ত্র পরিধান করিবার শক্তি ছিল না। এই স্থান সমুদ্র সমতল হইতে ২২০২৮ ফিট উচ্চ। উর্ধ্বে যে প্রস্তরখণ্ডের কথা লিখিয়াছি, তথা হইতে গৌরীকুণ্ড অনেক নীচে। উর্ধ্ব হইতে গৌরীকুণ্ড পাতাল বলিয়া বোধ হয়। রাস্তাও দুই মাইলের কম নহে।

গৌরীকুণ্ডের তীরে প্রকাণ্ড প্রস্তর। এই প্রস্তরের উপর দিয়া চলা বড়ই ক্লেশকর। গৌরীকুণ্ডের তীরে একটা গুহা আছে। উহাতে তিন-চারজন লোক বাস করিতে পারে, কিন্তু অগ্নি ব্যতীত এখানে টিকিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে কাঠ ছিল না ; সুতরাং গৌরীকুণ্ডে আমাদের থাকা হইল না। এই দেশের প্রথা যে, গৌরীকুণ্ডে স্নান করিয়া কিছু আহার করা চাই। আমাদের সঙ্গে আহারীয় ছিল। আমরা এখানে কিছু আহার করিলাম। আহার করিয়া আমরা কাষ্ঠের বাটিটি ঝুলিতে রাখিতেছি, এমন সময় আমার একমাত্র ভোজনপাত্র কাষ্ঠের বাটি গৌরীকুণ্ডের ভিতর পড়িয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা পাইলাম না। আমরা গৌরীকুণ্ডে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। এই সময় অনবরত ঝড়বৃষ্টি ও বরফপাত হইতেছিল। জীবনের আশা কিছুমাত্র ছিল না ; তবে কৈলাস বলিয়া মনের আবেগও ছিল না, কোন রকম চিন্তা বা নিরুৎসাহ ছিল না। এইরূপে নিম্নে অবতরণ করিয়া একটি নদী পাইলাম। নদীও সজলা। নদী দিয়া খরতর স্রোত বহিতেছে। নদীর উভয় তীর তৃণাচ্ছাদিত। গ্রাম্য পথের ন্যায় তীরে পথও আছে। রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও কমিয়াছে। এই রাস্তাতে একেবারে চড়াই নাই ; এখন অল্প অল্প

উৎরাই। পথ চলিতে আর কষ্ট নাই, তবে মধ্যে মধ্যে নদীর এক পার হইতে পরপারে যাইতে হইতেছে। রাস্তায় বড় লোকজন দেখিলাম না। দারচিনের রাস্তাই আমাদিগকে দারচিন লইয়া যাইতেছে, তবে মধ্যে মধ্যে কৈলাস পরিক্রমকারী দুই-একজন লামাকে দেখিতে পাইলাম।

তাঁহারা মৌনী হইয়া কৈলাস পরিক্রম করিতেছেন। আর একজন দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে আমাদিগের বিপরীত দিকে যাইতেছেন। আমরা যে নদীর পার দিয়া যাইতেছি, সেই নদীর উভয় তীরই জলসিক্ত, সুতরাং ভিজিতে ভিজিতে বেলা তিনটার সময় জংলিফু মঠে উপস্থিত হইলাম। দেশবাসীরা কৈলাসকে বড়ই মান্য করে। ইহারা তিন প্রকার পদ্ধতি অনুসারে কৈলাস পরিক্রম করে। কেহ কেহ প্রত্যুষে দারচিন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রের মধ্যে দারচিনে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রত্যেক মঠে এক-একদিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া দারচিনে ফিরিয়া আসে। আর যাহারা পরম ভক্ত, তাহারা একবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে ; দণ্ডবৎ করিয়া কৈলাস প্রদক্ষিণ করে ; তাহাদের বারো-তেরো দিনের কম কৈলাস প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হয় না। ইহারা বুকে একটি ভেড়ার ছাল বাঁধে ও সঙ্গে একজন লোক থাকে। সে-ই আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দেয় ; যথায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তথায় রাত্রিযাপন করে। আমরা অদ্য জংলিফু মঠে বাসা করিলাম। মঠে স্থান ছিল না ; মঠের রন্ধনশালায় আমার স্থান হইল। স্থানটি মন্দ নহে ; একটু গরম পাইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইলাম। সঙ্গে আহারীয় ছিল না, লামাও কৃপা করিলেন না, সুতরাং চা খাইয়া রাত্রি কাটাইতে হইল। এখানকার লামাটি ধর্মের ধার ধারেন না ; একটি বিবাহও করিয়াছেন, বাণিজ্য-ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মঠে থাকেন না ; মঠের নিম্নে তাঁবু খাটাইয়া সপরিবারে বাস করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য ভিন্ন অন্য কথা নাই। ইহার নামে লাসাতে অভিযোগ হইয়াছে, শীঘ্রই পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা। ২৭শে আষাঢ় জংলিফুতে আসিলাম। ২৮শে আষাঢ় অনুমান ৮টার সময় দারচিনে ফিরিয়া আসিলাম। দারচিন হইতে কৈলাস পরিক্রম করিয়া দারচিন পর্যন্ত চল্লিশ মাইলের কম হইবে না।

দারচিনে আসিলাম বটে, কিন্তু শরীর একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আসিয়া একান্ত অকর্মণ্য হইয়া পড়িলাম। উপবাস আমার অভ্যস্ত থাকিলেও হিমালয়ে উপবাস সহ্য হইল না। গতরাত্রি উপবাসী ছিলাম বলিয়া অদ্য আমার এই দুর্দশা। বেলা অনুমান ৮টার সময় দারচিনে পঁহুছিলাম। দারচিন মঠের প্রধান লামা ও পদচ্যুত লামার নিকট আমার পৌঁছানো-সংবাদ গেল ; তাঁহারা আমার আহারীয় পাঠাইয়া দিলেন।

অদ্য ২৮শে আষাঢ় এখানে বিশ্রাম করিলাম। দারচিন হইতে মানসসরোবর দুই দিনের পথ। ২৯শে আষাঢ় প্রাতঃকালে দারচিন পরিত্যাগ করিলাম। অদ্য অনেকগুলি লোক আমাদের সঙ্গী। এক সঙ্গে দশ-বারোজন লোক দারচিন পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চলিতে আরম্ভ করিলাম। অদ্যকার পথ সমভূমি হইলেও বড় জটিল। পশ্চাতে কৈলাস

সম্মুখে রাবণহ্রদ, পূর্বদিকে মানসসরোবর, মধ্যে মাঠ ; মাঠের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। কৈলাস হইতে যত নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সমস্ত নদীই এই মাঠ ভেদ করিয়া রাবণহ্রদে পড়িয়াছে, সুতরাং এই মাঠটিকে মাঠ না বলিয়া বিল বলিলেও চলে। একে হিমপ্রধান প্রদেশ, তাহাতে বিল। বিলে জলের অভাব নাই। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিতে হইতেছে, সুতরাং অল্প চলিতেই বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল, পা অসাড় হইয়া উঠিল ; বাতাস প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে চার-পাঁচ ঘণ্টাতে চারি মাইল পথ আসিলাম। ক্ষুধা-পিপাসার তো কথাই নাই। চলৎশক্তির পর্যন্ত অভাব হইল। এই মাঠের মধ্যে ভুটিয়াদের একটি ডুং ছিল। সেই ডুং-এ অনেকগুলি প্রান্ত-সীমার ব্যবসায়ী হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমার দুর্দশা দেখিয়া বসিবার আসন ও পানীয় চা দিল। আমি কিছু সুস্থ হইয়া আবার চলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহারা আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে বলিল, "আপনি কিছু আহার করুন এবং আরও দুই-এক ঘণ্টা বিশ্রাম করুন, পরে আমরা আপনার সঙ্গে যাইয়া আপনাকে বরখায় রাখিয়া আসিব।"

বরখা একটি ছোটখাটো রাজধানী। বরখার রাজা আজ বরখায় নাই; তিনি অদ্য কৈলাস প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াছেন। একজন সামান্য কর্মচারীর উপর রাজধানীর তত্ত্বাবধানের ভার। আমি এখানে অনুমান দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে বরখায় পঁহুছিলাম। বরখার রাজাকে বরখাতজ্জুন কহে।

রাজধানীটি রাবণহ্রদের উপকূলে স্থাপিত। চারিদিকেই মাঠ, গাছপালার নামগন্ধও নাই। ঘুঁটে ও ছাগলের নাদে কাষ্ঠের কার্য হইয়া থাকে। বাড়ি-ঘরের মধ্যে অতিথিশালা ও রাজবাটী উল্লেখযোগ্য। রাজবাটী সামান্য, একতলা, দেখিতে অতি কদাকার, ধূমের কালিতে কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় চারিদিকেই ঘুঁটিয়া ও ছাগলের নাদের স্তূপ। দশ-বারোটি কুকুর রাজবাটীর প্রহরী; তাহারা বিকট চীৎকার করিয়া দিনরাত্রি পথিকদিগের ত্রাস জন্মাইতেছে। সেই দিক দিয়া অপরিচিত লোকের যাতায়াতের উপায় নাই। অতিথিশালাটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তিব্বত, ভোট ও প্রান্তবাসী ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া থাকে। আমি অতিথিশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গীরা রাজকীয় কর্মচারীর নিকট চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। কর্মচারী আসিয়া আমার রাত্রিবাসের জন্য দুইটি কুঠরী পরিষ্কার করাইয়া দিলেন। একটিতে আমার থাকিবার স্থান হইল, অপরটিতে রন্ধনশালা ও সঙ্গীদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজভাণ্ডার হইতে ঘুঁটে, ছাগলের নাদ, ছাতু, মাখন ও লবণ আসিল; ইহাই এ দেশে রাজকীয় অভ্যর্থনা। আমি রাজকীয় অভ্যর্থনায় প্রীত হইলাম। রন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল এবং নগরবাসীরা আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁবুতে বাস করে। শীতকালে এখানে কেহই থাকিতে পারে না। রাজাকেও সদলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে যাইতে হয়, প্রজারাও রাজার

অনুকরণ করে। এখানকার চার পাঁচটি লোক কিছু কিছু হিন্দী জানে; ইহারা বাণিজ্যের জন্য হিন্দুস্থানে যাইয়া হিন্দী শিক্ষা করিয়াছে। সুতরাং এখানে আর আমায় কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। প্রজারা আমাকে বুঝিল; আমিও প্রজাদিগকে বুঝিলাম; তবে একজন প্রজা আমাকে এই বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল, "আমার ছয়টা ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে; তাহা কোথায় আছে বলিয়া দাও।" আমি বলিলাম, "তোমার ঘোড়া ডাকাতে লইয়া গিয়াছে, আমি কেমন করিয়া সন্ধান বলিয়া দিব?" সে বলিল, "তুমি সাধু সব জান, কেবল আমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছ।" এই বলিয়া সে বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। যেমন নিম্নদেশে সাধু দেখিলেই লোক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং ঔষধ চায়, সেইরূপ ইহারাও আমার নিকট নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল এবং ঔষধ প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি ইহাদের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সকলেই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। আমি নিস্তার পাইলাম।

মানসসরোবর বরখার রাজার অধীন; মানসসরোবরে যাইতে হইলে বরখার রাজার অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে। আমি ইতঃপূর্বে রাজার অনুমতি লইয়াছি, আমাকে আর কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। আমি এইস্থানে রাত্রিযাপন করিলাম। দারচিন হইতে বরখা ছয় মাইল। বরখা হইতে মানসসরোবর আট মাইল। অদ্য ৩০শে আষাঢ় সংক্রান্তি। পূর্বে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, সংক্রান্তির দিবসে মানসসরোবরে গিয়া স্নান করিব; অদ্য প্রত্যুষে উঠিয়া সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার জন্য দ্রুতবেগে মানসসরোবরের দিকে ছুটিতে লাগিলাম। সূর্যোদয়ের পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিলাম। এখন সূর্যোদয় হইয়াছে, চতুর্দিকের বরফ-মণ্ডিত পর্বতগুলি মাথা উঁচু করিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সূর্যদেব প্রসন্ন হইয়া সুবর্ণকিরণময় হস্ত পর্বতের মস্তকে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। এই আশীর্বাদে পর্বতশিখর যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রস্রবণরূপ গলদশ্রুতে ধরাকে সিক্ত করিতেছেন। ধরা রাবণহ্রদ ও মানসসরোবর রূপ উভয় হস্তে পর্বতের অশ্রুবেগ ধারণ করিয়াছেন। প্রভাত হইয়াছে, রৌদ্র উঠিয়াছে, শীতও একটু কমিয়াছে। এদিকে আমার হৃদয়ে মানসসরোবর যাইবার জন্য উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এখন পূর্বদিকে চলিতেছি; দক্ষিণভাগে রাবণহ্রদ, বামভাগে একটি ক্ষুদ্র বরফ-মণ্ডিত পর্বত; রাস্তা সবুজবর্ণ ঘাস ও কন্টকে আবৃত, হ্রদের জল গভীর নীলবর্ণ। এই মনোহর দৃশ্য বর্ণনার অতীত।

রাবণহ্রদের মধ্যে একটি পর্বতময় দ্বীপ। এই দ্বীপস্থ পর্বতও তুষার-মণ্ডিত। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনের আবেগে সরোবরের দিকে ছুটিতেছি, এমন সময় দুইটি বস্তু দেখা গেল। সেই দুইটি বস্তুকে আমার সঙ্গীরা মনে করিলেন, ঘোটকারোহণে দুইজন ডাকাত আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এখানে ডাকাতের বড় ভয়। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই ডাকাতের ভয়ে ভীত। রাস্তায় চলিতে চলিতে সম্মুখে যা কিছু চলৎ-বস্তু দেখা যায়, তাহাকেই ডাকাত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; কারণ বিভীষিকাময় স্থানে ভয়ের এমনই মহিমা যে, সম্মুখে যাহা কিছু বস্তু দেখা যায়, তাহাই

ভয়জনক বলিয়া মনে হয়। সম্মুখস্থ জিনিস দুইটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই সঙ্গীদের ভয়বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরা বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গের জিনিসপত্র টাকাকড়ি আহারীয় প্রভৃতি কন্টকগুল্মের নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পরস্পর অন্যমনস্ক হইয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম। সেই দুইটি জিনিস নিকট হইতে নিকটে আসিল। এখন দেখিলাম তাহারা দুইটি মনুষ্য, বোঝা ঘাড়ে করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। ক্রমে তাহারা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন দেখিলাম তাহারা দুইজন লামা, মানসসরোবর হইতে আসিতেছে, কৈলাসে যাইবে। দুইজনেই হস্তে জপচক্র ঘুরাইতেছে, আর বলিতেছে "ওঁ মানিপেমহুং"। ইহা এই দেশীয় লোকদিগের মহামন্ত্র। লামাদ্বয় আমাদের নিকট বসিল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানসসরোবর কত দূর?" লামা উত্তর করিলেন, "বরখা হইতে যত দূর আসিয়াছেন আর তত দূর।" এই বলিয়া লামাদ্বয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে হাসির উচ্চরব উঠিল।

আমি আমার দোভাষী ভৃত্য বিষ্ণু সিংহকে বলিলাম, "ভাল ডাকাত দেখিয়াছিলে বটে!" বিষ্ণু সিংহ বলিল, "এ বড় ভয়ানক স্থান; ডাকাতে পরিপূর্ণ; অতি সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। যদি ইহারা ডাকাত হইত, তবে কি হইত?" আমি আর বিষ্ণু সিংহের কথার উত্তর দিলাম না। সকলে সরোবরের দিকে চলিতে লাগিলাম। বিষ্ণু সিংহ লামাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এ পথে ডাকাতের ভয় আছে কিনা?" লামা উত্তর করিয়াছিলেন, "আজ কোনও ডাকাত দেখি নাই বটে, কিন্তু ভয় খুব।"

সে যাহা হউক, আমরা চলিতে লাগিলাম। এখন রাস্তা ঢেউখেলানো, একবার উপরে উঠিতেছি, একবার নিম্নে অবতরণ করিতে হইতেছে। যখন ঊর্ধ্বে উঠিতেছি, তখন মানসসরোবর নয়নগোচর হইতেছে, আর যখন নিম্নে অবতরণ করিতেছি, তখন আর সরোবর দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ ক্ষণিক দর্শন, তার পরক্ষণেই অদর্শনে মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি ক্রমাগত দৌড়িয়া একটি উচ্চ স্থানে যাইয়া উঠিলাম। সেইখান হইতে সরোবরের দর্শন অতি মনোহর। চারিদিকই পর্বতমালায় বেষ্টিত, মধ্যে নীলবর্ণ জলরাশি পবনের আবেগে আন্দোলিত হইয়া এদিক ওদিক ছুটিতেছে এবং সমুদ্রবৎ বীচিমালায় তীরভাগকে আক্রমণ করিতেছে। যখন ঢেউ ছুটিতেছে, তখন বোধ হইতেছে যে, নীলবর্ণ জলরাশি হইতে শুভ্র মুক্তামালা উদ্বেলিত হইয়া তীরের দিকে ছুটিতেছে। এই জলের মধ্যে অসংখ্য চক্রবাক চক্রবাকী ক্রীড়া করিতেছে, এবং বহুসংখ্যক রাজহংস মানসসরোবরের বক্ষে বিচরণ করিতেছে। এই হংস ও চক্রবাক-চক্রবাকীর বর্ণ কর্পূরবৎ শুভ্র। ইহা দর্শন করিয়া মনে হইল, মানসসরোবর শ্বেতপদ্মমালায় বিভূষিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গে শুভ্র মহা-শোভা সম্পন্ন করিতেছে। মানসসরোবরের চতুর্দিকের পর্বত-প্রাচীরও বরফে আবৃত।

আমি যেখানে বসিয়া আছি, এই স্থান হইতে জুগুমফা অর্ধ মাইল হইবে। জুগুমফা হইতে বামাবর্তে মানসসরোবর ভ্রমণ করিতে হইলে জুগুমফা হইতে নাংমুনা মঠে যাইতে হয়; নাংমুনা হইতে ঝিগেফ, ঝিগেফ হইতে সারালুং, সারালুং হইতে বণ্ডী, বণ্ডী হইতে

ইয়াংগো, ইয়াংগো হইতে ঠোকর, ঠোকর হইতে খুচুর। এই সব স্থানে এক একটি মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান আছে। এক মঠ হইতে অপর মঠ দশ-বারো মাইলের কম হইবে না। সুতরাং মানসসরোবরের পরিধি মঠের গণনা অনুসারে ৮০ হইতে ৮৫ মাইল। আমার বিচার অনুসারে মানসসরোবরটি অষ্টদল পদ্মের অনুরূপ, এক একটি পদ্মে এক একটি মঠ সংস্থাপিত। এই মঠের মধ্যে জুগুমফা মঠ সর্বপ্রধান এবং ঠোকর মঠ দ্বিতীয়। অদ্য আমার বিশ্রাম স্থান জুগুমফা মঠ; আমি এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জুগুমফাতে আসিলাম। মানসসরোবরের পশ্চিমতীরকে আলিঙ্গন করিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই পর্বতে অনেকগুলি স্বাভাবিক গুহা আছে এবং পর্বতকে আশ্রয় করিয়া মঠ প্রস্তুত হইয়াছে। এই মঠে যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে; কিন্তু কে যাত্রী, কে ডাকাত মঠের অধিকারী তাহা চিনিতে না পারিয়া যাত্রীদিগকে স্থান দেন না।

আমি মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর মঠের একজন লামা আমাকে মঠে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ইহা শুনিয়া বিষ্ণু সিংহ মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রধান লামাকে আমার পরিচয় দিয়া দিল, এবং লামা মঠের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আমাকে মঠের মধ্যে লইয়া গেলেন। এই মঠেও আমি একটি ভাল কুঠুরী পাইলাম। এই মঠে প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রথমেই রাস্তার বামপার্শ্বে রন্ধনশালা। এই রন্ধনশালাতে মঠের সমস্ত লোকের রন্ধন হয় ও অতিথিদিগেরও রন্ধন হইয়া থাকে। রন্ধনশালায় মঠের কর্মচারী লামার বাস। যত আগন্তুক ও ব্যবসায়ী এই রন্ধনশালায় স্থান পাইয়া থাকেন। রন্ধনশালার পশ্চিম দিকে আর একটি কুঠুরী, সেই কুঠুরীতে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল। এই কুঠুরীর মধ্যে অনেক জিনিসপত্র ছিল, তাহা এদিক ওদিক সরাইয়া আমার স্থান হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে বড় ডাকাতের ভয়। বাহিরে জিনিসপত্র রাখিলে ডাকাতেরা তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে মঠই কেল্লা; এখানে তাহারা জিনিসপত্র রাখে ও নিজেরা থাকে। এদিকে জুগুমফার ন্যায় আর নিরাপদ স্থান নাই। আমার কুঠুরীর পশ্চিমদিকে হলঘরের ন্যায় একটি বৃহৎ কুঠুরী। কুঠুরীর পূর্বদিকে সুবৃহৎ গুহা। গুহার ঊর্ধ্বদিকে হরপার্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং অনেকগুলি শিব ও শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গুহার মধ্যে হস্তলিখিত রাশি রাশি পুস্তক অতি গোপনে সুরক্ষিত। সকলের ভাগ্যে এই পুস্তকদর্শন ঘটে না, কেবল দেবদর্শন করিয়াই চলিয়া যান। লামার সঙ্গে সদ্ভাব হওয়াতে আমি এই পুস্তকগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই গুহাটি অন্ধকারময়. আলোক ভিন্ন এই গুহাতে প্রবেশ করা যায় না।

মানসসরোবর আমাদের একটি পীঠস্থান। সতীর দক্ষিণ হস্ত এই মানসসরোবরেই পড়িয়াছিল। এই পীঠের ভৈরব অমর, দেবী দাক্ষায়ণী। এই গুপ্ত গুহাই পীঠস্থান। এই গুহার সম্মুখেই যে হলঘরটির উল্লেখ করিয়াছি, সেই হলঘরের প্রায় চতুর্দিকই পশমের গদি দ্বারা সুসজ্জিত, গদির উপর লাল-নীল বস্ত্রের আবরণ। এই আসনে লামারা বসিয়া জপ করেন এবং বিশেষ পর্বদিবসে এই স্থান হইতে গুহাস্থিত দেবীর দর্শন হইয়া থাকে

পূর্ব দিবস উপস্থিত হইলে এই ঘর ও গুহাটি আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, সুতরাং তখন দেবীদর্শনের আর কোনও কষ্ট হয় না। এই ঘর হইতে বাহির হইয়াই ঊর্ধ্বদিকে সিঁড়ি, সিঁড়ির পর ছাদ, ছাদের উত্তর ও পূর্ব দিকে দ্বিতল ও ত্রিতলে চার-পাঁচখানি ঘর আছে। এই সব ঘরে লামাদিগের বাস। প্রধান লামার বসিবার ঘরের পশ্চাতে তাঁহার যোগাসন। সেই যোগাসনের গৃহটি অতি সঙ্কীর্ণ; অতি কষ্টে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং সেই গৃহটি হইতে সরোবর দেখা যায়।

গৃহটির পশ্চাৎভাগে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেই তীরস্থ পর্বতে উঠা যায়। এই পর্বতের ঊর্ধ্বদেশে একটি গৃহ আছে, সেই গৃহে একটি যোগিনীর বাস। দুই বৎসর হইল তিনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, আরও দুই বৎসর আমি এখানে থাকিব। ইঁহার সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। তাহাতে জানিলাম, ইনি একজন প্রধান রাজযোগী। ইঁহার জেষ্ঠ্যভ্রাতাও মহাযোগী। ইনি ইঁহার ভ্রাতার শিষ্যা। পূর্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এইস্থানেই বাস করিতেন, অদ্য তিনি কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। রাস্তাতে যে লামাটির সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও গুরু। ইনি এই গৃহ হইতে বাহির হন না ; মঠবাসীরা দয়া করিয়া যাহা কিছু দেন, তাহাতেই ইঁহার উদর পূর্ণ হয়। ইঁহারা উভয়েই শৈব।

এই পর্বতে আরও চার-পাঁচটি গৃহ আছে। যাহারা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা ঐসব গৃহে বাস করে ও সোরা লবণ প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে। আমি মঠে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম ও লামাপ্রদত্ত চা পান করিলাম। পরে স্নানার্থে সরোবরতীরে গমন করিলাম। মঠ হইতে সরোবরতীর অর্ধমাইল নিম্নে। মঠ হইতে সরোবরে অবরোহণ করিবার একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া সরোবরে গেলাম। সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া সরোবরে স্নান করিতে ইচ্ছা হইল। বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, খুব হাওয়া উঠিয়াছে, সরোবর হইতে প্রচণ্ড ঢেউ উঠিয়া তীরকে আক্রমণ করিতেছে। আমি শীতে কম্পান্বিত-কলেবর ; ঢেউয়ের সঙ্গে যত মৎস্য উঠিতেছে, তাহা তীরপ্রস্তরে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ গতাসু হইতেছে। আমি সরোবর দর্শন করিতেছি ; যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূরই নিম্নে দেখিতেছি প্রস্তর, আর কিছুই নাই। আমি কাহারও কথা না শুনিয়া গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলাম, এবং সরোবরের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়া পড়িলাম ; খুব অবগাহন করিলাম, শত শত ডুব দিলাম, আর ইচ্ছামত জলপান করিলাম। প্রাণের আনন্দে শীতের কষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম না। এখানে প্রায় সমস্ত দিনই বসিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার পূর্বে জুগুমফায় ফিরিয়া আসিলাম। এই জুগুমফার সকলেই জপযোগী ; কেবল প্রধান লামা প্রাণায়াম-যোগী ; ইঁহারা মহাশঙ্খমালা জপ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রুদ্রাক্ষমালাও জপ করেন। মঠবাসীরা সকলেই বিনীত, শান্ত, অতিথিসেবাতৎপর ও উদার। এই মহাতীর্থে আসিয়া আমার মনে হইল, এই তীর্থের ব্রাহ্মণ লামা ও ডাবা ; ইঁহাদিগকে ভোজন দেওয়া উচিত। ইহা প্রধান লামাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "বেশ, ভোজন করাইলেই

চলিবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি খাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "চা, ছাতু ও মাংস।" তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত প্রস্তুত হইল এবং ভোজনকার্য শেষ হইয়া গেল। লামার সঙ্গে এখন আমার খুব ভাব হইয়াছে এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। তিনি শাস্ত্রপাঠ করিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, আমিও চণ্ডীপাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছি। আমি চণ্ডীপাঠ করিতেছি আর তিনি বলিতেছেন, "এই চণ্ডী আমার কাছেও আছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কি কি গ্রন্থ আছে?" তিনি কহিলেন, "বিষ্ণুর সহস্রনাম ও ভগবদ্গীতা আছে।" তাঁহার সহিত আমার যত কথা হইয়াছিল, সমস্তই দোভাষীর মারফৎ। তাঁহার কথা দোভাষী আমাকে হিন্দী করিয়া বুঝাইতেছিল ; আমার কথা তাঁহাকে তিব্বতীয় ভাষায় বুঝাইতেছিল ; কারণ তিনিও হিন্দী জানেন না, আমিও তিব্বতীয় জানি না। মাঝে মাঝে আকার-ইঙ্গিতেও কথাবার্তা হইতেছে। আমি বলিলাম, "এই মঠে তিনদিন বাস করিয়াই আমি মানসসরোবর প্রদক্ষিণ করিতে যাইব।" তিনি বলিলেন, "তাহা হইবে না ; কারণ সরোবরের চতুর্দিকেই ডাকাতদিগের আড্ডা। যতদিন ইচ্ছা আপনি এখানে বাস করুন, মানসসরোবর দর্শন ও সরোবরে স্নান করুন ; ইচ্ছা করিয়া বিপদ আহ্বান করা উচিত নহে।" আমি তাঁহার কথা শিরোধার্য করিলাম এবং সরোবর-প্রদক্ষিণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম।

এখানে পঞ্চ রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। অদ্য ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে লামার জন্য বরখা হইতে ঘোটক আসিয়াছে। লামা অদ্য বরখায় যাইবেন এবং কল্য বরখার রাজার সঙ্গে ছেক্‌রামুণ্ডী যাইবেন। এখানকার রাজারা বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া থাকেন এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অধীন ও নিকটস্থ 'মুণ্ডী' অর্থাৎ বাজারে গমন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে একজন লামা থাকেন। লামা শাস্ত্রপাঠ করিয়া রাজাদিগকে শুনান এবং লামারাও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন। তাই এই মঠের লামা দুই মাসের জন্য মঠ পরিত্যাগ করিবেন। মঠ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লামা বলিলেন, "আপনি কি করিবেন ও এখন কোথায় যাইবেন?" আমি বলিলাম, "আমি কল্যই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ঘুচুর মঠে যাইব ; তথা হইতে তক্‌লাখার্ হইয়া খুজরুনাথে যাইব।" লামা বলিলেন, "তা বেশ। খুজরুনাথ হইতে ফিরিবার সময় আপনি ছেক্‌রামুণ্ডী হইয়া যাইবেন। তথায় আমার সঙ্গে ও বরখার রাজার সঙ্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া লামা চলিয়া গেলেন। আমিও স্নানার্থ মানসসরোবরতীরে গেলাম।

অদ্য বড় হাওয়া উঠিয়াছে, হাওয়ার জন্য মানসসরোবরের অধিবাসী চক্রবাক-চক্রবাকীরা আসে নাই ; কেবল একটি হংস ও হংসী সরোবরের বক্ষে ক্রীড়া করিয় বেড়াইতেছে। হংসের আকার দেশীয় রাজহংসের অনুরূপ। শরীর শুভ্র, চঞ্চু ও চরণ রক্তবর্ণ গতি মন্থর। আমি স্নান করিয়া হংস ও হংসী দর্শন করিতে লাগিলাম, এবং অদ্যও সন্ধ্যার সময় বাসস্থানে ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া শুনিলাম, সীমান্তবাসী কয়েকজন যাত্রী সরোবরে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাদের সমস্ত দ্রব্য ও বস্ত্রাদি ডাকাতেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয় গিয়াছে। তাহারা মঠের আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আমি অগৌণে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, কথা সত্য। আমার সঙ্গে এতদিন একজন নানকপন্থী সাধু ছিল। আমি বাসায় আসিয়া দেখিলাম সে চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আমার সঙ্গে যা কিছু আহারীয় ছিল, তাহার কিছুই নাই। কি করিব, মঠ হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিলাম এবং সেই রাত্রি এখানে বাস করিলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে জুগুমফা পরিত্যাগপূর্বক মানসসরোবরের পূর্বতীর ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। বেলা এগারটার সময় ঘুচুর মঠে উপনীত হইলাম। এই মঠে আড়ম্বর কিছুই নাই ; একটি দেবালয় ও একটি পুস্তকালয় আছে, এবং দুইজন লামা এখানে বাস করেন। আমি মঠে উপস্থিত হইবামাত্র লামা আমাকে রন্ধনশালায় স্থান দিলেন ও আতিথ্যসৎকার করিলেন। অদ্য এই মঠে অনেকগুলি অতিথি। তাহার মধ্যে দুইজন লামা লাসা হইতে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই অদ্য নয়দিন হইল উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া ভজন করিতেছেন। চাও পান করেন না, কেবল দিনান্তে একবার মাত্র দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করেন। প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পাঠে বসেন ; মধ্যে মধ্যে ডম্বরুধ্বনি করেন, আবার পাঠ করেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দেন। দিনে পাঠ ও ডম্বরুবাদন, রাত্রিতে জপ ও ধ্যান করেন। এইরূপ করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। আর দুই দিন ইঁহারা এই ব্রত যাপন করিবেন এবং তৃতীয় দিবসে এখানে হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিবেন। এই মঠে বৌদ্ধমূর্তি ভিন্ন অপর মূর্তি নাই। মঠটি দ্বিতল। উপরতলাতে অতিথিশালা। আজ সেই অতিথিশালা শূন্য ; কারণ আমরা সকলেই নিম্নতলে বাস করিতেছি। অপরাহ্নে আমরা সকলেই দ্বিতীয় তলাতে উঠিলাম।

দুইজন লামা প্রকাণ্ড দুই বাঁশী বাজাইতে লাগিল। এই বাঁশীগুলি পিত্তল-নির্মিত, দশ হাত লম্বা এবং আওয়াজ বড় গম্ভীর। এই বাঁশীর সঙ্গে সুবৃহৎ নাগরা ও ডম্বরু বাজিতে লাগিল। আমাদের সম্মুখেই মানসসরোবর, আমি দর্শন করিতেছি, আর লামাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তোমরা কাশী লামাকে এত সম্মান কর কেন?" লামা বলিলেন, "শুনুন, আমাদের এই দেশ পূর্বে রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। আমরাও রাক্ষস ছিলাম। কাশী হইতে পদ্মমুনি গ্রন্থ লইয়া জ্বালামুখীতে যান। জ্বালামুখী হইতে তিব্বতে আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন ও মঠ সংস্থাপন করেন এবং আমাদিগকে "ওঁ মণিপদ্মেহুঁ" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, এবং লাসাতে আপনার আসন সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। পদ্মমুনি যোশীমঠ হইতে নিতি পাসের নিকটবর্তী হোতি পাস দিয়া ত্রেতাপুরি আসেন। ত্রেতাপুরি, কৈলাস ও মানসসরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া লাসায় যান। এখনও পদ্মমুনি লাসার প্রধান লামা হইয়া আছেন। তবে তিনি দেহ জীর্ণ হইলে জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনিই যে আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরাবর্তন করেন, তাহার প্রমাণ কি?" লামা উত্তর করিলেন, "প্রমাণ আছে। যখন প্রধান লামার নূতন দেহ হয়, তখন লাসার প্রধান মঠের কোন্ সিন্দুকে কত টাকা আছে, কোথায় কি জিনিসপত্র আছে, তাহা বলিতে হয়। যদি তিনি বলিতে না পারেন, তাহা হইলে লামার

প্রধান আসনে তিনি বসিতে পারিবেন না। ততদিন প্রধান লামার আসন শূন্য থাকিবে। তবে ফলকথা এই যে, লাসার প্রধান লামার পদ অধিক দিন শূন্য থাকে না।" তাঁহার সঙ্গে এই সব কথাবার্তা কহিতে কহিতে রাত্রি হইয়া গেল। আমরা সন্ধ্যার পরে নিম্নতলে চলিয়া আসিলাম। আমরা যেমন কোন গ্রন্থ লিখিবার পূর্বে 'ওঁ নমো গণেশায়' লিখি, এই দেশের গ্রন্থ-লেখকরা সেইরূপ কাশীর নাম লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ এই পদ্মমুনিকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পদ্মপাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীর সারনাথ হইতে প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় এবং কাশী হইতেই কোনও বৌদ্ধ শ্রমণ তিব্বতে আসিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। ইহার মীমাংসা পরে হইবে।

অদ্য শ্রাবণের সপ্তম দিবস অতীত হইল ; অদ্য এই ঘুচুর গুম্ফাতেই রাত্রিবাস করিলাম। ইতঃপূর্বে যে জুগুম্ফার নাম উল্লেখ করিয়াছি, যেখানে আমি ছয় রাত্রি বাস করিয়াছিলাম, সেই গুম্ফার নিম্নে একটি খাল আছে। খালটি মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া রাবণহ্রদে যাইয়া পড়িয়াছে। এই খালটিতে জল নাই। এই খালটির মধ্যে দিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেই রাক্ষসতালে যাওয়া যায়। রাক্ষসতাল এই মানসসরোবর হইতে তিন মাইল। মানসসরোবর হইতে যে খালটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই খালটিকে দেশীয় লোকেরা শতদ্রু বলিয়া থাকে। শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান মানসসরোবর। এই খালটি অন্তঃসলিলা এবং অধিক বরফপাত হইলে বরফ গলিয়া এই খালটি মানসসরোবরের ও রাবণহ্রদের জলভাগকে এক করিয়া দেয়। রাবণহ্রদের উত্তর দিক দিয়া শতদ্রু বাহির হইয়া নিম্নে গিয়া পড়িয়াছে। এই খালের উত্তরতীরে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই উষ্ণ প্রস্রবণটি জুগুম্ফার পর্বতের ঠিক পূর্বদিকে। এই উষ্ণ প্রস্রবণের তীরে তিনটি গুহা আছে। মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও সাধু আসিয়া এই গুহাতে বাস করেন। আপাততঃ গুহা শূন্য। ডাকাতের ভয়ে আর এখন কেহ গুহাতে বাস করেন না।

গুম্ফা শব্দের অর্থ মঠ। *

সিনিয়লচু (২২,৬২০)

(বিশ্বের সুন্দরতম পর্বতশৃঙ্গ অভিযান)

শঙ্কু মহারাজ

ব্রাহ্মমুহূর্তে শুভদৃষ্টি হল। সুন্দরের অভিসার সার্থক হল। আমার আঠারো বছরের স্বপ্ন সত্য হল।

সত্যি বলতে কি এমন অতর্কিতে অদর্শনের যন্ত্রণার উপশম হবে, তা একটু আগেও আশা করি নি। কেমন করে করব? এখনও যে আমাদের এই মূল শিবিরে প্রভাতের পরশ লাগে নি। রীতিমত রাত রয়েছে। সবে সকাল সাড়ে চারটে। প্রচণ্ড শীত। তবু প্রাকৃতিক প্রয়োজনে স্লীপিং ব্যাগের মায়া কাটিয়ে তাঁবুর বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে বিস্ময়ে ও পুলকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন বিস্মৃত হয়েছি। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি সিনিয়লচুর দিকে, সুন্দরের পানে। নিজের অলক্ষ্যেই কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ছে —

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।...
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর।"

জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকলে এমন সুন্দরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয় না।

তবে শুধু সিনিয়লচুর সৌন্দর্য নয়। পরিবেশ তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে সুন্দরতর করে তুলেছে। আগেই বলেছি এখনও শিবিরে সূর্যের আলো এসে পৌঁছয় নি। মাটিতে তাই কালো আঁধার কিন্তু আকাশ আলো হয়ে গিয়েছে। সেখানে নীলের ছড়াছড়ি। আর অদৃশ্য অংশুমানের সোনালী কিরণ এসে সিনিয়লচুর সারা গায়ে সোনা দিয়েছে ছড়িয়ে। মাটির জগতে সোনার জন্য এত হানাহানি আর এখানে কত সোনা।

শুধু সিনিয়লচু নয়। লিট্‌ল-সিনিয়লচু, টেন্ট-পিক, পিরামিড-পিক্, নেপাল-পিক্ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক ও দুই নম্বর শিখর—এক কথায় সিনিয়লচুর প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই সোনার পাহাড়ে পরিণত। কিন্তু প্রতিবেশীদের কথা থাক, সোনার কথাও আর নয়। হিমবন্ত-হিমালয়ের বুকে সোনা-রূপার এমন ছড়াছড়ি আমি এর আগেও দেখেছি। কিন্তু যা কখনও দেখি নি, তা হল সিনিয়লচু। যেমন শিখর, তেমনি গিরিশিরা আর গড়ন। শিখরটি যেন মানুষের হাতে তৈরী মেট্রো ডিজাইনের চূড়া। একটা দিক ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে, আরেকটা দিক ধনুকের মতো বেঁকে নিচে নেমে এসেছে। শুধু সুন্দর নয়, সেই সঙ্গে অভিনব বটে।

গিরিশিরাটি সত্যি যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার। তারপরে তুষার-সঞ্চয় আর গড়ন? মনে হচ্ছে হাজার হাজার স্থপতি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মণিমুক্তা দিয়ে শত শত বছর ধরে সৃষ্টি করেছে এই অনিন্দ্যসুন্দরকে।

এ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। আমি তাই তার দিকে তাকিয়ে আবার গেয়ে উঠি —

'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত —
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত।।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে।।
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা —
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত —
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত।।"

কবি সিনিয়লচুকে দেখেন নি। কিন্তু তিনি যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, আমি তারই সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমি ভাগ্যবান, বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ও সুসাহিত্যিক ফ্রাঙ্ক স্মাইথের সেই দুরধিগম্য দেবালয়ের দ্বারে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আমি এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সামনে বিহ্বল ও ভাষাহীন হয়ে রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু মহাকবি নন, তিনি যে আমার ভাষার মালাকর।

"বাইরে কে গান গাইছেন?" পাশের তাঁবু থেকে ক্যামেরাম্যান সুশান্তবাবু বলে ওঠেন।

"তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে আসুন।" আমি বলি "সিনিয়লচুকে দেখুন, ছবি নিন।"

শুধু সুশান্তবাবু নয়, একে একে সবাই বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। আর এসেই নিশ্চল ও নীরব হয়ে যায়। আমার মতোই অপলক নয়নে শুধু সিনিয়লচুকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

আমাদের শীত করছে না, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিচলিত হচ্ছি না, কেবল সিনিয়লচুকে দেখছি। তাকে দেখা ছাড়া আমাদের এখন আর কোনো কাজ নেই। আমরা দেখছি সিনিয়লচুকে। দেখছি তার স্বর্ণসিংহাসনসম শিখর আর বাঁকা তলোয়ারের মতো মূল-গিরিশিরা। দেখছি তার তুষারপ্রপাত আর হিমবাহ। দেখছি আর দেখছি। এ দেখার শেষ নেই।

আমরা কলকাতার কয়েকজন শীতকাতুরে মানুষ কতক্ষণ এই ষোলো হাজার ফুট উঁচু হিমবাহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি, খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল, তখন প্রভাতের পরশে জেমু হিমবাহ আলোময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতে সিনিয়লচুর তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং তার গায়ে রামধনুর রং লেগেছে। তাকে আরও সুন্দর লাগছে।

কিন্তু সুন্দর তো চিরস্থায়ী নয়। বরং যৌবনের মতো সুন্দর সর্বদা ক্ষণস্থায়ী। কথা নেই বার্তা নেই কারণ নেই, কোথা থেকে যেন পুঞ্জীভূত মেঘের দল সারি বেঁধে ছুটে আসছে। তারা সিনিয়লচু আর তার প্রতিবেশীদের সারা গায়ে সাদা ওড়না দিচ্ছে জড়িয়ে।

ধীরে ধীরে ওদের দেহের এক-একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে প্রকৃতির এই বিচিত্রলীলা দর্শন করছি।

নেই, কেউ নেই কিছু নেই! সবার সঙ্গে আমার চোখের সামনে সিনিয়লচু অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন কোথাও সোনা নেই, রূপা নেই, রামধনু নেই—শুধুই সাদা। সীমাহীন সাদার সমুদ্রে সিনিয়লচু ডুব দিয়েছে।

এ অবগাহন অনন্তকালের জন্য নয়। যে কোন মুহূর্তে মেঘ কেটে যেতে পারে, তখুনি সিনিয়লচু আবার আমার সামনে আবির্ভূত হবে। তবু মনটা ভারী হয়ে ওঠে। যাকে দেখার জন্য কত কষ্ট করে এতদূর থেকে ছুটে এসেছি, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

চমক ভাঙল। এই প্রথম অনুভব করছি এখানে প্রবল বাতাস বইছে, এখনও রোদ ওঠে নি, ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘড়ি দেখি, ছটা বাজে।

"চা আসছে।" সহসা অসিতবাবু বলে ওঠে।

সে ঠিকই বলেছে। চেতাকে নিয়ে মেট বেরিয়ে এসেছে কিচেন থেকে। তাদের হাতে চায়ের কেটলি ও মগ।

"সাবাস, মেট!" অমূল্য তাকে অভিনন্দিত করে।

"গুড মোর্নিং সাব্।" মেট ও চেতা উত্তর দেয়।

গরম চায়ের মগে ঠোঁট ঠেকিয়ে চারিদিকে তাকাই। গতকাল রাতের আঁধারে শিবিরের অবস্থানটা দেখতে পাই নি। আর আজ এতক্ষণ সিনিয়লচুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি নি। এবারে অবসর পাওয়া গেছে। অতএব আমাদের মূল শিবিরটিকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি এ জায়গাটি জেমু গ্রাবরেখার মৃত অংশ। গতকাল সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদী পেরিয়ে যে উঁচু প্রায়-সমতল মালভূমির সদৃশ ভূখণ্ডে উঠে এসেছিলাম, এটি তারই পশ্চিমাংশ। শিবির ক্ষেত্রটি বেশ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। জুনিপার ও নানা ছোট ছোট গাছ রয়েছে প্রায় সর্বত্র। কিন্তু কোনো বড় গাছ নেই। আছে শেওলা গজানো বড় বড় পাথর। তা থাকগে, গ্রাবরেখায় পাথর থাকবেই। কিন্তু তাতে আমাদের তাঁবু টাঙাতে কোনো অসুবিধে হয় নি। পাশাপাশি সাতটি 'টু-মেন টেন্ট' টাঙানো হয়েছে। একটায় নেতা অমূল্য সেন একা, বাকী ছটায় আমরা বারোজন। যথারীতি অসিতবাবু আমার 'টেন্ট-মেট্'।

শিবিরক্ষেত্রটির উত্তরে সামান্য দূরে একটা বেশ উঁচু গিরিশিরা আর দক্ষিণ দিকটা নেমে গিয়েছে গ্রীনলেক থেকে আসা নদীর তীরে। নদী এখানে একটি নিতান্তই নাতিপ্রশস্ত নালা। এটি জেমু চু-য়ের উপনদী। তাই নাম জেমু নালা। পারাপার কোনো সমস্যাই নয়। পাথর থেকে পাথরে পা রেখে জুতো না ভিজিয়ে পার হওয়া যায়। নদীর এপারে তাঁবু ও পলিথিন খাটিয়ে মালবাহকরা বাসা বেঁধেছে আর ত্রিপলের ছাউনিতে কিচেন-কাম-স্টোর বানানো হয়েছে।

জেমুনালা পেরিয়ে দক্ষিণে খানিকটা এগিয়ে গেলেই জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ। তারপরেই সিনিয়লচু থেকে সিনিয়লচু হিমবাহ নেমে এসে জেমু হিমবাহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই সঙ্গম ছাড়িয়ে আমাদের পথ।

কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ভবিষ্যতের জন্যই জমা থাকুক। এখন বর্তমানের কথা ভাবা যাক। এখনও এখানে রোদের দেখা নেই। আজ দেখা পাওয়া যাবে কিনা, তাও বুঝতে পারছি না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও সিনিয়লচু আর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে শিখরে আমরা অবাক বিস্ময়ে রামধনুর খেলা দেখেছি। হিমালয়ের সূর্য বড়ই অস্থির ও চপলমতি। তার খেয়াল বোঝা ভার।

অথচ উচ্চ-হিমালয়ে সূর্যের আরেক নাম জীবন। তাঁর কৃপা ছাড়া কোনো পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না। দেব দিবাকর আমাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করবেন কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। তাহলেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। আশায় বুক বেঁধে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং রোদের প্রতীক্ষায় না থেকে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। বহু কাজ পড়ে রয়েছে।

মেট এসে সেলাম করে, "ম্যানেজার সাব্, আজ ক'জন কুলি ছেড়ে দেবেন?"

"লীডার সাব্ কি বললেন?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

মেট জবাব দেয়, "এখনও কোনো কথা হয় নি তাঁর সঙ্গে, তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন"।

তাকিয়ে দেখি; নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এক হাতে আয়না ধরে আরেক হাতে দাড়ি কাটছে অমূল্য। সহনেতা বীরেন সরকারও ওখানে রয়েছে। মেটকে নিয়ে নেতার কাছে আসি।

পরামর্শের পরে ঠিক হল মেট ও চেতাকে বাদ দিয়ে আমরা বিশজন পোর্টার স্থায়িভাবে মূল শিবিরে রাখব। তাদের মধ্যে চারজন দার্জিলিঙের হ্যাপ্ ও তিনজন টিবেটান হ্যাপ্। তার মানে আজ তেরজন পোর্টার এখানে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কাকে কাকে রাখা হবে, তা ঠিক করবে মেট।

এই অভিযান শুরু হবার পর থেকে বার বার '১৩' সংখ্যাটি কেন ফিরে ফিরে আসছে, বুঝতে পারছি না। ১৩ জন সদস্য কলকাতা থেকে রওনা হয়েছে, ১৩ই মে আমরা সিকিমের মাটিতে পদার্পণ করেছি, আজ আবার ১৩ জন মালবাহক মূল-শিবিরে রেখে বাকি মালবাহকদের ফিরে যেতে বলছি।

তারা ফিরে যাবে লাচেন। অভিযান শেষে খবর পাঠাবার পরে তাদের কয়েকজন আসবে এখানে। মালপত্রসহ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

এই যাওয়া ও আসার জন্য তাদের দেড়দিন করে তিনদিনের বাড়তি মজুরী দিতে হবে। তাতেও প্রায় দিন সাতেকের মজুরী ও খাবার বেঁচে যাবে। কারণ এখানে এখন আমাদের এত মালবাহকের প্রয়োজন নেই।

আমি আর অসিতবাবু মেটকে নিয়ে আমাদের তাঁবুতে এলাম। যে সব কুলি-কামিনদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম টুকে নিলাম। ওদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অগ্রিম দিয়ে দিতে হল। হিসেব করব লাচেন ফিরে গিয়ে, সেখানেই সব বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

অগ্রিম নিয়ে হাসিমুখেই বিদায় নেয় ওরা। হয়তো ঘরের টানে টাকার মায়া কাটিয়েছে কিন্তু আমরা হাসিমুখে বিদায় দিতে পারি না। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। গত চারদিন এর

সবাই সঙ্গে ছিল। আমাদের মাল বয়েছে, চা খাইয়েছে, পথ দেখিয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার আসবে এখানে, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু অধিকাংশই হয়তো আর কোনদিন আমার পথের সাথী হবে না।

তাই আমি দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। ওরা চলে যাচ্ছে সারি বেঁধে। কাছের থেকে দূরে, বহুদূরে। গতকাল আমরা যে পথ দিয়ে এখানে এসেছি, সেই পথ দিয়েই ওরা আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তাই নিয়ম, আসা আর যাওয়ার একই পথ।

একসময় ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি কিচেনে এসে ঢুকি। ব্রেকফাস্ট রেডি। রুটি অমলেট ও আলুর তরকারী।

খাবার দিতে দিতে মেট জিজ্ঞেস করে, "সাব্, যে তেরোজন পোর্টার এখানে রাখলেন, তারা কি করবে?"

বীরেন ও পর্বতারোহী অসিত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে অমূল্য বলে, "দুজন চলে যাক তেলেম্। দু বোঝা বাঁশ নিয়ে আসুক।"

"বাঁশ দিয়ে কি করবেন!"

"তুষারপাতে পথরেখা নিশ্চিহ্ন হলেও যাতে পথ ভুল না হয়, সেই জন্য মার্কিং ফ্লাগের বদলে বাঁশ ব্যবহার করব।"

"নিশান বানাবো।" বীরেন যোগ করে, "ভুলে ডিমার্কেশন ফ্ল্যাগগুলো নিয়ে আসা হয় নি।"

"কিন্তু তেলেম্ গেলে তো ওরা আজ ফিরে আসতে পারবে না, কাল ফিরবে।" মেট বলে।

"তাই আসবে।" অমূল্য মঞ্জুর করে, "তবে ওদের বলে দাও যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসে।"

মেট মাথা নাড়ে। তারপরে বলে, "বাকি এগারোজন পোর্টার আজ কি করবে সাব্?"

একটু ভেবে নিয়ে বলি, "তিনজনকে কাঠ আনতে নিচে পাঠাও, সারাদিনে অন্তত দু-বোঝা করে জ্বালানী আনতে হবে। আর বাকি আটজন অসিতের সঙ্গে মাল নিয়ে ওপরে যাবে।"

"ঠিক হ্যায় সাব্।" মেট সেলাম করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য কুলিদের কাছে চলে যায়।

বিনীত নেতাকে জিজ্ঞেস করে, "আজ তাহলে ক'টা 'লোড্' ওপরে যাবে?"

"পনেরো।"

"তার মানে সাতজন হ্যাপ্ ওপরে যাচ্ছে?"

"না।"অমূল্য বলে, "শেরিং-এর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে, তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। লাক্পা এখানে না থাকলে বীরেনের পক্ষে কিচেন ম্যানেজ করা মুশকিল।"

"তাহলে তো তেরোজন পোর্টার ওপরে যাচ্ছে। তেরোটা 'লোড্' ওপরে যাবে?"

"হ্যাঁ, তেরোজন পোর্টার তেরোটা লোড্ বইবে আর কেশব ও অসিত রুক্স্যাকে দু-লোড্ মাল নিয়ে যাবে।"

অসিত ও কেশব কোন মন্তব্য করে না, কেবল মৃদু হাসে।

সুশান্তবাবু বলেন, "তার মানে ওরাও দু-জন পোর্টার?"

"হ্যাঁ।" অমূল্য উত্তর দেয়, "আপনি শঙ্কুদা ডাক্তার চন্দন ও সাংবাদিক রমেনদা ছাড়া আমরা সবাই অভিযানের মালবাহক, কেবল দিনমজুরী পাবো না এই যা।"

বীরেন বলে, "আমি কিচেনে আছি। অসিত ও কেশব তোমরা তৈরি হয়ে নাও, সময় নষ্ট করো না। আধঘন্টার মধ্যে প্যাক্-লাঞ্চ দিয়ে দিচ্ছি। বিনীত ও হিমাদ্রি ওদের মালপত্র সব গুছিয়ে দাও। অরুণ ও শরদিন্দু তোমাদের সাহায্য করবে।"

অমূল্য বলে, "অসিত, তোমরা এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে সেখানে মাল রেখে আজ ফিরে আসবে। আগামীকাল আবার পনেরোটা 'লোড্' নিয়ে ওপরে যাবে এবং এক নম্বর প্রতিষ্ঠা করবে। পাঁচজন হ্যাপ্ ওপরে রেখে দেবে। তাদের নিয়ে পরশু তোমরা দু-নম্বর শিবিরের পথ তৈরি করবে আর পরশু বিনীত দশজন পোর্টার নিয়ে এক নম্বরে যাবে।" আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। কুলিদের সাহায্যে এবং অরুণ ও শরদিন্দুর সহযোগিতায় বিনীত ও হিমাদ্রি 'প্যাকিং লিস্ট' দেখে দেখে ওপরে পাঠাবার মাল বাছাই করতে লেগে গেল।

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞেস করে, "লীডার, প্রত্যেক ক্যাম্পের জন্য একটা করে মেডিকেল কিট্ লাগবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তাছাড়া থাকবে 'ফার্স্ট-এড' বক্স।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"সেটা ঠিক করাই আছে।" ডাক্তার বলে, "আমি মেডিক্যাল কিট্গুলো ঠিক করে ফেলেছি।" ডাক্তার তার কাজে লেগে যায়। অসিতবাবু সাহায্য করছে তাকে।

সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান ও আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না। আমি শুধু ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখছি আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। না-রোদ ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। সিনিয়লচু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত সবাই তেমনি মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে।

সিনিয়লচুর প্রায় সোজাসুজি পশ্চিমে অর্থাৎ আমাদের শিবিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাঞ্চনজঙ্ঘা। কিছুক্ষণ আগে আমি বিশ্বের এই তৃতীয় উচ্চতম শিখরের বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ দেখেছি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন সিনিয়লচুর গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার উচ্চতা সিনিয়লচুর চেয়ে সামান্যই বেশি। দু-য়ের মাঝে উচ্চতার ব্যবধান যে প্রায় ছ'হাজার ফুট, তা মনেই হয় না। আরও কাছে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার বড্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমরা যে পর্বতাভিযানে এসেছি। কর্তব্যের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই আমাদের।

বীরেনের ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। কিচেন থেকে বীরেন ডাকছে। তার মানে প্যাক্-ল্যাঞ্চ তৈরি।

কুলিরাও ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে। তারা নিজেরাই রান্না করেছে, আমরা রেশন দিয়েছি। দুজন কুলি বাঁশ আনতে নিচে চলে গিয়েছে। এখন তিনজন কাঠ আনতে যাচ্ছে। এরা তিনজনই মেয়ে, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী। মেট অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও ছোটদের ছেড়ে দিয়েছে, দশজন স্বাস্থ্যবান যুবক ও এই তিনটি যুবতীকে এখানে রেখেছে। ওদের নাম থাসা, নাজে ও আথি।

কাঁধে দড়ি নিয়ে নাচতে নাচতে নিচে যাচ্ছে ওরা। যেন তিনটি বনহরিণী ছুটে চলেছে।

অসিতবাবু সহসা বলে ওঠে, "না, সাঙবার সিলেক্শান ভাল বলতে হবে। কাজের মানুষগুলোকে রেখে দিয়েছে।"

"অসিতদা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না।" অসিত গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে।

"কি বলতে চাচ্ছিস তুই?" অসিতবাবুর কণ্ঠে কৃত্রিম ক্রোধ।

অসিত আবার বলে, "যে মেয়েটাকে অসিতদা সারা পথে লজেন্স খাইয়েছে, সেটাকে রাখা হয়েছে—তাই না?"

"আমি রেখেছি?"

"কি জানি? মেটকে কি বলেছো তা তুমিই জানো।"

"অসিত ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

অসিত মোটেই ভয় পায় না। সে আবার বলে, "সুশান্তদা, আমি আজ সারাদিন এখানে থাকব না আর কাল তো ওপরেই চলে যাচ্ছি, আপনারা একটু অসিতদার দিকে নজর রাখবেন।"

"তবে রে!" অসিতবাবু অসিতের দিকে এগিয়ে যায়, অসিত ছুটে কিচেনের ভেতরে গিয়ে ঢোকে। আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

প্যাক্-লাঞ্চ নিয়ে নিল ওরা—অসিত, কেশব, সাঙ্গে ও নওয়াঙ এবং তিনজন টিবেটান হ্যাপ্। ওদের নাম থামডং, নোরগে ও থাণ্ডুপ। তিনজনই কষ্টসহিষ্ণু যুবক। গত বছরের সিনিয়লচু অভিযানে মালবাহকের কাজ করেছে। দু-নম্বর শিবির পর্যন্ত পথ ওদের জানা আছে। শেরপা পাই নি, ওরাই এখন আমাদের প্রধান ভরসা।

এবারে ওদের বিদায় দেবার পালা। জানি এ বিদায় নিতান্তই সাময়িক। ওরা আজই ফিরে আসবে। তাহলেও উৎকণ্ঠার কবল থেকে মুক্তি পাই না। যেখানে প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুর হাতছানি, ওরা সেই জগতে চলেছে। তার ওপর আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে-কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হতে পারে। উঠতে পারে তুষারঝড়।

তবু দিতে হবে বিদায়। দুর্গম থেকে দুস্তরের পথে ওদের যেতে হবে এগিয়ে। এই এগিয়ে যাবার নামই পর্বতারোহণ। আমরা পর্বতাভিযানে এসেছি।

অসিত প্রণাম করে আমাকে। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি। একে একে সবাইকে আলিঙ্গন করি। ওরা এগিয়ে চলে। সুশান্তবাবু ছবি তোলেন।

অভিযানের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। প্রথম পর্যায়ে গাড়িতে করে লাচেন এসেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পায়ে হেঁটে মূল শিবিরে পৌঁচেছি। আর এই তৃতীয় পর্যায়ে পর্বতারোহীরা সিনিয়লচুর গায়ে এক নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

আমরা ওদের এগিয়ে দিই। অসিত আর কেশবের পেছনে পেরিয়ে আসি জেমু নালা। তারপরে জেমু হিমবাহের জীবন্ত অংশ—পাথর আর বরফের ঢেউ, একটির পরে একটি ঢেউ। আস্তে আস্তে নিচু হয়ে অনেক নিচে সিনিয়লচু হিমবাহে মিশেছে। যেমন বিপজ্জনক, তেমনি কষ্টকর পথ। সেই পথ পেরিয়ে ওদের পথ—সিনিয়লচু শিখরের ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ।

অসিতবাবু ছবি নেয়। আবার করমর্দন আর আলিঙ্গন। তারপরে ওরা যায় এগিয়ে, আমরা থাকি দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখি। একসময় হিমবাহের ঢেউয়ের মাঝে ওরা যায় হারিয়ে। আমরা ফিরে চলি শিবিরে।

ন'টা বেজে গিয়েছে। বেলা বাড়ছে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। দেখব কেমন করে? আকাশ যে তেমনি মেঘে ঢাকা। সিনিয়লচু সেই যে সকালে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে, আর তাকে দেখতে পাই নি।

এ অদর্শনের জন্য অবশ্য আপসোস করার কিছু নেই। সকালে তার যে অনিন্দ্যসুন্দর অপার্থিব রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, তা আমৃত্যু আমার মনের মুকুরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাছাড়া সকালের সেই দেখা তো শেষ দেখা নয়। আমি যে বেশ কয়েকদিন সিনিয়লচুর পদতলে প্রতীক্ষা করব। তার সঙ্গে আরও বহুবার দেখা হবে আমার। তাকে দেখার জন্যই তো আমার এই অভিযানে আসা। আমি তাকে দেখব দুপুরের উজ্জ্বল আলোয়, বিকেলে আর গোধূলি বেলায়। দেখব রাতের আঁধারে আর চাঁদের আলোয়।

বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা। একে রোদ নেই, তার ওপরে হিমেল হাওয়া। তাঁবুতে আসি আমি একা। অসিতবাবু ডাক্তারের তাঁবুতে—মেডিক্যাল কিট্ প্যাক্ করছে। এখন আমার কোন কাজ নেই। অযথা কষ্ট কবি কেন? তার চেয়ে বরং একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক। আমি স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ি।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি—সিনিয়লচুর ভাবনা। তার কথা ছাড়া এখন যে আর কারও কথা মনে আসছে না আমার। আমি ভেবে চলি—

প্রথমেই মনে পড়ছে ক্লড হোয়াইট-এর কথা, আজকের কথা নয়। ১৮৯০ সালে সিনিয়লচুর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হোয়াইট সাহেব যে কথা বলেছিলেন, আজও তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হোয়াইট বলেছেন—"Siniolchu was flooded with the rosy light from the rising sun and no mere photograph can give any idea of the beauty of the scene.

সেই বর্ণনাতীত বিস্ময়কর সৌন্দর্য আজ আমিও দর্শন করেছি। এবং একথা শুনেই পর্বতারোহীরা এই সুন্দরের অভিসারে আসা আরম্ভ করেছেন। তাঁরা সিনিয়লচুকে দেখেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন কিন্তু তার শিখরে আরোহণ করার কথা কল্পনাও করেন নি। ফ্রাঙ্ক স্মাইথের মতো পর্বতারোহী পর্যন্ত সিনিয়লচু শিখরকে বলেছেন—'inaccessible' আর শিখরশিরাকে বলেছেন—'Scimitar' বা বাঁকা তলোয়ার।

কিন্তু মানুষ জগতের সবচেয়ে সাহসী, শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান প্রাণী। পূর্বগামীদের সতর্কবাণী কোনকালে পরবর্তীদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। সকল উপদেশ উপেক্ষা

করে দুঃসাহসীরা এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা ভয়কে জয় করে, কষ্টকে উপেক্ষা করে, অসাধ্য সাধন করেছেন।

সেই দুঃসাহসীদের দলনায়ক প্রখ্যাত জার্মান পর্বতারোহী পল বএর। বএর ১৯২৯ ও ১৯৩১ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে এসে ব্যর্থ হন। পাঁচ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের অগাস্ট মাসে তিনি আবার এই জেমু হিমবাহে আসেন।

সেবারে তিনি ঠিক কোন পর্বতারোহণের পরিকল্পনা করে আসেন নি। এসেছিলেন তিনজন জার্মান যুবককে পর্বতারোহণ শিক্ষা দিতে। তাঁদেরনাম—কার্ল উইয়েন (Karl Wien), এডলফ্ গুটনার (Adolf Gottner) এবং জি. হেপ্ (G. Hepp)। তাঁদের মধ্যে তুলনায় উইয়েন ছিলেন অভিজ্ঞ। কারণ তিনি একত্রিশ সালের কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের সদস্য ছিলেন।

তাঁরা সেবারে ৬ই অগস্ট (১৯৩৬) কলকাতায় পৌঁছন এবং ১০ই অগস্ট গ্যাংটক রওনা হন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অভিযাত্রীরা গ্যাংটক থেকে লাচেন আসেন। লাচেন তখন প্রায় জনশূন্য। গ্রামবাসীরা যথারীতি গ্রীষ্মকালীন চাষাবাদের জন্য থাঙ্গু চলে গিয়েছেন। তাই কুলি যোগাড়ের জন্য অভিযাত্রীদের দিনদুয়েক লাচেনে কাটাতে হল।

লাচেন থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয় দিনে তাঁরা মূল শিবিরে পৌঁছলেন। আমাদেরই মতো কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁদের দেখা আর আর আমাদের দেখা এক নয়। দুবার অভিযান করেও বএর কাঞ্চঝঙ্ঘার স্বপ্ন-শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি, অভিযানকালে তাঁর প্রিয় সহযাত্রীরা শহীদ হয়েছেন। সুতরাং এই শিবির থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার পরে তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল, তা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। হিমালয় আমাদের, কিন্তু ওঁদের মতো করে মনে-প্রাণে আমরা হিমালয়কে আজও ভালোবাসতে পারি নি।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—সেদিন মূল শিবির থেকে বএর ও তাঁর সহযাত্রীরা শুধু কাঞ্চজঙ্ঘা দেখেন নি, দেখেছেন সিনিয়লচু। সেই দেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে উইয়েন লিখেছেন—

"We know no mountain that can equal Siniolchu in beauty and boldness of feature. Its ridges are as sharp as a knife-edge, its flanks, though incredibly steep, are mostly covered with ice and snow, furrowed with ice-flutings so typical of the Himalaya. The crest of the cornice-crowned summit stands up like a throne ...."

এবারে ওঁদের অভিযানের কথায় আসা যাক। মূল শিবির প্রতিষ্ঠার পরে পর্বতারোহীরা সিনিয়লচুর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জেমু হিমবাহের বিস্তৃত অংশ সমীক্ষা করেন। এই সময় তাঁরা এ অঞ্চলের যে মানচিত্র (Toposheet) অঙ্কন করেছেন, তা আজও মূল্যবান রূপে সমাদৃত।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অভিযাত্রীরা ২৩,৩৬০ ফুট উঁচু টুইন্‌স শৃঙ্গের পূর্ব শিখর (Eastern of the Twins) আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তারপরে তাঁর

হিমালয়কে ভালোবেসেই তাঁরা দলে দলে হিমালয়ের পথে পথে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। প্রচারের লোভ কিংবা কোনো স্বার্থসিদ্ধির মোহ তাঁদের ছিল না। সুতরাং কোনো শৃঙ্গে আরোহণ না করে, মিথ্যে সাফল্যের কথা প্রচার করার মতো মানসিকতা তাঁদের না থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই জার্মান অভিযাত্রীদের—যাঁরা সেই অভিযানের মাত্র ন'মাস বাদে পর্বতারোহণের প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সোনাম ওয়াঙ্গিলের নেতৃত্বে সিনিয়লচু শিখরে প্রথম ভারতীয় আরোহণ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বপূর্ণ। এবং এ যুগে আমরা যেভাবে পর্বতারোহণ করে থাকি, তাতে জার্মানদের সেই অভূতপূর্ব আরোহণকে বিস্ময়কর বলে মনে হতেই পারে। তাহলেও সেকালের আরোহণ সম্পর্কে একালে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ তাহলে তো আরেক জার্মান অভিযাত্রী হার্মন বুহ্‌ল-য়ের (Herman Buhl) একাকী নাঙ্গাপর্বত আরোহণকেও অবাস্তব বলতে হয়।

আজ তাই সিনিয়লচুর সামনে দাঁড়িয়ে আমি সেকালের সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের উদ্দেশে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

আর সেই সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের অন্তিম অভিযানের অবিস্মরণীয় কাহিনী—

উইয়েন, গুট্‌নার এবং হেপ্‌ দেশে ফিরে মাত্র মাস সাতেক ঘরে ছিলেন। তারপরেই তাঁরা হিমালয়ের হাতছানিতে আবার ঘর ছেড়েছেন। অনিবার্য কারণে সেবারে বএর সঙ্গী হতে পারেন নি। কিন্তু আরও ছ'জন জার্মান অভিযাত্রী তাঁদের সঙ্গে এলেন। তাঁরা হলেন—হ্যান্‌স হার্টমা, পি. ফ্রাঙ্কহাউসার, এম্‌. ফেফার, উল্‌রিচ্‌ লুফ্‌ত, মুল্‌রিটার এবং ট্রল্‌। গিলগিট স্কাউটস-এর ডি.এম.বি. স্মার্ট পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সেবার তাঁরা আর সিকিমে আসেন নি, এসেছিলেন কাশ্মীরে—বিশ্বের অন্যতম নিষ্ঠুর পর্বতশৃঙ্গ নাঙ্গাপর্বতে। ২৬,৬২০ ফুট উঁচু এই শিখরটি বহু তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের ৩রা জুলাই আরেক জার্মান পর্বতারোহী হার্মান বুহ্‌লের কাছে প্রথম পরাজয় বরণ করেছে।

কিন্তু ১৯৫৩ সালের রূপকথা নয়, আমি স্মরণ করছি ১৯৩৭ সালের সেই অমর কাহিনী। কার্ল উইয়েন এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তিনি তাঁর দল নিয়ে নাঙ্গাপর্বতে এলেন।

৭ই জুন (১৯৩৭) তাঁরা ২০,২৪০ ফুট উঁচুতে চার নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করলেন। বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বরফ খুঁড়ে একটা খাদের ভেতরে তাঁবু টাঙ্গানো হল। ১১ই জুন থেকে শিখরাভিযাত্রীরা সেখানে বাস করতে শুরু করলেন।

তারপরে তিন দিন ধরে প্রবল তুষারপাত হল। সুতরাং তাঁরা স্থান নির্বাচন করেও পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করতে পারলেন না। তুষারপাতের মধ্যেই ১৪ই জুন সকালে স্মার্ট কুলিদের নিয়ে মূল শিবিরে নেমে এলেন। চার নম্বর শিবিরে রয়ে গেলেন—উইয়েন, হেপ্‌, গুট্‌নার, হার্টমান, ফ্রাঙ্কহাউসার, ফেফার ও মূল্‌রিটার এবং নজন শেরপা। তাঁরা রয়ে গেলেন চিরকালের মতো। কিন্তু সেদিন স্মার্ট সেকথা ভাবতেও পারেন নি। তাঁর

আশা ছিল শিখরাভিযাত্রীরা দিন তিনেকের মধ্যে পাঁচ ও ছ নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

কিন্তু মানুষ আশা করে, ভগবান বাদ সাধেন। না, ভগবান নয় নিষ্ঠুর নাঙ্গাপর্বত। ১৮ই জুন লুফ্‌ত শিখরাভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ নিয়ে কয়েকজন কুলিসহ চার নম্বর শিবিরে উপস্থিত হলেন। এসেই আঁতকে উঠলেন। সেখান যে কেউ নেই, কিছু নেই শুধু রয়ে গিয়েছে অতিকায় তুষারধস নেমে আসার চিহ্ন। তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁর বন্ধুরা, সহযাত্রী! লুফ্‌ত পাগলের মতো চিৎকার করে তাঁদের নাম ধরে ডাকতে থাকলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। শুধু লুফ্‌তের আকুল আহ্বান নাঙ্গাপর্বতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

একটু প্রকৃতিস্থ হবার পরে লুফ্‌ত মালবাহকদের নিয়ে সেই তুষারধসের ভেতরে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। বহু চেষ্টার পরে তিনটি রুক্‌স্যাক্ পেলেন। বুঝতে পারলেন তিন-চারদিন আগে নাঙ্গা থেকে নেমে আসা তুষারধস তাঁর সাত সঙ্গী ও নয় শেরপার তুষার-সমাধি রচনা করেছে।

লুফ্‌ত বুঝতে পারলেন, যন্ত্রপাতি ছাড়া সেই বিরাট ধসের তলা থেকে সহ-যাত্রীদের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মালবাহকদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন মূল শিবিরে।

চারিদিকে দুঃসংবাদ দেওয়া হল। খবর পৌঁছল জার্মানীতে। পল বএর দুজন পর্বতারোহীকে নিয়ে বিমানযোগে এসে পৌঁছলেন কাশ্মীরে। গিলগিট স্কাউটরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের সাহায্যে।

১৫ই জুলাই অর্থাৎ একমাস বাদে তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন তখনও সেখানে সেই অভিশপ্ত তুষারধসের চিহ্ন বর্তমান। ধসটা যে জায়গা অধিকার করে রয়েছে, তার দৈর্ঘ্য ১৩০০ ফুট ও প্রস্থ ৫০০ ফুট।

তখন বর্ষাকাল, আবহাওয়া খুবই খারাপ। তারই মধ্যে বএর অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিলেন। চারদিন বরফ খোঁড়ার পরে শিবিরের প্রথম নিদর্শন পেলেন—একখানি আইস এক্‌স। তারপরে আরও দুদিন প্রাণপাত পরিশ্রমের পরে তাঁবু খুঁজে পেলেন। প্রথম তাঁবুতেই ন'জন শেরপার মৃতদেহ পাওয়া গেল। শেরপা সর্দার নুরসাঙ তাঁদের শেষকৃত্য সম্পাদন করে সেখানেই আবার সমাধিস্থ করলেন।

সদস্যদের তিনটি তাঁবুর মধ্যে দুটি খুঁজে পাওয়া গেল। প্রথম তাঁবুতে হার্টমান, ফেফার ও হেপ্ আর দ্বিতীয় তাঁবুতে ফ্রাঙ্কহাউসার ও কার্ল উইয়েন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন।

আবার অনুসন্ধান চলল, কিন্তু সবই বৃথা হল। চারিদিকে দশ ফুট গভীর পরিখা খনন করেও তৃতীয় তাঁবুর হদিস মিলল না। পাওয়া গেল না মূল্‌রিটার এবং সিনিয়লচু বিজয়ী এডল্‌ফ গুট্‌নারকে।

পাওয়া গেল ডায়েরী ও ঘড়িসহ অভিযাত্রীদের কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। দেখা গেল তাঁরা ১৪ই জুন বিকেল পর্যন্ত ডায়েরী লিখেছেন এবং ঘড়িগুলো বারোটা বেজে কয়েক

মিনিট বাদে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মানে স্মার্ট যেদিন চার নম্বর শিবির থেকে নিচে নেমে যান, সেদিনই (১৪ই জুন) রাত বারোটার পরে নাঙ্গাপর্বত থেকে সেই মরণধস নেমে এসেছে, মরণজয়ী অভিযাত্রীদের সঙ্গে হিমালয়ের চিরমিলন ঘটেছে।

নিষ্ঠুর নাঙ্গাপর্বত আমার সিনিয়লচু বিজয়ী প্রিয় পর্বতারোহীদের প্রাণ হরণ করেছে। আজ সিনিয়লচুর পাদদেশে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীরদের অমর প্রাণের উদ্দেশ্যে জানাই আমার শতসহস্র প্রণাম।

পরদিন। আজ সকালেও সিনিয়লচুর সঙ্গে দেখা হল আমার। আমি তাকে দেখি, দু'চোখ ভরে দেখি আর দেখি। এ দেখার যে শেষ বলে কিছু নেই। হিমালয় সুন্দর, সিনিয়লচু আরো সুন্দর। সুন্দর কি কখনো পুরনো হয়? আর তাই বোধহয় সুন্দরের অভিসার সার্থক হলেও হৃদয় অপূর্ণ থেকে যায়।

আজ কিন্তু নিজের থেকে ঘুম ভাঙ্গে নি। ঘুম ভাঙ্গিয়েছে সাঙবা। সে বেড-টি নিয়ে এসে বলেছে—গুড্ মোর্নিং সাব্!

স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসেছি। উঠে বসেছে অসিতবাবু। আমরা গরম চা-য়ের মগ হাতে নিয়েছি। ঘড়ি দেখেছি—তখন সকাল ছ'টা। জিজ্ঞেস করেছি—বরফ পড়ছে নাকি?

—না সাব্! মেট বলেছে—আকাশ সাফ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদেই রোদ আসবে এখানে।

—সত্যি! আমরা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছি।

— হ্যাঁ সাব্। বাইরে আসুন না, এসে দেখুন না, পাহাড়গুলো কেমন বড়িয়া দেখাচ্ছে।

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি উইণ্ড্-প্রুফটা গায়ে দিয়ে পা-দু'খানা জুতোর মধ্যে কোনো রকমে গলিয়ে বেরিয়ে এসেছি বাইরে। আর এসেই দেখা হয়েছে সিনিয়লচুর সঙ্গে। দেখা হয়েছে তার সহযোগী লিট্‌ল-সিনিয়লচু, প্রতিবেশী পিরামিড ও টেন্ট্ পিক্-এর সঙ্গে। দেখা হয়েছে সিকিমের ইষ্টদেবতা কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে। টেন্ট্ (২৪,০৮৯) ও পিরামিড (২৩,৪০০) আমাদের উত্তর-পশ্চিমে আর কাঞ্চনজঙ্ঘা সোজা পশ্চিমে। তাদের সবার শিরে সোনালী সূর্যের সম্পাত—তারা তেমনি সোনার খনিতে পরিণত।

শুধু আমি আর অসিতবাবু নই, আমরা সবাই বেরিয়ে এসেছি বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর দেখছি। এ দেখার শেষ নেই।

কেবল কাঞ্চনজঙ্ঘা কিংবা সিনিয়লচু নয়, চারিদিকেই দেখি। আমাদের শিবির, এই হিমবাহ আর ঐ সোনালী পর্বতমালা। গতকাল রাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে গিয়েছিল। তাই তাঁবুর কোণে কোণে আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মুক্তোর মতো বরফ জমে আছে। ভারী ভাল লাগছে দেখতে।

মনে পড়ছে সত্তর বছর আগে লেখা কয়েকটি কথা। এমনি এক মে মাসের সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের মূল শিবির থেকে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ দেখেছিলেন সিনিয়লচুকে। এই

স্বর্গীয় শৃঙ্গকে তাঁর মনে হয়েছিল অশরীরী পরী বলে। স্মাইথের ভাষায়—'fairy like ethereal.'

সিনিয়লচু শৃঙ্গে আরোহণ সম্পর্কে স্মাইথের তখন মনে হয়েছে—'mountain has been called the "Embodiment of Inaccessibility", yet who would think of Siniolchu in terms of accessibility or inaccessibility? It is too beautiful to be defined by man.'

স্মাইথ যা পারেন নি, আমি তা পারব কেমন করে? আমি শুধু বলতে পারি—সিনিয়লচুর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

ফ্রাঙ্ক স্মাইথ বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী। কিন্তু সিনিয়লচুকে দেখে তাঁর মনে পর্বতারোহণের বাসনা হয় নি। তিনি এই গিরিশৃঙ্গের অপরূপ রূপ দর্শন করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

আমি পর্বতারোহী নই, কেবল পর্বতারোহীদের সঙ্গে এখানে এসেছি। তারা এসেছে সিনিয়লচুর শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করতে। সিনিয়লচু অতিশয় দুর্গম শিখর। স্মাইথের ভাষায়—'Embodiment of Inaccessibility', তার ওপরে আমরা শেরপা পাই নি এবং আবহাওয়াও সুবিধের নয়। অতএব আমার পর্বতারোহী বন্ধুদের স্বপ্ন সফল হবে কিনা তা কেবল সিনিয়লচু জানে। আমি শুধু বলতে পারি—আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আমি সিনিয়লচুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি আর দেখছি। স্মাইথের মতো আমিও আমার সর্বসত্তা দিয়ে অনুভব করছি সিনিয়লচু সুন্দর, তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।

তাই অসিতবাবু ও সুশান্তবাবুকে বলি—ছবি নিন। যাঁরা আজ আমার পাশে নেই, তাঁদের জন্য আমি এই অনিন্দ্যসুন্দরকে নিয়ে যেতে চাই, আমি তার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে মর্ত্যলোকে অক্ষয় করে রাখতে চাই। স্মাইথও তাই চেয়েছেন। তিনি তাঁর 'The mountain Scene' বইতে লিখেছেন, 'Years afterwards when memories are failing, a photograph will recapture much that has long been forgotten. And it will do more than this; it will extend the scope of memory far beyond one particular scene and set in motion a whole train of thoughts, just as a smell may resurrect some childhood scene.....'

ওঁরা ছবি নিচ্ছেন। কয়েকদিন পরে অভিযান শেষ হবে। আমরা এই অভিযানের অভিজ্ঞতা মন ভরে নিয়ে ঘরে ফিরব। আস্তে আস্তে এই দৃশ্য আমাদের মনের ক্যানভাসে ফিকে হয়ে যাবে। তখন এর এক-একখানি ছবি আজকের এই দিনটিকে, এই অভিযানের সুখস্মৃতিকে আমার মনের পর্দায় নূতন করে জীবন্ত করে তুলবে। *

তমসা উপত্যকায়

শম্ভুনাথ দাস

১লা অক্টোবর, আমরা ছেড়ে চলেছি ওস্‌লা। ছেড়ে যাচ্ছি এ পথের শেষ গ্রাম। এগিয়ে চলেছি স্বর্গারোহিণীর দিকে, তার দক্ষিণ পার্শ্বে। সেখান থেকেই শুরু হবে অভিযানের চূড়ান্ত পর্ব। এ অঞ্চলে প্রবল জনশ্রুতি যে, এই স্বর্গারোহিণী শিখরেই পাণ্ডবেরা আরোহণ করেছিল এবং একমাত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গাভিমুখে যেতে সক্ষম হন। শিখরটির ডানদিকেই রয়েছে যমদ্বার-হিমবাহ। গিবসন সাহেব তাঁর ১৯৫২ সনের স্বর্গারোহিণী অভিযান কালে যমদ্বার-হিমবাহের ওপর প্রায় ১৭৫০০ ফুট পর্যন্ত কুকুরের পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। স্থানীয় লোকের ধারণা এই পদচিহ্ন পাণ্ডব-সহযাত্রী সেই কুকুরটির। যমদ্বার হিমবাহ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মধ্যে বিচিত্র ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। গিব্‌সন সাহেবও যমদ্বার হিমবাহের ওপর একদিন রাত্রে অনুভব করেন, কে যেন তাঁবু নাড়াচ্ছে। বাতাসের বেগ এমন তীব্র নয় যাতে তাঁবু নড়তে পারে। তারপর মাঝরাতে হঠাৎ দেখা গেল, মাঝে মাঝে পাথরের টুকরো তাঁবুর ওপর এসে পড়ছে। শিবির এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে যেখানে পাথর গড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যমদ্বার হিমবাহ অতন্দ্র প্রহরীর মত স্বর্গের প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস অনধিকার প্রবেশকারীদের ভয় দেখাবার জনাই নাকি যমরাজের এই সব কীর্তিকলাপ। যাই হোক আপাততঃ আমরা যমদ্বারের দিকে যাচ্ছি না, চলেছি স্বর্গারোহিণী অভিমুখে, শিখরটির বাঁদিক দিয়ে অর্থাৎ পেছনের দরজা দিয়ে স্বর্গারোহিণী শিখরাবলীর অন্যতম অপরাজিত শিখরটিতে (২০৩৭০) আরোহণের প্রচেষ্টা চালাতে, যার স্থানীয় নাম থারিডানকার।

আমাদের স্বর্গারোহণ সম্ভব হবে কি না জানি না তবে দুর্যোধনের দেশের মধ্য দিয়ে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ কল্পনা খুবই অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পরাজিত কৌরব-পক্ষীয়দের আস্থা অর্জনের জন্য পাণ্ডবেরা এই অঞ্চলে এসেছিল। লোককথায় তাই এলাকাটি পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এই দেশের প্রান্তে এক দুর্গম শিখর স্বর্গারোহিণী নামে সবিশেষ পরিচিতি লাভ করে। দুরধিগম্যতাই স্বর্গারোহণের গোপন ঠিকানা, দূরদর্শিতার দুর্জ্ঞেয় রহস্য। স্বর্গ যেন স্বপ্নময় মায়া জগতের এক তমিস্র ভাবনা। মহাভারতের স্বর্গ যেখানেই থাকুক না কেন, মর্তের মৃত্তিকায় এই তমসার তীরে তীরে মহাভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অনেক রীতি রেওয়াজ আজও মূর্ত হয়ে আছে। এই তমসার তটে শুধুমাত্র দুর্যোধনকে নয়, দেখেছি সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী প্রভৃতির উত্তর সাধক-সাধিকাদের। তমসার তরঙ্গে কান পেতে শুনেছি অতীত মূক ইতিহাসের মুখর কাহিনী। মনে হয়েছে সব যেন কোন সুদূরের শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থপূর্ণ অবশেষ।

জৌনসার আর রাওয়াই, নিম্ন আর উচ্চ তমসা উপত্যকার মেয়েরা আজও দ্রৌপদীর মত বহুপতি নিয়ে সুখে ঘর সংসার করে থাকে। বড়ভাই বিয়ে করে নিয়ে এলেও অন্য

ভাইয়েরা সমভাবেই স্বামীত্বের অধিকার পায়। বয়সের তারতম্য খুব বেশী হলে ছোট ভাইয়ের জন্য বড় ভাই আবার বিয়ে করতে পারে। সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর ওপর সবাই সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়া পত্নী হয় পূর্বতন স্ত্রীর ছোট বোন। এতে পারিবারিক শান্তি রজায় থাকে। এই রীতির ফলে স্ত্রীর শুধু বহুপতি নয়, পুরুষদেরও একাধিক স্ত্রী বর্তমান। তবে কোন একজনের বিশেষ কোন একক পত্নী থাকে না।

কিন্নর, লাদাখ, তিব্বত প্রভৃতি প্রত্যন্তেও এই ধরনের দ্রৌপদী-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত। হিমালয়ের বহুপতিত্ব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক। উচ্চ কন্যাপণ দিয়ে ছেলেদেরকে তাদের জীবন-সাথী সংগ্রহ করতে হয়। বিবাহের অনুষ্ঠান অবশ্য সাদাসিধে। কন্যাপক্ষ মূল্যগ্রহণ করলে সব সমস্যার সমাধান। বিয়ের পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। সেখানে সে ঘরসংসার পাতে। তার প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার পুরুষদের চেয়ে বেশী। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতে কেরালার মালাবার অঞ্চলে অধুনা বিলুপ্ত বহুপতিত্ব ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বিবাহের পর কন্যা আপন পিতৃগৃহেই বসবাস করতো। স্বামী এবং তার ভাইয়েরা পালাক্রমে শ্বশুরবাড়ীতে মাত্র কয়েক রাত্রি যাপন করার সুযোগ পেত। সেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার মেয়েদের দিক থেকে বর্তায়। আর হিমালয়ে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ পিতা থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আগে মেয়েরা সম্পত্তির এক অংশ পেত যা 'সৌতিয়া বাট' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আমলে এইসব প্রাচীন প্রথা রদ করে একমাত্র পুত্রদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়। পূর্বপ্রথার জের টেনে জ্যেষ্ঠপুত্র একটা অংশ বেশী পেয়ে থাকে, যাকে 'জেঠালী' ভাগ বলা হয়। এক সময় বহুপতিত্ব বিবাহ-ব্যবস্থা ভূসম্পত্তির বিভাজন বন্ধ করে; যৌথ পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক জীবনকে সুসংহত করতে যথেষ্ট সহায়ক ছিল। বর্তমানে নানা রকমভেদে সেই সমাজে বহু জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এরাও একপতি, এক প্রাণ, একতার দিকেই ঝুঁকছে।

তমসা উপত্যকার বিবাহিতা নারীদের দুই রূপ। স্বামীগৃহে থাকাকালীন এরা রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রতিরূপা 'র‍্যন্তী'। সামাজিক বিধি-অনুযায়ী তখন তাদের মেলামেশার সুযোগ সীমিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এদের দম ফেলার অবকাশ নেই, নানারকম এবং রীতিমত কঠোর পরিশ্রমের কাজ যথা দূর থেকে জল আনা, কাঠ সংগ্রহ, ক্ষেতের কাজে সহায়তা, গৃহপালিত জীবজন্তুর তদারকি করা ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে সন্তান প্রতিপালন, রান্নাবান্না, স্বামীদের পরিচর্যা প্রভৃতি দায়দায়িত্ব। পূজাপার্বণ উপলক্ষে এরা মাতৃগৃহে যাওয়া বেশী পছন্দ করে। উৎসবের আনন্দ সেখানে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা সহজ। কোন বিশেষ কাজকর্মের বোঝা সেখানে বহন করতে হয় না, মেলামেশার অবাধ সুযোগ। মনে পড়ে যায় পুরোনো সেই দিনের কথা, আবার যদি দেখা হয়ে যায় তবে পূর্ব অনুরাগীর প্রাণের মাঝে তখন সে তার ধ্যানের 'ধ্যন্তী'। বাপের বাড়ীর লোকজনেরা এই ধরনের অবাধ মেলামেশাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

হিমালয় অধিবাসীদের আতিথ্যের তুলনা নেই। সর্বপ্রকারে অতিথি নারায়ণের সেবা এবং তাকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা এরা সচেতন ভাবে করে; এমন কি নির্বিচারে আপন কন্যাকে

অতিথি সেবায় নিযুক্ত করতেও তারা দ্বিধা করত না। তমসার অন্যতম উপনদী সুপিনের উপশাখা ওরবা গাড প্রসঙ্গে সহযাত্রীর সেই কাহিনীটির মধ্যেই এই ধরনের প্রাচীন সামাজিক রীতির এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গল্পটি মহাভারতের, ভীষ্ম কর্তৃক কথিত। কৌরবকূলের দুর্যোধন ছাড়া আর এক দুর্যোধনের পৌত্র সুদর্শন ও তার পত্নী ওঘবতীর সঙ্গে প্রসঙ্গটি জড়িত। এ দুর্যোধন ইক্ষাকু বংশীয় এক ধর্মাত্মা রাজা। দেবনদী নর্মদার গর্ভে তার এক পরমা রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, নাম রাখা হয় সুদর্শনা। কন্যা শুল্ক নিয়ে দুর্যোধন সুদর্শনাকে অগ্নিদেবের হাতে সমর্পণ করেন। সুদর্শনার পুত্র সুদর্শন আর তার বিবাহ হয় নৃগ-রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতীর সঙ্গে। পত্নীর সঙ্গে সুদর্শন কুরুক্ষেত্রের কাছে বাস করতে থাকেন। সাধ্বী পত্নীর প্রতি তার নির্দেশ ছিল 'আমি গৃহে থাকি বা না-থাকি তুমি কখনও অতিথি সেবায় অবহেলা করবে না।'

একদিন সুদর্শন কাঠ-সংগ্রহের জন্য বনে গিয়েছেন, ঘরে ওঘবতী একা। ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম গৃহে প্রবেশ করে অতিথি সৎকারের যোগ্য দাবী জানায়। আসন, পাদ্য, আহারে তিনি তুষ্ট হন। শেষে সলজ্জভাবেই ওঘবতী অতিথির শেষ ইচ্ছা পূরণ করে। সুদর্শন ফিরে এসে পত্নীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। ওঘবতী তখন ব্রাহ্মণের বাহুপাশে আবদ্ধা। পতিব্রতা পত্নীর এ ঘটনায় সুদর্শন বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওঘবতী অতিথি সৎকার ব্রত পালন করেছে বলেই তিনি সাতিশয় গর্ববোধ করেন। এই ওঘবতীর নামেই ওঘবতী নদী, যার তীরে আটান্ন দিন শরশয্যায় শায়িত থেকে দেবব্রত ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

পুরোলা থাকাকালে সেখানকার এস. ডি. এম কদম্‌জী এ অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের অবাধ যৌন জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনান। বিশেষ করে স্বামী ছাড়া মেয়েদের অন্য পুরুষ রাখা, এবং তা থেকে উৎপাদিত সন্তানেরা বৈধ সন্তানরূপে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথাগুলো তার কাছে খুবই অভিনব বলে মনে হয়েছে। তার ধারণা এগুলি একমাত্র তমসা-উপত্যকার বিশেষ রীতি, এসব প্রথার সমর্থনে তিনি কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। আলোচনার সময় তাই তিনি এইসব 'জঘন্য', 'ঘৃণ্য' রীতিনীতির খুব নিন্দা করেন।

কথাগুলো সঠিক। সত্যিই তমসাসহ কুমাউঁ-গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে সন্তান লাভের আশায় এই ধরনের প্রথা নানাভাবে আজও টিকে আছে। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয়, 'ঠেকা' নেওয়া। পশুচারণ ও কৃষিকার্যে সহায়তা করার জন্য সন্তান চাই। হিমালয়ের মত দুর্গম ও রুক্ষ পার্বত্য এলাকায় ইঞ্চি ইঞ্চি করেই জমিকে চাষের উপযোগী করে তুলতে হয়। নানারকম প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হলে অধিকতর জনবল অপরিহার্য। পুত্রকামনা মানুষের চিরন্তন কামনা, পবিত্রতম কামনা। এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয় তা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। বিধবারা এখানে স্বর্গীয় পতির নামে 'সেবক পতি' দ্বারা সন্তান লাভ করে থাকে। এইসব সন্তানেরা পূর্বতন স্বামীর নামে সামাজিক সুযোগ সুবিধা মর্যাদা এমন কি সম্পত্তির অধিকার

পর্যন্ত পেয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পুরুষদের স্ত্রীরা অন্য পুরুষ দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান লাভ করতে পারে। সংসারে সন্তান চাই। তাই সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ নারীদের কোন সামাজিক মূল্য নেই বরং নানাভাবেই তারা নিগৃহীত হয়। সন্তানবতী নারীর মূল্যও সর্বাধিক। বিবাহ বা পুনর্বিবাহের সময় যে নারী গর্ভবতী থাকে তার চাহিদা সব থেকে বেশী এবং অধিকতর মূল্যেই তাকে সংগ্রহ করতে হয়। এই ধরনের সপুত্র বিবাহকে বলা হয় 'স্যুচেলা-বিবাহ'। বিবাহের পর সেই সন্তান বৈধ সন্তানের মর্যাদা পায়।

আজকের নরনারীর যৌন সম্পর্কের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সাধারণ যৌন প্রবৃত্তি ব্যক্তিগত যৌনপ্রণয়রূপে উন্নীত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠার মধ্যে যে সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে না পারলে শুধুমাত্র 'আধুনিকতা'র চিন্তাধারায় নরনারীর এই ধরনের যৌন সম্পর্ক বিচিত্র মনে হলেও এখানে কোনটাই কিন্তু নিন্দনীয় নয়। যৌন প্রবৃত্তি প্রাকৃতিক ব্যাপার। তার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি যৌন মিলনে। সে মিলনের জন্য নর নারীর সম্পর্ক যুগে যুগে বদল হয়েছে। প্রয়োজনেই বিবিধ সামাজিক বিধান গড়ে ওঠে আবার পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষই সেই বিধান সংস্কার করে নববিধান চালু করে। লিখিত ইতিহাসের সময় থেকে, সম্পত্তির নির্ভুল উত্তরাধিকার লাভের প্রশ্নে "প্রজা বিশুদ্ধর্থম স্ত্রিয়ম্ রক্ষেৎ প্রয়ত্নতঃ", এই মনুশাসনের সূত্রপাত। মনুস্মৃতিতে তাই বলা হয়েছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' ইত্যাদি। উত্তরাধিকারীর জন্য নরনারীর সম্পর্ক, নানা ধরনের বিবাহ পদ্ধতি, সতীত্বের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। পেছিয়ে-পড়া সমাজের রীতি-নীতি তথাকথিত আধুনিকতার মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে পদে পদে ভুল হবে, বিভ্রান্তি বাড়বে। ইতিহাস-ভিত্তিক যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে এই সব প্রাচীন প্রথার বাস্তব সামাজিক ভিত্তি ও উপযোগিতা উপলব্ধি করা যাবে। আমাদের অতীত স্মৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে, ইতিহাসের পাতায় পাতায়, এমন কি অমৃতসমান মহাভারতেও এই ধরনের সামাজিক প্রথা ও নানাপ্রকারের যৌন সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিবাহের রীতি তথা নর-নারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে মহাভারতে চার যুগে চার রকম ধর্মের কথা বলা হয়েছে। ধর্ম বলতে সে যুগে অর্থ ও কাম অর্থাৎ ধন ও সন্তান উৎপাদনকে বোঝাত। কৃত যুগে সংকল্প, ত্রেতা যুগে সংস্পর্শ, দ্বাপরে মৈথুন আর কলি যুগে দ্বন্দ্ব। আদিমতম যুগের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়েছিল। সে যুগে দল বেঁধে থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতিরাজ্যে বিঘ্ন বিপর্যয়ের অন্ত নেই, মানুষের একমাত্র ভরসা হল সংখ্যাধিক্যতা। আদিমতম চিন্তায় তাই একের চেয়ে সমষ্টির গুরুত্ব সর্বাধিক। কৃত যুগে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে যে নির্বিচার যৌন মিলন দেখা যায় তা এই বন্য যুগের চিত্র। দলগত বা যূথ বিবাহে সন্তানের পরিচয় মাতার দিক থেকে নিরূপণ করা হত। দলের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য ও পরিবারের কর্ত্রী ছিল মাতা। দলগত বিবাহে ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যার মধ্যে মিলন নিন্দনীয় ছিল না। আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে এ ধরনের সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতি এবং

মাৎস্য ও বায়ুপুরাণে ব্রহ্মা কর্তৃক নিজ নিজ কন্যাকে বিবাহ করার কথা বলা হয়েছে। হরিবংশে বিশিষ্ট প্রজাপতির কন্যা শতরূপাকে যৌবনে বিশিষ্ট প্রজাপতির পত্নীরূপে দেখা যায়। এ ছাড়া, মনু কর্তৃক কন্যা ইলাকে বিবাহ করার কথাও লিখিত আছে। হরিবংশে এক জটিল যৌন-সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। দশ ভাই প্রচেতার মিলনে জন্ম হয় সোমের, সোমের কন্যা মরীশা ; শেষে দশ ভাই প্রচেতা ও সোমের ঔরসে মরীশার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম। পরে এই দক্ষ প্রজাপতি সাতাশটি কন্যার জন্ম দিলেন এবং প্রত্যেককেই সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতা সোমের কাছে অর্পণ করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক ভ্রাতা ভগ্নীর মিলনকাহিনীর সংবাদ পাওয়া যায়। প্রজাপতির দুই কন্যা সীতাসাবিত্রী ও শ্রদ্ধা এবং এক পুত্র, সোম। সোমের আকর্ষণ শ্রদ্ধার প্রতি, অপরদিকে সীতাসাবিত্রীর ইচ্ছা সোমের সঙ্গে মিলিত হবার। শেষে পিতা প্রজাপতির উপদেশে সীতাসাবিত্রী মাদুলী দিয়ে সোমকে বশ করে তার ইচ্ছা পূরণ করে। ঋগ্বেদে যম-যমীর উপাখ্যানে ভাইবোনের মিলন-স্মৃতি বিধৃত। বৌদ্ধজাতক অনুসারে সীতা রামের ভার্যা ও ভগিনী। এই ধরনের সম্পর্ককে অজাচার বলা হয়।

একই রক্তের সম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলনে উৎপাদিত বংশধর পঙ্গু হয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অজাচারের কুফল বন্য মানবগোষ্ঠী বুঝতে পারে। অজাচারের অবাঞ্ছনীয়তা আবিষ্কার আদিম মানুষের পক্ষে একটা বিরাট আবিষ্কার। ফলে রক্তের সম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলন দিন দিন নিষিদ্ধ হতে থাকে। শুরু হয় রক্ত সম্পর্কিত গোত্রের বাইরে বিবাহ। পরবর্তী যুগের 'সংস্পর্শ' অজাচারকে বাদ দিয়ে দলগত বিবাহ-সম্পর্ক, এক-বিবাহ-বিধির পথে একটা পদক্ষেপ। দলগত বিবাহ থেকে 'জুড়ি-বিবাহ' যার অপর নাম গন্ধর্ববিবাহ। এক্ষেত্রে একজোড়া পুরুষ-নারী অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। এই প্রথায় চাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। বিশ্বামিত্র-মেনকা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, উর্বশী-পুরুরবা, অর্জুন-উলুপী-চিত্রাঙ্গদা, ভীম-হিড়িম্বা, যযাতি-শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি সংস্পর্শমূলক বিবাহের মাত্র কয়েকটি পরিচিত চিত্র। পাশাপাশি পৈশাচী বিবাহের উদাহরণ অর্জুনের সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, অনিরুদ্ধের ঊষা, প্রদ্যুম্নের প্রভাবতী, নিকুম্ভের ভানুমতী হরণ ইত্যাদি। তিলোত্তমার জন্য সুন্দ উপসুন্দের লড়াই এরই অন্যরূপ। বর্বর যুগের শেষে সম্পদ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। দ্বাপর যুগে দেখা যায় মৈথুন। সাধারণ অর্থে এক পুরুষের এক নারী কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পুরুষের অন্য নারী সংসর্গে কোন বাধা নেই। মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হতে থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য এই নব বিধি সমাজের মাতব্বর ব্যক্তিরা চালু করে। গোত্র-জ্ঞাতি ভিত্তিক সমাজের উপর রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের পদধ্বনি শোনা যায়। সে যুগে অতীতের বিভিন্ন যৌন সম্পর্কের স্মৃতি 'পুরাতন ইতিহাস' বলে বর্ণিত হলেও প্রয়োজনে সে সব নজির তুলে এক বিবাহের গণ্ডীকে শিথিল করা হয়েছে। অন্য উপায়ে সন্তান লাভের বহু কাহিনী মহাভারতেই পাওয়া যায়। বলিরাজা তার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য দীর্ঘতমাকে নিযুক্ত করে। প্রথমে সুদেষ্ণার এক ধাত্রী-কন্যার গর্ভে দীর্ঘতমা এগার জন ঋষির জন্ম দেয়, তারপর সুদেষ্ণার

গর্ভে জন্ম লাভ করে পাঁচটি পুত্র। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা কল্মাষপাদ পুত্রলাভের আশায় বশিষ্ঠকে অনুরোধ করে এবং রাজমহিষীর গর্ভে অশ্মক নামে এক পুত্র হয়। মহাভারতে বিভিন্ন উপায়ে উৎপন্ন সন্তানদের নানাভাগে বিভক্ত করা হয়। আপন ঔরসজাত পুত্র 'আত্মস্বরূপ', পতির অনুমতিতে অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান 'নিরুক্তজ', বিনা অনুমতিতে সন্তান হলে 'প্রসৃতিজ'। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র 'দত্তক পুত্র', মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত 'কৃতক পুত্র'। গর্ভবতী নারীর বিবাহের পর যে পুত্র হয় তার নাম 'অধ্যোঢ়' আর অবিবাহিতা কুমারীর পুত্র 'কানীন'।

এই ধরনের উদাহরণ শুধুমাত্র প্রাচীন সাহিত্যে নয়, আজও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পেছিয়ে পড়া মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। চোখ মেলে দেখতে আর যুক্তিদ্বারা গ্রহণ করতে পারলে কলিযুগের দ্বন্দ্ব-বিবাহের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত 'মুক্ত ও স্বাধীন প্রেম'-বিলাসীদের মোহমুক্তি ঘটবে। এটাই অতীত অনুসন্ধানের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত।

তমসাচ্ছন্ন তমসাতীরবাসী জৌনসারী ও রাওয়াইরা মহাভারতীয় সমাজব্যবস্থার জীবন্ত যাদুঘর। তাদের সমাজ জীবনে সেদিনের অনেক প্রথা আজও সজীব হয়ে আছে। সমাজ-বিকাশের ধারা কখনই একমুখি হয় না। পরিবর্তনের আঁকাবাঁকা পথে বিকাশের নানা ধারা কোথাও আপন গতিবেগ হারিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে যুগ যুগ ধরে প্রায় একই ভাবে অবস্থান করতে পারে। এটা এশীয় সমাজের অন্যতম বিশেষত্ব। ইতিহাসের রথচক্রের গতি এখানে মন্দ-মন্থর, কালের যাত্রাধ্বনি এখানে নিঃশব্দ পদক্ষেপ করে থাকে। বিশেষ করে দুর্গম হিমালয়ের দূর দুর্গম অঞ্চলের জীবন স্রোত যেন অতীত দিনের এক একটা বিশেষ বিশেষ যুগের শিলীভূত প্রতিরূপ।

পাণ্ডবদের 'পিতা' প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বসবাস কালে কিমিন্দম মুনির অভিশাপে সন্তান-উৎপাদনে অক্ষম হলে বংশরক্ষার জন্য তিনি কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমে সে রাজী হয় না। তাকে দ্বিধামুক্ত করার জন্য পাণ্ডু বলেন যে, আপৎকালে স্ত্রীলোক উত্তম বর্ণের পুরুষ অথবা দেবর থেকে পুত্রলাভ করতে পারে। ধর্মতত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন যে, পুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামী ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিচরণ করত, তাতে কোন দোষ হত না, কারণ প্রাচীন ধর্মই এই প্রকার। উত্তরকুরু দেশবাসী এখনও সেই ধর্মানুসারে চলে, এদেশে সেই প্রাচীন প্রথা অধিককাল রহিত হয়নি। তারপর পাণ্ডু উদ্দালক পত্নীর কাহিনী প্রসঙ্গে বলে যে, শ্বেতকেতু পিতার সমক্ষে মাতার এই ধরনের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হলে, পিতা উদ্দালক তার সন্তানকে বলেন, ইহাই সনাতন ধর্ম। প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত শ্বেতকেতু মন্তব্য করেন, যে নারী পতির আজ্ঞা পেয়েও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে আপত্তি করবে তার ভ্রূণ হত্যার পাপ হবে। শেষে পাণ্ডু আপন জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করে কোন তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বারা পত্নীদের ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে সম্মত করান। হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্বতে কুন্তীর গর্ভে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে যুধিষ্ঠিরের, পবনদেবের ঔরসে ভীমের ও ইন্দ্রের দ্বারা অর্জুনের জন্ম হয়। আর মাদ্রী অশ্বিনীদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেব

নামে যমজ পুত্রের মাতা হন। এরা সকলেই 'বিপিতা' পাণ্ডুর পুত্ররূপে পরিচিত, সামাজিক স্বীকৃতি সহ তার সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

কুন্তী শুধু এই তিন পুত্রের জননী ছিলেন না, বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় সূর্যদ্বারা কর্ণ নামে তার এক পুত্র হয়। মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও সত্যবতীর কানীন পুত্র। তীর্থপর্যটন কালে পরাশর মুনি যমুনা তীরে এসে রূপগুণবতী সত্যবতীর রূপে মোহিত হন। মৎস্যগন্ধা কুমারীকে তিনি শুধু সুবাসিত গন্ধবতী যোজনগন্ধায় রূপান্তরিত করেন নি, সেই সঙ্গে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে সত্যবতীর সঙ্গে মিলিত হন। যমুনার কোন দ্বীপে জাত এই পরাশর পুত্রই দ্বৈপায়ন ব্যাস। শান্তনু যমুনা তীরবর্তী বনে ভ্রমণকালে এই সত্যবতীর সন্ধান পান, পরে তিনি তাকে বিবাহ করেন। সত্যবতী-পুত্র বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী পুত্রহীন অবস্থায় বিধবা হলে বংশরক্ষার জন্য সত্যরতী ভীষ্মকে ভ্রাতৃবধূর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করতে বলেন। আপন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে তিনি একার্যে অস্বীকৃত হলেও পুরাকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহবাসে সন্তান-উৎপাদনের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ-পুত্র বিবাহকারীর সন্তান হয়, এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সত্যবতী লজ্জিতভাবে আপন পূর্ব ইতিহাস ব্যক্ত করে দ্বৈপায়নকে স্মরণ করেন। ব্যাস কেবল ধর্মপালনের মহৎ উদ্দেশ্যে সত্যবতীর অভীষ্ট কার্য করতে সম্মত হয়। ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয় আর বিদুরের জন্ম হয় এক দাসীর গর্ভে। মহাভারতের কালগত হলেও দেখতে পাচ্ছি হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে আজও সেই প্রাচীন প্রথাই প্রচলিত আছে।

নিম্ন তমসা-উপত্যকার জৌনসারীদের মধ্যে দ্রৌপদী-বিবাহ রীতির সন্ধান পেয়ে ১৯৫৪ সনে কানাইয়া লাল মুন্সী মন্তব্য করেছিলেন, a fossil of the age the *Mahabharata*. কথাটা আরও ব্যাপক অর্থে সত্য এবং উপরি-তমসার ফতে পর্বত এলাকার রাওয়াইদের সম্পর্কে সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু সমস্যা হল রাওয়াইরা যে দুর্যোধন-ভক্ত, দুর্যোধন-উপাসক। আগেই বলেছি, এই অঞ্চলটি কৌরব পক্ষীয় দুর্যোধনের অধীন ছিল। মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পরাজিত সেনাদল ও নাগরিকেরা এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাদের পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাব এবং দুর্যোধন সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এই অঞ্চলের মাত্র কয়েক মাইল নীচে পাণ্ডব ভক্তদের অস্তিত্ব থাকায় মুন্সীজী প্রশ্ন তুলেছেন, Was there a war between the Pandava worshipping Khasas and the Fateh Parvat Khasas who, having won a victory, foreswore allegiance to the gods of the enemies and accepted their enemy Duryodhan, as their guardian deity?

(দ্রঃ Foreword, 'Social economy of a Polyandrous people' by R N. Saksena.)

শত্রু মিত্রের পরস্পরের দেবদেবী পরিবর্তনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইরাণের মধ্য দিয়ে আর্য-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারত আগমনের পর 'দেব' আর 'অসুর' দ্বন্দ্বের

কথা এবং অর্থ বিপর্যয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে পাই। বিজয়ীরা বিজিতের দেবদেবীসহ অনেক কিছুই আত্মসাৎ করে নবরূপে নবীন-সাজে আপন করে নেয়। পরাজিতেরা আত্মরক্ষা ও আত্মমর্যাদার জন্য অনেক সময় গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আপন ভাবনা-চিন্তা নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। সেই ধরনের কোন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকলেও কৌরব কুলের দুর্যোধন যখন এই ভারতেরই সন্তান, এরই বুকে বহুদিন ধরে বসবাস করেছিল এবং প্রচলিত ন্যায়-নীতি-ধর্মানুসারে অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ পেয়েছে তখন তাদের অনুগামী বা পক্ষধর থাকা মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নয়। তবে এই দুর্যোধন সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের গভীরভাবে অনুশীলন করা দরকার। যা দেখেছি, যা বুঝেছি তা থেকে এই বিশ্বাসই দৃঢ়মূল হয়েছে যে রাওয়াই খশেরা প্রকৃতই দুর্যোধনের উত্তরসাধক। বৈচিত্র্যময় ভারত-সংস্কৃতির এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের আধার এই তমসা উপত্যকা। মহাকালের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে দুর্যোধন-ভক্তরা দুর্গম হিমালয়ের এই নিভৃত অঞ্চলে মহাভারতের কাল থেকে বসবাস করে আসছে।

তমসার তীর ধরে পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ কল্পনা সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, মহাকাব্যের সার্থকতার জন্য কবির আনুগত্য এক পক্ষের প্রতি থাকলেও অন্য পক্ষ যা ভারতীয় মহাজনতার এক বিরাট অংশ তারা কি চিরকাল শত্রু হয়েই থেকে যাবে। ভারতে ভ্রাতৃবিরোধই কি একমাত্র সত্য? রাজ্য নিয়েই রাজনীতি। যতক্ষণ ধন, যশ আর সম্পত্তির পেছনে ছোটাছুটি ততক্ষণই পাণ্ডব-বিজয় সত্য। কিন্তু তারপর দেখা যায়, যা নিয়ে এত অশান্তি, এত হানাহানি, লোকক্ষয়, তার মধ্যে নেই কোন সুখ শান্তি। মহাজীবনের জন্য, অপার শান্তির আশায় যে আকুলতা তার জন্য শত্রু-মিত্র সকলেই সমভাবে ব্যাকুল। তাই মনে হয়, মহাশান্তির পথরেখা কল্পিত হয়েছে পরাজিতের মহাপ্রস্থানের মর্ম মন্থন করে, বিজেতার স্বর্গারোহণ চিহ্নিত হয়ে আছে বিজিত রাজ্যের স্বর্ণশিখরে। এটা দুর্যোধন-ভক্ত রাওয়াই চিন্তার অভিনবত্বকেই শুধু প্রকাশ করে না ; তাদের উদার মন, বিরাট হৃদয়ের স্পর্শও এতে পাওয়া যায়। জীবন-দর্শনের এক দুরূহ প্রশ্নের উত্তর মেলে, বিরোধ আর হানাহানিই একমাত্র সত্য নয়। তাই লিপিবদ্ধ না থাকলেও লোক-প্রচলিত এ গাথার মর্মবাণী মহাকাব্যের মত ব্যঞ্জনাময়, মহাভারতের ন্যায় সত্য। ক্ষণকালের জন্য হলেও এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমরা তমসাতীর ধরে এগিয়ে চলি স্বপ্নশিখর স্বর্গারোহিণী অভিমুখে। *

* *লেখকের দুর্যোধন দ্রৌপদীর দেশে গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত*

শতোপন্থ

শান্তি চক্রবর্তী

১২ই জুন ভোর পাঁচটার মধ্যে মালপত্র বেঁধে তৈরি হই। গাইডও এসে সময় মত উপস্থিত হয়। ছ'টায় লাঠি ঠুকে বেরিয়ে পড়ি। যাত্রী হিসাবে দুই ডাক্তারবাবু, সেনদা, দেবুবাবু ও খোকনকে নিয়ে আমরা ছ'জন। কিন্তু গাইড ও কুলী নিয়ে চলছি বারোজন। রুদ্রনাথের গাইড পণ্ডিতজী ও কুলী হুকুম সিং অবশ্য যাচ্ছে শতোপন্থ দর্শনের উৎসাহে।

বদ্রীনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রাপথে পা বাড়াই। পেছনে আসে বীথি, নন্দ ও মিত্রদা দুর্গম-পথযাত্রীদের এগিয়ে দিতে। বীথির মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বলে,—মনে হয় আবহাওয়া ভালই পাবেন। তবু পাহাড়ী অঞ্চলের কথা কিছু বলা যায় না। খুব সাবধানে চলবেন। অযথা বিপদের ঝুঁকি নেবেন না।

পুল পেরিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়াই। বদ্রীনাথকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। রওনা হওয়ার আগে পেছনে ফিরে তাকাই। দেখি বীথি তখনও ওপারে একা দাঁড়িয়ে আছে। হাত ইশারায় ফিরে যেতে বলি। ডাক্তার বিশ্বাসকে বলি—আর পেছনে নয় সামনের দিকে তাকান।

সর্বপ্রথম গাইড আলমসিং নেগি ও যশপাল। সবার পেছনে বদ্রীনাথের কুলীর সঙ্গে শিবরাজ সিং। মাঝে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে দেবনারায়ণ চক্রবর্তী (দেবুবাবু)। মন্দির ছাড়িয়ে নারায়ণ পর্বতের কোল ধরে চলছি। বাঁ দিকে পাহাড়ের চড়াই। ডান দিকে ফসলের ক্ষেত। ক্ষেতের প্রান্তে পুণ্যসলিলা অলকানন্দা। যত এগোই, শহরের কল-কল্লোল ক্ষীণ হয়ে আসে। পরিমণ্ডল গম্ভীর হয়। তপোলোকের নিস্তব্ধতায় এক সর্বব্যাপী সত্তার স্পন্দন অনুভব করি। বন্ধনমুক্ত এই উদার প্রকৃতির যে কি অচ্ছেদ্য আকর্ষণ, যারা একবার এসেছে, তারাই জানে।

যেতে যেতে ঝুপড়ি থেকে এক সাধুবাবাকে বের হতে দেখে মনে পড়ে বছর আটেক আগের কথা। ১৯৮০ সালে বদ্রীনাথকে দর্শন করে এই পথেই মাতৃমন্দিরের খোঁজে এগিয়ে চলি। সঙ্গে ছিলেন গঙ্গোত্রীর এক সাধুবাবা। দশ বছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেবার চলছেন শতোপন্থ দর্শনে। মন্দির থেকে এক কিলোমিটারের মত এসে সাধুজী ডানদিকে ক্ষেতের মধ্যে নেমে যান। ভাবলাম, কি জানি হয় তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সাধুজীর অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে আপনমনে চলতে থাকি। মানাক্যাম্পে পৌঁছোবার আগেই সাধুজী ধরে ফেলেন। বলেন—'এক সতীর্থের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে উনি এখানে আছেন। বড় পবিত্র জায়গা। এখানেই নাকি সনক-সনন্দাদির আশ্রম ছিল। তাই যখনই এ পথে আসি, ওঁর ঝুপড়িতে দু'দণ্ড বসে যাই।' কিন্তু এবার আর সময় দিতে পারেননি শতোপন্থের চিন্তায়। আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা। সময়ের এত টানাটানি যে ইচ্ছা থাকলেও পথের মাঝে কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি না।

দেখতে দেখতে তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত হয়। মানাগ্রামে যখন পৌঁছোই সকাল তখন সাড়ে সাতটা। ভেবেছিলাম মিলিট্যারি ক্যাম্প চেকিং-এ কিছু সময় নষ্ট হবে। কিন্তু না। চেকিং তো দূরের কথা। কোনো জোয়ানকেই এগিয়ে আসতে দেখলাম না। বিনা বাধায় এগিয়ে চলি। একটু উপরে উঠতেই পরিচিত জায়গাটি চোখে পড়ে। সেই দণ্ডোপরি উড়ন্ত পতাকা। শিলাস্তূপের মাঝে ক্ষুদ্র মন্দির। যেন কারোর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নিশ্চল।

আট বছর আগে পথ ভুল করে খানিকটা উপরে উঠে যাই। জনমানবশূন্য বিস্তীর্ণ দিগন্তের মাঝে কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। কাউকে জিজ্ঞেস করব, মন্দির কোথায় এমন লোক খুঁজে পাই না। অনন্যোপায় হয়ে একখানা পাথরের উপর বসি। পাঁচ সাত মিনিট কেটে যায়, কোনো পথচারীর সাড়া পাই না। ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াই। হঠাৎ শিলাস্তূপের আড়াল থেকে কমণ্ডলু হাতে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাই। মন্দিরের খোঁজেই যে দাঁড়িয়ে আছি, সেকথা বলতেও ভুলে যাই। সাধুবাবা বোধহয় মনের কথা বুঝতে পারেন। বলেন—চল, আমার সঙ্গে।

পেছনে যন্ত্রচালিতের মত চলতে থাকি। খানিকটা নেমে পতাকাযুক্ত এক ছোট মন্দিরের সামনে উপস্থিত হই। ভিতরে ঢুকতে পারি না। দরজা তালাবন্ধ। শুনি পর্বদিন ছাড়া মন্দির খোলা হয় না। সামনে তিন চার হাত পরিমিত এক ফালি বারান্দা। এক পাশে অর্ধনির্বাপিত অগ্নিকুন্ড? অপর পাশে সিঁদুরলিপ্ত একখানি পাথর। সাধুবাবা আসনে বসে কাছে ডাকেন। আঙ্গুলে সিঁদুর নিয়ে কপালে টেনে দেন। বলেন—এবার মাকে দর্শন কর।

গরাদের ফাঁক দিয়ে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকি। পাষাণ প্রতিমা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মায়ের সেই স্নেহবিগলিত মুখ এবার আর খুঁজে পাই না। বোধহয় সেই চোখ আর সেই আকুলতা নেই। মন ছুটে চলছে এবার কল্পনার স্বর্গরাজ্যে অলকাপুরীর পথে পথে।

সামান্য কিছু জলযোগ করে আবার যাত্রাপথে নেমে পড়ি। দু'পাশে ছোটবড় শিলাস্তূপ। মাঝে পাথর বিছানো পথ। প্রায় সমতল বললেই চলে। তবে সে বেশীদূর নয়। মিনিট পনেরো পরেই গভীর খাদ পায়ের কাছে এগিয়ে আসে। পথ সংকীর্ণ হয়। কোথাও বা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। মাতৃমন্দির ছেড়ে এক কিলোমিটারের মত এসেছি। তখনও ওপারের বাড়িঘর, অলকা-সরস্বতী সঙ্গম (কেশব প্রয়াগ) গণেশগুম্ফা ও ব্যাসগুম্ফা বিন্দু বিন্দু চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখি সামনের যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। পথ এমন ধ্বসে গেছে যে পা রাখার জায়গা নেই। আলম সিং আইস অ্যাক্স দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে দেয়। আর তাতে পা রেখে অতি সন্তর্পণে ফুট পাঁচেক জায়গা পার হই। ভাবি, গোড়াতেই যে পথের এই অবস্থা, শেষ পর্যন্ত সে কি চেহারা নেবে কে জানে। তবে মনোবল হারাই না। কারণ পথের এ দুর্গমতা জেনেই এসেছি। তা ছাড়া স্বর্গলোকের স্বপ্নে কোনো সংকটই আর গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না।

পথ ধীরে ধীরে উত্তরদিক থেকে পশ্চিমে ঘোরে। ব্যাসগুম্ফা গণেশগুম্ফা অদৃশ্য হয়। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় অলকানন্দার শুভ্র প্রবাহ। দেড় কিলোমিটার পার না হতেই সামনে খাড়া উৎরাই। পথ বলে কিছু নেই। পাথর ধরে ধরে যেখানে যেমন পারি পা রেখে

পাহাড়ের গা বেয়ে নামি। তাতেও কি বিপদ কাটে! শুরু হয় বিস্তীর্ণ হিমবাহ। দু' ফার্লং পর্যন্ত সে যেন ঝক্‌ঝকে এক বিশাল রূপোর পাত। খাড়াই না হলেও ঘরের চালের মত ঢাল। বারবার পা হড়কে যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে অতি সাবধানে পা বাড়াই। মনে হয় তুষার সায়রে কয়েকটি অসহায় প্রাণী চলছি। পণ্ডিতজী তো একবার পা ফস্‌কে পড়েই যান। ভাগ্য ভাল কাছে পিঠে কোনো খাদ নেই। তবে হিমবাহ যেখানে পাহাড়ের কোলে মিশেছে, সেখানে হাঁ করে আছে বিরাট ফাটল। আলম সিং তাই সাবধান করে,—'পাহাড়ের কাছে যাবেন না।' যেখানটা খুব পিছল, অ্যাক্স দিয়ে বরফ কাটে, তবে পা ফেলি। প্রায় আধঘন্টা এইভাবে চলে জায়গাটি পার হই। সামনেই চড়াই। পথ যেমন সংকীর্ণ, তেমন বালি কাঁকরে ঝুরঝুরে। সামান্য আনমনা হলেই অন্ধকার।

চড়াই-এর মাথায় শিলাপাথরে আকীর্ণ বিস্তৃত ভূখণ্ড। সমতল নয়। সামান্য চড়াই-উৎরাই-এ ঢেউ খেলানো। খাদে পড়ার ভয় না থাকলেও পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ার আশংকা আছে। জায়গাটির নাম সীতাবন। এখান থেকে দেখা যায় ওপারের সধূম্র বসুধারা। চার পাঁচশো ফুট উপর থেকে এক বিশাল জলধারার আচমকা পতন। বিস্তৃত পর্বতমালার মাঝে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পণ্ডিতজী বলেন—ওর কাছেই অষ্টবসুর তপস্যাস্থল, নরনারায়ণের পিতা ধর্মরাজের সাধন-ভূমি।

সীতাবন ছাড়িয়ে রামবন। রামসীতা কখন এ পথে এসেছিলেন জানি না। তবে নাম দুটির সঙ্গে বন শব্দটির তাৎপর্য মাথায় ঢোকে না। বন তো দূরের কথা, একটা ঝোপঝাড় পর্যন্ত চোখে পড়ে না। চারপাশে শুধু তরুলতাশূন্য রুক্ষ পাহাড়। কোথাও হিমবাহ। কোথাও বালিপাথরের মাঝে ক্ষীণ জলধারা।

পূর্বেই বলেছি পথ বলে কিছু নেই। পাহাড়ের চূড়াই পথের নিশানা। গাইড যখন যে দিকে হাঁটে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলি। এক সময় আলম সিং শ্যালককে (বদ্রীনাথের কুলী) নিয়ে এত এগিয়ে যায় যে দৃষ্টির মধ্যে পাই না। পথের নিশানা হারিয়ে বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে থাকি। চারপাশে ভগ্নবিধ্বস্ত পর্বত প্রাচীর, নিশ্চল নিস্তব্ধ শিলাপাথর, দূরে তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। যতদূর চোখ যায়, কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু অন্তহীন উদার পরিসর আর আমি। সেই অপরিচিত ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতায় মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠি। পরক্ষণেই অনাস্বাদিত অপার্থিব অনুভূতিতে ডুবে যাই। জানি না একেই বিরাটের সঙ্গে মিলনের পূর্বাভাস বলে কিনা। যে ভাষাতেই এর ব্যাখ্যা হোক, সে উপলব্ধি যে জীবনের এক পরম সঞ্চয় একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ পণ্ডিতজীর গলায় চমকে উঠি। বলেন—'একা দাঁড়িয়ে আছেন যে? আলম সিং কোথায়? সেনবাবু?' বলি—'ওরা সব এগিয়ে গেছে।' দেবুবাবুরা পেছনে আসছেন বলে পণ্ডিতজীও দ্রুত পায়ে ছোটেন। পাতলা ছোটখাটো মানুষ। তার উপর হাঁপানির রোগী। কিন্তু যখন ছুটতে থাকেন, কে চলবে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে। চলতে চলতে গলা চড়িয়ে হাঁক দেয়, যদি আলম সিং বা সেনবাবুর সাড়া পায়।

একটু বাদে পিছিয়ে পড়া সহযাত্রীরাও এসে পড়ে। নিশ্চিন্ত মনে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নবোদ্যমে রওনা দেই। দেবুবাবুকে বলি—গাইড্‌কে বলবেন এভাবে যেন সকলকে ফেলে এগিয়ে না যায়।

প্রায় মিনিট দশেক চলার পর বহুদূরে আকাশের গায়ে পুতুলের মত, তিনটি চেহারা চোখে পড়ে। দেবুবাবু বলেন—ঐ তো সেনদা টুপি নেড়ে জানান দিচ্ছেন। কোথায় যাবেন? রান্নাবান্নার জিনিসপত্র সব আমাদের সঙ্গে।

চড়াই দুরারোহ না হলেও পথ যে ক্রমাগত উঠেই চলছে সে বুঝতে পারি দমের ঘাটতি থেকে। কিন্তু বিরামহীন পদক্ষেপে ঐ উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়াও একসময় পায়ের কাছে নেমে আসে। কাছে পৌঁছেই চৌধুরীদার কড়া ধমক—এভাবে খেয়াল খুশিমত চলবে না আলম সিং। তোমাকে আনা হয়েছে পথ দেখাবার জন্য। এখন থেকে শ্যালক ভায়াকে সামনে দিয়ে তুমি থাকবে সবার পেছনে।

যাত্রীদের মেজাজ ঠান্ডা রাখার জন্য পণ্ডিতজী একগাল হেসে বলেন—কোনো চিন্তা নেই বাবুজী। আমি থাকব আপনাদের সঙ্গে। বলি—অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ভরসা পাই না। পণ্ডিতজী নিজেই তো একবার ভুল করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন। ভাগ্য ভাল শিবরাজের চোখে পড়েছিলেন। নয়তো আপনার খোঁজেই সারাদিন কেটে যেত। দেবুবাবু বাধা দিয়ে বলেন,—পথের মাঝে আর গোল বাধাবেন না। গাইড্‌ব্যাটা চটে গেলে মহাবিপদে পড়ব।

প্রায় চল্লিশ মিনিট চলার পর সামান্য পরিবর্তন ঘটে। রুক্ষ শিলাপাথরের মাঝে মাঝে কিছু সবুজ কাঁটাগাছ দেখা দেয়। তারার মত কিছু হলুদ ফুলও চোখে পড়ে। কোথাও বা শেওলা জড়ানো পাহাড়ের গায়ে সামান্য কমনীয়তা ফুটে ওঠে। যত এগোই দুপাশের পাহাড় সরে যায়। এগিয়ে আসে খোলামেলা বিস্তৃত এক ভূখন্ড। আলম সিং বলে—লক্ষ্মীবনের কাছে এসেছি। তবে আমরা বিশ্রাম নেব গুহা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গিয়ে। ডাক্তার বিশ্বাস বাধা দিয়ে বলেন—কেন? গুহাতেই তো রান্নাবান্নার সুবিধা হবে। তা ছাড়া বেলাও কম হয়নি। প্রায় এগারোটা। সকালে ব্রেকফাস্টও ভাল হয়নি। এভাবে খালি পেটে হাঁটা মোটেই ঠিক নয়। জিনিসপত্র গুহার সামনেই নামাতে বলো।

আলম সিং রাজি হয় না। বলে—ওখানে জল পাব না বাবুজি। অনেক নীচে নামতে হবে। একটু এগিয়ে গেলে হাতের কাছেই জল পাব। খানা পাকাতে সুবিধা হবে।

দেবুবাবুও সায় দিয়ে বলেন—এতটাই যখন এসেছেন, আর একটু না হয় কষ্ট করুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহার কাছে পৌঁছোই। মালপত্র খোলা হয় না। তবে একটু বিশ্রাম না করে পারি না। শুনেছি বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী নাকি এখানে এক সময় তপস্যা করেছিলেন। পুরাণের সত্যতা নিয়ে মাথা ঘামাই না। লক্ষ্মীবনে লক্ষ্মীদেবীকে স্মরণ করে বিশ্রামের সময়টুকু এক মধুর আবেশে কাটাই। লক্ষ্মীদেবীর কথা জানি না। তবে এখানের প্রাকৃতিক পরিবেশ যে দেবদানব, মানব সকলেরই তপস্যার অনুকূল সেকথা বলার অপেক্ষা

করে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব থেকে কত যে দেবতা, ঋষি, মহর্ষি যুগে যুগে এই তপোলোকে আসন পেতেছেন, কত যে যোগী চোখ বুজে পাথর হয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সংসারী জীব আমরা আবার ফিরে যাব সেই বেদনাময় বিষয়ীর জীবনে। তবু বলব এই ক্ষণকালের বিশ্রামটুকু হয়ে থাকবে অশান্ত চিত্তের পরম আশ্রয়।

যাত্রা আবার শুরু হয় অলকানন্দার কিছু উপর দিয়ে। সামান্য চড়াই-উৎরাই। কিন্তু সর্বত্রই খোঁচা খোঁচা শিলাপাথর। তবু অতিক্রান্ত পথের তুলনায় সুগম এবং নিরাপদ। ক্লান্তিতে পা অচল হ'য়ে আসে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে পারি না। কেমন যেন মোহাচ্ছন্নের মত পায়ের পেছনে পা ফেলে চলছি। হয়তো পরিমণ্ডলের দিব্য প্রভাবই এর কারণ। প্রায় বারো হাজার ফুটের উপর দিয়ে পর্যটন। শীতে জড়সড় হওয়ারই কথা। কিন্তু না। রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের নীচে জড়তা তো দূরের কথা, অফুরন্ত শক্তি যেন কোথা থেকে পাই। বদ্রীনাথে বসে ভাবতে পারি নি এমন সুন্দর আবহাওয়া পাব। বোধহয় তীর্থের দেবতা ডেকেছেন বলেই এমন হলো।

প্রায় আধ ঘন্টা চলার পর পিঠের বোঝা নামে। বস্তা খোলা হয়। রান্নার আয়োজনে শিবরাজ পাথর সাজিয়ে আগুন ধরায়। হুকুম সিং ক্যান ভরে জল আনে। দেবুবাবু নিজে বসেন আলুর খোসা ছাড়াতে। ভক্তিমান পণ্ডিতজী ঘুরে বেড়ান নানা দেবতার স্তবস্তুতি করে। কষ্ট হলেও জায়গাটি নির্বাচনের জন্য আলম সিং-এর প্রশংসা না করে পারি না। এমন মনোমুগ্ধকর নিসর্গের বর্ণনা মহাকবি কালিদাস কিম্বা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দেওয়াই সম্ভব। শুধু পরবর্তী পর্যটকদের উৎসাহ দেবার জন্য জায়গাটির সামান্য পরিচয় দেব।

বাঁদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়। কোথাও তার বিধ্বস্ত গাত্রে ছোট বড় পাথরের জটলা। কোথাও ঝোপঝাড় বা ঘাসের আবরণে শ্যামল শোভা। কোথাও বা শুভ্রতন্বী গিরিপ্রবাহিনীর ক্ষীণধারা। ঢালের কোলে খানিকটা সবুজ সমতল জায়গা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপ। যেন শ্রান্ত পথিকের আরামকেদারা। ডানদিকে ঢালের প্রান্তে অলকানন্দা। ওপারে ধাপে ধাপে বিচিত্র গড়নের পাহাড়। আকাশচুম্বী সুতীক্ষ্ণ চূড়া। খাঁজে খাঁজে তুষারের শুভ্র আস্তরণ। যেন শিল্পীর গড়া সুরম্য দেবালয়। কি জানি, হয়তো এই সব দৃশ্যই মন্দিরের গঠনশৈলীকে প্রভাবিত করেছে।

নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকি। এর মধ্যে আলম সিং যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। বলে,—কি দেখছেন?

—দেখছি পাহাড়গুলি। যেন এক একটা মন্দির।

—অলকাপুরীর নাম শুনেছেন তো? এখান থেকেই দেখা যায়। কৌতূহল আর ধরে না। কল্পনার কুবেরের রাজধানী দেখার জন্য সোৎসাহে জিজ্ঞেস করি,— কোন দিকে?

মন্দিরের মত যে পাহাড়গুলি বললেন, ওরই মধ্য দিয়ে দেখুন একটা ধারা নেমে আসছে। ঐ নদী ধরে উপরের দিকে তাকান। যেখানে পাহাড়ের গায়ে কুয়াশার মত হাল্কা মেঘ জমে আছে ওদিকেই অলকাপুরী।

কি আছে জানি না। তবে যতদূর চোখ যায় মনে হয় অত্যুজ্জ্বল হর্ম্যময় এক স্বপ্নপুরী। হয়তো ঐ রজতশুভ্র তুষারলোকে আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে গন্ধর্বরাজের সভা বসে। অপ্সরা-কিন্নরীদের নাচের ছন্দে নূপুর বাজে। কৌতূহলী সঙ্গীরাও এসে পাশে দাঁড়ায়। হাতে চায়ের গ্লাস দিয়ে ডাক্তার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেন—আমাদের কি ওদিকেই যেতে হবে?

সামান্য পশ্চিমে ঘুরে আলম সিং বলে—না বাবুজী। ঐ যে দূরে দিকজোড়া ধব্‌ধবে জায়গাটা দেখছেন, ওটা পার হতে হবে।

শুনে মাথা ঘুরে যায়। তবে মোটেই দমে যাই না। ছোটবেলা মহাভারত পড়ে স্বর্গারোহণের পথটা নানাভাবে কল্পনা করেছি। আজ সেখানে সশরীরে দাঁড়িয়ে ভয়ে পিছিয়ে যাব! মুহূর্তের দুর্বলতা প্রবল উদ্দীপনায় মিলিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি,—হিমবাহের নাম কি? বলে—একটা নয় বাবুজী! দুটো হিমবাহের সঙ্গম! বাঁদিক থেকে ভগীরথ-খরক এসে অলকানন্দা-হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে!

চড়াই এর দুর্গমতার কথা ভেবে চক্রতীর্থের দূরত্বের কথা জানতে চাই। বলে, সাত কিলোমিটারের কম হবে না। ভাবি, পাহাড়ীদের হিসাবেই সাত কিলোমিটার! আমাদের পায়ে কতদূর হবে কে জানে।

লক্ষ্মীবন থেকে চক্রতীর্থ পথের এই অংশটাই শুনেছি যেমন দুর্গম, তেমন বিপদ-সংকুল। ভয় হয় সন্ধ্যার আগে চক্রতীর্থে পৌঁছতে পারব কিনা। কিন্তু থেমে যাবারও তো উপায় নেই। লক্ষ্মীবনের গুহা ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। চক্রতীর্থের মধ্যে আর কোনো আশ্রয় নেই। তা ছাড়া সময়ের টানাটানিও আছে। এক বেলা নষ্ট হলে শতোপন্থ দর্শন অসম্ভব হয়ে উঠবে। আকাশের দিকে তাকাই। কেমন যেন সাহস পাই। ভরসা পাই যত কষ্টকরই পথ হোক, পার হয়ে যাব। জানি না এই বিশ্বাস, এই অগাধ নির্ভরতা কোথা থেকে পেলাম।

ভাবতে ভাবতে একটু আনমনা হয়ে পড়ি। হঠাৎ চৌধুরীদার উল্লসিত কণ্ঠ—ফিরে দেখুন শান্তিদা, কোথায় এসেছি। আলম সিং-এর আঙ্গুলটা তখনও উঁচু হয়ে আছে। বলে—যে নীলকণ্ঠ পর্বত বদ্রীনাথ থেকে দেখেছেন, এ তারই পেছনের দিক।

পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করি। মনে হয় শুভ্রকান্তি নীলকণ্ঠের বিস্তীর্ণ জটাজাল—অনাদি অনন্তকালের যোগমগ্ন রূপ। অভ্রভেদী চূড়ার অপরপ্রান্ত যে এমন রহস্যময় না দেখলে কোনোদিনই বুঝতাম না। এখানের মাটি, পাথর, আলো বাতাস সব কিছুর মধ্যেই ফুটে ওঠে একটা অদ্ভুত ত্যাগের সুর। অন্তহীন আকাশে ওঁকার ধ্বনি। বাতাসে বৈরাগ্যের মহামন্ত্র, নদী কল্লোলে মিলনের ঐকতান। ধ্যানমৌন চিরবিশুদ্ধ এ যেন এক অমৃতলোক। এর পবিত্র আবেষ্টনে ভোগের স্পৃহা শিথিল হয়। স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ কেটে যায়। জীবনের অন্ধকার ঘুচে অন্তর ভরে ওঠে মহাজ্যোতির আলোকে।

এ অনুভূতি শুধু আমার নয়। যে কেউ এই নিভৃত অন্দরে প্রবেশ করবে তারই প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। পাশে দাঁড়িয়ে যে সতীর্থেরা মহাবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, কি দেখছে

ওরা? কেন অমন তন্ময় হয়ে আছে? এই 'কি' ও 'কেন' এর জবাব ভাষাতে নেই, আছে নিবিড় উপলব্ধিতে।

বেলা বারোটার মধ্যে খানা প্রস্তুত। গরম খিচুড়ির সঙ্গে পাঁপরভাজা। অত্যুচ্চ গিরিলোকে প্রচন্ড শীতে এর চেয়ে মুখরোচক কিছু হতে পারে জানি না। স্বাদে গন্ধে মনে হয় মা লক্ষ্মীর অদৃশ্য হস্তের তৈরী।

ভোজন পর্ব শেষ হয়েছে, এমন সময় জনাতিনেক পাহাড়ী রমণী নিচ থেকে উপরে উঠে আসছে। পরনে ঘাগরা। মাথায় ওড়না। পিঠে জ্বালানি কাঠের বোঝা। ওরা আসছে অলকানন্দার কোল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে। যাবে মানাগ্রামে। গহন গন্ধর্বলোকে মর্ত্যবাসীদের দেখে ওরা সকৌতুকে তাকায়। পণ্ডিতজী খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ওরা কান দেয় না। মৃদু হেসে আপন পথে চলতে থাকে। কষ্টে পড়লেও ওরা আপন মর্যাদায় সজাগ। ওরা যে স্বর্গের নট-নটীর বংশধর।

মালপত্র গুটিয়ে সাড়ে বারোটার মধ্যে রওনা হই। ভোজনের মাত্রাটা একটু বেশী হওয়ায় কেমন যেন অবসাদ বোধ করি। তবে পথের দুর্গমতায় সে জড়তা বেশীক্ষণ ঠাঁই পায় না।

পথ ক্রমান্বয়ে বাঁদিকে ঘোরে। যত এগিয়ে যাই পাহাড়-পর্বত রুক্ষ হয়ে ওঠে। সামান্য ঝোপঝাড় যা ছিল তাও মিলিয়ে যায়। যেদিকে তাকাই শুধু ধূসর শিলাপাথর। কোথাও বা গলিত তুষারের ক্ষীণস্রোত। লাঠিতে ভর দিয়ে পাথর থেকে পাথরে পা বাড়াই। কখনো লাফিয়ে পার্বত্যধারা পার হই। কিন্তু দ্বিতীয় বাঁক ঘুরতেই পড়ি মহাসমস্যায়।

সামনে প্রশস্তধারা। প্রচণ্ড তার বেগ! কতটা গভীর তাও কেউ জানি না। আলম সিং বলে—বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে এলে পাথরে পাথরে পা রেখে পার হওয়া যেত। বেলা বাড়াতে বরফ গলে এত জল হয়েছে। প্যান্ট গুটিয়ে আগে নিজে স্রোতের গভীরতা দেখে। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—নেমে আসুন। কোনো ভয় নেই। আমার তো মাথায় হাত পড়ে 'হাণ্টার-সু' খোলার চিন্তায়। কিন্তু উপায় কি! জুতো-মোজা খুলে প্যাণ্টটা হাঁটুর উপরে গুটিয়ে নিই। একটু একটু করে লাঠিতে ভর করে জলে নামি। ঠাণ্ডায় মনে হলো পা দু'খানা কেউ কেটে নিয়েছে। মাঝামাঝি যেতে হাঁটুর উপর জল ওঠে। প্যান্ট ভিজে যায়। কিন্তু সেদিকে তাকাব কি! খরস্রোতে পা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাই। প্রায় দশ বারো ফুট স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে পারে উঠি। অসাড় পা দু'টো নিয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়ি। তাড়াতাড়ি জুতো মোজা পরি দু'হাতে বেশ করে রগড়াই, তবে উঠে দাঁড়াতে পারি।

জলস্রোত পার হয়ে খানিকটা উপরে উঠি। বাঁদিকে দেখি পাহাড়-কাঁপানো জলপ্রপাত। একটা নয়, দু'টো নয়, পরপর পাঁচটা। প্রায় হাজার ফুট উঁচু থেকে আকাশের বুক চিরে

ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেমন তাদের প্রচণ্ড বেগ, তেমন গম্ভীর আওয়াজ। যেন দুন্দুভি শব্দে আকাশ-গঙ্গা নামছে। এক অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্য। আলম সিং বলে,—এর নাম 'পঞ্চসর'। ইচ্ছা থাকলেও বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারি না। সামনে সংকটময় পথ। দিনের আলোতে পার হতে না পারলে সমূহ বিপদ।

শিরদাঁড়া ধরে চলছি। কোথাও নড়বড়ে পাথরে টাল সামলাই। কোথাও কুলির হাত ধরে জলের ধারা পার হই। সেও যায় ভাল। সামনে আসে কঠিন পরীক্ষা। দূর থেকে দেখা সেই বিস্তৃত হিমবাহের সঙ্গম। যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। যেন এক শ্বেত সমুদ্র।

প্রথমে নিজের চেষ্টাতেই খানিক উঠি। তারপর আর পা রাখতে পারি না। চড়াই ক্রমাগত এমন খাড়া হয়ে ওঠে যে বারে বারে নীচের দিকে নেমে যাই। দলনেতা দেবুবাবু তাড়াতাড়ি সামনে এসে আইস-অ্যাক্স দিয়ে খাঁজ কেটে দেন। আর তাতে পা রেখে একজনের পেছনে আর একজন এগিয়ে চলি। এক ঘণ্টার উপর লাগে হিমবাহের শেষপ্রান্তে পৌঁছোতে।

তাতেও কি বিপদ কাটে! শুরু হয় পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া চড়াই। পা রাখার জায়গা যেমন সংকীর্ণ, তেমন বালি-পাথরে ঝুরঝুরে। পনেরো বিশ ফুট জায়গা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়। কষ্টের চেয়েও আতঙ্কে মুখ শুকোয়। তবু বিশ্রামে বসি না বেলার দিকে তাকিয়ে। সূর্য হেলে পড়ে। পথ কতটা বাকি, কি তার চেহারা কিছুই জানি না।

চড়াই শেষে খানিকটা নেমে আবার ওঠা। তারপর আকাশের গা ছোঁয়া বহুদূর বিস্তৃত এক সরলরেখা। শুনি ঐ রেখাই নাকি আমাদের সামনে এগোবার পথ। এই প্রাণ সংশয়কর দুর্গম পার্বত্য শিরদাঁড়ার কথা মহাভারতে পড়েছি। পূর্ব-সূরীদের মুখেও নানা বর্ণনায় শুনেছি। এমন মুখোমুখি হব কোনদিন ভাবিনি। ভয় আর আনন্দের জড়াজড়িতে কেমন যেন অচল হয়ে পড়ি। মনকে শক্ত করে সন্তর্পণে পা বাড়াই। দু'পাশে পাহাড়ের ঢাল। ঢালের গায়ে নানা আকারের বিচিত্র বর্ণের পাথর। আমরা চলছি শিরদাঁড়ার উপর থেকে পঁচিশ ত্রিশ ফুট নীচ দিয়ে। বাঁদিকে প্রায় শ'চারেক ফুট নীচে বিস্তৃত হিমবাহ। কখনো বড় বড় শিলাস্তূপ দু'হাতে ধরে তার মাথায় উঠি। কখনো পাহাড়ের বুক ধরে সামনে পা বাড়াই। কোথাও লাঠিতে ভর দিয়ে এক শিলা থেকে আর এক শিলায় পা ফেলি। সামান্য অন্যমনস্ক হলেই, হয় গড়িয়ে চারপাঁচ ফুট নীচে পড়া, নয়তো পাথরের ফাঁকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গা। এমন একাগ্রতার সঙ্গে চলছি, যে পেছনের সঙ্গীরা কে কোথায় আছে তাকাতে সাহস পাই না। দেবলোকের পথ এমন কঠিন বলেই বোধ হয় এত বেশী আকর্ষণীয়।

ঘণ্টা দুই এইভাবে চলার পর একটু একটু করে নীচে নামতে থাকি। যত নামি পাহাড়ের রূক্ষতা কমে আসে। আশেপাশে দেখা দেয় কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়। ঢালের নীচে বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর। কোথাও বরফ গলা স্রোত। কোথাও ক্ষুদ্র জলাশয়। যেন গিরিপ্রাচীরে ঘেরা আধমজা সরোবর।

আলম সিং বলে—আর ভয় নেই। বাবুজী। চক্রতীর্থে এসে গেছি। নীচের সমতল জায়গাটা ছাড়িয়ে সামান্য উপরে উঠলেই গুহা। আপনারা আস্তে আস্তে আসুন। আমি এগিয়ে যাই।

আলম সিং সড়সড় করে নেমে যায়। আমরাও খানিকটা স্বচ্ছন্দে পা ফেলি। প্রান্তরের মাঝামাঝি যখন পৌঁছোই সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে। সামনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে একটা শিলাস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আলম সিং আর যশপাল হাত নাড়ছে। তবে ঐ কি গুহা? এতগুলি লোক ওর মধ্যে থাকব কি করে?

থাক্ সে চিন্তা। যিনি টেনে এনেছেন তিনিই করবেন সে ব্যবস্থা। চৌধুরীদা ও সেনদাকে এগোতে বলে খোকন ও ডাক্তার বিশ্বাসের অপেক্ষায় একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসি।

নিস্তব্ধ নিঝুম সন্ধ্যা। ধ্যানগম্ভীর গিরিমালা। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিমণ্ডল। শুনেছি নারায়ণ নাকি এক সময় এখানে সুদর্শন চক্র রেখে ধ্যানে বসে ছিলেন। নারায়ণ কি করেছিলেন পুরাণকারেরাই জানেন।—তবে আজও নিতান্ত বিষয়ী লোকও যদি এসে বসে, সংসার জীবনের সব কথা যে ভুলে যাবে, তা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আনন্দের আতিশয্যে চোখ ভেঙ্গে জল আসে। কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ি।

আচম্‌কা বজ্রনিনাদে পাহাড় কেঁপে ওঠে। চম্‌কে উঠে চারপাশে তাকাই। দেখি ভগীরথ খড়কের দিকে ধোঁয়া উঠছে। ইতিমধ্যে খোকনদের নিয়ে দেবুবাবুও এসে পাশে দাঁড়ান। বলেন,—শুনেছেন হিমানী-সম্পাতের গর্জন?

—শুধু শুনেছি? হৃদযন্ত্রটি প্রায় বিকল হয়ে পড়েছিল। হেসে বলেন—রাতে আরও দু'একবার বিকল হতে পারে। অবিশ্বাস করি না। যে ভাবে পাহাড়ের গায়ে বরফ ঝুলছে, খসে পড়লেই হয়।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসার আগে যথাস্থানে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। সারা দিন শরীরের উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তাতে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনা। অথচ কোথাও যে হাত-পা ছড়াব তেমন জায়গাও দেখছি না।

ছোট গুহা। দু'জন বড়জোর তিনজন কোনোমতে পা টান করতে পারে। তবু ওরই মধ্যে ঢুকে পড়েছেন খোকনকে নিয়ে দুই ডাক্তারবাবু ও সেনদা। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কে কি অবস্থায় আছে জানি না। তবে সেনদার পা-দু'খানি তখনও গুহার মুখ জুড়ে। অর্থাৎ ভিতরে টানার মত জায়গা নেই। এদিকে বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারি হয়। জুতোর ফিতে খুলতে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়। ডাক্তারবাবুরা ভিতরে ডাকেন। কিন্তু ঢুকব কোথায়? মোমবাতি জ্বালিয়ে সেনদা বলেন—আসুন এর মধ্যেই ব্যবস্থা করে নেব।

ছোটখাটো মালপত্রগুলি পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে কোনো রকমে আর এক জনের পিঠ ঠেকাবার ব্যবস্থা হয় তবে খোকনের জায়গা হয় বুকচাপা এক পাথরের নীচে। কিন্তু যার জন্য দুশ্চিন্তা, তার কিন্তু সামান্যতম উদ্বেগ নেই। অভিনব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় ও যেন আনন্দে বিহ্বল।

আশ্রয়ের মোটামুটি একটা সুরাহা হলে, গাইড্ ও কুলীদের নিয়ে দেবুবাবুর অবস্থা দেখতে বেরিয়ে পড়ি। কারণ গুহা বলতে ঐ একটি। সঙ্গে টেন্টও নেই যে বিকল্প ব্যবস্থা হবে। অথচ বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি হিমানী সম্পাত।

গুহা থেকে খানিকটা উঁচুতে আলোর শিখা দেখে এগিয়ে যাই। কাছে যেতেই দেবুবাবুর সাদর অভ্যর্থনা—ভিতরে আসুন শান্তিদা। স্টোভের পাশে বসুন। হেসে বলি—ভিতর কোথায়? সবটাই তো খোলা আকাশের নীচে।

—না-না। দেখছেন না পাথরখানা কেমন অষ্টনাগের ফণার মত হয়ে আছে। দু'পাশে দেখুন বিশ্বাসদার প্লাস্টিক শীট দু'খানা কেমন কাজে লাগিয়েছি। তা ছাড়া চারপাশের পাথরগুলিও দেয়ালের মত হয়ে হাওয়া আটকাচ্ছে।

কথার মাঝে পণ্ডিতজীও এসে কম্বল জড়িয়ে বসেন—বলেন—সবই বদ্রীনাথজীর লীলা বাবুজী। নয়তো গুহা আর পাথর দিয়ে এমন করে সাজিয়ে রাখবেন কে? সাধুসন্তেরা তো এরমধ্যেই সাধন-ভজন করেন।

—ওঁদের কথা ছেড়ে দিন পণ্ডিতজী। ওঁরা ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর। ভোগবিলাসে অভ্যস্ত আমরা কি পারব এত কষ্ট সইতে?

—না পারলে আনন্দলোকের স্বাদ পাবেন কি করে? স্বর্গের পথে চলছেন। পরীক্ষা দেবেন না?

—পরীক্ষা যে বড় কঠিন পণ্ডিতজী। উৎরোতে পারব কি?

—ঠিক পারবেন। যাঁর নাম নিয়ে এতটা পথ এসেছেন, তাঁর কৃপা হবে না? রাত পোয়ালেই দেখবেন কোথায় এসে পড়েছেন। ঘরে ফেরার কথা একবারও মনে আসবে না।

বই-এ পড়েছি। পূর্বসূরীদের মুখেও শুনেছি তপোলোকের আশ্চর্য মহিমা। কিন্তু সে দিন হিমালয়ের গহনলোকে মনটা যেমন নাড়া খেয়েছিল, তেমন আর কোনো দিন বোধ করিনি। এক অদ্ভুত উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত জড়তা যেন ছেড়ে যায়। মনটা চনমন করে ওঠে রাত্রি অবসানের অধীর প্রতীক্ষায়।

স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াই। দেবুবাবু টেনে ধরেন—বসুন, একটা নতুন জিনিস খাওয়াব আজ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে স্টোভের পাশে জমিয়ে বসি। শিবরাজ খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে—এ পাহাড়ী খানা বাবুজী। খেলেই গা গরম।

কড়াই থেকে খানিকটা থালায় তুলে দেয়। বার দুই মুখে দিয়ে থালাখানা সরিয়ে রাখি। একে অরুচি, তার উপর নোনতা হালুয়া। কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠে। শিবরাজ বোধ হয় একটু ক্ষুন্ন হয়। বলে—এত উঁচুতে এই হলো সবচেয়ে ভাল খানা বাবুজী। খেয়ে ফেলুন। শরীরটা তাজা হবে।

কষ্ট করে আরও কয়েকবার মুখে দেই। কিন্তু গলার নীচে আর নামে না। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ি।

অবসাদে কেমন যেন অর্ধচেতন অবস্থায় ঢলে পড়ি। কথা কানে আসে। বলতে পারি না। চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। রুটি তরকারি দিয়ে যায়। ক'বার মুখে দিয়েছি, মনে নেই। ক্লান্তির ঘোর যখন কাটে, মুখমোছা রুমালখানা তখনও হাতের মধ্যে।

শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে রাতে একবার না উঠে পারি না। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে অনেক কষ্টে বাইরে বেরিয়ে আসি। শীতে হাত-পা জমে যায়। তবু ভিতরে ঢোকার কথা মনে আসে না।

নিঝুম নিভৃত রাত্রি। নিস্তব্ধ তুষার মৌলী হিমাদ্রি। ধ্যানগম্ভীর সে যেন এক মহাযোগীর মুখোমুখি। এই অখণ্ডমৌনতায় সুর মিলিয়ে কোথা থেকে এক অপূর্ব গুঞ্জন ভেসে আসে। কান খাড়া করে শুনি দেবতার বন্দনায় নির্ঝরের গান। সুর ও লয়ের মূর্ছনায় সর্বাঙ্গের গ্রন্থিগুলি বিবশ হয়ে আসে। ভয়-ভাবনার অতীত এক অপার্থিব অনুভূতিতে নিথর হয়ে থাকি। ইচ্ছা হয়, অনন্তকাল এমনি পাথর হয়ে থাকি। কিন্তু এ ভোগের শরীরে তা সম্ভব হয় না। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে যাই সেই অন্ধকার গুহাতে।

পরের দিন অর্থাৎ ১৩ই জুন ভোর না হতেই পণ্ডিতজীর কণ্ঠে সুললিত শিবস্তোত্র। শিবরাজ আর কুয়ার সিংও শুয়ে নেই। তাড়াতাড়ি উঠে স্টোভে চায়ের জল বসায়। ব্রেকফাস্টের আয়োজন করে। গহন গিরিলোকে সে এক উদ্দীপনাময় সোরগোল। দুর্গম-পথ-যাত্রার আজ শেষ পর্ব। স্বপ্নের শতোপন্থ দর্শনের আসন্ন মুহূর্ত।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই। আলম সিং তাড়া দেয়—তাড়াতাড়ি। তৈরী হয়ে নিন। ন'টায় পৌঁছোতে পারলে বারোটার মধ্যে ফিরে আসতে পারব। চৌধুরীদা লাঠিটা হাতে নিয়ে বলেন,—তৈরী তো হয়েই আছি। পোশাক পরিচ্ছদ কি কিছু খুলেছি রাতে? জুতোর ফিতে বাঁধলেই পা বাড়াতে পারি।

ব্রেকফাস্টের প্যাকেট নিয়ে সাড়ে ছ'টার বেরিয়ে পড়ি। সকলের আগে চৌধুরীদা ও সেনদাকে নিয়ে আলম সিং। পেছনে পণ্ডিতজী, কুয়ার সিং ও ডাক্তার বিশ্বাস। সবশেষে শিবরাজের সঙ্গে আমি আর খোকন। দেবুবাবুর আর দলভারী করার সুযোগ হয় না। তাঁকে থাকতে হয় খানা তৈরীর ব্যবস্থায়।

যাত্রা শুরু হয় ১৩৭৭০ ফুট থেকে। সমাপ্তি ঘটবে ১৫০০০ ফুট অতিক্রম করে ১৪৪০০ ফুটে। সামনে সেই সুউচ্চ পার্বত্য শিরদাঁড়া যেন দিগন্ত বিস্তৃত এক বিশাল প্রাচীর। একদিকে ঢাল নেমেছে চক্রতীর্থের গুহার দিকে। অপর দিক নেমেছে গন্তব্যস্থল অভিমুখে। চড়াই বেয়ে উঠছি। ফেলা আসা পথের মত প্রাণ সংশয়ী না হলেও বিপদ-সংকুল। সর্বত্রই প্রায় জলে ভেজা গোছা গোছা ঘাস। কোথাও বালিকাঁকরের মাঝে ছোট ছোট কাঁটা গাছ। পথ বলতে কিছু নেই। যার যেখানে সুবিধা হয় পা ফেলে উঠি। কখনো শক্ত হাতে আগাছা ধরে। কখনো লাঠির সাহায্যে? যাত্রারম্ভের দলবদ্ধতা ভেঙ্গে সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তবে দৃষ্টি রাখি আলম সিং-এর দিকে।

শ'খানেক ফুট উঠতেই বেশ হাঁপিয়ে পড়ি। বুকে কেমন একটা চাপ বোধ করি। তবে সকালে চড়াই ভাঙ্গতে গিয়ে পূর্বেও এরকম অনুভব করেছি। হয়তো সেই অভিজ্ঞতার জন্যই মনোবল হারাই না। মিশ্রির টুকরা মুখে ফেলে একটু দম নেওয়ার চেষ্টা করি। সেনদার মুখে ওয়াটার-বোটল। চৌধুরীদা লাঠিতে কপাল ঠেকিয়ে নিশ্চল। ক্লান্তি নেই পণ্ডিতজীর। সদাপ্রফুল্ল মুখে কখনো সঙ্গীদের অভয়দান, কখনো বিধাতার জয়গান।

প্রায় ঘন্টাখানেক এভাবে হাত-পায়ের পরীক্ষা দিয়ে শিরদাঁড়ার শীর্ষদেশে পৌঁছোই। তারপর যে দৃশ্য, তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমন ভয়ঙ্কর। সামনে তুষারমণ্ডিত শতোপন্থের শিখর। আর তার বিশাল বক্ষ জুড়ে বিচিত্র ভঙ্গে শুভ্র তরঙ্গ। নিসর্গের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন স্বর্গশোভা দেখছি। আলম সিং-এর মুখে শুনি ওরই নীচে শতোপন্থতাল। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নাকি ঐ স্বর্গীয় সরোবরের তিন কোণে যোগাসনে সমাহিত।

কিন্তু স্বপ্নময় দেবলোকে যাই কি করে? নীচের দিকে তাকালে সর্বশরীর কেঁপে ওঠে। প্রায় পাঁচশো ফুট একটানা ভয়ঙ্কর উৎরাই। পথ তো দূরের কথা। সহজভাবে পা রাখারও সুবিধা নেই। বসে আছি যেন বিশালকায় এক জন্তুর পিঠে দু'পাশে পা ফেলে।

পণ্ডিতজী অভয় দেন। শিবরাজ উৎসাহ দেয়। আলম সিং ঝুরঝুরে বালি-পাথরে অ্যাক্স দিয়ে গর্ত করে। শক্ত করে হাত ধরে। তবে অতি সাবধানে এক এক করে নীচে নামি। উৎরাই-এর শেষে পৌঁছে মনে হল প্রাণটা ফিরে পেয়েছি।

এরপর আবার শুরু হয় পূর্বদিনের মত বিধ্বস্ত পাহাড়ের শিলাপাথর, ধূসর ধূলোবালি। তবে পথ দুর্গম হলেও তেমন কষ্টকর মনে হয় না। বোধহয় অতীতের অভিজ্ঞতাই এর কারণ। প্রায় দেড় কিলোমিটার পার হয়ে আবার একটা উঁচু বাঁধের মত জায়গায় উঠি। এখান থেকে প্রথম দর্শন করি স্বপ্নের দিব্য সরোবর।

মাথার ওপর উদার অনন্ত আকাশ। চারপাশে তুষার মৌলী গিরিশিখর। আর তার মাঝে নীল কাচের মত স্বচ্ছ বারি। যেন কোনো সুদক্ষ শিল্পীর পটে আঁকা ছবি। স্বর্গ কোথায় জানিনা। তবে এ দৃশ্য যে এক অপার্থিব অনুভূতি জাগায় সে কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

বদ্রীনাথ থেকে সত্যপদ বা শতোপন্থতালের দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার। অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪৪০০ ফুট উচ্চতায়। অর্থাৎ প্রায় মানস-সরোবরের সমান উঁচুতে। হ্রদের পরিধি প্রায় দেড় কিলোমিটার। দেখতে অনেকটা হরতনের মত। আকারে ছোট হলেও এর নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয়।

কাছে যাওয়ার জন্য দুরন্ত বেগে নেমে চলি। পথের দুর্গমতা বা বিপদের সম্ভাবনা মনে থাকে না। শুধু আমার নয়, উৎসাহের আতিশয্যে বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল অন্যান্য সঙ্গীদেরও।

হ্রদের কাছে পৌঁছে এক মহাবিস্ময়ের মুখোমুখিতে সব যেন স্তব্ধ হয়ে যাই। সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনা সব বিস্মৃত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার আনন্দে বিভোর হয়ে থাকি।

পণ্ডিতজী ও শিবরাজ স্নানান্তে পিতৃপুরুষদের জলদান করে। অন্যান্য গাড়োয়ালবাসীরা স্নান না করলেও হাত-পা ধুয়ে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে। পারি না আমরা শরীরের অক্ষমতায়। পুণ্যবারি শুধু সর্বাঙ্গে সিঞ্চন করে তীর্থযাত্রা সার্থক মনে করি।

বদ্রীনাথের সাধু সন্তোষগিরি বলেছিলেন তাঁর গুরুজী এখানে সাধন-ভজন করেন। সকলেরই ইচ্ছা তাঁকে দর্শন করবার। কিন্তু কোথায় তাঁর আসন কেউ জানি না। আশপাশের গুহার দিকে তাকাই। এমন সময় ডালপালা কাঁধে এক সাধুজী এগিয়ে আসেন। বয়স সত্তরের ঘরে হবে। তবে বেশ মজবুত শরীর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গায়ে শুধু একখানা পাতলা কম্বল। আশ্চর্য, যাঁর কষ্টের কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করি, তিনি কিন্তু নির্বিকার। বলেন—কুঠিয়ায় চলুন চা খেয়ে ঘুরতে বেরোবেন। চা-পানে আগ্রহ না থাকলেও সাধুজীর কুঠিয়া দর্শনের লোভ ছাড়তে পারি না।

চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি—কোথায় পেলেন ডালপালা, সারা পথে তো পাথর আর বরফই দেখলাম।

—ঠিকই বলেছেন। তবে এখানে কিছু জুনিপার গাছ আছে। বড় চমৎকার গাছ কাঁচা অবস্থাতেও বারুদের মত জ্বলে। বরফের রাজ্যে আগুনের জন্য এই গাছই একমাত্র সম্বল।

সাধুজী চায়ের আয়োজন করতে যান। বাধা দেই—অকারণ ব্যস্ত হবেন না সাধুজী। বসতে পারব না। বরং যতটুকু সময় আছি ঘুরে দেখি।

—তা দেখুন। তবে একদিন থেকে গেলে আরও দুটি সুন্দর কুণ্ড দেখে যেতে পারতেন। ডাক্তার বিশ্বাস বলেন—সোমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ডের কথা বলছেন তো? সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না। আজই চক্রতীর্থ ছেড়ে ফেরার পথে রওনা হতে হবে।

সাধুজী আমাদের দিনের হিসাব জানেন না। তাই আবার উৎসাহ দিয়ে বলেন—বার বার তো আসা হবে না। একদিন থেকে দেখে যান। খুব একটা দূরও নয়। সোমকুণ্ড মাত্র আড়াই কিলোমিটার। সূর্যকুণ্ড সেখান থেকে আর ততটা। তবে দুর্গম। যেতে আসতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগবে।

দর্শনের খুব ইচ্ছা হলেও থাকতে পারি না নানা কারণে। প্রথমতঃ একদিন দেরী হলে নির্দিষ্ট দিনে হরিদ্বারে ট্রেন ধরা খুবই কঠিন হবে। তাছাড়া সাধুজীর ঘরখানাও এত বড় নয় যে আট দশজন লোক থাকতে পারি। সঙ্গে তাঁবু ও রেশনও নেই যে একদিন কাটাব

প্রত্যাবর্তনের জন্য উঠে দাঁড়াই। সেনদা ও ডাক্তার বিশ্বাস প্রণামী হিসাবে কিছু রাখেন গ্রহণ করেন না। বোধহয় খাদ্যসামগ্রী কিছু দিলে গ্রহণ করতেন।

বাইরে নেমে দাঁড়াই। উনিও এসে পরমাত্মীয়ের মত পাশে দাঁড়ান। তারপর এক এব করে বিভিন্ন গিরিশিখরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—সামনে যে অভ্রভেদী মহাশৈল দেখছেন ঐ হলো চৌখাম্বা, যাকে গাড়োয়ালের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেখেছেন। তবে এত কাছে এমন স্পষ্ট করে কোথাও পান নি। শতোপন্থ হিমবাহ ওখান থেকেই নেমে এসেছে। ওর অপরদিকে নেমেছে গঙ্গোত্রী-হিমবাহ। পর্বতারোহণের শিক্ষা ও অভিজ্ঞত নিয়ে দু'একটা দল আজকাল ঐ দুর্গম পথে গঙ্গোত্রী থেকে বদ্রীনাথ আসে। সেনদা সা

দিয়ে বলেন—ঐ পথেরই একদল পর্যটকের সঙ্গে মানা-চেক পোস্টে দেখা হয়। ওদের মুখেও শুনেছি পথের ভয়াবহ দুর্গমতা। তবে ওদের কষ্টের কিছুটা লাঘব হয়'গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম' এর পরিচালনাধীনে আসাতে।

কথার মাঝে হঠাৎ ডাক্তার বিশ্বাসের উল্লসিত কণ্ঠ—দেখুন,—দেখুন ঐ উজ্জ্বল হিমগিরি কেমন ধাপে ধাপে উঠে আকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। সাধুজী বলেন—ঐ তো স্বর্গারোহিণী,—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের সিঁড়ি। খুব ভাগ্যবান আপনারা। এমন ঝলমলে নীল আকাশ বড় একটা দেখা যায় না এখানে। বদ্রীনাথের করুণাতেই বোধহয় এমন দর্শন হলো। আনন্দে চোখ দিয়ে জল গড়ায়। শুধু আমার নয়, যারা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সকলের। যেন এক মহাজ্যোতির স্পর্শে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে দূর-দূরান্তে ভেসে চলছি। হারিয়ে ফেলেছি আমার 'ছোট-আমি' কে 'বড়-আমি'র মধ্যে। হিমালয়ের আলো বাতাস উদার পরিসর মানুষের প্রকৃতিতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এটাই তার বিশেষ মহিমা। তার একদিকে যেমন আছে ভয় ও ভীষণতা। অন্যদিকে তেমন আছে মধুর প্রশান্তি, ভাবের গাম্ভীর্য ভাব ও ভাবনার, সাধন ও দর্শনের এত বড় আশ্রয় আর কোথাও নেই। সে যে দেবতাত্মা। তাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জুনকে বিভূতি বর্ণনকালে বলেছিলেন—'যজ্ঞানাম জপোযজ্ঞোহস্মি স্থাবরানাং হিমালয়'।

হিমালয়ে হয়তো আরামের শয্যা নেই; বিলাসের উপকরণ নেই। কিন্তু আছে অপার শান্তি, অসীম আনন্দ যারা তার পাথরে জঙ্গলে বিচরণ করেছে, রবিকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট দেখেছে, নিঃশব্দে শুনেছে অন্তরস্পর্শী অমৃত গুঞ্জন, তাদের বারবার ছুটে আসতে হবে তার রহস্যময় জগতে।*

*লেখকের 'শতোপন্থ ও পঞ্চকেদার' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

মদমহেশ্বর থেকে মুখিমঠ, সেকালে

শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর লালসাঙ্গাতে সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পরিব্রাজক শ্রীমৎ শীতলগিরিজিউ মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতা শ্রীশ্রীমতী ভূষণমণি সহ শ্রীশ্রীগুরুচরণ স্মরণপূর্ব্বক অলকানন্দার সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি, উক্ত পথে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ হইতে প্রত্যাগত কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রী ও সাধুমহাত্মার সহিত দেখা হয়। ক্রমশঃ দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রী৺গোপেশ্বর নাথ মহাদেবের নামীয় চটীতে উপনীত হই। এই স্থানটী কেদার খণ্ডে গোস্থলা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীশ্রী৺গোপেশ্বর দেবের মন্দির; তাহার সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ত্রিশূল, বৈতরণী কুণ্ড, দশ বারখানি ঘর, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের এবং মিঠাই আদির দোকান পাঠ ইত্যাদি আছে। এখানে জলের কষ্ট একটু বেশী, কারণ অনেক দূর হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে আবার উতরাই করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দুই মাইল দুরবর্ত্তী "বীর চটীতে' যাইয়া পৌঁছি। এই চটীর নিম্নদেশ দিয়া বীরনদী প্রবাহিতা; নদীর তীরে অনেক স্থলে বচের গাছ দেখা গেল। এখানে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদির দোকান আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে একটী সহজ চড়াই করিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী রাম চটীতে উপনীত হই। এখানে দুইখানি ঘর ও সাধারণ দ্রব্যাদির দোকান আছে। পার্শ্বে একটি জলের ঝরণা আছে। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বেলা তিনটার সময় অগ্রসর হইতে থাকি। এস্থান হইতে ক্রমশঃ সমতল রাস্তায় একমাইল দূরে আরামচটী পাওয়া যায়, এখানে জোয়ানা কোতোয়াল নামক জনৈক পাহাড়ী রাজবংশী স্বব্যয়ে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন ও অভ্যাগত সাধুমহাত্মাগণকে স্বব্যয়ে সদাব্রত দিয়া থাকেন, পার্শ্বে নিজের একটী দোকানও আছে তাহাতে প্রায় সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত থাকে। পার্শ্বে আরও একটী ধর্ম্মশালা আছে। ইহার পার্শ্ব দিয়া বালাসুত নদী প্রবাহিতা। ক্রমশঃ সমতল পথে চলিতে চলিতে বালাসুতা নদীর পুল পার হইয়া খানিক অগ্রসর হওতঃ রুদ্রগঙ্গার উপর পুল অতিক্রমান্তে মণ্ডলচটীতে যাইয়া উপনীত হই। এইস্থান হইতে একটী পথ চতুর্থ কেদার বা রুদ্রনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে ও দেড়ক্রোশ চড়াই পথে কংচে পর্ব্বতের উপর শ্রীঅনুসূয়া দেবীর মন্দির আছে। ঐ সকল স্থানে যাইতে হইলে বা দেবী দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। মণ্ডলচটীর বন্দোবস্ত অতি সুন্দর; ১০/১২ খানী বড় বড় ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। চটীর মধ্যদেশ দিয়া ৩/৪ টী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। চটীওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক। এখানে রাত্রিতে জলযোগ করিয়া রাত্রিবাস করা হয়। এখানে শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী নামীয় একজন বাঙ্গালী মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি, বউ কথা কও, পিকবধূ ঘুঘু প্রভৃতি বনবিহঙ্গগণ মধ্যে মধ্যে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মনে বেশ আনন্দ দিতেছিল। এই পথে লালসাঙ্গা হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও পাহাড় অঞ্চলেই তাঁহার বাসস্থান। তিনি বেশ সজ্জন, আমাদিগকে পথের অনেকগুলি সংবাদ বলিয়া দিলেন। ক্রমশঃ চড়াই করিতে করিতে সাড়ে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গল বা পাঙ্গরবাসা চটীতে আসিয়া উপনীত হই, এখানে সরকারী ধর্ম্মশালা, ৪।৫ খানা দোকান ও বড় বড় ঘর আছে। খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ জলখাবার জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। পরিস্কার জলের ঝরণাও আছে, তবে স্থানটী দেখিতে একটু অপরিস্কার। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে ক্রমশঃ চড়াই করিয়া একটী পর্ব্বত শৃঙ্গদেশে উঠি। এস্থান হইতে চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের সারি সারি প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ও পরিস্কার বায়ুসেবনে সমস্ত পথশ্রান্তি বিদূরিত হইয়া মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। ক্রমশঃ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশস্থ পথে অগ্রসর হইয়া আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী ভীমচটীতে উপনীত হই। এখানে পরিস্কার জলের ঝরণা, ৪।৫ খানা ঘর, খাদ্যদ্রব্যের ও সাধারণ মিঠাই প্রভৃতির দোকান আছে। এই চটীতে পরিস্কার ও ভাল মধু পাওয়া যায়। চটীওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের ঐক্যভাব দেখা গেল না। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়, এখানে দিনের বেলায়ও বেশ ঠাণ্ডার অনুভূতি হইয়াছিল। এস্থানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও বাস করা হয়। এই চটীর মধ্যদেশ হইতে একটী পথ শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর উক্ত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে চড়াই করিতে আরম্ভ করি। দুই পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল। ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা অনুভূত হইতে লাগিল, বেলা ৮টার সময়, শ্রী৺তুঙ্গনাথপর্ব্বত শিখর দেশে যাইয়া পৌঁছি। এখানে আসিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দভোগ করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালা আমাদের অতি নীচে দেখা যাইতে লাগিল, সুদূরবর্ত্তী তুষার ধবল পর্ব্বতশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এখানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেব, শ্রীশ্রীব্যাসদেব, ও শ্রীশ্রীমৎজগদ্‌গুরু শ্রী ১১০৮ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি একমন্দিরে আছে। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত ও চারিটী রৌপ্যনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে, পার্শ্বে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবী, শ্রী৺কালভৈরব এবং অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি আছে। মন্দিরের কিছু নিম্ন হইতে আকাশগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, উক্তস্থানে একটী জলের কুণ্ড বাঁধাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের প্রত্যহ পাঁচসের পরিমাণ ভোগের বন্দোবস্ত আছে। সমস্তই পাণ্ডা-মহারাজগণের ইচ্ছামত সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের রাওলসাহেব শ্রীমৎ বিশ্বলিঙ্গ জিউ মহারাজ এখানকার রাওল। তিনি যখন পূর্ব্বতন রাওলের চেলা ছিলেন তখন লালসাঙ্গার সবডিভিসনাল অফিসারের সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় একবার মাত্র এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, রাওলপদে

অভিষিক্ত হইবার পর আর এদিকে শুভাগমন করেন নাই। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের মন্দিরের দরজা শীতের ছয়মাস বন্ধ থাকে তখন ঐ পাঁচটী ধাতুমূর্ত্তির এইস্থান হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী মুক্ষু বা মুখীমঠে পূজা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে পাণ্ডামহারাজগণের বসতি আছে। শ্রীশ্রীকেদারনাথ দেবের দরজা খুলিবার তিনদিন পরে শ্রীতুঙ্গনাথদেবের দরজা খোলা হয়।

আকাশগঙ্গাতে স্নানপূর্ব্বক মদীয় পরিব্রাজক মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাসহ দর্শনাদি করিতে যাই। পূজারি পাণ্ডামহারাজ সুশৃঙ্খলের সহিত দর্শনাদি করাইলেন। পূর্ব্বে এস্থানে আসা-যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, তাই যাত্রি-সমাগম অতি অল্প হইত, অনেকেই পর্ব্বতের পাদদেশে মস্তক স্পর্শ করাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। এখন চড়াই উতরাই উভয়দিকে সুবিধাজনক রাস্তা প্রস্তুত হইয়া অত্যন্ত সুগম হইয়া গিয়াছে। এখানে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে, তবে সাধারণতঃ একটু মূল্য বেশী। দর্শনান্তে সমাগত সকলকে সদালাপ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উতরাই পথে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী চৌবত্তা চটীতে উপনীত হই। এখানে স্বনামধন্যা অহল্যাবাই জিউর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের ও সরকারী ৪ খানা বড় ধর্ম্মশালা, ৩।৪ খানি দোকান আছে। সাধারণ আহার্য্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তরিতরকারী কিছুই পাওয়া যায় না। জলের কষ্ট অত্যন্ত বেশী, অনেক দূর হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। এখানেও মধু পাওয়া যায় কখনও কখনও দুগ্ধ পাওয়া যায়। এখানে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের পাণ্ডা-মহারাজগণ এখান হইতে যাত্রিগণকে দর্শন করাইবার জন্য লইয়া যান আর যাঁহারা অমূলক ভয়ে যাইতে অনিচ্ছুক হন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও নির্ম্মাল্যাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দান করেন। বেলা ৪টার সময় উতরাই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী বানকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৭।৮ খানা ঘর, পরিস্কার জলের ঝরণা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান পাঠ আছে। এখানে ঝরণার জলের স্রোতের বেগে চাকা ঘুরাইয়া কাঠের ঘটী, বাটী, থালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এস্থানে কাঠের জিনিষ তৈয়ারির কৌশলাদি লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী গোকুলচটীতে উপনীত হই। এই চটীতে ৪।৫ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী পোথীবাসা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ১৫।১৬ খানা ঘর, সাধারণ আহার্য্য দ্রব্যও মিঠাই আদির দোকান ও পরিস্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই চটীর ঘরগুলি বেশ পরিস্কার এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়, ও রাত্রিযাপনান্তে ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে জলযোগের পর কুলুকুলু-নাদিনী আকাশগঙ্গার আনন্দধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ উতরাই পথে দুই মাইল দূরবর্ত্তী দরিয়াচটীতে উপনীত হই। এখানে ৪।৫ খানি ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাইর দোকান, জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে উতরাই পথে এক মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গাচটীতে আসিয়া উপনীত হই। পথে অনেকদল বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় সকলেই শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের চড়াই ও রাস্তার

বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সকলকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করা হয় ও উপদেশাদি দেওয়া হয়। দুর্গাচটীর তলদেশ দিয়া আকাশগঙ্গা আপন মনে প্রচণ্ড নিনাদে সাধারণ যাত্রিগণের পথশ্রান্তি দূর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই স্থানে ৪।৫ খানা ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। দুগ্ধও পাওয়া যায়। আকাশগঙ্গার উপর কাঠের পুল আছে। এখানে সাধারণ বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া গন্তব্যপথে সাধারণ একটী চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করি। মণ্ডলচটী হইতে যে চড়াই আরম্ভ করিয়া ছিলাম তাহার সীমা উত্তুঙ্গ শ্রীতুঙ্গনাথ শৃঙ্গে ও উতরাইর শেষ দুর্গাচটীতে। পথিমধ্যে জঙ্গলী মশা মাছি ও পোকার উৎপাত অত্যন্ত বেশী। চুপি চুপি কখন যে কামড়াইয়া দেয় তাহা বুঝিবার যোটি নাই, যখন চুলকান সুরু হয় তখন টের পাওয়া যায়। এইপথ অতিক্রমের সময় পায়ে ডবলমোজা পরিয়া বা পট্টী বান্ধিয়া চলা বিধেয়। এস্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মচটীতে উপনীত হই। পথে অনেকগুলি পরিস্কার জলের ঝরণা আছে। এই চটীতে ৪।৫ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ইত্যাদি আছে। জল একটু নিম্নদেশ হইতে আনিতে হয়, ইহার পশ্চিমপার্শ্বে শ্রীগরুড় জিউর মন্দির আছে।

বেলা ১০টার সময় মন্দাকিনী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পর্ব্বত মধ্যস্থিত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী উখীমঠে বেলা ১১।। টার সময় যাইয়া পৌঁছি। উখীমঠ পরম রমণীয় স্থান ও পর্ব্বত মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। এস্থানে সুন্দর বাগান আছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া মন্দাকিনী গঙ্গা কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে, এখানে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের পাণ্ডা শ্রীমৎবিশ্বলিঙ্গ রাওল সাহেবের গদি আছে। শীতের ছয়মাস শ্রীশ্রীকেদারনাথের পূজা এই মঠেই হইয়া থাকে। এইস্থানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে পঞ্চ কেদারনাথ অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ, শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ, শ্রীশ্রী৺রুদ্রনাথ, শ্রীশ্রী৺মধ্যমেশ্বরনাথ ও শ্রীশ্রী৺কল্পেশ্বরনাথ, শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবী, উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, মান্ধাতা, প্রদ্যুম্ন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর অনেক মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি প্রধান। এস্থানে পুলিশ চৌকি, পোষ্টঅফিস, দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, সাধারণ সদাব্রতের বন্দোবস্ত, ১৫।২০ খানি ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান, পরিস্কার জলের একটী কুণ্ড, (হাঁসপাতালের পার্শ্বে) পূর্ব্ব পূর্ব্বতন রাওল সাহেবগণের সমাধিস্থান ইত্যাদি আছে। হিমালয় প্রদেশে যতগুলি শিবালয় আছে তাহার প্রায় সকল গুলিই এই রাওল সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। মোটের উপর যতদূর জানা গেল তাহাতে মনে হয় যে, তিনি একজন বেশ সজ্জন ব্যক্তি। শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ দেবের রাওল সাহেবের মত তত বিলাসী নহেন, তবে ইহাঁরও রক্ষিতা স্ত্রীপুত্রাদি আছে। পূর্ব্বতন রাওল মহোদয়গণ সন্ন্যাসীর মত অবস্থান করিতেন এখন কালের কুটিল গতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্বতন চারিজন রাওল হইতে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান রাওলগণ আপন ভোগবিলাসাদি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অধিকারভুক্ত মঠাদির পরিদর্শন করিতেও অবসর পান না। এই স্থানে একটী ঘরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময়

পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেবের ধর্ম্মবন্ধু কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার কারফর্ম্মা মহোদয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি সস্ত্রীক ও সপুত্র শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেবের সমাধি গ্রহণের বিষয়াদি আলোচনা করিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উপদেশচ্ছলে আমার ভাবী জীবনের কতকগুলি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সময়েই হাওড়া বারাকপুরের সাধুমাতার আশ্রমস্থ শ্রীমৎ কিশোরানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের সহিত দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়। তিনি একজন সজ্জন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি; পরিব্রজ্যাবলম্বনে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন এবং শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম অভিমুখে চলিয়াছেন। পরস্পরের গতি বিপরীত দিকে বলিয়া বিশেষ কথাবার্ত্তাদি হইল না। এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও বাস করা হয়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শ্রীযুত সূর্য্যবাবুর পরিবার সহ মঠস্থ দেবতাদের দর্শন করিতে যাওয়া হয়। অদ্য শ্রীশ্রীমধ্যমেশ্বরনাথের যাত্রার দিন। যাত্রাটী কেবল বাদ্যোদ্যমে পরিসমাপ্ত দেখিলাম। উখীমঠ হইতে ১২ মাইল দূরে ঈশান কোণে দ্বিতীয় কেদার বা মধ্যমেশ্বরনাথের মন্দির। তাহা দর্শন করিতে হইলে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তাঁহারও পূজা ছয় মাস তথায় ও শীতের ছয়মাস উখীমঠে হইয়া থাকে। এখানে জলযোগ করিয়া উতরাই পথে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিয়া তিন মাইল চড়াই-এর পর গুপ্ত কাশীধামে উপনীত হই। যে যাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগ হইতে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা পথে যে সকল চটী পার হইয়া আসেন তন্মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ১০।। মাইল দূরবর্ত্তী অগস্ত্যাশ্রম একটী প্রধান স্থান। এখানে অগস্ত্যমুনির মন্দির ও তথা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের মন্দির আছে। তথায় একটী রুদ্রাক্ষের গাছ আছে এবং তথা হইতে ৪ মাইল দূরে চন্দ্রানদী ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গাদেবীর মন্দিরাদি আছে। এখানে যে লৌহ সেতু আছে তাহা পার হওয়ার জন্য মাশুল দিতে হয়। প্রায় সকল চটীর বন্দোবস্তাদি ভাল। এই পথে গুপ্তকাশী অতি প্রসিদ্ধ স্থান। উখীমঠ হইতে এ স্থানে আসিবার সময় মধ্য পথে যে পুল আছে তাহার দুইদিকে দুইজন প্রহরী নিযুক্ত আছে ও তাহারা অতি সাবধানে যাত্রীদের পার হইতে দেয়। পর্ব্বতগাত্রে নানা ফুল ফলে শোভিত গুপ্তকাশী স্থানটী পরম রমণীয়। এখানে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ হর-পার্ব্বতী, নারায়ণ ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে দুইটী পিত্তল নির্ম্মিত গোমুখী ধারা দিয়া শ্রীবিশ্বনাথ জিউর দুই পার্শ্বে দুইটী ঝরণা আসিয়া পতিত হইয়াছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ছাদযুক্ত যে বাড়ীগুলি আছে, তাহার পশ্চিমাংশের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত রাওল সাহেবের আসন ও পূজারী মহারাজের থাকিবার স্থান। আর অন্যান্য সব গুলিতে যাত্রীদের বাস করিবার বন্দোবস্তাদি আছে, এখানে ১৫।২০ খানি গৃহ, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য, মিঠাই আদি, কাপড় চোপড় ও মনোহারি জিনিষ পত্রের দোকান, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি আছে। এই পথে এইটী শেষ পোষ্ট অফিস। এখানে আসিয়া পৌঁছিবার সময় দেখিতে পাইলাম শ্রীযুক্ত রাওল সাহেব সুসজ্জিত হইয়া বাম হাতে এক খানা কাল

কাপড় লইয়া দুইজন সোঠাধারি আর্দ্দালি সহ পশ্চিম দিকে অতি ব্যগ্রতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন। আমরা উহার তথ্যানুসন্ধানার্থে পথি পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। খানিক পরে দেখা গেল গঢ়বাল জিলার কালেক্টর সাহেববাহাদুর আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাওল সাহেব তাঁহারই অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইতেছিল, সাহেব বাহাদুর ও সকল রাজ কর্ম্মচারীদের হাতে শোক চিহ্ন স্বরূপ কাল ফিতা বাঁধা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে একজন কর্ম্মচারীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় বিগত ১১ই মে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ শুনিয়া যথামত প্রার্থনাদি করিয়া একটী চটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। খানিক বিশ্রামান্তে শ্রীযুক্ত রাওল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া তাঁহার আমূল জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়; তিনি আলাপ ও ব্যবহারাদিতে বেশ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত যাইবেন ও তদনন্তর একবার শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরীতেও পদার্পণ করিবেন জানা গেল। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া আহারাদি করতঃ বিশ্রাম করা হয়। বৈকালবেলা সাধারণ বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়, এখানে রাত্রিতে সাধারণ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, ক্রমে জলযোগের ব্যবস্থাদি করিয়া রাত্রি বাস করা হয়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর সোজা পথে চলিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী নালা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। যাত্রিগণকে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে এই চটী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া নিম্ন পথে যাইতে হয়। এই পথটী উখীমঠ ও শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ হইয়া লালসাঙ্গাতে পৌঁছিয়াছে। এস্থানে শ্রী৺ললিতাদেবী ও মহাদেবের মন্দির, সাধারণ ২/৩ খানা ঘর, দোকান ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এই স্থানে নাগরা জুতা বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে বরাবর সোজা পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ণ স্থান বা নারায়ণ কোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের বিশাল মন্দির ও ৪।৫টী ছোট মন্দির, ৭।৮ খানি বেশ পরিষ্কার ঘর, খাদ্য দ্রব্য মিঠাই আদির দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে এবং এই চটীতে বেশ দুধ পাওয়া যায়। এস্থানে সাধারণ বিশ্রাম করা হয়। এই স্থান হইতে পাহাড়ী পথে শ্রীকালীমঠে যাওয়া যায়। যাঁহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে নারায়ণ স্থান হইতে পাহাড়ী লোক সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়। এস্থান হইতে ক্রমশঃ উতরাই করিয়া ২ মাইল দূরবর্ত্তী ব্যুঙ্গচটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৫।৬ খানা ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও সাধারণ জল খাবারের দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই চটীতে বেশ দুধ পাওয়া যায়। এবং খানিক উপরেও ২ খানা ঘর ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এখানে একজন জঙ্গম গোসাঞি বাস করেন। এখানেও ঝরণার জলের স্রোতের জোরে চাকা ঘুরাইয়া নানাবিধ কাঠের জিনিষ তৈয়ার হয়। এখানে বিশ্রামান্তে সাধারণ একটি চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী মৈখণ্ডা গ্রামে যাইয়া পৌঁছি। এখানে মহিষমর্দ্দিনীদেবীর মন্দির ও লৌহ-শিকল যুক্ত একটি দোলনা আছে। এই গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ও নানা শস্য পরিপূর্ণ দেখা গেল। এ স্থান হইতে খানিক দূরে পরিষ্কার জলের ২টি গোমুখী ধারা ও একটি শিবালয় আছে। এই স্থান হইতে ক্রমশঃ

অগ্রসর হইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী ফাটা চটিতে পৌঁছিয়া একটি বেশ পরিষ্কার ঘরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই চটিতে একটি সরকারী ধর্ম্মশালা, ১০।১২ খানি বেশ বড় বড় ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই প্রভৃতির দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে; চটিওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক ও বিশ্বাসী। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। এই চটিতে দুধ পাওয়া যায় ও অনেক নাগরা জুতা বিক্রয় হয়। বৈকাল বেলায় শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের ফেরত একদল বাঙ্গালীও ফিরিয়া আসিবার সময় হিন্দুস্থানী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের পেন্সন প্রাপ্ত সুবাদার নারায়ণ সিংহ, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী ও নবদ্বীপচন্দ্র রায, শ্রীযুত কামদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণব সাধু শ্রীযুত করুণাকর দাস মহাশয়দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রকার আলাপাদি হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তন করেন এবং সমস্ত সময়টা পরমানন্দে অতিবাহিত হয়। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও রাত্রি বাস করা হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী বাদলপুরে উপনীত হই; এখানে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও সাধারণ খাবারের দোকান ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে রামপুর চটি। এই চটিতে ১৫।১৬ খানা বেশ বড় ও পরিষ্কার ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাইয়ের দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ বিশ্রামান্তে গরম দুধ পান করা হয়। এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে জলের স্রোতের বেগে কাঠের জিনিষ তৈয়ার হইতেছে। তথা হইতে প্রায় ১০০ গজ উপরে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি দুই মাইল চড়াই করিয়া শ্রী৺ত্রিযুগী নারায়ণের দিকে, অপরটি সোজা শৌনক প্রয়াগ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে প্রায় দুই মাইল চড়াই করিয়া শ্রী৺শাকম্ভরী দেবীর মন্দির পাওয়া যায়। এখানে বাসস্থানের উপযোগী কোন গৃহাদি নাই। ঐ স্থান হইতে আর খানিক অগ্রসর হইলেই শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগী নারায়ণ দেবের মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখে তিন যুগের প্রজ্জ্বলিত ধুনা বিদ্যমান আছে; পাণ্ডা মহারাজগণ প্রত্যহ এই ধুনীতে কাঠ দিয়া থাকেন তাই কখনও নিবতে পারে না। প্রবাদ আছে যে দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহের সময় এই ধুনী প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোমাদিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মকুণ্ড, উত্তরে রুদ্রকুণ্ড ও বিষ্ণুকুণ্ড আছে, মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া বিষ্ণুকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেবের মূর্ত্তি ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। বাহিরে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চাতে লক্ষ্মীভাণ্ডার, এই মঠও শ্রীশ্রীকেদারনাথের রাওল সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। এখানে নারায়ণের পূজা বার মাসই হইয়া থাকে। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, ১০।১২ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান, সাধু সন্ন্যাসীর জন্য সদাব্রত ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে।

এখানে বেশ গোল আলুর চাষ হয়। শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেবের সাধারণ ভোগরাগের বন্দোবস্ত আছে, তবে প্রসাদ অন্য কাহারও ভাগ্যে তেমন জোটে না। মন্দিরের আশে পাশে নানা রং বিরঙ্গের সাপ দেখা যায়। এখানে পাণ্ডামহারাজগণের ৩০।৩৫ খানি বাড়ী আছে ও তাঁহারা বেশ চালাক চতুর।

শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে দুই মাইল উথরাই পথে রামপুর চটী ও সোজা রাস্তায় দুই মাইল দূরে শৌনক প্রয়াগ। এই স্থানটী মন্দাকিনী ও শৌনক গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত; এখানে কোন পাণ্ডাদি নাই। সমস্ত কার্য্যাদি স্ব স্ব বন্দোবস্তে করিতে হয়। এখানে একটীমাত্র ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও জলখাবারের দোকান ইত্যাদি আছে। পূর্ব্বে শৌনক গঙ্গার উপর একটী লৌহ ও কাঠের পুল ছিল। কয়েক বৎসর হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে শৌনকগঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটী কাঠের পুল দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে সাধারণ "উথরাই" করিয়া পুল অতিক্রম করতঃ আর একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি। ক্রমশঃ এক মাইল চলিয়া যাওয়ার পর মুণ্ডকাটা গণপতিদেবের মন্দির প্রাপ্ত হই। এখানে বিশেষ বাসোপযোগী গৃহাদি নাই। এই স্থান হইতে বরাবর সোজাপথে দুই মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড। বেলা সাড়ে এগারটার সময় গৌরীকুণ্ডে উপস্থিত হই। এখানে একটী শীতল জলের ও আর একটী উষ্ণ জলের কুণ্ড, শ্রী৺গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির, একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা, পাণ্ডা মহারাজগণের ১৫/২০ খানা বাড়ী, ১০।১২ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের ও মিঠাই মিষ্টান্নাদির দোকান এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। ইহার পার্শ্বদেশ দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছে। স্থানটী বড় সেঁথসেঁথে ও দুর্গন্ধপূর্ণ ও স্থানীয় দোকানদারেরা বিশেষ ধূর্ত্ত। এখানে বরিশাল নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত দুর্গানাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গুরুদেবের হঠাৎ সমাধি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বেলা তিনটার সময় এস্থান হইতে সাধারণ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী শ্রী৺চীরবাসা ভৈরব জিউর মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া উপনীত হই। ভৈরবজিকে ছিন্নবস্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয় প্রবাদ আছে যে, না করিলে তিনি যাত্রীর সমস্ত ফল হরণ করেন। এ পথটীর অনেক স্থান অত্যন্ত অপ্রশস্ত তবে চলিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না; কাণ্ডী, ঝাম্পান ইত্যাদি অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক মাইলের অধিক দূরে ভীমসেন শিলা বা ভীমসেনের বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডা মহারাজগণের মতে কিম্বদন্তী এই যে, ভীমসেন উক্ত স্থানে পতিত হইয়াছিলেন। এ স্থান হইতে প্রায় এক মাইলের অধিক দূরে রামবাড়া চটী। পর্ব্বতগাত্র হইতে পতিত শ্বেতধারা বিশিষ্ট প্রস্রবণগুলি দেখিতে পরম রমণীয়। এই পথের উপর দিয়া অনেকগুলি ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় রামবাড়া চটিতে উপনীত হই। এই স্থানে ১৫।২০ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাইয়ের দোকান, অনেকগুলি জলের লহর ও ঝরণা আছে। চটিওয়ালাগণ ভাল লোক। এখানে রাত্রিতে জলযোগ করিয়া অবস্থান করা হয়। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়াছিল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর ক্রমোচ্চ পথে চলিতে আরম্ভ করি। রাস্তার

দুই পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে অনেকগুলি লাঙ্গুলবিহীন ইন্দুর দেখা গেল। তাহারা শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনাভিলাষী মহাত্মাগণকে দেখিয়া আনন্দে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। ক্রমশঃ দুই মাইল অগ্রসর হইবার পর শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের মন্দিরের সুবর্ণ নির্ম্মিত চূড়া দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে চড়াই, উতরাই ও ঠাণ্ডা জনিত কষ্টের কথা বিস্মৃত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ একবার উচ্চৈঃস্বরে "শ্রীশ্রী৺কেদারনাথজিকি জয়" ও "এক শ্রীমৎ গুরুমহারাজকি জয়" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিলেন। তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া নয়নকোণে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনীর উপর এক কাষ্ঠনির্ম্মিত পুল উত্তীর্ণ হইয়া বেলা নয়টার সময় শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরীতে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরী প্রায় চতুর্দ্দিকে তুষার ধবল পর্ব্বতমালাবেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। স্কন্দপুরাণের মতে হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ গঙ্গাগর্ভে যত তীর্থ আছে সকলের অধিপতি শ্রী৺কেদারনাথ, আর স্থানটির নাম শ্রীকেদার খণ্ড। ইহার প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর। প্রবাদ আছে যে, পাণ্ডবগণ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্র সমরের পর আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবধ জনিত পাপক্ষয়ের জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনান্তেও তাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ধারণা না হওয়ায়, তাঁহারা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, "তোমরা হিমালয় প্রদেশে যাইয়া শ্রী৺কেদারনাথের দর্শন ও স্পর্শন কর তাহা হইলেই তোমরা পাপমুক্ত হইবে। তখন পাণ্ডবেরা এই দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু যথাস্থানে শ্রী৺কেদারনাথের দর্শন না পাইয়া অতি ক্ষুণ্ণমনে কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ তাঁহাদের ভক্তিপরীক্ষার্থ ধবল তুষারাচ্ছাদিত স্থানে নিজ মায়াপরিগৃহীত বিশাল মহিষ-মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। পাণ্ডবেরা ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন যে, এই বিশাল মহিষ-মূর্ত্তিই শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ। তখন তাঁহারা ঐ মূর্ত্তির কাছে অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে যেমন তাহার পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিলেন অমনি শ্রী৺কেদারনাথ স্ব মূর্ত্তিতে তাঁহাদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁহাকে যে বিশাল মূর্ত্তিতে প্রথম দেখিয়া ছিলেন তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। এখন নেপাল দেশে শ্রী৺পশুপতিনাথ দেবের যে মূর্তি আছে তাহা সেই বিশাল মহিষের দেহ এবং কেদারখণ্ডের ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি উক্ত বিশাল মহিষের শিরোভাগ বলিয়া বর্ণিত হয়। এই স্থানে কোন দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে না। শ্রী৺কেদারনাথের মন্দিরের দরজা দক্ষিণ মুখীয় ও মন্দির তিনটী খণ্ডে বিভক্ত। ভিতরের অংশে শ্রী৺কেদারনাথের বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের ভিতরে সদাসর্ব্বদা টুপটাপ করিয়া জল পড়িতেছে, হঠাৎ এই বিশাল মূর্ত্তি দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৌরীপীঠের উপর বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া যাত্রিগণ আপনাপন পাপ ও মহাব্যাধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইবার জন্য আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ভিতরের ভাগে আলোর বন্দোবস্তটী ভাল নহে ও মন্দিরের কোন জানালা ইত্যাদি নাই। এই মন্দিরেও শীতের ছয়মাস ব্যাপিয়া

একটী প্রদীপ জ্বলিতে থাকে ও দরজা খোলার দিন যাত্রিগণ উহা দর্শন করিয়া পরম কৃতার্থ হন। মন্দিরের মধ্যভাগে শ্রী৺পার্ব্বতীদেবী ও শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি এবং সম্মুখভাগে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, পিতলনির্ম্মিত নন্দী ও প্রমথগণের মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অমৃত কুণ্ড, ঈশান কোণে সুফল কুণ্ড, হংস কুণ্ড; তাহার দক্ষিণে রেতঃ কুণ্ড ও মন্দিরের সম্মুখে পারাসংযুক্ত উদককুণ্ড ইত্যাদি আছে। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে ক্ষীর, মহোদধি, সরস্বতী, স্বর্ণদ্বারী ও মন্দাকিনী গঙ্গা বহির্গত হইয়া মন্দাকিনী গঙ্গা নাম ধারণ করিয়া রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। স্নান ঘাটের পার্শ্বে শ্রী৺অন্নপূর্ণাদেবী, অগ্নিকোণে শ্রী৺ভৈরবনাথের মন্দির ইত্যাদি ও মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রীযুত রাওল সাহেবের একটী জীর্ণ বাড়ী আছে। পূর্ব্বতন রাওল মহোদয়গণের কেহ এখানে আসিয়া থাকিতেন না বলিয়া বাড়ীর এই দুর্দ্দশা। সম্প্রতি বর্ত্তমান রাওল সাহেব উক্ত বাড়ী এবং মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের প্রাঙ্গণ মেরামত করাইবার জন্য পরম উদ্যোগী হইয়াছেন। এখানে কালী কম্বলী বাবার তরফে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা, ইন্দোর, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবৃন্দের ও কলিকাতার চাষাধোবা পাড়া নিবাসী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা, ইত্যাদিতে ৪০।৫০টী ঘর, কয়েক খানি সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের ও মিঠাই মিষ্টান্নের দোকান, পাকা বান্ধান স্নান ঘাট ইত্যাদি আছে। এখানে সাধু ও অভ্যাগতদের জন্য সদাব্রত ও শীতোপদ্রব-নিবারণোপযোগী সমস্ত সম্ভার যোগান হইয়া থাকে। এখানে শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া পরমানন্দে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। পরমহংস স্বামী শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি একজন বেশ সুবিদ্বান ও সজ্জন মহাপুরুষ। এখানে দিনের বেলায়ও কলিকাতার মাঘ মাসের কন্‌কনে শীত অনুভূত হইতেছিল। এখানে সকল জিনিষ অত্যন্ত মহার্ঘ্য।*

** লেখকের 'হিমালয় ভ্রমণ' (১৯১১) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত*

ঋষিশৃঙ্গে

শৈবাল মিত্র

হিমালয়ের গাড়োয়াল রেঞ্জের
নন্দাদেবী স্যাংচুয়ারি পরিক্রমা
করে, আঠারো হাজার ফুট এক
পাহাড়ের দেওয়াল টপকে ঋষিশৃঙ্গের
তলায় এসে দাঁড়িয়েছে কলকাতার এক
পর্বতারোহী সংস্থার পাঁচ তরুণ
অভিযাত্রী। অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব
শুরু হবে এবার। ঋষিশৃঙ্গ পর্বতের
তেইশ হাজার ফুট উঁচু শিখরে উঠবে
তারা। তারাই প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী
দল, যারা স্যাংচুয়ারির এই পথ খুঁজে
বার করেছে। একটি জয় করায়ত্ত,
এবার আরেক জয়ের স্বপ্ন তাদের
চোখে। ঋষিশৃঙ্গের চূড়া স্পর্শ করতে
হবে। করতেই হবে।

রাত আটটার পরেও ঋষিপর্বত জয় করে কেউ ফিরল না দেখে মুনমুন বেশ উতলা হল। আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। মাঝে-মাঝে সাবুদানার মতো ঝরঝর করে বরফ পড়ছিল। বরফ-পড়া শেষ হলে শুরু হচ্ছিল বৃষ্টি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল অবিরাম। দুর্ভাবনার সঙ্গে হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল শীতলতা।

দু' একবার মুনমুন প্রশ্ন করল বাবুলালকে, "কী ব্যাপার, ওরা ফিরছে না কেন?"

নিজেকে যা-ই বোঝাক না কেন, সামিটে যেতে না পারায় বাবুলালের মেজাজ সকাল থেকেই খিঁচড়ে ছিল। মুনমুনকে ওষুধ দিয়ে, হরলিকস্ খাইয়ে ও চুপচাপ স্লিপিং ব্যাগের ওপর শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ক্যাম্পের জানলা দিয়ে একবার দেখল, প্রদীপ, ইন্দ্রনাথ আর অমূল্য শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওঠার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, ওদের গতি খুব আশাপ্রদ নয়। এক সময় তিন বন্ধু বাবুলালের চোখের আড়ালে চলে গেল। দুপুরে বরফ গ'লিয়ে জল গরম করে, মুনমুনের হাতে সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা করে বাবুলাল দু'কাপ হরলিকস্ বানিয়েছিল। এককাপ নিজের, অন্যটা মুনমুনের। ওই এক কাপ হরলিকস্ ছাড়া বাবুলাল আর কিছু খেল না। খিদে নেই, মুখে রুচিও নেই। তিন বন্ধু ফিরে না

আসা পর্যন্ত ও বোধহয় আর খেতে পারবে না। একবুক উদ্বেগ আর উত্তেজনা নিয়ে বন্ধুদের ফেরার জন্য বাবুলাল প্রতীক্ষা করছে। বাবুলালের সেবা আর সারাদিনের বিশ্রামে মুনমুন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বিকেল ফুরোতেই মুনমুন আর ক্যাম্পের মধ্যে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারল না। বারবার ঘর-বার করতে লাগল। সন্ধ্যের পর বাবুলালেরও দুশ্চিন্তা শুরু হল। কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না। সঙ্গে দূরবীণ নেই। ক্যামেরায় জুম্ লেন্স লাগিয়ে ঋষিপর্বতের চূড়ার দিকে ও বেশ কয়েকবার দেখল। কোথাও কিছু নেই। ধবধবে সাদা বরফের চূড়া আকাশ স্পর্শ করেছে।

একসময় চারপাশে অন্ধকার নামল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু উত্তরঋষি হিমবাহ জুড়ে বরফের ধস নামার আওয়াজ। বাবুলাল বলল মুনমুনকে, "ওরা নিশ্চয়ই কোনও গুহার মধ্যে ডেরা গেড়েছে। সেই গুহায় রাত কাটিয়ে কাল ভোরে সামিটে যাবে।"

মুনমুন শুনল বাবুলালের কথা, কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না।

বাবুলাল প্রশ্ন করল, "তোর হাতের অবস্থা কী?"

"ভাল", মুনমুন জবাব দিল।

দু'জনে আবার কিছু সময় চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকল। রাত নটা বাজার পর সিগন্যালিং গানটা নিয়ে বাবুলাল ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। পূর্ণিমার রাত। চাঁদ না ওঠায় নিকষ কালো অন্ধকার, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সিগন্যালিং গানে কার্টিজ ভরে বাবুলাল ফায়ার করল। জোরালো শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর টুকরো হাউইয়ের মতো ক্যাম্পের ঠিক ওপরের আকাশে দাউদাউ করে কয়েক সেকেণ্ড জ্বলল। পাহাড়ে, সমুদ্রে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে দলছুট পথভ্রান্ত অভিযাত্রীদের এভাবেই সংকেত পাঠানো হয়। বাবুলাল পরপর দুটো কার্টিজ ফাটিয়েও বন্ধুদের কাছ থেকে কোনও পাল্টা সংকেত পেল না। মুখের দু'পাশে দুটো হাত রেখে, একবুক শ্বাস টেনে বাবুলাল এবার গলা দিয়ে একটা আওয়াজ করল—"হো...ই।"

পাহাড় কাঁপানো এই প্রচণ্ড আওয়াজ শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনি তুলল, হো......ই। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে চারপাশ আবার নীরব, নিঝুম হয়ে গেল। একটা মোমবাতি জ্বেলে ক্যাম্পের জানলার পাশে রেখে দিল বাবুলাল। স্বচ্ছ, সাদা ফাইবার গ্লাসের চাদর ঢাকা জানলা। জানলার বাইরে, অনেক ওপর থেকেও এই মোমের আলো দেখা যাবে। বাবুলাল দেখল হাতঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে ও ঠিক করল, রাতে ঘুম ভাঙলে আরও একবার সিগন্যালিং গান নিয়ে ফায়ার করবে। কিন্তু বাবুলালের ঘুম আসছিল না। তিন বন্ধুর জন্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় মাথার মধ্যে অশান্তি ঘন হয়ে আছে। বাড়ির কথা ও ভাববার চেষ্টা করল। পাহাড় থেকে ফিরে বাড়িতে নানা মজার গল্প বলার সময় বাবুলাল টের পেয়েছে, সকলেই কিছু রহস্য, রোমাঞ্চ আর বিচিত্র কাহিনী শুনতে চেয়েছে। কিন্তু বিপদের ঘটনা শুনলে মা কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। বাবুলাল জানে,

সেরকম দু'একটা বিপদের ঘটনা ঘটলে তার পাহাড়ে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে। মা হয়তো আসতেই দেবে না। এবারে বাড়ি ফিরে গল্প করার সময়ে তাই যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। হিমবাহে ভেসে যাওয়ার কাহিনী শুনলে তার পাহাড়ে ওঠার পোশাক, যন্ত্রপাতি মা হয়তো ফেলে দেবে।

নিজের স্লিপিং ব্যাগের ওপর মুনমুন চুপ করে বসে ছিল। বাবুলাল বলল, "ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়।"

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে মুনমুন স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় নিল। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বাবুলাল আর একবার সিগন্যালিং গান ফায়ার করল। কিন্তু বৃথা! কেউ সাড়া দিল না।

খুব ভোরে মুনমুন ডেকে তুলল বাবুলালকে। ক্যাম্পের বাইরে এসে দুজনে দাঁড়াল। কী চমৎকার দিন! ঝকঝকে নীল আকাশ, সূর্য উঠেছে। ঘন রোদ এসে পড়েছে ক্যাম্পের ওপর। কোনওদিকে এক টুকরো মেঘ নেই। ক্যাম্পের উত্তর থেকে দক্ষিণে বরফে মোড়া সারি-সারি শিখর। সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাদেবী। ভোরের আলোয় স্বর্ণাভ হয়ে উঠেছে নন্দাদেবীর মুখ। সপারিষদ নন্দাদেবী ধ্যানে বসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু শ্বেতশুভ্র শিখরের সারি নন্দাদেবীকে ঘিরে আছে। ব্যতিক্রম চ্যাংব্যাং, তার গায়ে বরফের ছিটেফোঁটাও নেই। বাঁ দিকে প্রথম দুনাগিরি, তারপর চ্যাংব্যাং, পাশেই কলঙ্ক, তারপরেই ঋষিশৃঙ্গ, ঋষিপাহাড়।

বাবুলালের পাশে মুনমুনও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরের আলোয় উজ্জ্বল, পবিত্র হিমালয়ের এই অপরূপ মূর্তি দেখে সে বিহুল হয়ে পড়েছিল।

সকাল নটা বাজার পরও তিনজনের কেউ শিখর থেকে ফিরল না। আবার প্রতীক্ষা! বাবুলাল আর মুনমুন সকালে একমুঠো করে ভাজা সুজি খেয়েছে। তারপর এক কাপ করে হরলিকস্। মাঝে-মাঝে ছুরির মতো ধারালো বাতাস পোশাক ফুঁড়ে শরীরে কামড় বসালেও ওরা ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল না। ঋষিপাহাড়ের চূড়ার দিকে নজর রেখে ক্যাম্পের সামনে বসল দুজন। পরিষ্কার, নির্মেঘ দিন। শিখরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত কাছে, মনে হচ্ছে, এক দৌড়ে শিখর ছুঁয়ে নেমে আসা যায়। হঠাৎ বাবুলাল বলল, "ওই যে ওরা উঠছে। শিখরের খুব কাছাকাছি।" মুনমুন দেখল তিনজনকে, তিনজন মানুষ, পিঁপড়ের চেয়ে সাইজে একটু বড়, গুটিগুটি উঠছে। ক্যামেরার জুম লেন্সে তিন বন্ধুর অনেকগুলো ছবি বাবুলাল তাড়াতাড়ি তুলে নিল। আকাশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঝকঝকে আলো থাকলেও দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে একটা ঘন মেঘের দলকে ঋষিপাহাড়ের শিখরের দিকে বাবুলাল এগিয়ে যেতে দেখল। বাবুলাল বুঝল, এই মেঘে একটা কেলেঙ্কারি হবে। তাই হল। মেঘের আড়ালে তিন বন্ধু এবং শিখরটা হারিয়ে গেল। ক্যামেরা নিয়ে বাবুলাল ক্যাম্পে ফিরলো। দারুণ উত্তেজনা আর খুশীতে বুকের মধ্যে তোলপাড় আনন্দ। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে জয়ের এই দৃশ্য দেখে তার শরীরের সব শিরা, স্নায়ু দপদপ করছে। পায়ে পায়ে সফলতার কাছে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখতেও যথেষ্ট হিম্মত লাগে। টেন্টে ঢুকে স্লিপিং ব্যাগের ওপর শুয়ে বাবুলাল হাঁপাতে লাগলো।

বেলা বারোটা নাগাদ বাবুলাল চেঁচিয়ে উঠল, "সামিট জয় করে ওরা ফিরে আসছে।"

মুনমুন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। চাপ-চাপ মেঘের আড়ালে তিনজনের কাউকেই মুনমুন দেখতে পেল না। জুম লাগানো বাবুলালের ক্যামেরাটা নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে মুনমুন দেখতে পেল তিনজনকে। মনে হল, তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। এখনই নেমে আসবে। মুনমুনের অবসাদ, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা নিমেষে কেটে গেল।

আনন্দের চোটে বাবুলাল বলল, "আমার দারুণ খিদে পেয়েছে।"

ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে মুনমুন একটা মাংসের টিন খুলল। তারপর এক টুকরো বরফ ভেঙে জল গরম করতে বসল। মিল্ক পাউডার গুলে পাঁচ কাপ গরম দুধ বানাবে; বাবুলাল আর সে নিজে দু'কাপ খেয়ে বাকি তিন কাপ বন্ধুদের জন্যে ফ্লাস্কে রেখে দেবে। আরো দুটো মাংসের টিন আছে। সে দুটোই শেষ। প্রদীপ, ইন্দ্রনাথ আর অমূল্য ফিরে এলে সে দুটো খুলে বিজয়োৎসব হবে।

অমূল্য একটু ঘুমোলেও প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথের সারারাত তেমন ঘুম হয়নি। মাঝে-মাঝে ইন্দ্রনাথের ঝিমুনি আর সামান্য তন্দ্রা এসেছে, কিন্তু তন্দ্রার ঘোর বেশিক্ষণ থাকেনি। ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে। গত পঁচিশ দিন ধরে একটানা পাহাড়ে ওঠার নানা স্মৃতি আর ছবি মাথার মধ্যে গজগজ করছে। চোখ বুজলেই মাথার মধ্যে সেগুলো তালগোল পাকায়। তন্দ্রা ভাঙলেই ইন্দ্র বুঝতে পারছিল যে, প্রদীপ জেগে আছে। প্রদীপও ঘুমোয়নি, ঘুমোতে পারছে না, কিছু ভাবছে। কিন্তু অমূল্যর ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে ইন্দ্র কথা বলছিল না প্রদীপের সঙ্গে। প্রদীপের অবশ্য কথা বলার কোনও ইচ্ছে নেই। ডানপাশের কানের ব্যথাটা ক্রমশ টাটিয়ে উঠছে। বিষযন্ত্রণা কান থেকে গলা আর মাথার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে ব্যথার ঢেউ অনবরত ফুলে ছড়িয়ে মুছে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেও কেমন ঝিমঝিম ভাব। কাল সকালে আরও প্রায় হাজার ফুট উঠতে হবে। ভারী বিপন্ন বোধ করল প্রদীপ। একটু ঘুম হলে ব্যথাটা হয়তো কমত। কিন্তু ঘুম আসছে না। ঋষিশৃঙ্গের শিখর জয় না করা পর্যন্ত ঘুম হবে না। কানের ব্যথার জন্যে শিখরে উঠতে হয়তো একটু কষ্ট হবে। তা হোক। এসব জ্বালা, যন্ত্রণাকে এখন গ্রাহ্য করার সময় নেই। শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা কেন, শিখরে না ওঠা পর্যন্ত তার মরারও সময় নেই।

কখন যেন রাত শেষ হয়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রনাথ ঘড়ি দেখে বুঝতে পারেনি। তার হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা ঘড়ি ছিল প্রদীপের পকেটে। অমূল্যর শরীরে ঠেস দিয়ে দু'চোখ বুজে বসে থাকা প্রদীপ ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে, ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারল না। এই গুহা ছেড়ে এবার বেরোনো উচিত। ইন্দ্রনাথের ডাক শুনে অমূল্য তাকালো। প্রদীপ একইভাবে চোখ বুজে বসে আছে।

এখনই স্টার্ট করা উচিত, ইন্দ্রনাথ বলল।

তার কথা শুনে প্রদীপ সোজা হয়ে বসতে গুহার বাইরে গিয়ে অমূল্য দাঁড়ালো। ঘোলাটে আকাশ, চারপাশ কেমন গুম হয়ে গেছে। তুষারপাত হচ্ছে। অমূল্য ডাকতে প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথ বাইরে এসে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথ বলল, আমাদের মালপত্র ভেতরে থাক। ফেরার পথে নিয়ে যাবো। বাইরের আকাশের দিকে ইন্দ্রনাথ এতোক্ষণ নজর করেনি। এখন দেখল, অবিরাম বাতাসে তুষারকণা উড়ছে। কে যেন পিচকারি করে মুখে একটানা গুঁড়ো তুষার ছুঁড়ে মারছে। মাঝখানে প্রদীপ, পেছনে ইন্দ্রনাথকে রেখে অমূল্য উঠতে শুরু করল। কিছুটা উঠেই অমূল্য দেখল, সামনে একটা বরফের দেওয়াল। দেওয়ালটা যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠলো, আগে দেখা যায়নি। এই খাড়া দেওয়াল টপকে চূড়ায় পৌঁছোতে বাড়তি একঘণ্টা সময় লাগবে। এই দেওয়াল এড়িয়ে অন্য রাস্তা খুঁজে সামিটে পৌঁছোতে ঠিক কতোটা সময় লাগবে অমূল্য ধরতে পারলো না। একঘণ্টার চেয়ে যে অনেক বেশি, সে বিষয়ে অমূল্য নিঃসন্দেহ। ভারী দুশ্চিন্তা হলো তার। গত চার বছরে, চারটে অভিযানে অমূল্য পথপ্রদর্শক। সহযাত্রীদের সবচেয়ে সরল, সংক্ষিপ্ত পথ সে খুঁজে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সামনে বরফের খাড়া পাঁচিলটা দেখে সে একটু দিশাহারা হয়ে গেল।

অমূল্যকে পুতুলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রদীপ বলল, দাঁড়ালে কেন?

প্রদীপের প্রশ্ন শুনে অমূল্য যেন সাহস ফিরে পেল। ধীরে ধীরে সেই পাঁচিল বেয়ে সে উঠতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত টিপে দুঘণ্টার কঠিন, সতর্ক যুদ্ধের পর বরফের দেওয়াল টপকে একটা ঢালের ওপর দাঁড়াতেই অমূল্য শিখরটা স্পষ্ট দেখতে পেল। শিখরের ঠিক নিচেই একটা খাঁজ, একে বলে 'স্যাডেল'। দু' তিন ইঞ্চি গভীর নরম তুষারের ওপর দিয়ে ওঠার গতি কিছুতেই বাড়ানো যাচ্ছে না। অবশেষে তিন অভিযাত্রী শিখরের ওপর এসে দাঁড়াল। জোরালো দক্ষিণ-বাতাস তাদের শরীরের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের অভিনন্দন জানাল। তীক্ষ্ণ, গড়ানে শিখরটার ওপর দাঁড়িয়ে তিনজনই টলমল করছে। কেমন যেন বেসামাল, অনিশ্চিত পদক্ষেপ। প্রবল বাতাস তিনজনকেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দুটো পতাকা খুলে অমূল্য উবু হয়ে বসে আছে। অমূল্যর পায়ের কাছে প্রদীপ। বাতাসের টানে পতাকা দুটোর লাঠি যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। চারপাশে রুপোলী পাহাড়ের ঢেউ, সকলেই মহাকায়, মহান, মাঝে মাঝে জলস্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে নদী অথবা হিমবাহ, ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো না। আরো উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত, একের পর এক গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাহীন তুষারে ঢাকা শিখর, বিচিত্র রঙ আর চেহারা, সকলেই গম্ভীর আর মৌন, ইন্দ্রনাথের মনে হলো, এখনি যেন ওরা চোখ খুলে তাকাবে। ইন্দ্র ছবি তুলছে পরপর। হরদেওলের পেছন থেকে ত্রিশূলের মূল শিখর উঁকি দিচ্ছে। ক্রমাগত তুষারঝড়ে ঋষিশিখরের চূড়ায় ভাঙাগড়া চলছে। পেছনে, অনেক দূরে নন্দাদেবী মেঘাবৃত। সাফমিনাল আর দুনাগিরিকে পেছনে রেখে খুব তাড়াতাড়ি ইন্দ্র কয়েকটা ছবি তুলল। তিনটি চূড়াই মনে হচ্ছে এক সরলরেখায় আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরঋষি হিমবাহের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র মুগ্ধ হয়ে গেল। দুটো ধারা সাদা এবং কালো পাথরের টুকরোয় তৈরি পাশাপাশি পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে। ছবি তোলার পাট

চটপট শেষ করে বন্ধুদের নিয়ে ইন্দ্র নেমে যেতে চাইছে। এই গড়ানে শিখরের ওপর বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব। তাছাড়া কী এক রহস্যময় ধাঁধায় তার মাথার ভেতরটা ভনভন করছিল। জয়ের আনন্দ না শূন্যতা সে বুঝতে পারল না। বরফে পোঁতা ফ্ল্যাগ দুটো ছেড়ে অমূল্য উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের কিন্তু কোনও বিকার নেই। সে একইভাবে বসে আছে। ইন্দ্রনাথ বলল, "এবার ফিরতে হবে।"

প্রদীপ তবু উঠল না। ইন্দ্রনাথ হাত রাখল প্রদীপের কাঁধে। কাঁধে রাখতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের হাতটা প্রদীপের কানে একটু ঠেকতেই প্রদীপ ককিয়ে উঠল, "উফ্!" তারপর রাগী চোখে তাকাল ইন্দ্রের দিকে।

অবাক ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে তোমার?"

"কানে ভীষণ ব্যথা," প্রদীপ বলল।

নামার সময়ে প্রদীপ মোটেই সুস্থ বোধ করছিল না। হাওয়ার বেগ একটু কমলেও নিশ্চল মেঘে আকাশ গুম হয়ে আছে। প্রথমে ঝিরঝির করে তুষার পড়ছিল, কিন্তু ঘোড়ার জিনের মতো সেই স্যাডেলটা পেরোতেই প্রচণ্ড বেগে তুষারপাত শুরু হল। দড়ির সামনে এখন ইন্দ্রনাথ, মাঝখানে প্রদীপ এবং সবশেষে অমূল্য। প্রবল তুষারপাতের সঙ্গে শুরু হল শাঁইশাঁই হাওয়া। এক সময় ওরা গতরাতের সেই গুহাটার ঠিক মাথার ওপর একটা বরফের পাঁচিলের কাছে এসে দাঁড়াল। চারপাশে বরফের সীমাহীন মহাসমুদ্র। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

প্রদীপ বলল, "একটু বিশ্রাম না করে আমি আর নামতে পারব না।"

প্রদীপের নামার ভঙ্গি এবং মুখচোখের অবস্থা দেখে ইন্দ্র এবং অমূল্য দুজনেই বেশ ভয় পেয়েছিল। প্রদীপের মুখে শুধু অসুস্থতা নয়, আরও যেন কিসের ছাপ পড়েছে। ঋষিপাহাড় জয়ের আনন্দে গোটা পৃথিবী এবং জীবন যেন মূল্যহীন হয়ে গেছে। নামার ব্যাপারটা যেন আর তার মাথাতেই নেই। অথবা থাকলেও সেটা খুব জরুরি নয়। এটা উচ্চতাজনিত এক রোগ। এর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলে খুব অসুবিধে। অমূল্য বলল, "গুহা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি; তোমরা ধীরেসুস্থে এসো।"

ইন্দ্রনাথ বলল, "ঠিক আছে।"

ওরা দুজনেই প্রদীপকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইল। নাইলনের দড়ি থেকে নিজেকে খুলে অমূল্য চলে গেল গুহার দিকে। শীতল, শব্দহীন আর ভারী রহস্যময়, সাদা রঙের এক পৃথিবীর বুকে অমূল্য হেঁটে যাছে। অমূল্যকে খুব একা অসহায় মনে হচ্ছিল ইন্দ্রনাথের। তরঙ্গহীন এই তুষারসমুদ্রে আসলে সকলেই খুব একা, বিচ্ছিন্ন নির্জন দ্বীপের মতো। ক্যাম্পে পাশাপাশি থেকেও বন্ধুদের মনে হয়, অনেক দূরের মানুষ, অচেনা, কেউ কারো নয়। পাহাড়ের অনেক ওপরে একধরনের নিঃসঙ্গতা মানুষকে ভর করে। মিনিট-পাঁচেক বিশ্রাম করার পরেও প্রদীপ উঠল না। ইন্দ্রর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পেছনে বরফের ওপর প্রদীপ একইভাবে বসে থাকল।

"কী হল? ওঠো", ইন্দ্রনাথ বলল প্রদীপকে।

শূন্য, ফাঁকা দৃষ্টিতে প্রদীপ তাকাল ইন্দ্রনাথের দিকে। ইন্দ্র দেখল প্রদীপের দু'চোখের জমি কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। প্রদীপ বলল, "নামা খুব দরকার?"

প্রশ্ন শুনে ইন্দ্রনাথ হতবাক হয়ে গেল। প্রদীপ আবার নিজের মনেই কী যেন বিড়বিড় করছে। সেই নির্জন পার্বত্যভূমিতে প্রদীপের জড়ানো কথাগুলো ইন্দ্রনাথ শুনতে পেল। লাইনদুটো রবীন্দ্রনাথের, প্রদীপের ডায়েরিতে লেখা আছে।

"আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো,

এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে।"

"কী হয়েছে তোমার?" ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করল।

"কানে বড় ব্যথা।"

কথাটা বলতে বলতে বরফের ওপর প্রদীপ প্রায় শুয়ে পড়ল। খানিকটা আতঙ্কিত হয়েই ইন্দ্রনাথ উঠে এসে প্রদীপের পাশে উবু হয়ে বসল। প্রদীপের মাথাটা নিজের কোলে এনে রাখল। প্রদীপের জ্যাকেটের কলারের মধ্য দিয়ে ভেতরে তুষার ঢুকছে। তুষারকণাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ। প্রদীপের মুখে যাতে না বরফ পড়ে, সেজন্যে তার মুখটা ইন্দ্রনাথ মাটির দিকে রেখেছে। আরও প্রায় দেড় হাজার ফুট নামতে হবে। অসুস্থ, ক্লান্ত প্রদীপকে চাঙ্গা করার জন্য ইন্দ্রনাথ একতরফা কথা বলতে লাগল। বলল, "তুমি কেমন লিডার, গাছে তুলে আমাদের মই কেড়ে নিচ্ছ? আমি কিন্তু কলকাতায় ফিরে সব বলে দেব।"

ইন্দ্রের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে প্রদীপ শুয়ে আছে। এত বিদ্রূপেও সে চোখ খুলে তাকাতে পারছে না।

তুষার পড়ার বিরাম নেই। এই তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, সময়েরও অপচয়। অমূল্য নিশ্চয়ই গুহার সামনে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গুহার সামনে অপেক্ষা না করলেও একটু বাঁ দিকে নামার রাস্তার ওপরেই হয়তো অমূল্য দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রদীপের মুখ দেখে ইন্দ্রের মনে হল, প্রদীপ এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। খানিকটা ব্যস্ত হয়েই প্রদীপের জ্যাকেটের কলার ধরে ইন্দ্রনাথ একটা দারুণ ঝাঁকানি দিল।

"উফ্, কানে ব্যথা," প্রদীপ চোখ মেলে বলল।

"তুমি এখনই উঠে না দাঁড়ালে আমি কিন্তু তোমার ওই কানটাই মলে দেব।" ইন্দ্র বলল।

এ-কথায় দু'চোখ স্পষ্ট করে মেলে প্রদীপ তাকাল ইন্দ্রনাথের দিকে। তারপর প্রদীপ বিড়বিড় করল, "আমার কিন্তু সব মনে থাকবে।"

ইন্দ্র বুঝল, তার খোঁচাতে কাজ হয়েছে। প্রদীপকে আরও একটু উত্তেজিত করার জন্যে ইন্দ্রনাথ বলল, "তোমার মনে রাখার আমি পরোয়া করি না। আগে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর তোমার কেরামতি দেখাবে।"

প্রদীপ আস্তে আস্তে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল। প্রদীপের পিঠ চাপড়ে আনন্দে ইন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লিডার।"

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই প্রদীপকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। নরম তুষারের ওপর অমূল্যর পায়ের ছাপ। গুহার ভেতরে ঢোকার এবং বেরিয়ে যাওয়ার দু'জোড়া দাগ দুমুখো পাশাপাশি পড়েছে। টাটকা পদচিহ্ন। দেখেই ইন্দ্রনাথ বুঝল যে, তাদের জন্যে কিছু সময় অপেক্ষা করে অমূল্য নেমে গেছে। খুবই স্বাভাবিক। এই নির্জন পাহাড়ে একজন মানুষ একা-একা বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারে না। তাদের দেরি দেখে হয়তো অমূল্য ভেবেছে, ওর আগেই বন্ধুরা নেমে গেছে। ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারল, প্রদীপ এখনও সমান অসুস্থ। তার মুখের রঙ রক্তহীন ফ্যাকাসে, দু'চোখে সেই বিভোল দৃষ্টি। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেও প্রদীপের যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে। ইন্দ্রনাথ দেখল, গুহাতে আসার পথে কখন যে প্রদীপের বাঁ হাতের দস্তানাটা খসে গেছে, সেটা প্রদীপের খেয়াল নেই। বরফ কাটার গাঁইতিটা ডান হাতে ধরে প্রদীপ তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে। কাছে গিয়ে ইন্দ্র দেখল, প্রদীপের বাঁ হাতটা তুষার আর হাওয়ায় শক্ত, অসাড় হয়ে গেছে। পকেটে রাখা একটা বাড়তি হাতমোজা ইন্দ্রনাথ পরিয়ে দিল প্রদীপকে।

প্রদীপ বলল, "আমি একটু ঘুমোতে চাই। একটু ঘুমোলেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ এক পলক প্রদীপকে দেখে বলল, "এখানে কোথায় ঘুমোবে? একটা কেরোসিন কেক নেই, স্টোভ নেই। চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে যাব।"

খুব সন্তর্পণে, ধীরে-ধীরে ওরা নামতে শুরু করল। সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। এরকমভাবে নামলে আজ রাতে এই বরফের রাজত্বে কাটাতে হবে। প্রদীপ মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রদীপের একপাটি জুতোর ক্র্যাম্পঅন খুলে গেল। অনেকবার ইন্দ্র অনুরোধ করার পরেও প্রদীপ সেটা জুতোয় লাগাল না। বরফের ওপর থেকে ক্র্যাম্পঅনটা তুলে ইন্দ্র নিজের পকেটে রাখল।

প্রদীপ প্রশ্ন করল ইন্দ্রকে, "তোর সেই লাইনটা মনে আছে?"

"কোন লাইনটা?"

বিড়বিড় করে প্রদীপ বলল, "Death is not too high a price to pay for a life fully lived."

ইন্দ্র বলল, "তোমার ডায়েরিতে পড়েছি।"

কী যেন ভাবতে ভাবতে প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রদীপকে উত্তেজিত, সজাগ রাখার জন্যে ইন্দ্র একলাই বকে যাচ্ছে, "তুমি একজন ভেটারান ক্লাইম্বার, তোমার সুনাম বজায় রাখতে হবে। এভারেস্টের প্র্যাকটিস ক্যাম্পে তোমায় ডেকেছে, এটা কম কথা নয়।"

প্রদীপ কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে পড়লেই দড়িতে টান পড়ায় ইন্দ্রনাথের গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ তখন কিছু গা-জ্বালানো মন্তব্য করছে। "হেলিকপ্টারে চেপে তোমার আসা উচিত ছিল।"

কিন্তু কোনও বিদ্রূপ বা অপমান প্রদীপের গায়ে লাগছে না। ইন্দ্রনাথ চাইছিল, প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, পর্বতপ্রেমিক তার এই বন্ধুটি রেগে যাক, খেপে উঠুক, তাকে গাল দিক, মারতে আসুক। কিন্তু প্রদীপ কিছুই করছে না। ইন্দ্রনাথ বড় অসহায়, একা বোধ করল। ভাবল, অমূল্য সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু তা আর হবার নয়।

বেলা বারোটা নাগাদ পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে বাবুলাল সেই যে তিন বন্ধুকে নামতে দেখেছিল, সেই শেষ। তারপর অনেকবার চেষ্টা করেও ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাদের দেখতে পায়নি। বাবুলাল বুঝতে পারছিল যে, শিখরজয়ীদের নামার গতি সন্তোষজনক নয়। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বাবুলাল খানিকটা উদ্বিগ্ন হল। ঋষিপাহাড়ের সাদা পিচ্ছিল দেওয়ালটা মাঝে-মাঝে মেঘ, কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে আবার আলো জাগছে। সকালের মতো পরিষ্কার, উজ্জ্বল নয়, ফ্যাকাসে, ম্লান আলো। ক্যাম্পের সামনে বেশ কয়েকবার তুষারঝড় হয়ে গেছে। দুপুর শেষ হওয়ার পর হঠাৎ ক্যামেরার লেন্সে একজনকে দেখতে পেল বাবুলাল। কী ব্যাপার? একজন কেন? আর দুজন কোথায়? শিখর থেকে তো তিনজনকেই ফিরতে দেখেছিল সে। দেখেছিল দুহাজার ফুট ওপরে। পাহাড়ের চূড়ায় এই দূরত্বও অনেক। নামতে নামতে এক জায়গায় তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ছিল। চুপচাপ অনেকক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে বাবুলালের মনে হয়েছিল, ওখানে কোনো গুহা বা ঢল আছে। একটু পরে একজন এগিয়ে এসেছিল, বাকি দুজন আরো কিছু পরে একটা বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিল। অরপর প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শুধু একজনকে ফিরতে দেখছে৷ ভাল করে নজর বোলাতে বাবুলাল চিনতে পারল অমূল্যকে। বাবুলালের পাশে মুনমুন ফিসফিস করল, "মনে হচ্ছে অমূল্যদা।"

নেমে আসা মানুষটাকে ঠিকঠাক চিনতে না পারলেও মুনমুন দেখতে পাচ্ছিল। তার কথায় সায় দিয়ে বাবুলাল বলল, "হ্যাঁ, অমূল্য।"

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে মুনমুন প্রশ্ন করল, "প্রদীপদা আর ইন্দ্রদা গেল কোথায়?"

এ প্রশ্ন বাবুলালেরও। তাই সে কোনও জবাব দিল না। বাবুলাল দেখল, অমূল্যকে এখনও পাঁচশো ফুট নামতে হবে। কিন্তু এ কী করছে অমূল্য? পুরনো পথ না ধরে সে আড়াআড়ি এগিয়ে আসছে। ফলে সোজা ক্যাম্পের দিকে আসার বদলে অমূল্য ক্রমশই ডানদিকে সরে যাচ্ছে। অমূল্যকে নামতে দেখে তার জন্যে কমপ্ল্যান বানাল বাবুলাল। মুনমুন তখনও ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে অমূল্যকে দেখছে। বাবুলাল দেখল, অমূল্য আরও শ'খানেক ফুট নেমে এসেছে। ক্যাম্পের ডান দিকে আর বিশেষ সরেনি। একটা শক্ত বরফের বিশাল টিলার সামনে অমূল্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বরফের টিলাটা নীচ থেকে দেখে বাবুলাল বুঝতে পারল যে, এই টিলা বেয়ে অমূল্য একা নামতে পারবে না। লোহার মতো কঠিন এই বরফখণ্ড মৃত্যুফাঁদ। এর ওপর পা দিলে নিমেষে অমূল্য পিছলে যাবে। দু'হাত নেড়ে সামান্য বাঁ দিকে সরে আসার জন্যে বাবুলাল পাগলের মতো

সংকেত দিতে থাকল অমূল্যকে। কিন্তু বাবুলালের হাতের ইশারা, সংকেত, কিছু খেয়াল করল না অমূল্য। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের মাথায় ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ থাকার জন্যে অমূল্য হয়তো দেখতেই পেল না বাবুলালকে। বাবুলাল দেখল, সেই বরফের টিলার সাদা, শক্ত দেওয়ালের ওপরই অমূল্য পা রাখল। পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পিছলে গেল সে। বরফের দেয়ালের গা ঘেঁষে প্রথমে কোমরে ভর দিয়ে, পরে লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে অমূল্যকে পড়তে দেখল বাবুলাল। তার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল। কানের পাশে একটা আবছা ভয়ার্ত স্বর শুনতে পেল। অমূল্যর পড়াটা মুনমুনও দেখেছে। সেই ভয়ঙ্কর বরফের টিলাটার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দু'জনে চুপচাপ বসে থাকল। মনে মনে বাবুলাল বলল, 'ওঠ, উঠে দাঁড়া অমূল্য।' বোধহয় মিনিট দুই-তিন পেরিয়েছে, হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ক্যাম্পের দুশো ফুট ওপরে বরফ-ঢাকা একটা শিখরের ওপরে অমূল্যকে আবার দেখতে পেল ওরা। গলা ছেড়ে বাবুলাল চেঁচিয়ে উঠল, "অমূল্য—"

একটু পরেই অমূল্যকে ধরে বাবুলাল ক্যাম্পে ঢোকাল। বরফের কামড়ে অমূল্যর দু'পা, হাতের আঙুল ক্ষতবিক্ষত। কমপ্ল্যান আর ওষুধ খাওয়াবার পর অমূল্য একটু স্বাভাবিক হল। বলল, গুহা থেকে মালপত্র নিয়ে প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথকে অনেক খুঁজে, নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডেকে কোনো হদিস পায়নি। শয্যাশায়ী অমূল্যর শরীরের ওপর কয়েকটা স্লিপিং ব্যাগ চাপিয়ে বাবুলাল আবার ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়াল। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে ওপরের দিকে তাকিয়েই বাবুলাল এবার প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথকে দেখতে পেল। প্রদীপ আর ইন্দ্রনাথ মূল রুট ছেড়ে অমূল্যর চেয়ে আরো বেশি ডান দিকে সরে গেছে। বেশি নামতে পারেনি।

আকাশ না দেখেও বাবুলাল বুঝতে পারল, দিন শেষ হয়ে আসছে। এখনই অন্ধকার নামবে। চাঁদ না উঠলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই শক্ত, খাড়া বরফের দেওয়াল ভেঙে ওদের নামা খুব মুশকিল হবে। ভারী দুশ্চিন্তা হল বাবুলালের। ক্যাম্পের ভেতরে মুনমুন আহত অমূল্যর পাশে বসে আছে। মূল রুটের কাছাকাছি সামান্য বাঁ দিকে ইন্দ্রনাথ আর প্রদীপ সরে এল। সেখানে একটা বরফের খাঁজ। বাবুলাল আর দেখতে পেল না দুজনকে।

প্রদীপের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে যতটা সম্ভব নরম তুষারের ওপর দিয়ে ইন্দ্রনাথ হাঁটছিল। শক্ত বরফ দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল প্রদীপ। হঠাৎ ইন্দ্রনাথ লক্ষ করল প্রদীপের হাতের আইস অ্যাক্সটা নেই। একটু নজর চালিয়ে ইন্দ্রনাথ আবিষ্কার করল, প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে বরফের গায়ে আইস অ্যাক্সটা ঝুলছে। বরফে গাঁথার পর সেটা তুলে আনতে প্রদীপ ভুলে গেছে। তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। বরফের ঢল বেয়ে কুড়ি ফুট উঠে আইস অ্যাক্সটা এনে ইন্দ্রনাথ দিল প্রদীপকে। আইস অ্যাক্সটা হাতে কয়েক পা এগিয়েই প্রদীপ পিছলে গেল। একটা মস্ত ঝাঁকুনি খেয়ে পরিস্থিতিটি সামাল দিল ইন্দ্রনাথ। হঠাৎ প্রদীপ ডাকল ইন্দ্রনাথকে। ইন্দ্রনাথ বলল, "তুমি এসো আমার কাছে।" পাহাড় থেকে নামার সময় এটাই নিয়ম। ওপরের জন নীচের জনের কাছে আসে। প্রদীপ কিন্তু এল না, দড়ি ধরে ইন্দ্রকে টানতে খানিকটা অবাক হয়েই ইন্দ্রনাথ উঠে গেল প্রদীপের কাছে।

প্রদীপ বলল, "কানে দারুণ ব্যথা।"

ইন্দ্রনাথ বুঝল, প্রদীপ ভুল বকছে। ইন্দ্র নিজের জায়গায় ফিরে এল। কয়েক ফুট নামার পর আবার পিছলে গেল প্রদীপ। ইন্দ্রনাথ বুঝল এভাবে এগোলে বিপদ হবে। প্রদীপকে সামনে দিয়ে সে পেছনে থাকবে। পেছন থেকে দড়ি ধরে দুর্ঘটনা আটকানো অনেক সহজ। প্রদীপকে সামনে পাঠিয়ে ইন্দ্রনাথ পেছনে চলে এল। অমূল্যর ফেলে যাওয়া দড়ির প্রান্তটা বাঁধল নিজের কোমরে। দড়ির সামনের অংশটা প্রদীপের পাশে সাপের মতো লোটাতে থাকল। এতক্ষণে ইন্দ্রনাথ খানিক নিশ্চিন্ত হল। পাহাড় থেকে নামার সময় এটাই নিয়ম। সহযাত্রী কেউ অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়তে হয়। প্রদীপের নামার ভঙ্গি দেখে ইন্দ্রনাথ ভয় পাচ্ছে। প্রদীপ নামছে না, প্রতিটা ধাপ যেন হড়কে যাচ্ছে। চারপাশে ঘন হচ্ছে অন্ধকার। চোখের সামনে বরফের জগৎ আবছা হয়ে আসছে। ধীর গতিতে আরও কিছুটা নামার পর ঘন অন্ধকারে ঋষিপাহাড় ডুবে গেল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার পরের রাত হলেও মেঘের দরুণ চাঁদের আলো খুব কম।

হঠাৎ প্রদীপ থমকে দাঁড়াতে ইন্দ্র প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার?"

"সামনে একটা শক্ত বরফের খাদ," প্রদীপ জানাল।

ইন্দ্র বলল, "একটু ডান দিকে সরে যাও।"

প্রদীপ ডান দিকে সরার চেষ্টা করে পারল না। আবছা আলোয় প্রদীপের অসুবিধেটা ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারছে না। ইন্দ্রনাথ আবার ডান দিকে সরে যেতে বলায় প্রদীপ বলল, 'পারছি না।"

প্রদীপের কথা শুনে ইন্দ্রনাথ বেশ অবাক হল। খুব সহজ পায়ে বিশ-ত্রিশ ফুট দূরে খাদটার কাছাকাছি প্রদীপ নেমে গেছে। কোনও অসুবিধে হয়নি। ডান দিকে যথেষ্ট জায়গা আছে। তবু প্রদীপ সরতে পারছে না কেন?

বরফে পোঁতা আইস অ্যাক্সের সঙ্গে লাগানো দড়িটা প্রদীপের কোমর পর্যন্ত আলগাভাবে পড়ে আছে। অ্যাক্সের পাশে বাড়তি দড়িটা ইন্দ্র কুণ্ডলী করে গুটিয়ে রেখেছে।

কী করা যায় ইন্দ্রনাথ ভাবতে থাকল। দুজন মানুষ কোমরে দড়ি লাগিয়ে স্থির, নিঃশব্দ। ইন্দ্রনাথ বলল, "তুমি আমার কাছে ফিরে এসো।"

প্রদীপ নড়ল না। ইন্দ্রনাথ আবার ডাকতে প্রদীপ বলল, 'পারছি না।"

নিজের কোমরে আঁটা দড়ির প্রান্তটা খুলে প্রদীপকে পাঠালে হয়তো কিছুটা লাভ হতে পারে, ইন্দ্রনাথ ভাবল, আইস অ্যাক্সের দড়িটা একইভাবে রেখে দড়ির অপর প্রান্তটা প্রদীপের কোমরে বেঁধে দিলে দুদিকের বাঁধনে প্রদীপ ভরসা পাবে। তখন হয়তো ও নিজেই হেঁটে উঠে আসবে। আসলে এই মুহূর্তে ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনাটাই জরুরি কাজ।

পাঁচ নম্বর ক্যাম্প থেকে পরপর দু'বার আলো-বন্দুকের সংকেত এল। ইন্দ্রনাথ বুঝল বাবুলাল অন্ধকারে পথের সংকেত দিচ্ছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্প তাহলে আর বেশি দূরে নয়। মাথার টুপিটা সামান্য ওপরে তুলে লম্বা শ্বাস টেনে মুখের দু'পাশে হাত রেখে ইন্দ্রনাথ আওয়াজ দিল, "ও...হো।"

প্রত্যুত্তরে বাবুলাল একই আওয়াজ দিল। ওপর ও নীচের সেই ওহো-ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাজতে থাকল। একটু পরে বাবুলাল আবার আওয়াজ দিতে ইন্দ্রনাথ প্রদীপকে বলল, "সাড়া দাও।"

প্রদীপ নিঃশব্দ, কোনো উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ আবার বলল, "প্রদীপ, ওরা খুঁজছে আমাদের। জানান দাও।"

প্রদীপ একই রকম, নির্বিকার নিঃশব্দ।

বাধ্য হয়ে ইন্দ্রনাথ নিজেই সাড়া দিল। দু'বার অনেকটা সময় ধরে লম্বা, জোরালো শব্দ তুলতে ইন্দ্রনাথের বুকের সব হাওয়া যেন ফুরিয়ে গেল। ভারী কষ্ট আর অস্বস্তি হচ্ছিল তার। তুষারপাত আর হাওয়া কমে যেতেই আকাশের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। চাঁদের আলোয় স্বচ্ছ হয়ে উঠল চারপাশ। বিস্তীর্ণ বরফের আয়নার বুকে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে পর্বতের পৃথিবী আরো দৃশ্যমান হয়ে উঠল। পাহাড়ি খাড়াই-এর সামনে প্রদীপ থমকে দাঁড়াবার পর প্রায় দশ মিনিট কেটে গেছে। দুজনেই যেন পাথর হয়ে গেছে। একটু আগে ভাবা পরিকল্পনাটা কাজে লাগাবার জন্যে নিজের কোমরের দড়িটা ইন্দ্রনাথ খুলে ফেলল। দড়িটা একটা অ্যালুমিনিয়ামের সেফটি রিং দিয়ে কোমরে লাগানো থাকে। চাবির রিং-এর মতো এই রিংটাকে বলে, ক্যারাবিনার।

রিংসুদ্ধ দড়ির প্রান্তটা প্রদীপের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, "এটা ধরো।"

দু'বার ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয়বারের চেষ্টায় প্রদীপ সেটা ধরতে পারল। চাঁদের আলোয় প্রদীপকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। বেশ সহজভাবেই ঢলটার সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রদীপ। রিং সহ দড়ির প্রান্তটা প্রদীপ ধরার পর ইন্দ্রনাথ বলল, "রিংটা কোমরে লাগিয়ে নাও।"

রিংটা অনেকটা সেফটিপিনের মতো, দু'আঙুলে চেপে রিং-এর মুখটা প্রদীপ খুলতে পারল না। প্রদীপের নিষ্ফল চেষ্টা ইন্দ্রনাথ দেখতে পাচ্ছিল। বলল, "আর একবার চেষ্টা করো।"

"পারছি না", প্রদীপ জানাল।

"নিশ্চয় পারবে।"

"আমার হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। জোর নেই।"

প্রদীপের জবাব শুনে ইন্দ্রনাথ শব্দহীন হয়ে গেল।

কিছু সময় নীরবতা, দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

প্রদীপ বলল, 'ইন্দ্র, একটু সাহায্য করো আমাকে।"

"কী সাহায্য," ইন্দ্রনাথ জানতে চাইল।

"যে-কোনো সাহায্য, একটু সাহায্য পেলেই আমি ফিরতে পারব।"

ইন্দ্র বুঝল, আইস অ্যাক্সের দড়ি ধরে প্রদীপকে টেনে তুলতে হবে। আর কোনও উপায় নেই। নাইলনের দড়ির দুটো প্রান্তই প্রদীপের কাছে, মাঝখানে ইন্দ্রনাথ। আর একটা

বাড়তি দড়ি থাকলে ভাল হত। কিন্তু নেই। আইস অ্যাক্সে লাগানো দড়ির মাঝখানটা জুতোর ক্র্যাম্পঅন দিয়ে চেপে ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে। নিচু হয়ে জুতো সরিয়ে ইন্দ্রনাথ দড়িটা ধরতে গেল। ডান হাতের দুটো আঙুলে ইন্দ্র দড়িটা স্পর্শ করল। নিছক স্পর্শমাত্র, ধরতে পারল না দড়িটা। তার আগেই বরফে পোঁতা আইস অ্যাক্সটা ছিটকে গেল। ইন্দ্রনাথ দেখল, হাতের কাছে দড়িটা নেই। সাদা বরফের খাড়া দেওয়াল দিয়ে দড়িটা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শুধু দড়ি নয়, গড়িয়ে পড়ছে আইস অ্যাক্সটাও। সাদা বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত নামতে থাকা দড়ির প্রান্তে প্রদীপ। প্রদীপ তলিয়ে যাচ্ছে। পিচ্ছিল, খাড়া বরফের ঢালের ওপর শরীরের দু'পাশে দুহ'াত রেখে প্রদীপ বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন এক শিশু পার্কে স্লিপ চড়ছে। যত নীচে নামছে, তত বেড়ে যাচ্ছে প্রদীপের পড়ার গতি। ক্রমশ শরীরটা একটা কালো বিন্দু হয়ে নীচে, অনেক নীচে মিলিয়ে গেল।

ইন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি, কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। অসাড়, শূন্য মাথায় অতলস্পর্শী খাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু আয়নার মতো কঠিন বরফ আর ধুধু নীরবতা। একসময় তার সংবিৎ ফিরে এল। গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল, "প্রদীপ...লিডার...।"

নিশ্চল বরফ তরঙ্গে তার গলা ঘুরে ঘুরে প্রতিধ্বনিত হল। কেউ সাড়া দিল না। বরফের সেই দেওয়ালের ওপর ইন্দ্রনাথ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। মাথা ঝিমঝিম করছে, মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না কিছু। চারপাশে ফ্যাকাসে অন্ধকার। মেঘভাঙা চাঁদের আলোয় চকচকে সাদা বরফের ঢালগুলো দেখা যাচ্ছে। অনেকটা সময় আগে বেসক্যাম্পের আলোটা ইন্দ্রনাথ দেখেছিল। এখন সেখানেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চাঁদ ওঠার পরেও টর্চ জ্বেলে বাবুলাল কয়েকবার সংকেত পাঠিয়েছে। টর্চের আলোও আর জ্বলছে না। বাবুলাল আর মুনমুন নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। ইন্দ্রনাথ হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ আবার উঠে দাঁড়াল মনে মনে ভাবল, কাঁদলে বা ভেঙে পড়লে চলবে না। বেসক্যাম্পে আমাকে পৌঁছোতেই হবে।

নিজের অবস্থাটা ইন্দ্রনাথ বোঝার চেষ্টার করল। গাঁইতি নেই, দড়ি নেই, খালি হাতে কঠিন বরফের এই খাড়াই দেওয়াল বেয়ে তাকে নামতে হবে। তখনই তার মনে পড়ল, প্রদীপের জুতোর ক্র্যাম্পঅনটার কথা। অনেক অনুরোধেও কাঁটাটা প্রদীপ যখন জুতোয় লাগাল না, তখন ইন্দ্রনাথ নিজের পকেটে সেটা রেখেছিল। হ্যাঁ, পকেটেই সেটা আছে। ক্র্যাম্পঅনটা হাতে নিয়ে শক্ত বরফ এড়িয়ে নরম তুষার খুঁজে ইন্দ্রনাথ আবার নামতে শুরু করল। সামিটে চড়ার সময় স্নো গ্লাস পরে পাওয়ার লাগানো চশমাটা ইন্দ্রনাথ পাঁচ নম্বর ক্যাম্পে রেখে এসেছিল। এখন প্রতি পদক্ষেপে সেই চশমাটার অভাব ইন্দ্র টের পেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ভাল করে। একটা জায়গায় পৌঁছে ইন্দ্রনাথের মনে হল, ঠিক তার পায়ের নীচেই বেসক্যাম্প। মই বেয়ে নামার মতো হাতের কাঁটাটা বরফের দেওয়ালে গেঁথে ধীর চালে সে নামছে, ইন্দ্রনাথের হঠাৎ মনে হলো, তার সঙ্গে কেউ

একজন দড়িতে বাঁধা, সেও পেছনে পেছনে নামছে। বরফে তার পায়ের আবছা শব্দ ইন্দ্রনাথ শুনতে পেল। প্রদীপ নাকি? পেছন ফিরে তাকিয়ে ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় ইন্দ্রনাথের মনে হলো, একটু ওপরে একটা বরফের শিরার আড়ালে কে যেন সরে গেল। ভারী অবাক হয়ে সেদিকে একপলক তাকিয়ে থাকলো ইন্দ্রনাথ। নাহ, কেউ নেই। কোমর স্পর্শ করে নাইলনের দড়িটারও হদিশ পেল না সে। একটু আগের দুর্ঘটনার ছবিটা তার মাথায় ভেসে উঠলো। খাড়া সাদা দেওয়াল বেয়ে একটা দড়ি সরসর করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে! ইন্দ্রনাথ বুঝল তার মাথায় বিভ্রম আর প্রহেলিকার কুয়াশা জমছে। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে আবার নামতে শুরু করল। ফের সেই শব্দ, আর একজন তাল মিলিয়ে নামছে। হঠাৎ তার পা পিছলে গেল। হাতের কাঁটাটা বরফে আটকে ইন্দ্রনাথ পড়াটা ঠেকাতে চাইল। কিন্তু পারল না। এতক্ষণ বরফের দিকে মুখ করে সে নামছিল। 'পড়ার সময় পর্বতারোহীর সহজাত শিক্ষায় সে শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। এখন বরফের ওপর তার পিঠ, মুখটা আকাশের দিকে। দু'পায়ের জুতো আর হাতের কাঁটা দিয়ে ইন্দ্রনাথ আরো কয়েকবার বরফের দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। দু'পায়ের মাঝখানে নরম তুষার জমছে। হাতের কাঁটাটা হঠাৎ ছিটকে পড়ে গেল। ইন্দ্রনাথ দেখল আকাশের চাঁদ ধীর, স্থির, শান্ত, তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় দেড়-দু'শো ফুট পড়ার পর নরম তুষারস্তূপে তার শরীরটা আটকে গেল। ও ভাবতে চাইল, এখন কত রাত? আকাশভর্তি তারা আর চাঁদের দিকে একপলক তাকাল। মনে মনে হিসেব করল, এখান থেকে বেসক্যাম্প খুব দূরে নয়। আবার চেষ্টা করতে হবে। ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়াল।

রাতের শীতল অন্ধকারে চারপাশের বরফ শক্ত হয়ে আছে। দিনের বেলায় এমন হয় না। সূর্য উঠলে, রোদ পড়লে, বহু বছর ধরে জমে থাকা পাথরের মতো কঠিন বরফস্তরও নরম, গলা-গলা হয়ে ওঠে। কিন্তু রাতের বেলায় আবার জমাট বেঁধে যায়। সতর্ক পায়ে সেই কঠিন বরফের ওপর দিয়ে আন্দাজে একপা এগোতেই ইন্দ্রনাথ আবার পিছলে গেল। বরফের খাড়া দেওয়াল দিয়ে তার শরীরটা ঘুরপাক খেয়ে নামতে থাকল।

রাতের অন্ধকারে কতক্ষণ যে বেহুঁশ ছিল, ইন্দ্রনাথ জানে না। জ্ঞান ফিরতে বুঝল যে, কোনও একটা বরফের খাঁজে তার শরীরটা আটকে আছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে বরফে। একটা হাত বরফের ভেতর, অন্যটা বাইরে। মাথার কোষগুলো সব মরে গেছে, আচ্ছন্ন, বিভোর। ইন্দ্রনাথের মনে হল দূর বিদেশে, কোনো একটা জায়গায় সে খেলতে গেছে। খেলার মাঠের চারপাশে বরফ পড়েছে। মাঠে আসার পথে একটা বরফের নালায় সে পড়ে গেছে, উঠতে পারছে না। সে চেঁচাল, "আমাকে বাঁচাও।"

চারপাশে অনেক মানুষ। কিন্তু তার ডাক শুনে কেউ তাকে বাঁচাতে এল না। হঠাৎ দেখল তার মুখের ওপর মমতা ভরা দুচোখ মেলে প্রদীপ তাকিয়ে আছে। একটু হেসে

প্রদীপ বলল, ওঠ। এভাবে শুয়ে থাকলে চলবে? বড় অবাক হল ইন্দ্রনাথ। চোখ মেলে তাকাতেই একঝলক ঘন, উষ্ণ রোদ দেখতে পেল। রোদের তাপেই হয়তো তার মাথা আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। হুঁশ ফিরে পেল সে। ফিরে পেয়েই বুঝল, সে মরতে বসেছে, সামনে অবধারিত মৃত্যু, নিজেকে নিজে না বাঁচালে এই বরফসমাধি থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে আসবে না। অদম্য মনোবলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে দেখল, কঠিন বরফে দুটো পা আটকে গেছে। ডান হাতে বরফ সরাতে গিয়ে বুঝল, সারারাত বরফের ওপর থাকার জন্যে হাতটা অকেজো হয়ে গেছে। বাঁ হাত দিয়ে পায়ের নীচের বরফ ও খোঁচাতে থাকল। অনেকক্ষণের চেষ্টায় প্রথম ডান পা, পরে বাঁ পা বরফের কামড় থেকে বেরিয়ে এল। উদ্বেগ আর ক্লান্তিতে ইন্দ্র হাঁপাচ্ছিল। দু'পায়ের ওপর দাঁড়াতে গিয়ে বুঝতে পারল পিঠের শিরদাঁড়ায় দারুণ ব্যথা। কুঁজো পিঠ সোজা হচ্ছে না। দুটো পা লোহার মুগুরের মতো ভারী। ডান হাত ফুলেছে, বেজায় ব্যথা, হয়তো ভেঙে গেছে। তুষারক্ষতও হতে পারে।

সূর্য উঠেছে। আকশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। ঝকঝকে, ঘনরোদ এসে পড়েছে তার শরীরের ওপর। রোদ তো নয়, যেন উষ্ণজীবন। কী আরাম! কঠিন বরফে রোদ প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে তার দু'চোখে লাগছে। তাকানো যাচ্ছে না। সূর্যালোকিত বরফের দিকে পনেরো মিনিট খালি চোখে তাকিয়ে থাকলে একজন মানুষের অন্ধ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গলায় ঝোলানো স্নো-গ্লাসটা খুলে বরফ মুছে পরিষ্কার করার সময় সেটা ইন্দ্রনাথের হাত থেকে পড়ে গেল। চোখের পলকে ত্রিশ ফুট নীচে গড়িয়ে চলে গেল সেটা। ত্রিশ ফুট নেমে স্নো-গ্লাস তুলে আনার শক্তি আর ইন্দ্রের শরীরে নেই। ইন্দ্রের মনে পড়ল, চশমার রঙিন অ্যাটাচিটা জ্যাকেটের বুকপকেটে আছে। পকেট থেকে অ্যাটাচি বার করে চোখের সামনে ধরে এক পা এগোতেই ইন্দ্রনাথের শরীর দুলে উঠল। টলমল করতে থাকল বরফের পৃথিবী। ইন্দ্রনাথ বুঝল, তার হাঁটার শক্তি নেই। বরফে কোমর ঘসে কিছুটা গিয়ে একটা ঢলের ওপর ওই শরীরটা স্থির হয়ে গেল। ঢলের ঠিক নীচেই একটা ছোট উপত্যকা, নরম তুষারে ঢাকা। উপত্যকাটা ইন্দ্রর খুব চেনা লাগল। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের ষাট-সত্তর ফুট ওপরে এই উপত্যকাটা, ক্যাম্প থেকেই ও দেখেছিল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢলের কিনারায় এসে শরীরটা ছেড়ে দিতেই ত্রিশ ফুট নীচে সেই বরফের উপত্যকার ওপর ইন্দ্রনাথ আছড়ে পড়ল। খুব একটা ব্যথা লাগল না। হয়তো ব্যথা পাওয়ার অনুভূতিটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। পিছলে পড়ার সময় শক্ত মুঠিতে অ্যাটাচিটা ধরে থাকলেও পড়ার পর ইন্দ্রনাথ দেখল, সেটা হাতে নেই। কটকটে, চোখধাঁধানো রোদ। ইন্দ্রনাথ বরফের দিকে তাকাতে পারছে না। কোনওমতে উপত্যকার নরম বরফের ওপর উঠে দাঁড়াতেই ইন্দ্রনাথ দেখল, অমূল্যকে নিয়ে চার নম্বর ক্যাম্পের পথে মুনমুন নেমে যাচ্ছে। হাত নেড়ে তাদের দুজনকে বিদায় জানাচ্ছে বাবুলাল।

ইন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখতে পেল মুনমুন। চেঁচিয়ে উঠল, "ইন্দ্রদা...।" এবার বাবুলাল দেখল ইন্দ্রকে।

বাবুলাল প্রশ্ন করল, "কেমন আছিস ইন্দ্র?"

"আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। একটা স্নো-গ্লাস দে।"

"আমার কাছে এই একটাই, আর নেই।" বাবুলাল জানাল।

প্রায় চোখ বুজে ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে ছিল। বাবুলালের কথায় চোখ খুলল। একটু এগোতেই সামনে একটা ফাটল। খুব চওড়া নয়, লাফিয়ে পেরোনো যায়। কিন্তু সে কি লাফাতে পারবে? লাফাতে না পারলে ফাটলটা কাটিয়ে ঘুরপথে যেতে হবে। সে অনেক শক্তি আর সময়ের ব্যাপার। একলাফে এই ফাটলটা পেরিয়ে যেতে পারলে হামাগুড়ি দিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে। শরীরের সব শক্তি, সাহস এবং বাঁচার আকুলতা একটা লম্বা নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে, আহত ক্ষতবিক্ষত শরীরে সেই ফাটলের ওপর দিয়ে ইন্দ্রনাথ একটা লাফ মারল। পেরেছে। পাঁচ নম্বর ক্যাম্পের একটু আগেই বাবুলাল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল ইন্দ্রনাথকে। তারপর প্রশ্ন করল, "প্রদীপ কোথায়?"

কী একটা বলতে গিয়ে বাবুলালের বুকের ওপরে ইন্দ্রনাথ বেহুঁশ হয়ে গেল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগের একটা দৃশ্য হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মনে পড়ল। তার নাইলনের দস্তানাটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে প্রবল বাতাসে টুপটুপ করে পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। *

*লেখকের 'ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত' গ্রন্থ থেকে

মণিমহেশ

শ্যামসুন্দর বসু

আফ্রিকায় এক জাতের পাখী আছে, নাম—মেইম্যাট। মধু পাগল। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে মধুর খোঁজে। কিন্তু হলে কি হবে, নিজের দৌড় ওই খোঁজ খবর করে ঠিক-গাছের ডালে বসা পর্যন্ত। তার বেশি কিছু না। তাহলে স্বাদ পাওয়ার কি কোনো ব্যবস্থাই নেই ? আছে। মধু-বৃন্দাবন যোগের মোক্ষম ব্যবস্থা। বেঁজি আর শেয়ালের মাঝামাঝি দর্শনের দারুণ মৌচুষকি জীব বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় 'হানি ব্যাজার' নামে। প্রথমে জন্তুটির উদ্দেশ্যে জঙ্গলে জুড়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয় পাখীটা। তা শুনে 'ব্যাজার' বেরিয়ে এলে কিচির মিচির শব্দে 'মেইম্যাট' পথ দেখিয়ে উড়ে চলে। মোটেই বেজার হয়ে নয়, রীতিমত হৃষ্টচিত্তে অনুসরণ করে 'ব্যাজার' মহারাজ। এরপর উড়ন্ত পাখীটার কাজ নির্দিষ্ট গাছের মৌচাকটি চিহ্নিত করে দিয়ে ডালে বসে লক্ষ্য করা। নীচের জীবটি এক নজর দেখে ঝটপট উঠে গিয়ে নখের থাবায় ভেঙে মাটিতে ফেলে দেয় মৌচাকটি। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে মহানন্দে চলে মধুপান।

আমাদের মনটা হল 'মেইম্যাট' পাখী। পঞ্চভৌতিক দেহটি 'ব্যাজার'। দুজনে মিলেমিশে ধেয়ে চলে হিমালয়ের মধু-অমৃত আহরণে। এবং মৌমাছির ভূমিকায় স্বচ্ছন্দে বসানো চলে প্রকৃতিকে।

কথিত আছে, কাশ্মীরে মুসলমানদের অনাচার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে অমরনাথ আরও দুর্গম নিরাপদ স্থান নির্বাচন করেন হিমাচলে। এখানকার বাসিন্দারা বলে চাম্বা কৈলাস। নবরূপে অমর তীর্থের দেশজোড়া নাম হয় মণি মহেশ। এহেন মহেশ তীর্থ সুলভ হবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

সাধারণত মণিমহেশ যাত্রীদের পাঞ্জাবের সীমান্ত শহর পাঠানকোট রেল স্টেশনে নামতে হয়। এখান থেকে বাসযোগে চাক্কী, দুনেরাধর, বানীক্ষেত হয়ে চম্বা যাওয়াই সোজা। বানীক্ষেত থেকে পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়েও চাম্বা পৌছানো যায়। প্রথমে পড়ে ডালহৌসি। পরে খাজিয়ার। পাঠানকোট থেকে ৮০ কিলোমিটার।

কিন্তু আমার পথ পূর্বে কিন্নর থেকে হিমাচলের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম প্রান্তে চাম্বা কৈলাস বা মণিমহেশ। দুটিই হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত। বাসটি 'সুঙ্গরা' থেকে ছেড়ে রামপুর বুশায়ার ছুঁয়ে সিমলার দিকে না গিয়ে সেঁজ পর্যন্ত যায় সোজা। এখান থেকে ডাইনে বেঁকে শতদ্রু পেরিয়ে ঢোকে কুলু জেলায়। সকালবেলায় চীরগাছের মিষ্টি বুনো গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে মন-মহাশয় বিদ্রোহ করে ওঠে, চলমান যন্ত্রযানের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে।

নাটকীয় প্রবেশ ইচ্ছাপূরণ দেবীর। সামনের ডানদিকের চাকা 'পাংচার'।

বিপজ্জনকভাবে খাদের দিকে মুখ থুবড়ে থমকে গেল। কমসে কম এক ঘণ্টার ল্যাঠা। সুবর্ণ সুযোগ। রাস্তা ধরে খানিকটা দেখা যাক বরং। চটপট নামি।

হাজার হাজার চীরগাছ বাঁ দিকের গা বেয়ে উঠে গেছে। ফাঁক দিয়ে 'প্রোজেক্টার' বিচ্ছুরিত আলোর মতো সূর্যরশ্মির ঝিলিমিলি সরে সরে যাচ্ছে ডান দিকের নীচে সবুজ পর্দায়। এদিকে অনেকটা খেজুর গাছের পদ্ধতিতে মাটির চার ফুট উঁচু থেকে রস নেওয়ার ব্যবস্থা চীরগাছগুলিতে। নীচে টিনপাতা আছে একে একে। নামমাত্র প্রসেসিংয়ের পর রজনের টিন ভর্তি হয়ে চালান যাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল শহরগুলিতে, রং তৈরির কারখানায়। কাঁচা রসের নেশা ধরানো গন্ধে ভরে গেছে ছায়া সুনিবিড় অঞ্চলটা। গাঁয়ের আম—বউলের বাগান মাঝে দাঁড়ালে এমনটা হয়। ভেসে আসছে পাখীদের তান। অনেক নীচের প্রান্তরে ঘন সবুজ ধানের মখমল পাতা রয়েছে। মাঝে মাটি লেপা কুটিরকে ঘিরে কচি পাতার কলাবাগান চকিতে নিয়ে যায় গ্রাম বাংলার 'ধানসিঁড়ি' কোলে। ধুলো মাখা একদল ছেলে মেয়ে হৈ হৈ করে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে। বাস ও তার যাত্রীদের ভাল করে দেখতে। ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছেলে তার দিদির কোলে চড়ে কিছুতেই আসবে না। চিৎকার জুড়ে দেয়। বিরক্ত দিদি নামিয়ে দিতেই, টলমল পায়ে মুখ ভরা উপচে পড়া হাসিতে সকলের অংশীদার হয়। হিমালয়ের সঞ্জীবনী সুধায় মানুষ যে। হোক না কদিন হল শিখেছে দাঁড়াতে। শিখেছে যখন, স্বাধীন তখন। চলবে না খরবদারি।

ঘণ্টা দেড়েক পর বাস আবার হেলতে দুলতে চলল। নামেই চলা। 'বহেনা'র কাছে এসে আবার থমকে যায়। আর যাবে না। বিরাট ধস হুমড়ি খেয়েছে। সবার সঙ্গে নেমে মালপত্র কাঁধে তুলে হাঁটা দেব। এমন সময় ৩/৪ জন গ্রামবাসী বোঝাল, 'নদীর ওপারের বাস ধরতে ঘুর পথে ১ কিলোমিটার শুধু শুধু হাঁটবেন কেন? নদীটায় এক হাঁটু জল, আরামসে পেরিয়ে যান।'......

ক্রমে কারসোগ হয়ে সুন্দর নগরের সুন্দরতম বাঁধের পাশ দিয়ে রাত সাড়ে সাতটায় বিয়াস নদীর পূর্ব তীরে মাণ্ডি পৌঁছাই।

মাণ্ডিতে সে এক জ্বালা। নদীর ওপারে বাজার এলাকায় থাকার অনেক জায়গা। কিন্তু ওখান থেকে এতটা এসে ভোর পাঁচটায় চাম্বার বাস ধরা অসুবিধের কথা। কাছাকাছি থাকাই ভালো। বাস স্ট্যাণ্ডের পিছনে উঁচুতে ট্যুরিস্ট লজের আলো জ্বল জ্বল করছে। মূল্যবান ভেবে এড়িয়ে পাশের পি. ডব্লু. ডি বাংলায় অনেক চেষ্টা করলেও ঠাঁই হয় না। চৌকিদার উপস্থিত যাত্রীদের জন্য হোটেল ব্যবসায় ব্যস্ত। আমার দিকে না তাকিয়ে গ্লাসে ডিমের কুসুম নাড়তে নাড়তে 'সামনের সপ্তায় খোঁজ নেবেন' বলেই উনুনের সস্‌প্যানে ঢেলে দিল। আওয়াজ উঠল ছ্যাঁক করে। কথা না বাড়িয়ে ফিরি। কেন না ওর কথামতো সামনের সপ্তায় আমি এখানে নয়, বাড়িতেই পৌঁছে যাব। অগত্যা ট্যুরিস্ট লজে যেতে হয়।

স্যুট টাই পরা ম্যানেজার যা রেট বলল তাতে আমার মতো মধ্যবিত্তর কানে ঐ ডিম ছোঁড়া 'ছ্যাঁক' আওয়াজের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু এল না। একটা ছোট্ট সিঙ্গল বেড রুমের এক রাতের সর্ব নিম্ন চার্জ ৬০ টাকা। সর্বাধিক ২৫০ টাকা মাত্র।

রাত্তিরে কোথায় মাথা গোঁজা যায় এই দুশ্চিন্তায় বেরিয়ে আসছি, এমন সময় অগতির গতি দারোয়ান এসে কানে কানে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে বলল, ডর্মিটারী আছে। দশ টাকা লাগবে। হাতে চাঁদ। আমি একা মানুষ, প্রায় ভবঘুরে। ডর্মিটারীতে অসুবিধে কোথায়? 'তথাস্তু' বলে, অগ্রিম মিটিয়ে আনন্দে অনুসরণ করি। টর্চ জ্বেলে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল। প্রায় অন্ধকার। গ্রাম বাংলায় একে 'পাঁদাড়' বলে।

আনন্দ নয় মহানন্দ। দরজা খুললে দেখি, সারি সারি স্পঞ্জের বিছানা (হোক চাদরহীন নোংরা) খালি পড়ে আছে। অর্থাৎ আজকের রাত টুকুর জন্যে এই পাঁদাড়পুরীর একছত্র অধিপতি, স্বয়ং। তিনদিন গায়ে জল পড়েনি। যদিও হিমালয়ে রোজ স্নানের প্রয়োজন হয় না। তবু, শাওয়ার বাথ-এর ব্যবস্থা আছে দেখে আর লোভ সামলানো গেল না। চট্‌জলদি শাওয়ারের নীচে ভাল করে মাথা ও গা হাত পা ধুয়ে নিই। সদর দরজায় তালাটা লক করে শিস্ দিতে দিতে পেরিয়ে যাই বাসস্ট্যাণ্ডে, রাতের খাওয়া সারতে।

সব সেরে শুতে রাত এগারোটা বেজে গেল। তবু সারাদিন বাস 'জার্নির' ফলে ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।......

ভোর পাঁচটা মানে অন্ধকার। বিয়াস পার হয়ে বাস এবার ডান দিকে ঘুরে আর এক প্রস্থ অতিক্রম করে একই নদীকে। বেদের 'বিতস্তা'। টলেমির 'বিদাসপেস'। মধুর নামের এই বিয়াস বা বিপাশা নদীর প্রাণ সঞ্চার হয়েছে রোটাং গিরিবর্ত্মের 'বিয়াস-রিখি' অঞ্চলে। সেদিনের শিশু ক্রমে পরিণত হয় রূপসী যুবতীতে। নূপুর কিংকিনীর ঝঙ্কার তুলে নৃত্য—চপল ছন্দে নেমে চলে কুলু জেলার মধ্য দিয়ে। ২৫৬ কিলোমিটার এগিয়ে ভারতীয় পাঞ্জাবে ফিরোজপুরের উত্তরে শতদ্রুতে মিলে ধেয়ে চলে শতদ্রু নামে, পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর দিকে। অবশ্য একা নয়। পাঁচটি নদী—শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ঝিলাম ও ইরাবতীর ধারা আজকের পাঞ্জাব নয়, স্বাধীনতা-পূর্ব সমগ্র পাঞ্জাবের সীমানায় মিলিত হয়ে (এইজন্য পাঞ্জাবকে পঞ্চ নদের দেশ বলা হয়) সিন্ধুর দিকে ধেয়ে চলে। ঝিলাম, কাশ্মীরের নদী। উৎপত্তিস্থল কাশ্মীরের ভেরীনাগ প্রস্রবণ। চন্দ্রভাগা (চেনাব) বা প্রাচীন অক্সিনীর, জন্ম লাহুলের বারালাচা গিরিবর্ত্মের সন্নিহিত অঞ্চল। উৎস থেকে সাঁড়াশীর মতো চন্দ্র ও ভাগা যথাক্রমে ৯৬ ও ৬৪ কি.মি. ঘুরে মিলিত হয়। তারপর লাহুল-চাম্বায় আরও ১৪৪ কি.মি. ধেয়ে জম্মু কাশ্মীব হয়ে বর্তমান পাকিস্তানের মাঘিয়ানার দক্ষিণে জং -এর কাছে ঝিলামের সঙ্গে মিলে এগিয়ে চলে। কিছু দূরেই মুলতান জেলার সরাইসিধায় যোগ দেয় রাভী বা ইরাবতী। বিয়াস ও চন্দ্রভাগার মতো রাভীর জন্মও হিমাচল প্রদেশে। চাম্বা-খাড়ামুখের সোজা পথ ছাড়িয়ে কাঙড়া জেলার বড়া বঙ্গাহাল পর্বতের ওপরে। ঝিলাম, রাভি ও চন্দ্রভাগার মিলিত

ত্রিধারা আরও দক্ষিণে গিয়ে বিয়াস শতদ্রুর যুগ্ম স্রোতের সাথে সঙ্গম ঘটিয়ে নাম নেয় পঞ্চ নদ। এদের মধ্যে দীর্ঘতম পথ যাত্রা তিব্বতের শতদ্রু নদীর। ওদিকে তিব্বত হিমালয়ের বিশালকায় নদ সিন্ধু হাঁ-হাঁ করে ধেয়ে আসে। সঙ্গম স্থল থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে মিথানকোটের কাছে বিশালকায় সিন্ধুতে সর্বহারা হয় পঞ্চনদ। একগুচ্ছ জলধারায় ধনী হয়ে প্রাচীন সভ্যতার ধারক-বাহক সিন্ধুর মহা মিলন সাঙ্গ হয় আরব সাগরের সুনীল গভীরে।

চোখের পর্দায় আসে একের পর এক মনোরম দৃশ্য। পাহাড়িয়া ঝর্ণা কিশোরীদের দুষ্ট নাচন খেলা আর হিমালয়ের উদার কোল-সিঁড়িতে হলদে—সবুজ ধানের বহুতা মেলার কাজল পরে এগিয়ে চলি। ক্রমে বৈজনাথ, দলাইলামার বর্তমান নিবাস ধরমশালা, চুয়ারি ও বানীক্ষেত হয়ে স্থাপত্য কলার অনুপম নিদর্শন সদা সান্ত্রী প্রহরা নিযুক্ত সাসপেনশন ও প্রি-ফেব্রিকেটেড শীতলাব্রীজ পেরিয়ে প্রবেশ করি মণি মহেশের তোরণদ্বার সুন্দরী চাম্বা (৯১৭ মিটার) উপত্যকায়।...

প্রকৃতির নিখুঁত রত্ন সৌন্দর্যের প্রবেশ দ্বার চাম্বা। কত না পথ। সাহসী ট্রেকারদের জন্যে আছে লাহুলের পথে পাঙ্গী উপত্যকার মিষ্টি মধুর জনপদ কিলার। ১৬৫ কিলোমিটারের চাম্বা-টিসা-কিলার ট্রেক করতে সময় লাগে ৬/৭ দিন। পথে পড়বে চাম্বার গভীরতম অরণ্যানী ও সাচ্ গিরিবর্ত্ম। কষ্ট থাকলেও ক্রমাগত দৃশ্য পরিবর্তন এ পথে মনপ্রাণ ভরানোর উৎস। গাড়ি পথও আছে। টিসা পর্যন্ত বাস। ওখান থেকে জিপ যোগে আলওয়াস। বাকিটা হাঁটা। কিলার থেকে ট্রেক রুটে বা হাঁটা পথে ত্রিলোকনাথ। অপর দিকে শ্রীনগর পর্যন্ত যাওয়ার পথ আছে। কিলার তিনটি কারণে বিখ্যাত।এক, রামধনু রঙিন প্রাকৃতিক রূপরাশির প্রাচুর্য। দুই, হজমী জলের ঝর্ণাধারা। সব শেষ ও প্রধান কারণ এখানকার জাগ্রত দেবতা দ্যেতনাগ। শোনা যায়, নিয়মিত দেব আহুতিতে নির্দিষ্ট এক পুত্রের জন্য বিধবার আকুল কান্নায় ব্যথিত গদ্দি যুবক বিধবার পুত্রের বিনিময়ে নিজপ্রত্যঙ্গের একটি করে কেটে উৎসর্গ করে আর চিৎকার করে বলতে থাকে, 'এবার জাগো!' কিন্তু পাথরের মূর্তিতে প্রাণ আর প্রতিষ্ঠা হয় না। তখন রেগে মেগে গদ্দি সেই মূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। মূর্তি এসে ঠেকে এই কিলারে। এক মেষপালক দেখে মাথায় করে নিয়ে চলল বাড়িতে। খানিকটা যাওয়ার পর এমনই ভার লাগল যে আর নড়তে পারে না। ঠাকুরের ইচ্ছে বুঝে সেই থেকে সেখানেই প্রতিষ্ঠা হল নাগ দেবতার।

টিসা থেকে হাঁটা পথে চারটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার পথ আছে। ছাবরি, কুবচা, ছোবিয়া ও কুগতি গিরিবর্ত্ম। শেষের তিনটি দিয়ে ভারমোর আর ত্রিলোকনাথে পৌছানো যায়। এছাড়া চাম্বা-ভারমোর-মণিমহেশ পথের ডাকতো চিরকালের।

আর একটি ভাল হাঁটা পথ—সলুনি হয়ে ভাগুাল। উত্তর পশ্চিম দিকে সলুনির দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। ভাগুাল আরও ২৪ কিলোমিটার। এদিক থেকে ভাগুাল কাশ্মীর শ্রীনগর প্রবেশের চাবিকাঠি। অর্থাৎ রাস্তা আছে। ভ্রমণ রসিকদের জানা থাকবে,

হিমালয়ের প্রায় সর্বত্র হাঁটা পথের জনপদে সহজ মূল্যে পি. ডব্লু. ডি. ফরেষ্ট বাংলো পাওয়া যায়। খাওয়ার জন্যে চৌকিদারের শরণাপন্ন হওয়াই সুবিধাজনক।

চাম্বা থেকে পিছন ফিরে ট্রেক করার চিত্তহারী পথ আছে বিছানো। দক্ষিণ দিকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে চাম্বা জেলায় অপরূপা খাজ্জিয়ার (২১৪১ মিটার)। যাদুময় স্বর্গোদ্যান। চতুর্দিকে পাইন ও দেবদারু বনের ঘেরাটোপ। সেখান থেকে ভেলভেট মসৃণ দুর্বাদলের ঢাল নেমেছে প্রকৃতির সবুজ অলঙ্কারে মোড়া হ্রদের উপর পর্যন্ত। ভেসে. থাকে ঘাসে ভরা ছোট দ্বীপ। আয়োজন রয়েছে নৌকা বিহারের। আছে নয় গর্তের চিত্তাকর্ষক 'গলফ' ময়দান। আর আছে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত স্বর্ণ গম্বুজযুক্ত খাজ্জিনাগের মন্দির।

খাজ্জিয়ার থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে রোমাঞ্চ-রমণীয় আভিজাত্যে ভরা রূপসী শহর ডালহৌসি (২৩৭৮ মিটার)। পাঠানকোট থেকে চাম্বার পথে বানীক্ষেত হয়ে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। রাজকীয় তুষার মুকুট পরিহিত ধৌলাধর গিরিশ্রেণীর মধ্যমণি হয়ে পাঁচটি পাহাড়ের কোল আলো করে আছে রূপবতী শহরটি। পাইন ও ওক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খানিকটা চড়াই ভাঙলে তিনটি বিখ্যাত নদী বিয়াস, রাভি এমনকি চন্দ্রভাগা পর্যন্ত দেখা যায়, এক নজরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মণীষীদের স্মৃতিধন্য শৈলাবাসটির রূপকার লর্ড ডালহৌসি। নির্মাণ সময় ১৮৫৪ সাল।....

বাস যোগেও বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। চাম্বা থেকে তিসা (৭২ কিলোমিটার), ভারমোর (৬৫ কিলোমিটার), ডালহৌসি (৫৩ কিলোমিটার) পাঠানকোট (১২২ কিলোমিটার), অমৃতসর (২২৯ কিলোমিটার)। জলন্ধর (২২৫ কিলোমিটার) দিল্লী (৬০৫ কিলোমিটার), চণ্ডীগড় (৩৯৪ কিলোমিটার) এমন কি মাণ্ডি ও সিমলা পর্যন্ত সরাসরি।.......

মণিমহেশের উৎসব রাধাষ্টমীতে। শুরু হয় ১৫ দিন আগে জন্মাষ্টমীর দিন। রাধাষ্টমীর আটদিন আগে চাম্বায় এঁর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিরাট শোভাযাত্রা সহযোগে ছড়িযাত্রা শুরু হবে। নাম তার চর্পটনাথ ছড়িযাত্রা। শেষ হবে রাধাষ্টমীর দিন—মণিমহেশের পদতলে পবিত্র ডাল হ্রদে স্নান, পূজা ও মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। সারা জেলার এমনকি অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দারাও হাজির হন সেই উৎসবমুখর প্রাঙ্গণে। মেলার হাট বসে যায় চাম্বা, ভারমোর ও হ্রদের তীরে। অস্থায়ী তাঁবু, দোকান ও হরেক মানুষের সার লেগে যায় সর্বত্র। কলকাকলিতে ভরে থাকে সারা তীর্থপথ। গদ্দিদের মহান তীর্থ মণিমহেশ। হাজার হাজার গদ্দি সেদিন হ্রদের তীরে এসে ভেড়া বলি দেয় শ'য়ে শ'য়ে। চাম্বার সর্বোচ্চ পবিত্র হ্রদের জলে পুণ্য স্নান শেষে ফেরার পালা। এখন নীরব নির্জন তীর্থে গিয়ে ধারণাই করা যাবে না উৎসবের সময় কি বিশাল আকার ধারণ করে।

সবিনয়ে জানাই, 'হিমালয়ের নির্জনতার স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগেই আমার বেশি আনন্দ। বেশি তৃপ্তি'।

—তাহলেও চেলা নাচানোর মতো অলৌকিক অভিজ্ঞতার দরকার ছিল বইকি।

কৌতূহলের প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'সেটা কি রকম?'

—চর্পটনাথ মন্দির থেকে পূজা অনুষ্ঠান শেষে ছড়িযাত্রা শুরু হল। তার মধ্যে বেশ কিছু ভক্ত উপোস পালনে মণিমহেশকে দিবারাত্রের ধ্যান-জ্ঞান করে। ভারমোরে পৌঁছে আর এক প্রস্থ পূজার্চনা হলে পর, একজন সাধারণ মানুষের ওপর হঠাৎ দেবতা ভর করে। প্রথমে অজ্ঞান হয়। জ্ঞান ফিরলে অন্য মানুষ। অন্য মূর্তি। অন্য স্বর। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাচতে থাকে। তখন আর 'সে' নয়—'তিনি'। তিনি আজ্ঞা দিলে তবেই যাত্রীরা মূল মণিমহেশের পদতলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। নচেৎ নয়। আপত্তি সত্ত্বেও যদি কেউ এগুবার চেষ্টা করে তার সমূহ বিপদ। প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। হয়ও। পরীক্ষিত সত্য। একেই বলে চেলা নাচানো।

পরে ভারমোরে অনেকের মুখে শুনি, এক বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুর কথা। নাম নৃপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। কলকাতার ভবানীপুর থেকে চাকরী উপলক্ষ্যে সোজা ভারমোরে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। যাত্রীদের সঙ্গে 'অন ডিউটী' পা বাড়াচ্ছিলেন মণিমহেশের দিকে। ভর করা দেবতা ঘোষণা করেন, ওঁর যাওয়া হবে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র, সবে এসেছেন। এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে মনে মনে মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়েন, বেপরোয়া। বেশি দূর যেতে হয় না। শুকনো ডাঙায় আচমকা হড়কে গিয়ে পা ভাঙে। ছেদ পড়ে যাত্রায়। সেই থেকে ডাক্তারবাবুর বিশ্বাস হয়, প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের বাইরেও কিছু আছে।...

চৌগানের পাশ ঘুরে বাজারের মধ্যে দিয়ে পথ চলি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস কাছারি শুরু হলেও কোথাও কোনো চিৎকার চেঁচামেচি নেই। সবকিছুই চলছে স্বাভাবিক শান্তিতে। অন্যান্য জিনিসের সাথে চাম্বার শ্রেষ্ঠ সূচী শিল্পের চাদর, শাল, নকসা দেওয়া রুমাল, চর্মশিল্পের চপ্পলসহ হরেক জিনিস ও মধুর দোকানে শুরু হয়ে গেছে বিকি-কিনি। যেগুলি ভারত বিখ্যাত।

বাজার থেকে রাস্তা পার হয়ে সামান্য উপরে রাজপ্রাসাদ। সহিলভার্মা রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেন। শোনা যায় গদ্দিরা বিনা পারিশ্রমিকে প্রাসাদ তৈরি করছিল। ভেড়া চরানোর সময় গ্রীষ্মকাল এসে গেলে তারা সাময়িক অব্যাহতি চাইলে রাজা তাদের বন্দী করে রেখে দেন। তারা আর কি করে, অগতির গতি মণিমহেশকে স্মরণ করে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারে ঘুম ভেঙে দেখে খোলা দরজা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানিয়ে সকলে দেয় দৌড়। সে রাজাও নেই, সেই জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদও নেই। কটি ভাঙা দেওয়ালের স্মৃতি চিহ্ন রেখে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ব্যবসাকেন্দ্র।

মূল রাজপ্রাসাদের আরও পরে তৈরি হয় অখণ্ডচাঁদি। যার মধ্যে চলছে এখন কলেজ। কলেজের পিছনে জেনানা মহলে শোনা যায় রাজবংশধারা টিম টিম করছে। দেখার সৌভাগ্য হয়নি। রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ভূরি সিংহ। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে সংগৃহীত রানীদের জন্যে তৈরি করান রাজমহল। এঁদের মধ্যে ভারমোরের রানীই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠা। তাই তাঁর জন্য আলাদা করে গড়ে তোলেন ভারমৌরী মহল। এই দুটি মহল জুড়ে এখন স্কুল লাইব্রেরী ইত্যাদি। রাজবাড়ির সর্বত্র ভগ্নদশা। কোথাও বা চিহ্নমাত্র বর্তমান। চাম্বার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সিং-এর (১৯৩৫-১৯৪৮ খৃঃ) সময়, ৮ই মার্চ, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে চাম্বা ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিমাচল প্রদেশের জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়।

কিন্তু রাজবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও চাম্বার প্রাচীন ঐতিহ্য-সম্পদ-সংস্কৃতির প্রাচীন গরিমা ধরে রাখা আছে হিমাচলের প্রাচীনতম মিউজিয়াম মহারাজা ভূরি সিং'-এর (১৯০৪-১৯১৯ খৃঃ) রঙমহলে। রঙমহলের দেওয়াল চিত্র পৃথিবী বিখ্যাত। এখানে কাংড়ার রাজা সংসার চাঁদের আমলের চিত্রমালা, বাশোলি স্কুল ও পাহাড়ি চিত্রকলার বহুমুখী সংগ্রহ দেখার মতো। এছাড়া ভাস্কর্য, শিলালিপি, অস্ত্রভাণ্ডার, সূচী শিল্প, প্রস্তরকাঠ-ধাতুর উপর বিভিন্ন কারুকার্যের সমারোহ চির স্মরণীয় করে রেখেছে। তখনকার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ ফোগেল ও হিমালয় পর্যবেক্ষক স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড-এর সহযোগিতায় ভূরি সিং মিউজিয়ামটির দ্বার উন্মুক্ত হয় ১৯০৮ সালে। রাজার আর দুই কীর্তি, রাজ্যে প্রথম পাঠলাইব্রেরী ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন (১৯০৫ খৃঃ)।

এদিকে পড়ি দারুণ সমস্যায়। এক ভদ্রলোক 'পাগল হো গয়া' বলে হাত ধরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে ফেরত পাঠায়। শহরের যেখানেই যাই প্রত্যেকেই দেয় একই দুঃসংবাদ। তিনদিন আগে শেষ হয়েছে মণিমহেশের উৎসব। প্রচণ্ড তুষার ও বৃষ্টিপাতে অনেকগুলি যাত্রী মারা গেছে। স্বয়ং ডেপুটি এস. পি. আহত। এমনিতেই দুর্গম পাহাড়ী পথে আগুয়ান হওয়ার ভরসা সহজে কেউ দেয় না। এক্ষেত্রে চারিদিক থেকে আর এক পা না এগিয়ে ফেরার পরামর্শের বজ্রপাত হতে থাকল। কেবল মঙ্গল শঙ্খের ব্যতিক্রম ঠাকুর ধাবার (হোটেল) 'মালকিন' বড় ভাই। বলে, 'ক্যা মৌসম হররোজ খতরনক হো সকতা? আগে বাঢ়ো, মৌসম আপনা দিলমে আ যায়েগা।'

সাবাশ! এমন ভরসার কথাই তো বিপর্যস্ত হৃদয় শুনতে চাইছিল। বিভ্রান্ত মন শান্ত হতে থাকে। নিশ্চিন্তে ঘুমও হয়। বুঝি, চাম্বা-কৈলাসজীর সম্মতি আছে।

সকাল সকাল বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে টিকিট কেটে অপেক্ষা করি বাসের জন্যে। আস্তে আস্তে লোকজন বাড়তে থাকে। দোকানপাট খুলছে। বাস আসতে সময় আছে। অতএব চা খাওয়া যাক। দোকানদারকে বলি, 'এক গ্লাস চা দিন তো ভাই।'....

যাই হোক, সকাল সওয়া ছটায় চাম্বা থেকে বাস ছাড়ল ৬৫ কিলোমিটার দূরে ভারমোরের পথে। রাভী নদীর তীর ধরে। কুড়ি কিলোমিটারের মতো এসে বাস একটা বড় ব্রীজ পার হল। ইরাবতী এতক্ষণ বাঁ দিকে ছিল। এইমাত্র ডানদিকে বাঁক নিয়ে নেমে চলেছে। জায়গাটির নাম বাগ্গা। আরো প্রায় ১৫ কিলোমিটার এসে গেহেরা। বর্দ্ধিষ্ণু

গ্রাম। সরকারী অফিস, চৌকি, দোকান-পত্র ও লোকজন সবই আছে। ড্রাইভার সকলকে চা খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নেমে যায়। সকলের সাথে আমিও নামি। তবে চা খেতে নয়।

ক্ষণকালের জন্য ইরাবতীর নির্জন সঙ্গী হওয়ার বাসনায় ছায়াঘেরা নিরিবিলি গাছের নীচে বসি। ইরাবতীর জলের রঙ ঠিক ঘোলাও নয় আবার পুরোপুরি স্বচ্ছও নয়—সাদাটে। কেমন পবিত্র ভাব। শিব কপোলের ভস্মের মতো।

অদূরে একদল কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে খেলছে। ভেসে আসছে তাদের কলতান। ইরাবতীরও শোনা যাচ্ছে গুনগুন গুঞ্জরণ। শুধু আজ নয়, সভ্যতার পুণ্য লগ্ন থেকে পুণ্য সলিলা মানুষকে শুনিয়ে এসেছে তার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। নাম দিয়েছে যে যার মনের মতো করে।

ঋগ্বেদে ডেকেছে পরুষ্ণি নামে। খ্যাতনামা গ্রীক পণ্ডিত ক্লডিয়াস টলেমী তার জিওগ্রাফাইকে হুফেজেসিস (GEOPRAPHIKE HUPHEGESIS) নামক বিশাল গ্রন্থে এ নদীর নামকরণ করেছেন অদ্রিস (ADRIS)। অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায় হাইদ্রাওতিস (HYDRAOTIS), রোহাদিস (RHONADIS) নামে অভিহিত। আইন-ই-আকবরীতে ইরাওয়াদী। সংস্কৃতে ইরাবতী। বর্তমানের রাভী।

কল্লোলিনী নদীর তীরে গড়ে ওঠা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাহোর শহর ও প্রাচীন হরপ্পার মূক ধ্বংসাবশেষের কথা শুনিয়েছে ইরাবতী। ভারত ও পাকিস্তানের হাজার হাজার একর কৃষি জমিতে সেচের কাজে লেগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে জুগিয়েছে অন্নের গান।

হর্নের আওয়াজে চমক ভাঙে। গাড়িতে উঠি। ছোট একটা ব্রীজ পেরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ হল। গণ্ডগোল হয়েছে কি কিছু? না, সে রকম মনে হচ্ছে না তো। ড্রাইভার সিটে বসে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। ডানদিকে, পাহাড়। তবে সে পাহাড়ী চালচিত্রের মাধুরিমাই আলাদা। সবুজ পর্বত প্রান্তরের মাঝ বরাবর নীল বসনা পাহাড়ী ঝর্ণা বালিকা। ঘুঙুরের বোল তুলে সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে আসছে ইরাবতীর অঙ্গনে।

না-না-না। পাহাড়ী নির্ঝরিণী এক নয়। পাহাড়ী কন্যাও যোগ দিয়েছে একই ভঙ্গিতে, কত্থক নৃত্যে। তবলা সঙ্গতে আছেন ইরাবতী মহারানী। বছর সাতেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে বেণী দুলিয়ে ওড়না উড়িয়ে ঝর্ণা ধারার গা দিয়ে নাচতে নাচতে নামে। দূর থেকে মনে হচ্ছে পাহাড়ীয়া নদী আর বালিকায় কোনো ভেদ নেই।

আমাদের ড্রাইভার হাত নেড়ে ইসারা জানিয়ে একটা পাথরে গালে হাত দিয়ে বসল। যেন কি হারানোর দুঃখে চিন্তিত। মেয়েটি এসেই ড্রাইভারের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে কলকল করে উঠল।

'পিতাজি মেরা চুড়িয়াঁ লায়া না?' বোঝা গেল, পিতা-পুত্রি। দেনা-পাওনার ব্যাপার।

—'নেহি রুমকী, মুঝকো বিলকুল ইয়াদ নেই থা। কাল জরুর মিল জায়গা।'

রুমকী বাবার মুখের দিকে স্থির নেত্রে থাকে। চোখে জল টল-মল। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল। এমন সময় পিতাজির গোঁফের ফাঁকে হাসি। দু হাতে দু গোছা চুড়ি বার করে মেয়ের জলভরা মুক্তো-চোখের সামনে ধরে।

'কাহেকোঁ মুঝে ঝুটা বাত বোলনে লাগা' বলে, মেয়ে আনন্দ-অভিমানে বাবার পিঠে গুমগুম করে কিল বসাতে লাগে। মিথ্যে বলার শাস্তি। সামনে এসে ঝটিতি কাঁচের চুড়িগুলি পরে গলা জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে থাকে। হঠাৎ গলা ছেড়ে চুড়ি ভর্তি দুহাতে বাবার গালে ঠাস করে কষিয়ে দেয় চড়। আনন্দের আতিশয্যে।

'পহ্‌লে ভেইয়াকো দেখলাউঙ্গা' বলেই ছিটকে গিয়ে আবার লাফিয়ে উঠতে থাকে।

স্নেহময় বাবা হেসে উঠে চিৎকার করে, 'হোঁশিয়ার সে জানা—'

স্নেহ-অভিমান-আনন্দের চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, আমাদেরও সকলের ঘরে রুমকিরা বসে আছে কাম্য জিনিসটার অপেক্ষায়। না পেলে ব্যথা-বেহাগের সুর তোলে। পেলে সোহাগ-আদরে ভরিয়ে তুলবে প্রাণের আঙিনাখানি।

খুশীর জোয়ার ভরা মনে শিস্ দিতে দিতে ড্রাইভার উঠে স্টিয়ারিং ধরল। জায়গাটির নাম লুনা। স্থানীয় এক সহযাত্রী নির্দেশ করে, ঐ মেয়েটির পথ ধরে চড়াই পথে আরও পাঁচ কিমি গেলে ছাত্রারী। প্রশস্ত মনোরম উপত্যকার প্রাচীনতম গ্রামের মাঝে আদ্যাশক্তির মন্দির। সপ্তম শতাব্দীর তৈরি। মহারাজা মেরু ভার্মার পৃষ্ঠপোষকতায় গুগ্‌গা নামে দরদী মন্দির শিল্পীর নিরলস প্রয়াসে পাথর ও কাঠের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই দর্শনীয় মন্দির। গুগ্‌গার নিপুণ হাতে খোদাই করা শিল্প সুষমায় মণ্ডিত মন্দিরটি ক্ষয়িষ্ণু হলেও আলো-বাতাস এবং ঝড়বৃষ্টির মাঝে আজও টিকে আছে।

চাম্বা থেকে গেহেরা হয়ে ছাত্রারী যাওয়াই সোজা। দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। রাধাষ্টমী শেষে এখানে মেলা বসে। দেবীর প্রতি গ্রামবাসীদের অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। দেবী প্রতিষ্ঠার কাহিনীও কম আকর্ষণীয় নয়। একবার এক গৃহস্বামীর নজরে আসে, অনেকগুলির মধ্যে একটি গরু দুধ দিচ্ছে না। কি ব্যাপার। তাহলে কি গরু চরানো ছেলেটা চুরি করে নিচ্ছে? দেখতে হয়।

একদিন সকালে রাখাল গরুর পাল নিয়ে বেরিয়ে গেল, গৃহস্বামীও অনুসরণ করে চুপি চুপি। বেশ কিছুটা দূরে ঝোপের মধ্যে বসে লক্ষ্য করে, রাখাল দিব্যি গরু চরাচ্ছে। কখনো ক্লান্ত হলে শুয়ে পড়ে গাছের তলায়। আনন্দে কোমর থেকে বার করে বাঁশী বাজায়। নতুন বাছুরটি কান খাড়া করে শোনে। কিন্তু দুধ চুরি করার নামগন্ধ নেই। সারাদিন বসে বসে বিরক্ত হয়ে যায়। মনে ভাবে, নিশ্চয়ই গরুটার কোন রকম অসুখ হয়েছে। বাড়ি ফিরবার জন্য উঠে পড়ে। এমন সময় হঠাৎ লক্ষ্য করে, সেই গরুটি ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে। পিছু পিছু গিয়ে দেখে আশ্চর্য ব্যাপার! একটা গাছের নীচে গিয়ে গরুটি দাঁড়াতেই বাঁট থেকে আপনা-আপনি দুধ ঝরে যাচ্ছে। কোনও কূলকিনারা বুঝতে না পেরে গৃহস্বামী চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফেরে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে, করুণ বদনে ঐ গাছের নীচে দেবী বসে থাকতে থাকতে মাটির নীচে অদৃশ্য হলেন। বুঝতে দেরী হয় না। সকাল না হতেই গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি ছোটে। গাছ তলায় মাটি খুঁড়ে দেবী মূর্তি বার করে প্রতিষ্ঠা হল। ক্রমে জঙ্গল পরিণত হল জনপদে।...

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, একই শক উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে নানা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে রাজপুত রক্তের বুড়ি ছুঁয়ে আজকের হিমাচলের কানেত, গুজ্জর ও গদ্দী ইত্যাদিরা চলমান।

পাহাড় কাঁপিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে বাসটা আসছে। যাত্রীসমেত খাড়ামুখের সঙ্কীর্ণ সঙ্গম প্রান্তে ঝড়ের গতিতে ঘুরিয়ে থামল। কারও ভয়ডর নেই। সবাই নিশ্চিন্ত। শিবভূমি যে। একে একে নামলে আমরা কজন উঠে পড়ি। গর্জন করে চলতে শুরু করল। রাস্তা বরাবর সঙ্গিনী ভূডল নদী। বাঁদিকে ইরাবতীর এই উপনদীর পথ চলা শুরু হয়েছে কুগতি পাশের তুষার রাজ্যে। খাড়া মুখ পর্যন্ত ৪৫/৪৬ কিলোমিটারের যাত্রা পথে আপন ক্ষমতায় খাড়াই পাহাড় কেটে পথ করে নিয়েছে ভূডল। কুগ্‌তি গ্রাম থেকে হাডসার ভারমোর হয়ে খাড়ামুখ পর্যন্ত অঞ্চলকে তাই বলা হয় ভূডল ভ্যালি।

বলে রাখা ছিল। পাঁচ কিলোমিটার এসে লাহুল গ্রামে যাত্রী নামানোর জন্য বাস থামতেই ড্রাইভার সাব অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয় নদীর ওপারের রাস্তা। যে পথ গেছে তুন্দ্রাকালী দেবীর মন্দির ছুঁয়ে ত্রিশ কিলোমিটার পরে কালীছো গিরিবর্ত্মে। সেখান থেকে তিসা হয়ে ত্রিলোকনাথ যাওয়ার দুটো রাস্তা আছে। একটা তিসা হয়ে। আর একটা পাঙ্গী ভ্যালীর ডান দিকে নেমে।

সাধারণ ট্রেকারদের কাছে দুর্গম গিরিবর্ত্মে চড়ার আনন্দ শৃঙ্গ জয়ের শামিল। গিরিবর্ত্মের রাস্তা দেখলে তাই মাথার মধ্যে রক্ত চনমন করে উঠে পড়ে। এমনকি গিরিবর্ত্মের আলোচনাতেও। কিন্তু এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় নেই। একটা ছোট্ট জীবনের কিছুটা সময়ের মধ্যে কতটাই বা সম্ভব? কট্টর হিমালয় পাগলও সারা জীবন ঘুরে নামমাত্র দেখতে পান। এক জীবনে পরিপূর্ণভাবে হিমালয় দেখা সম্ভব না। এতোই বিশাল তার ব্যাপ্তি। সর্ব অর্থে।

উচ্ছল ভূডল নদীর তীর ধরে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ যাযাবর গদ্দীদের আদিভূমি গদেরান বা ভারমোরে (২১৪১ মিটার)। চতুর্দিকে দূর বনানীর পিছনে সারি সারি তুষার চূড়া। যেন অমল ধবল মন্দির শীর্ষ। দেবতাত্মার মন্দির। সোপান বেয়ে বিশাল চীর বৃক্ষ-সারি স্থির অচঞ্চল। মনে হচ্ছে, শিবাশ্রমে যোগমগ্ন জটাজুটধারী উন্নত শির প্রাচীন ঋষিবৃন্দ। নীরব নিথর। তন্ময় চিত্ত। কোল ঘিরে ঢেউ খেলানো সবুজ শস্যক্ষেত্র। সবার মাঝে চোখ জুড়ানো গ্রামটি নিমেষে পৌছে দেয় ছায়া ঘন শান্তশ্রী তপোনীড়ের জগতে।

দুপাশে দোকান। এগিয়ে বাঁ দিকে ট্যুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গেছে হাডসারের দিকে। সামনে উঁচুতে চৌরাশীর প্রাঙ্গণ। ডানদিকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে রেস্ট হাউস ও বিভিন্ন সরকাবী বিভাগ। কোনও দিকে না গিয়ে প্রথম ঢোকা যাক নামকরণ প্রসঙ্গে।

ভারমোরের আদি নাম ব্রহ্মপুর। এ বিষয়ে প্রথম মত, এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণীদেবীর নাম থেকে হয়েছে ব্রহ্মপুর। ডান দিকের অফিস পাড়া দিয়ে চড়াই ভেঙে

পৌঁছতে হয় চতুষ্কোণ কুণ্ডের পাশে ব্রাহ্মণী দেবীর মন্দিরে। পথ দু' কিলোমিটারেরও বেশি। শোনা যায়, দেবীর প্রিয় ছেলের প্রিয়তম চকোর পাখীটিকে এক কৃষক মেরে ফেললে ছেলেটি দুঃখে মারা যায়। মা আত্মহত্যা করেন ছেলের শোকে। ঘটনার পর থেকেই গ্রামবাসীদের উপর প্রেতাত্মার অত্যাচার চলতে থাকলে, গ্রামবাসীরা দেবীর পূজা অনুষ্ঠান শুরু করে। তাঁর নামেই ব্রহ্মপুর। ক্রমে ব্রহ্মপুর থেকে ভারমোর।

প্রবাদ, সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় কাশ্মীর থেকে কৈলাসের পথে শিব ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষসহ এই অঞ্চলে বিশ্রামের আয়োজন করেন। হলে কি হবে, দেবী তাঁর এলাকায় অনধিকার প্রবেশে ক্রোধান্বিত হয়ে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগের আদেশ দেন। মহেশ্বর রাতটুকু থাকার জন্য অনুনয়-বিনয় জানালে, দেবী মঞ্জুর করেন। আশুতোষ পরের দিন যাত্রার প্রাক্কালে সন্তুষ্ট হয়ে দেবীকে আশীর্বাদ করে যান এই বলে, এখন থেকে ব্রাহ্মণী হবে মণিমহেশের অগ্রজ তীর্থ। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণী তীর্থ সেরে মণিমহেশ দর্শন অত্যন্ত শুভ।

দ্বিতীয় মত, এ রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মেরু বর্মন (৬৮০ খৃঃ) নাকি গাড়োয়াল কুমায়ুনের ব্রহ্মপুর রাজ্য থেকে এসেছিলেন। রাজ্যের নাম তাই ব্রহ্মপুর।

তৃতীয়, এ রাজ্যের ইতিহাস ভারমা বংশের ইতিহাস। ভারমা থেকে ভারমোর নামকরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তোরণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি মন্দিরময় চৌরাশীর চত্বরে। ইতিহাসের রেকর্ড (১৩শ বছরেরও বেশি) রাজত্বের অধিকারী চাম্বা রাজ বংশের প্রথম তিনশো বছরের (৬২০-৯২০ খৃঃ) রাজধানী এই ভারমোর।

জনশ্রুতির জয়স্তম্ভ দিয়ে শুরু হলেও ভার্মা উপাধি নিয়ে প্রথম রাজা ও রাজত্বের সূচনা হয় আদি ভার্মার আমলে, ৬২০ খৃষ্টাব্দে। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হর্ষভার্মা গত হওয়ার কিছুকাল মধ্যে এক তিব্বতী দস্যু বাহিনী এ অঞ্চলে চালিয়ে যায় তাণ্ডব লীলা। নষ্ট হয় বহু প্রাচীন কৃষ্টি।

৬৬০ খৃষ্টাব্দ। ধ্বংসস্তূপের চারিদিকে শ্মশানের নীরবতা। নতুন জনপদ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দিবাকর ভার্মা। সঙ্গে এল লোকজন ও আত্মীয় পরিজনের বিশাল বাহিনী। ভাবী রাজ্যের সৃষ্টিদূত।

এরপর যে রাজার খ্যাতি ইতিহাসের পাতা জুড়ে, তিনি হলেন দিবাকরের পুত্র মেরু ভার্মা (৬৮০ খৃষ্টাব্দ)। চত্বরের চুরাশিটি মন্দির তৈরি হয় তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায়, সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারকচিহ্ন হিসেবে। শুধু এই চুরাশী কেন? পরবর্তীকালে চাম্বা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আরও অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠার ধর্মযজ্ঞ-হুতাগ্নিতে আলোকিত করেছিলেন শাসনের ন্যায় দণ্ড, সুশাসক মেরু ভার্মা।

৭৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় নরপতি অজেয় ভার্মার সময় রাজপুতানা ও দিল্লী থেকে বেশ কিছু সংখ্যক রাজপুত ও ব্রাহ্মণ আসে। অনেকের বিশ্বাস, এরাও হতে পারে গদ্দিদের পূর্বপুরুষ।

অদ্ভুত জীবন ঘটনার মধ্য দিয়ে ৮২০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন মূষণ ভার্মা। মূষণ তখন মাতৃগর্ভে। বিদেশী সৈন্যরা তার পিতা লক্ষ্মী ভার্মাকে খুন করে রাজ্য দখল করে নেয়। রানী পালিয়ে গিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নিলে, সন্তান প্রসব হয়। দূর থেকে গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনে প্রাণ ভয়ে ভীতা রানী ঈশ্বর নাম স্মরণ করে শিশুটিকে ফেলে চলে যান অন্যত্র। পরে রাজ-অনুগত পুরুষেরা শঙ্কিত চিত্তে গুহায় এসে আশ্চর্য হয়ে দেখে, একটি দুটি নয়-অসংখ্য মূষিকের নিশ্ছিদ্র পাহারায় শিশুপুত্র জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ। নাম হয় মূষণ বর্মন। সহৃদয় এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে কাংড়ার সুকেত রাজ পরিবারে আশ্রয় ও রাজ কন্যার সাথে বিবাহের পর সৈন্য সংগ্রহে হৃত রাজ্য ছিনিয়ে নেন। সেই থেকে রাজ্যে মূষিক হত্যা নিষিদ্ধ।

৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারমোরের শেষ রাজা হন সহিল ভার্মা। রাজধানী উঠে যায় চাম্বায়। যার রূপকার একাই সহিল ভার্মা। দীর্ঘ সফল রাজত্বের শেষে পুত্র যুগাকরকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে, ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বাকি জীবনটা অতিবাহিত করতে চলে আসেন অতীতের ভারমোরে। সঙ্গে থাকেন একগুচ্ছ মহাত্মা ও যোগী চর্পটনাথ। তিনি একাধারে গুরু ও সব সময়ের আত্মিক বন্ধু। এ যেন সমুদ্রের বাষ্পীভূত জলকণা দেশ দেশান্তর পর্বত প্রান্তর ঘুরে নদীপথে আবার রত্নাকরের সুনীল চরণতলে আশ্রয় নেওয়ার কাহিনী।

চৌরাশীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলির মধ্যে অঙ্গ সৌষ্টবে লিঙ্গরাজ মণিমহেশ ও অষ্টধাতুর লক্ষ্মণা (লক্ষ্মী) মন্দির এবং মূর্তির মধ্যে নন্দী শ্রেষ্ঠ। এছাড়া আছে সূর্য লিঙ্গ, জ্যোতি লিঙ্গ, নকেশ্বর, ক্রমেশ্বর, হরিহর, দশনাম আখড়া, নরসিংহ কার্তিক, গণেশ, শীতলা ও অর্ধগয়াকুণ্ড। কথিত আছে, এক পুণ্য প্রভাতে শিবজায়া গয়া স্নানের বাসনা জানালে, ভস্মধারী হিমালয় আবাসের মৌতাত ছেড়ে সমতলে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পাশেই ছিল বুদ্ধি শিরোমণি মাতৃভক্ত গণেশ। ভাবনা কি? মাত্ স্মরণে ভূপৃষ্ঠে তীর নিক্ষেপ করলে একযোগে বেরিয়ে আসে সকল পুণ্য জল ধারা। সৃষ্টি হল পবিত্র অর্ধগয়া কুণ্ড। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রথম সৃষ্ট চুরাশিটি মন্দিরেই পূজিত হতেন লিঙ্গমূর্তি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, রাজা মেরুবর্মা বিশাল দেবদারু বৃক্ষের নীচে পাথর ও কাঠের অপরূপ কাজকরা লিঙ্গ রাজ মণিমহেশ মন্দিরটি ও সামনে পিতলের বিশাল প্রাণবন্ত নন্দী মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন সেই ৬৮০—৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। শিলালিপিতে ও ধাতু মূর্তিতে উৎকীর্ণ সময় পঞ্জিকা নিমেষে পৌছে দেয় প্রাচীন অরণ্য বেষ্টিত এক উন্নত-মনা শিল্পবোধের জগতে। তেরশো বছর আগেকার দৃষ্টি নন্দন কারুকার্য আধুনিক মনের রোমান্সের সঙ্গে ঘটায় মেলবন্ধন।

এসে দাঁড়াই সেই মন্দিরটির সামনে। যেটি, ভারমোর তথা সমগ্র চাম্বা কৈলাস তীর্থ পথের সকল উন্নতির প্রবাদ পুরুষ স্বামী জয়কিষণ মহারাজের সমাধি মন্দির। চলতি নাম নাগা বাবা। মহারাষ্ট্রীয় মারাঠি সন্ন্যাসী তাঁর মহামূল্যবান জীবনের অনেকখানি সময় বিলিয়ে দেন অবহেলিত ভারমোরের উন্নতিকল্পে। মন্দির-তীর্থপথ সংস্কার থেকে শুরু করে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পান্থশালা, ডাকঘর, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মানুষের আপদে বিপদে পর্যন্ত স্বামীজির প্রশান্তিময় কল্যাণ হস্তের স্পর্শ ছিল। খেটে খাওয়া মানুষ, রাজা রাজড়া এমনকি

সাহেব সুবোরাও ছুটে আসতেন তাঁর জ্যোতির্ময় কথামৃত ধারায় শুচিস্নাত হতে। কি যাদু ছিল!

তিনি আর নেই। ১৯৬৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর রাত ৯টার সময় বিলীন হয় তাঁর নশ্বর দেহ। বয়স তখন ৯৩ বছর। আশ্রমের মাঝে বিরাট শিবলিঙ্গ, চুরাশির একটি। পাশের ঘরে নাগা বাবার সুদৃশ্য মর্মরমূর্তি। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহারাজ প্রেমনারায়ণ গিরিজী, সহাস্যে প্রেমময় আশীর্বাদ অন্তে চারটি আপেল হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "একা যাচ্ছ—পারলে হাড়সার থেকে একটি গুর্খা কুলি নিও।"

মন্দির চত্বর থেকে স্কুল বাড়ির পাশ দিয়ে পূর্বে খানিকটা নেমে পড়ল জীপ চলা রাস্তা। প্রায় সমতল। দুটি জীপ চলাচল করে সাধারণত মালবাহক হিসেবে। যাত্রী পেলে তুলে নেয়। পাঁচ টাকা মাথা পিছু। পুরো জীপ ভাড়া করতে গেলে অবশ্য বিশাল টাকা। একশো থেকে দুশো পর্যন্ত। হাড়সার পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র ১৩ কিলোমিটার। মনের আনন্দে চালু করে দিই সব পথিকের ভরসা নিজস্ব দুপেয়ে গাড়িটি। উপর থেকে নেমে এসেছে পাইনের সারি। আর নেমেছে হরেক রকম খেলায় মেতে নানা জলধারা। শেষ হবে নীচে উচ্ছল ভূডলের বুড়ি ছুঁয়ে।

বাঁকের মুখে বিচিত্র মিলন। এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গদ্দী বাবা মাকে নিয়ে চলেছে নব-যুবা পুত্র। মণিমহেশ দর্শনে। উৎসবের সময় বাবা রীতিমত হিল ডায়রিয়ায় ভুগছিল। একটু সেরে উঠতে তাই ক'দিনের মধ্যে পুত্রের দ্বিতীয়বার পুণ্য যাত্রা, কর্তব্যের খাতিরে। বাবা-মার পরনে জাতীয় পোশাক থাকলেও ছেলের গায়ে আধুনিকতার গন্ধ। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। পাজামার বদলে ফুল প্যান্ট। গায়ে ফুলশার্টের ওপর কুর্তা। মাথায় পাগড়ি বা 'তুর্বান' কিছুই নেই। যা আছে তা হল, কোমরে পাক দেওয়া কালো চুলের মতো ফেট্টি দেওয়া সেই বিশাল লম্বা 'ডোরা'। যাকে ওদের ভাষায় বলে, 'শিউজিকা জটা।' হাল আমলের লেখাপড়া শেখা যুবক। শ্যাম ও কুল রাখার সমঝোতায় বিশ্বাসী। তাই নব কার্তিকের কোমরে চড়ে হিমালয় শিবের জটা।

উঁহু! বাপের অসুখ পুরোপুরি সারেনি। হুস্ করে পথের কোণে একহাত গালে দিয়ে আর হাতে পাথর চেপে একটেরে হয়ে বসে পড়ল। ময়কাণ্ড! ছেলে কাতর আবেদন জানায় আমার কাছে 'বড়িয়া', আছে কিনা। দাস্ত বন্ধের তিনখানা ট্যাবলেট ছেলের হাতে দিয়ে ভরসা দিই। কৃতজ্ঞতার অভিনন্দন কুড়িয়ে আবার পথ চলা। ওদের আজ হাড়সারে রাত্রিবাস। কাল পাণ্ডাকে বগলদাবা করে তীর্থযাত্রা। মাথায় ঢুকল না, কোন ভরসায় বেড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে নিয়ে এই সর্বনাশ ময়কাণ্ড রোগ।

ক্রমে রেজাউর, ভ্রাঙ্গলা, সাণ্ডি পেরিয়ে এ পথের শেষ গ্রাম হাড়সার (২১০০ মিটার) পৌঁছে যাই। মেলা শেষে প্রস্তুতি চলছে তাঁবু ইত্যাদি খোলা ও গুটিয়ে নেওয়ার। ডানদিকের একটু উপরে শিব মন্দির। প্রায় সব বাড়ির শ্লেট পাথরের ছাদে দেখি কিশোরী রঙের মেলা। পাকা ভুট্টা শুকোচ্ছে। গুর্খা কুলির জন্য পি ডব্লু ডি ঠিকাদার তিলক্ বাহাদুরকে

ধরলে আপ্যায়ন শেষে উনি এবং ওনার স্ত্রী উভয়েই বোঝালেন মেলার জন্য সদ্য দেওয়া চুনের দাগ ধরে নির্ভয়ে একা যেতে। তাছাড়া ৪/৫ জনের বাঙ্গালী দল নাকি খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে ধানছু অভিমুখে। পা চালালে ধরে ফেলতে পারব।

চড়াই পথের শুরুতেই বাঁদিকে অমর গঙ্গা ও ভূড়ল নদীর সঙ্গমস্থল। ওপার দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে কুগ্‌তি (প্রায় ২৭৪৫ মিটার) গ্রামে। হাড়সার থেকে কুগতি পেরিয়ে ত্রিলোকনাথ (২৯১৭ মিটার) পৌছতে ৫/৬ দিন লাগে।

পথটি এই রকম—হাড়সার থেকে কুগ্‌তি গ্রামের দূরত্ব ১২.৮ কিলোমিটার। উচ্চতা ৩,০৫০ মিটার। কেনাকাটার ব্যবস্থা ও থাকার জন্য স্কুলবাড়ি এবং ফরেস্ট রেস্ট হাউস পাওয়া যেতে পারে। কুগ্‌তি থেকে ডুগ্‌গিনালার দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। উচ্চতা—৩,২০৩ মিটার। থাকতে হবে ওভার হ্যাঙ'-এর নীচে। ডুগ্‌গিনালা-অ্যালিয়াস (৪,২৬৭ মিটার) মোট রাস্তা ১৪.৪ কিলোমিটার। রাতের গতি তাঁবুর মধ্যে। অ্যালিয়াস থেকে কুগ্‌তিপাশ—(৪৯৬১ মিটার) পার হয়ে খরদেওনালা (৩,২০৩ মিটার) পর্যন্ত ঘাম ঝরাতে হবে ১৬ কিলোমিটার। এখানেও রাতের বন্ধু তাঁবু। খরদেওনালা-ঝালমা বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পায়ে হাঁটা পথটি ১১.২ কিলোমিটারের মত। ঝালমা-উদয়পুর সবটাই বাসরাস্তা। এখানকার রেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা ভালই। উদয়পুর থেকে ত্রিলোকনাথের দূরত্ব ৪.৮ কিলোমিটার। যার মধ্যে হাঁটা পথ ভাঙতে হবে ৩.২ কিলোমিটার।

সুপ্ত বাসনা ছিল, মণিমহেশের পর কুগ্‌তি পথে ত্রিলোকনাথ যাওয়ার। কিন্তু বড় ছেলের সজল চোখ ইচ্ছের পথটা রোধ করে দাঁড়াল, আকাশচুম্বী হয়ে। কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে চলল কুগ্‌তি গিরিবর্ত্মের দিকে। ধানছু পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তাটুকুর বেশির ভাগই পাকদণ্ডী চড়াই। উৎরাই এর সুখ দুরাশা। এপাশে লম্বা লম্বা ঘাসের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রঙিন ফুলের প্রজাপতি। ওপাশে উঠে গেছে গহীন অরণ্য। মধ্যে পাহাড়ী সুন্দরী অমরগঙ্গা খিলখিল হাসিতে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাজিয়ে চলেছে নূপুর কিঙ্কিনী। অবাক বিস্ময়ে চলেছি। হঠাৎ আঁতকে উঠি! প্রকাণ্ড এক মিশমিশে কালো কুকুর সঙ্গে চলেছে। ভয়ঙ্কর চেহারা। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। খাবার দিয়ে ভোলাই। ফটো তুলতে গেলে পজিসন নিয়ে বসে পড়ে। যেন সব জানে। কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না। কি জ্বালা! ভয় হয়—যুধিষ্ঠিরের কুকুরের মতো মহাপ্রস্থানের পথ দেখাবে নাতো?

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ ধানছু (২৫০০ মিটার) পৌছই। সময় লাগল সাড়ে তিন ঘণ্টা। দলটিও সবে পৌছেছে। হলদিয়া রিফাইনারি থেকে অসিত রায়ের নেতৃত্বে পাঁচজনের গ্রুপ। মণিমহেশের পর কুগ্‌তি হয়ে ত্রিলোকনাথ যাওয়ার প্ল্যান। সঙ্গে দুজন কুলি এসেছে হাড়সার থেকে। এখানে একদিক খোলা কাঁধ সমান একটি চালা দোকান আছে। মজার কথা, দোকানের মালিক কিষাণ চাঁদ রাতে প্রেতাত্মার ভয়ে একা কিছুতেই থাকবে না। চলে যায় হাড়সারে মালপত্র খোলা-মেলা রেখেই। জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার বলতো কিষাণ, তোমার দোকানের আটা-আলু-চা-চিনি-মশলাপাতি এমন কি খারাপ যে, ভূতবাবু সেগুলো ছেড়ে তোমার দিকে ঝোঁকে?

কিষাণ চোরা লাজুক হাসি ছাড়া আর কিছুই উত্তর দেয় না। কেবল যাত্রীদল থাকলে কিষাণ চাঁদ থাকার ভরসা পায়, লাগোয়া চালা ঘরটার মধ্যে। এই একটা লক্ষ্য করার মত আশ্চর্য ব্যাপার। সাধারণ মানুষতো কোন ছার। সমবায়ের হাজার হাজার টাকার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস রাস্তায় পড়ে আছে। কেউ হাত দেয় না। বললে, হেসে বলে—বাবু এ শিব ভূমি, কে চুরি করবে?

খাওয়া দাওয়ার পর গল্পগুজব সেরে শুতে গিয়ে খেয়াল হয়, সবকিছু রেখে এসেছি চাম্বায়। তাতে কি? শিবভূমির সরল প্রাণ মানুষ কিষাণ শর্মাতো আছে। কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে কাঁধে করে এনে ফেলল ১ ফুট চওড়া একটি কাঠের লম্বা তক্তা। দ্রুত গতিতে তার ওপর পেতে দিল, এ পর্যন্ত আসা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর পদধূলি গর্বিত কয়েকটি ছেঁড়া চট। চটের বিছানার শ্রীমুখ দর্শনে অভিলাষী হয়ে, ভুলে, পট করে জ্বালি টর্চ। মরি মরি রূপ দেখে লজ্জায় ফট করে নিভিয়ে, চোখ বুজে শুয়ে পড়ি। গায়ের চাদর? কোনও চিন্তা নেই। ভেড়ার লোমে তৈরি, নিজের সেরা চাদরটি বিনীত ব্যস্ততায় চাপিয়ে দিল দেহে। কিন্তু বিধি বাম। নীচের দিকটা অর্ধগোলাকার, সঙ্কীর্ণ সেই কাষ্ঠখণ্ডে ব্যালেন্সের ঘুম অথবা ঘুমের ব্যালান্স কষতে কষতে রাতটাই পার করে দিই আর কি।

অবিশ্যি আমি একা নই। দলটিতে রঞ্জন নামে ছেলেটিরও শোচনীয় হাল। ছাপোষা ছেলে। হঠাৎ পাহাড়ের নেশায় দুর্গম পথে পাড়ি। ভোলা আর প্রণব তাদের সমবায় প্রথায় কেনা এয়ার ম্যাট্রেসটা এবারের মতন দান করেছে রঞ্জনকে। শোয়ার তেমন কিছু নেই বলে। ওদিকে দলপতির কড়া হুকুম যে যার কাজ নিজে করে নিতে হবে। শীর্ণকায় রঞ্জন জীবনে প্রথম রীতিমত চড়াই ভাঙ্গার ধকলে এমনিতেই বিধ্বস্ত। তার ওপর বসল, ফুঁ দিয়ে হাওয়া ভরতে। পারবে কেন। খানিকটা করে তেড়ে ফুঁড়ে হাওয়া ভরে চোখ ঠেলে হাঁফাতে থাকে, হেঁপো রুগীর মতো। মরিয়া হয়ে এইভাবে টানা যুদ্ধ চলে ঘণ্টাখানেক ধরে। তারপর শোয়ার পালা। ক্লান্তদেহে একে একে সবাই হল স্থির। কেবল দুটি প্রাণী অস্থির। আমি আর রঞ্জন। প্রচণ্ড হাওয়ার চাপে মাঝখানটা ফুলে ওঠা সুখী এয়ার ম্যাট্রেস কিছুতেই অনভ্যস্ত আরোহণকারীকে খুশি করতে রাজি নয়। আছে আছে গড়িয়ে পড়ে হুস করে। কখনও এপাশে, কখনও বা ওপাশে। চাদর চাপা অবস্থায় শুনি ভেসে আস রঞ্জনের চাপা ক্রোধের সুর—'যাঃ শালা—দূর শালা—'।

ভোর তখন পাঁচটা। চাপাচাপি দিয়ে বাইরে এসে দেখি কোথায় ভোরের আলো। তুষার চূড়ার ওপর থেকে ঝিলিক দিয়ে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে সারা উপত্যকা জুড়ে ব্রাহ্ম মুহূর্তের নিস্তব্ধ পবিত্রতায় সে কি ভুবন ভোলানো স্নিগ্ধ মোহিনী রূপ।

সকাল ছটায় বেরিয়ে পড়ি মণির পুণ্যমালা হৃদয়ে ধারণ করার উদ্দেশ্যে। গ্রুপটির বেরুতে দেরি আছে। স্বপনেশ এর হাঁটুতে পুরানো চোট ফুলতে আরম্ভ করেছে। কুগতি পারে ত্রিলোকনাথে গোটা দলটা কীভাবে যাবে, বুঝতে পারছি না। কারণ, শুধু কুগতি গিরিবর্ত্মে পৌঁছে ফিরে আসার প্রোগ্রাম থাকলে স্বপনেশকে হাডসারে রেখে যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু ওদের পথ ওপারে ত্রিলোকনাথ দর্শন সেরে মানালি। অর্থাৎ একযোগে

অসম্ভব। এদিকে আমার রীতিমত তাড়া। ধানছু থেকে মণিমহেশ দর্শন সেরে আজই চাম্বা পৌঁছতে হবে। সর্বসাকুল্যে ১০০ কিলোমিটারের পথ। অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে। সংসারী মানুষ। বড় দায় যে।

সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা শুধু চড়াই আর চড়াই। কিছুদূর ওঠার পর বুঝতে পারি, দেবাদিদেব হিমালয় কষ্টি পাথরে ভক্তের অনেক ঘাম ঝরিয়ে, তবেই না পরাবেন সেই স্বর্ণরত্নমালা। তাঁর স্বর্গীয় পদতলে মনপ্রাণ সমর্পণ করে আমিও আজ উৎসাহে মরিয়া। বান্দর ঘাঁটি চড়াই-এর পর ছিটকে উঠা লক্ষ লক্ষ জলকণার অপরূপ জলপ্রপাতটি ডানদিকে রেখে ভাঙতে হচ্ছে ভৈরোঘাঁটির চড়াই। ঠাণ্ডা থেকে হঠাৎ দু হাতের আঙুলে অসহ্য যন্ত্রণা। দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে দেখতে থাকি।

হ্যাঁ, ঐতো। খানিকটা নীচে এক জায়গায় ধোঁয়া বের হচ্ছে। মেষপালকরা রুটি তৈরিতে ব্যস্ত। হাত পা আগুনে ভালো করে সেঁকে রুটি জল খেয়ে আবার উঠতে থাকি। শেষে হাজির হই ভৈরোঘাঁটিতে। ঘাসে ভরা সবুজ প্রান্তরে। ছোট ছোট হলুদ ফুলগুলি ঘাসের মধ্যে মুচকি হাসছে। আরও একটা খাড়া পাহাড়। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গ্লেসিয়ারের পাশ দিয়ে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ডে। ফুট দেড়েক গভীর ছোট্ট কুণ্ডটির চারদিকে সিঁদুর, শাঁখা ও পয়সা ছড়ানো। পবিত্র জল মাথায় দিয়ে নামমাত্র চড়াই ভেঙে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হই মণি-কৈলাস শৃঙ্গের (৫৬৫৬ মিটার) পদতলে, ডালহ্রদের তীরে (৪১৮৩ মিটার)।

তুষার বেষ্টিত স্বচ্ছ হালকা সবুজ রঙা হ্রদটির মাঝখানের গভীরতা এক কোমর। প্রায় একশো মিটার পরিধিযুক্ত হ্রদটিকে এক সাধুজী বৃত্তাকারে পরিক্রমা করে চলেছেন নিঃশব্দে। এক পাশে যাত্রীদের আনা ছোটো খাটো শিবশিলাখণ্ড, ত্রিশূল ও একটি ঘণ্টা ঝুলছে। আশেপাশে মেলা শেষের নানা চিহ্ন।

চারিদিকে সীমাহীন নিস্তব্ধতা। পর্বতগাত্রের খাঁজে খাঁজে তুষারগুচ্ছ আকার নিয়েছে শিবপুষ্পরাশির। প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত সর্বত্র মেলে রয়েছে স্বর্গীয় পবিত্রতা। তারই মধ্যে নীল শুধু নীল আকাশে মাথা তুলে শ্বেতশুভ্র ধ্যানগম্ভীর জ্যোতির্ময় যোগীরাজ স্ব-মহিমায় চির ভাস্বর। হ্রদের জলে তার প্রতিবিম্ব।

কোথা হতে ভাসমান শুভ্রপুঞ্জ মেঘের টুকরোগুলি কৈলাসপতির দেহে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় প্রকৃতি দেবী তাঁর সৃষ্ট পুষ্প ও বিল্বপত্র ভাসিয়ে দিয়েছেন পুরুষ শ্রেষ্ঠ'র পায়ে অর্ঘ্য দিতে।

নয়ন সার্থক। জীবন ধন্য। প্রকৃতির নিখুঁত সৌন্দর্যমণ্ডিত রত্নভাণ্ডারের মধুপানে অন্তরাত্মা হয়েছে অসীম তৃপ্ত। আর কেন। পাখি উড়ে ফেরে নিজ নিকেতনে—কৈলাসের গানে।*

*লেখকের 'ত্রিকৈলাস ও মানস সরোবর' গ্রন্থ থেকে

ডায়েরি

সুজল মুখোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব : চন্দনবাড়ী—পানিখার

সুজল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল বেলুড়ে। তিনি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। ভারতের প্রথম বেসরকারি পর্বতারোহণ সংস্থা 'হিমালয়ান এসোসিয়েশন' এবং 'গঙ্গোত্রী গ্লেশিয়ার এক্সপ্লোরেশন কমিটি' ও 'ট্রেকার্স গিল্ড'-এর সঙ্গে তিনি ছিলেন অঙ্গাঙ্গি। তিনি একজন প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও সংগঠক। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হিমালয়ের প্রতি ভালোবাসা। হিমালয়ের জন্য তিনি তাঁর জীবন ও যৌবন উৎসর্গ করলেও তেমন প্রচারের আলোয় আসতে পারেন নি। আর তাঁর সে বাসনাও ছিল না। তিনি হিমালয় ও পর্বতারোহণকে নিয়েই আনন্দে মেতে ছিলেন। পরিতাপের কথা এই আনন্দময় মানুষটি অকালে বিদায় নিয়েছেন। সুজলের অকাল প্রয়াণের পরে তাঁর অনুজ নিশীথরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৯৯৫ সালে সুজলের ডায়েরির কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন। সেই ডায়েরি থেকেই অজাতশত্রু হিমালয় প্রেমিক সুজল মুখোপাধ্যায়ের কিছু অভিজ্ঞতা ও ভাবনাকে এখানে সংকলিত হল।

☐ *যোজীপাল, শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট '৮৯ :*

"আগের দিন ঘোড়াগুলো নিয়ে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। JIM থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। ঘোড়াওয়ালা ৬টার সময় আমাদের খুঁজে চলে গেল। তারপর আর আসেনি। JIM-এর অধ্যক্ষ সুন্দর গাড়িখানা দিয়ে ডাক্তারকে নামিয়ে দিয়েছেন পহলগামে। ঐ গাড়ী পরের দিন ছাড়তে যাবে আমাদের চন্দনবাড়ী। ঘোড়ার চিন্তা নিয়ে আগের দিন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। আজ সকাল থেকে সলিলের সঙ্গে JIM-এর বাড়ীতে পহলগামে আর ঘোড়ার চিন্তা। ভগবান এটাও ঠিক করলেন—প্রশান্ত আর সৌরেন বাজারে ওকে ধরলো। মকবুল ঝড়ের বেগে এলো, টিপ সই দিল। হাজার টাকা বায়না নিয়ে চলে গেল আমাদের সম্পূর্ণ ভারমুক্ত করে। সকাল ১০-৩০-এ JIM-এর গাড়ী ছাড়লো। পথে ওর গ্রামে ওর সন্ধান পেলাম। নিজের মাল তুলে দিয়ে ঘোড়ার খোঁজে বেরোলো। আমরা গাড়ী নিয়ে চন্দনবাড়ী এলাম। সেই অমরনাথের ট্রাভেলসের সামনে গাড়ী থামলো। চেনা জায়গা সবকিছু মনে পড়ছিল। ভাইয়ের সেই Bridge-এর ওপর স্লিপ খাওয়া—আমাদের তাঁবু, খাওয়ার জায়গা সব। চন্দনবাড়ী এখন ভাঙ্গা হাট চেনাই যায় না। আমাদের রান্না শুরু হয়ে গেল। JIM-এর সদস্যদের বিদায় জানানো হোল—অনেক ছবি উঠলো। পুলকের সঙ্গে হঠাৎই চেনা কুলীর (NIM-এর) সঙ্গে দেখা। ওরা ফিরছে অভিযান সেরে। খুব সস্তায় আমরা ওদের পেতে পারি। প্রায় ৪ হাজার টাকা বাঁচবে। কিন্তু মকবুলকে কথা দেওয়া—সে দৌড়া-দৌড়ি করছে। অবশেষে ঠিক হলো যাকে কথা দেওয়া হয়েছে সেই মকবুলই থাক। আফশোষ রয়েই গেল।

প্রায় তিনটের সময় ও এলো। চন্দনবাড়ী ছেড়ে এগোবার চিন্তা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু মকবুলের চাপে বেরিয়ে পড়লাম—তিনটেয় বেরিয়ে ৭টায় পৌঁছলাম যোজীপাল। Hut-এ থাকা।"

☐ *যোজীপাল থেকে রঙ্গমার্গ, শনিবার, ২৬শে আগস্ট, ৮৯ ঃ*

"সকালে সুন্দর আবহাওয়ায় বেরিয়ে পড়লাম। শেষনাগে চা ও আলুর পরোটার জন্য এক ঘণ্টা নষ্ট এবং মস্ত ভুল। শেষনাগের সেই বরফের ব্রিজের পরেই ডানদিকের ঢাল ধরে উঠে যাওয়া—সোজা গুলল গালি। একটার পর একটা ঢাল-যেন শেষ হতে চায় না। তারপর নামা। আবহাওয়া খারাপ। হাত, পা ঠাণ্ডা। পাথরের আড়ালে বসে বিশ্রাম। তারপর সেই ভয়ঙ্কর নামা বরফের ঢাল পর্য্যন্ত কে জানত এর পরেও কপালে আরো সাংঘাতিক নামা। বরফের পর সেই gully ধরে নামা। তারপর তাঁবু দেখা দেওয়ার পরও সেই প্রচণ্ড ঢাল। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁবুতে।

রাত্রে সুন্দর খাওয়া দাওয়া, আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি। রান্নাঘরের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। রাতে প্রচণ্ড ঝড় আর তার সঙ্গে বৃষ্টি।"

☐ *রঙ্গমার্গে থাকা, রবিবার, ২৭শে আগস্ট ঃ*

"পরের দিন আশা নিরাশার দোলা, আকাশ ছাড়বে না। এই একটু খোলে তো আবার আরো খারাপ। সবাই তাঁবু বন্দী। বেরোন হলো না। হতাশা, অর্থনাশ ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও মানসিক বল অটুট। রাতে রেডিও'র খবর—জম্মু-শ্রীনগর পথ বিচ্ছিন্ন, দিল্লীতে প্রচণ্ড বৃষ্টি। সারা উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বৃষ্টিপাত। কিছু করার নেই। সবে দুদিন হাঁটা হয়েছে—থেমে যাওয়া ভালো লাগেনা। মেনে নিতেই হয়। বসে বসে ঘোড়াওয়ালাকে পয়সা গোনা গায়ে লাগে। তার থেকে বড় কথা একদিন নষ্ট হওয়া। কিছু করার নেই। জায়গাটা একটা পকেটের মতো—সমস্ত মেঘগুলো যেন এইখান দিয়েই উড়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিপাত করছে। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় সারাদিন বৃষ্টির মধ্যে তাঁবুর ভিতরে কাটানো একটা প্রচণ্ড মানসিক চাপ—যদি বৃষ্টি কালকেও না থামে? যদি আগামীকালও আটকে থাকতে হয়? সবাইকে বোঝাই, কত আর জল হতে পারে? রেডিও'র আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভবিষ্যৎবাণী আমাদের জন্য নয়। It must be fine in thc next morning. Boys cheer up. Weather has to be clear tomorrow. Whatcver comes we are moving next day. Better luck. Have a good sleep."

☐ *রঙ্গমার্গ থেকে হামপেট, সোমবার, ২৮শে আগস্ট ঃ*

"ভোরের আকাশ মুখ ভার করে রয়েছে। পরিষ্কার হয়েও হচ্ছে না। তবে আমরা বেরিয়ে পড়বোই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি এবং আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গুর্জর হাট-এর পাশ দিয়ে নালা পেরিয়ে সেই পথটা ধরলাম যেটা কিনা Wardwan-Insan হয়ে Morgan-এ চলে গেছে। বিরাট সাদা পাথর, গুর্জরদের একটা বড় আড্ডা, কুকুরের উৎপাত, তারপরই বাঁদিকে নেমে আসা Ice bridge পর্য্যন্ত।

একটু বিশ্রাম, ঘোড়াওয়ালারা এলে তাদের সঙ্গে Ice bridge-এর ওপর দিয়ে Sain নালা পেরিয়ে left bank ধরে চড়াই। পাঁচশো ফুট মতো চড়ার পর—ধার ধার রাস্তা। দূরে বিরাট সাদা পাথর, গুর্জরদের হাট, তারপরই নামা Sain এবং Kanital নালার সঙ্গম পর্য্যন্ত। এখান থেকে Sain-কে ছেড়ে দিয়ে Sanital নালার right bank ধরে পূবদিকে 90° turn. পথ ভাল, ধীরে ধীরে উঠছি। কোন কষ্ট নেই। হঠাৎ একটি ঘটনায় সবাই আমরা হতবাক্, কেউ কেউ বুক চেপে ধরেছি, চীৎকার কারোর মুখ দিয়েই বেরোয়নি, মাল নিয়ে আমাদের একটা চোখ কানা ঘোড়া পাক খেয়ে খেয়ে ঢাল বেয়ে চলেছে, আর দশ ফুট মত গেলেই সোজা দেওয়াল নিচে, অনেক নিচে Kanital নালা। কোন যেন এক অমানুষিক শক্তিতে ভর করে ঘোড়াটা একটা পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—সে নিজে বাঁচে, আমরা বাঁচি, ঘোড়াওয়ালা গিয়ে তাকে আস্তে আস্তে ঢাল দিয়ে নিয়ে আসে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

আবার চলা। আরো এক কিলোমিটার মত গিয়ে একটা ice bridge Kanital নালার ওপর। ওপরে অর্থাৎ left bank-এ যেতে হবে। Ice bridge-এর পর উপরের ঢালের রাস্তাটা অত্যন্ত সরু, ভাঙ্গা-পাথর পড়ার জায়গা। মাঝ পথে গিয়ে আবার সেই ঘোড়াটাই slip করল। মকবুল প্রাণপণে তাকে ঠেলে রেখেছে আর সৌরেন গলার দড়িটা প্রাণপণে টেনে রেখেছে। ঐ ঢালুতেই মকবুল ঘোড়ার পিঠের মালটা নামিয়ে নেয়। ঘোড়া আবার পথে উঠে আসে। আমাদের দ্বিতীয় ফাঁড়া ভালভাবেই কাটলো। এবার Kanital নালার left bank ধরে আরো প্রায় ৪ কি.মি. গিয়ে বিরাট ময়দানে হামপেটে আমাদের তাঁবু লাগলো। সুন্দর আবহাওয়া। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এখানে গত তিনদিনের মত আর মাল পাহারা দেওয়ার কোন প্রয়োজন হল না। গুর্জর হাট অনেক ওপরে।"

□ *হামপেট থেকে কানিতাল, মঙ্গলবার, ২৯শে আগস্ট :*

"সকালবেলা বেরিয়ে পড়া। সামনেই একটা ridge প্রায় নদীতে এসে মিশেছে। প্রথমে লম্বা ময়দান পার হতেই নদীর ধার দিয়ে সুন্দর রাস্তাটা। পাশাপাশি নদী চলেছে, চড়াই নেই। সুন্দর আবহাওয়ায় সবাই সুস্থ দেহে প্রকৃতিকে প্রতি পদে উপলব্ধি করতে করতে হাঁটা। অনেকদিন এত সুন্দর জায়গায় হাঁটিনি। Zanskar হিমালয় নাকি কঠিন, দুর্গম পথ! কিন্তু আবহাওয়ার কৃপা পেলে এ জায়গা তো অতি মনোরম চলার পথ। একটুও চড়াই নেই। আনন্দ উপভোগ করতে করতে হাঁটা। ১৬ কি.মি. পথ কখন পেরিয়ে এলাম বোঝা গেল না। পথের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ডানদিক থেকে (দক্ষিণ দিক) আসা বিরাট এক নালা পার হওয়া। জুতো খুলে ঠাণ্ডা জলে নালা পার হওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বোধহয় Humpet-এর থেকে সুন্দর জায়গা। ওর ওপর দিয়েই আগামীকালের পথ Lonvilad gully."

□ *কানিতাল থেকে দুনার, বুধবার, ৩০শে আগস্ট :*

"সকালবেলা সুন্দর আবহাওয়ায়—সবল, সতেজ মন নিয়ে সবাই যাত্রা শুরু করেছিলাম। শেষ যে এইভাবে হবে কল্পনাও করতে পারিনি। আবহাওয়া খারাপ হলে

সুন্দর পথ যে কতো ভয়ঙ্কর হতে পারে তার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল আজ। সবাই যে সুস্থ দেহে একত্রে এই সন্ধ্যা ৭টায় বসে আছি এটাই আশ্চর্য্য। Lonvilad glacier সত্যিই সুন্দর। দেখতে দেখতে উপভোগ করতে করতে glacier feature লক্ষ্য করতে করতে এমন সুন্দর হাঁটা কোনদিন হেঁটেছি বলে মনে পড়েনা। বিরাট ফাটলের মধ্যে গুম গুম এবং আরো কতোরকম বিচিত্র আওয়াজ—এক একটা গর্ত ধার থেকে দেখলে মাথা ঘুরে ওঠে। ধারে দাঁড়িয়ে দেখার পর মনে হয়—একা একা অত ধারে যাওয়া উচিৎ হয়নি। পড়ে গেলে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই ভীষণ সৌন্দর্য্যের আকর্ষণও তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

প্রথমটা যতো relax mood-এ ছিলাম, বিকালের দিকে আর তা থাকে না। এর ওপরে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাই। সমস্ত দলটা আগু-পেছু হয়ে যায়। রাস্তার গণ্ডগোল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত পা জমে যাওয়া। ঠোঁট দুটোও যেন আর পড়তে চায় না ঠাণ্ডায়। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যাচ্ছে। সহ্যের শেষ সীমায় পৌছে গেছি। মনে দ্বিধা জাগে পারব তো শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে পৌছাতে। দলের সবাই আমাকে নিয়েই ব্যস্ত। আমার জন্য এদের ভীষণ চিন্তা। প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে কেবল আমার জন্যই ওদের গতি মন্থর। ওরা তো অনেক আগেই সুন্দর তাঁবুর আশ্রয়ে পৌছাতে পারতো। আমার জন্যই ওদের এই দুর্দশা। খুব খারাপ লাগে। মনে হয় পাহাড়ে আর আসা উচিৎ নয়।

অবশেষে পৌছাই। কল্যাণ জুতো, মোজা খুলে দিয়ে একরকম sleeping bag-এর মধ্যে ভরে দেয়, এগিয়ে দেয় গরম কফির মগ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এবং—সব জামা কাপড় ভিজা অবস্থায়—প্রচণ্ড মানসিক শক্তি না থাকলে এখানে survive করা যায় না। ঘণ্টা খানেক বিশ্রামের পর রাতে গরম গরম পরটা আর ডাল—অপূর্ব।"

☐ *দুনার থেকে পানিখার, বৃহস্পতিবার, ৩১শে আগস্ট :*

আগের দিনের প্রচণ্ড ধকল সামলে বেরোতে ১০টা বেজে গেল। সকালে রোদ ভালো থাকায় সব জিনিস শুকিয়ে নেওয়া হলো। আজ আর পথে কোন অসুবিধা নেই। সমান রাস্তা—৪-৫ঘন্টার পথ পানিখার।

শুরুতেই জুতো খুলে বাঁদিকের বোরাং গলি থেকে আসা নালাটাকে পেরোতে হল। সুন্দর পথ। তিনটে নাগাদ পানিখার পৌছে গেলাম। সামনেই ছেলাং নালা গিয়ে মিশেছে সরু নদীতে। ৭৩-৭৪ সালে এসেছিলাম এই পানিখারে নুন অভিযানের সময়। তখন অবশ্য এসেছিলাম শ্রীনগর-কারগিল হয়ে। ব্রীজ দিয়ে ছেলাং নালা পার হয়েই বাঁ দিকে সুন্দর camping ground. এখানেই আমাদের ক্যাম্প লাগানো হয়েছে। এখান থেকে আমরা যাবো পদম।

কারগিল থেকে একটা বাস আসে ১২টা নাগাদ। সেটাই আবার ঘন্টাখানেক বাদে ফিরে যায় কারগিল, পদম যাওয়ার কোন নিয়মিত গাড়ী নেই। মাল নিয়ে যে সব ট্রাক যায় তাতে দু-একজন কোনরকমে চলে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মত বড় দলের পক্ষে

যাওয়া অসম্ভব। এখানে থেকে পদম যেতে নাকি ১২ ঘন্টা সময় লাগে। রাস্তা ১৮০ কি.মি. মত এবং খুব খারাপ পথ।

পুলিশ থানায় যোগাযোগ করা হয়েছিল। ওদের কথায় পুলিশ মিলিটারীকে Wireless-এ যোগাযোগ করতে পারে না। বিশেষ কোন officer-এর নাম বললে তাকে হয়তো যোগাযোগ করা যেতে পারে। থানার অফিসার বলেছেন কোন গাড়ী যদি কারগিল যায় তাহলে উনি তাতে পুলক ও প্রশান্তকে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, আজ কোন গাড়ী কারগিল গেল না। কাজেই কারগিলে কোন যোগাযোগ করা গেল না। প্রথম পর্ব ভালভাবে শেষ হলেও দ্বিতীয় পর্বের চিন্তা শুরু হল। এখান থেকে কোন রকমে বেরিয়ে পড়তেই হবে।"

□ *পানিখার ক্যাম্পসাইট, শুক্রবার, ১লা সেপ্টেম্বর ঃ*

"সুন্দর ভোর। ৭টায় ক্যাম্পে রোদ্দুর এলো। বিশ্রামের দিন। শিথিল মেজাজ। চিন্তা যায় না। পুলক ও প্রশান্ত সকাল থেকেই তৈরী হয়ে আছে যদি কারগিলে যাবার কোন গাড়ী পাওয়া যায়। অবশেষে বারটার বাসেই যাওয়ার ঠিক হলো।

সুন্দর দিন। রোদ্দুর ঝলমল করছে। কিছু কেনাকাটা, গোছানো আর কাচাকুচি। সমস্ত জিনিস রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া। দফায় চা, কফি, জলখাবার। কিন্তু পদম পৌঁছানোর গাড়ীর চিন্তা লেগেই রইলো। বেলা একটায় পুলক, প্রশান্ত, সলিল বাসে কারগিল রওনা হলো। ওখানকার মিলিটারী বেস-এ যোগাযোগ করার জন্য।

আমি আর সকলকে নিয়ে গেলাম ক্যাম্পে, ওদের বলে দিলাম যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—যাতে আগামীকাল ২ তারিখ আমরা পদম পৌঁছাতে পারি। তেসরা সেপ্টেম্বর পদম থেকে শুরু করলেও আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ছেলেদের নিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর দিল্লী থেকে ডিলাক্স ধরতে পারবো এবং যারা continue করবে তারা ঠিক সময়ে সিমলাতে তৃতীয় পর্বের ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে।"

□ *শনিবার, ২রা সেপ্টেম্বর, পানিখার ক্যাম্প ঃ*

"ভোরবেলা দেরী করে ওঠা। সারারাত চিন্তা হয়েছে ওরা গাড়ীর কিছু করতে পারবে তো? আজ আমাদের যেমন করেই হোক পদম পৌঁছাতে হবে। তবেই প্রোগ্রাম ঠিকমতো থাকবে। গাড়ীর আওয়াজ পাচ্ছি, আর দৌড়াচ্ছি। কারগিল থেকে ১০টার মধ্যে বাসটা পৌঁছে গেল। ছেলে পাঠাচ্ছি যদি কোন খবর এসে থাকে। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। ভালো লাগছে না। সারাদিন কেটে গেল। এদের কোন খবর নেই। সকাল-দুপুর-বিকেল সন্ধ্যোবেলা বেড়াচ্ছি ব্রীজের ধারে। উৎকণ্ঠা রেখে, পানিখার পুলিশ ষ্টেশনে-এর ওয়ারলেস অপারেটরের সঙ্গে দেখা। কোন খবর নেই। সন্ধ্যার পর অপারেটর এসে খবর দিয়ে গেল। কারগিল থেকে ওরা রাত ৩টেয় বেরিয়ে আগামীকাল ভোরে ৬টার মধ্যে পৌঁছবে, আমরা যেন তৈরী থাকি। ক্যাম্পে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে।"

□ *রবিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, পানিখার থেকে পদম ঃ*

"ভোর বেলা ওরা truck নিয়ে এসে গেল। আমরা মোটামুটি তৈরী ছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি সত্যিই ওরা রাত তিনটেয় বেরোতে পারবে বলে। পুলক, সলিল, প্রশান্ত—ওদের কারগিলের দিনগুলো খুব ধকল গেছে।

৭টা নাগাদ শুরু হল সেই ঐতিহাসিক ট্রাকযাত্রা। আমার অবশ্য সামনে ড্রাইভারের পাশে স্থায়ী আসন। পাশাপাশি পশ্চিম থেকে পূবে কারগিল থেকে পদম ২৩২কি.মি। এ এক অপূর্ব আবহাওয়ায় অপূর্ব যাত্রা। পেছনে যারা ছিল—আমাদের দল-কাউকে চেনার উপায় নেই। এ এক বীভৎস অবস্থা। প্রচণ্ড মানসিক জোর এবং প্রস্তুতি না থাকলে এই ধকলে মেজাজ ঠিক থাকে না।

বেলা ১১টা নাগাদ রংদুম নামে জায়গায় পৌঁছালাম। এখানেই দুপুরের খাওয়া সারতে হবে। ড্রাইভার মহম্মদ ইয়াসিন—সবাই বলে ওস্তাদ—অপূর্ব হাত—রাস্তা কি ভীষণ খারাপ। চালানোর হাত ততো ভালো। বিশাল ময়দান। দূরে রংদুম গোমফা। Camping ground."

দ্বিতীয় পর্বঃ পদম—দারচা

□ *সোমবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, পদম থেকে রেরু ঃ*

"১২টায় শুরু, ৩টেয় বরদুম গোমফা, রেরু-র আগে camping ground পৌঁছতে বিকাল হয়ে গেল। সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড, বোর্ড আছে। বাঁ দিকে নালা। ছোট্ট জলা। ঘোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরদিন।

একটি বোর্ড লাগানো আছে। বিদেশীরা এখানে ক্যাম্প লাগালে চার্জ দিতে হবে। তবে কত এবং কাকে দিতে হবে—কে সংগ্রহ করবে কিছুই লেখা নেই। আমাদের সঙ্গে বিদেশী রয়েছে তাদের তো কোন চার্জই লাগলো না দেখলাম। কাকস্য পরিবেদনা। কেউ নেই এ তল্লাটে। শুধু বোর্ডটাই আছে।

পাশে নালা—নালার জলটা ময়দানে একটু নিচু জায়গায় জমে একটা সুন্দর ছোটোখাটো লেক তৈরী করেছে।

প্রথম দিন। রাস্তা বেশ লম্বাই মনে হ'ল, ১২টায় পদম থেকে শুরু করে ৬টা পর্য্যন্ত হাঁটা।".

□ *মঙ্গলবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, রেরু-সুলে-ইছার ঃ*

"ঘোড়া বিভ্রাট। বিরাট দেরী। মানসিক চাপ। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। দিন নষ্ট, অল্প march, বুড়োর সঙ্গে হৈ হৈ—প্রায় মারপিট। পাশ দিয়ে নদীর ধাপ। ঘোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সকাল বেলা। নদীর ধারে অপেক্ষা। পিছনে দেরী। সামনে কেলবর্ক-এর দলকে আটকে দেওয়া। নদীর ধারে সুন্দর জায়গা। তিন ঘণ্টা নষ্ট।

প্রশান্তরা ঘোড়া load করে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। আমার কাছ পর্য্যন্ত। চলে এসেছে। ঘোড়ার দেখা নেই। ওরা বললে ridge-এর মাথায় দেখেছে। তাহলে এত দেরী কেন? ওদের বসতে বললাম—ঘোড়া না নিয়ে আসব না। আমি এগিয়ে গেলাম। বাকীরা এক নদীর ধারে অপেক্ষা করছে। Advance দল দু ঘন্টা ওখানে বসে আছে। আমি আসার পর আরো এক ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। ৩টার সময় আর ধৈর্য্য ধরা যাচ্ছে না। দুজনকে পিছনে পাঠালাম দেখতে—নিশ্চয়ই কোন অঘটন। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। একটা দিন নষ্ট। অবশেষে ওরা এল। প্রচণ্ড বকাবকি করলাম ঘোড়া ছেড়ে এগিয়ে আসার জন্য। ঘোড়াওয়ালা অভিজ্ঞ নয়—মাল বাঁধতে পারে না।

ইছার গ্রামের আগে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে (পাপুল) তাঁবু লাগানো হল। হিসাবমত আজ কেলবক যাওয়ার কথা ছিল। মাত্র ৩।৪ ঘন্টা হাঁটা হয়েছে। Camping site-এ বিরাট বিদেশীদের দল। মানালী থেকে পদম যাচ্ছে। সেখানে অন্য ঘোড়াওলা বুড়োর সঙ্গে বিরাট ঝগড়া, মারামারির অবস্থা, কারণ অবশ্যই আছে। আমাদের ঘোড়াওয়ালাকে আলাদা করে নিলাম।

রাগের মাথায় ফটাফট্ তাঁবু লেগে নগর তৈরী হয়ে গেল—রান্না শুরু, পেটে গরম চা, চিঁড়ে, চানাচুর পড়তেই সব ঠান্ডা। আবার যে যার মেজাজে ফিরে এলো। প্রচণ্ড দলগত উৎসাহ—ছবির মতো কাজ।"

☐ *বুধবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ইছার-কেলবক-টেটা :*

"সকালে শুরুতে অল্প ঘোড়া বিভ্রাট। তারপর সারাদিন একটানা হাঁটা। Kelbock-এ চা খাওয়া। আগের দিন পৌঁছানো যেত না। কেননা পাপুল থেকে Kelbock পর্য্যন্ত আর কোন ভাল camping ground নেই। ভালই হয়েছিল আগের দিন ওখানে camp করে। Tstang–Surlgy–Kelbock–Yol, ভাঙ্গা বাড়ী-দুটো কুকুর—তারপরেই damp camping ground—বড় বড় পাথর—আরো এগিয়ে ওপরে ক্ষেতের পাশে chorten-এর গায়ে camp, সুন্দর জায়গা। রাত জেগে ঘোড়া পাহারা, সলিলের মেজাজ খারাপ। প্রেসার কুকারে nugget বিভ্রাট। হাওয়া।

নদী উত্তর বাহিনী। Yol-Teta village—সারাদিন একটানা হাঁটা। ক্লান্তি।

বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে। বাইরে ঠাণ্ডায় বসার অসুবিধে। ঘোড়াওয়ালা বাইরে খোলা হাওয়ায় শোবে। ঘুম হবে না—ঘোড়া পাহারা দিতে হবে। যদিও পা বাঁধা আছে। পাশেই সবুজ লোভনীয় ক্ষেত। কড়াইশুঁটি যত পার ক্ষেত থেকে তুলে নাও। ঢালাও অনুমতি, কোন দাম লাগবে না। আমরা তুলেছিও অনেক। দু-তাঁবুর মাঝে রান্না হচ্ছে—

তবে ঘোড়া যদি ক্ষেতে যায় তবে ঘোড়া পিছু এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। বড় কড়া নিয়ম। আমাদের পাঁচটা ঘোড়া পাঁচ হাজার টাকা। কাজেই ঘোড়া সামলাও। দরকার হলে রাত জেগে ঘোড়া পাহারা দাও।"

□ *বৃহস্পতিবার, ৭ই সেপ্টেম্বর, টেটা-কুরু-কারগিয়াক :*

"দশটায় যাত্রা। ৬টায় পৌছানো। Teta গ্রামের মধ্য দিয়ে অপূর্ব রাস্তা। Kuru ব্রীজ পেরিয়ে নদীর true right bank। এতদিন true left bank ধরে হাঁটা ছিল। অপূর্ব যাত্রা। River bed. বাঁদিকে মোড় নিলেই Peak ও Pass-এর দিকের দৃশ্য। Kargiak গ্রাম, আরো তিন কিলোমিটার এগিয়ে এসে ক্যাম্প। এই কারগিয়াক গ্রাম থেকেই আমাদের বাঁদিকে অর্থাৎ SE-এ Surichan LA হয়ে Chumik Marpo যাবার পথ। Chumik Marpo হয়ে Thoyar হয়ে Leh-Manali Road-এর ওপর Sarai Kilang. তারপর Baralacha Pass পার হয়ে Zing Zing Bar হয়ে Darcha.

Teta—Kuru—Shangse থেকে একটা রাস্তা Phirtse la হয়ে Chumik Marpo-তে গিয়ে পড়েছে। Kargiak গ্রাম ছেড়ে আরো বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে নদীর ধারে তাঁবু লাগানো হল। সুন্দর জায়গা। চলার পথ থেকে একটু নিচে, হাওয়া কম। কিছুটা এগিয়ে রইলাম। ঠাণ্ডা বেশ ভাল রয়েছে। জায়গাটায় সকালে রোদ্দুর আসতে একটু দেরী হবে মনে হয়।

Rock Peakটার নাম Swiss Map থেকে নেওয়া GUMBURANJON."

□ *শুক্রবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, কারগিয়াক্-লাকোং :*

আমাদের ঘোড়াওয়ালা, একদিন যে পেছিয়ে গিয়েছিলাম—তা পুষিয়ে দিয়েছে। এই দুদিনে সে আমাদের conventional camping ground থেকে আরো আগে টেনে এনেছে। অবশ্য এর জন্য আমাদের সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত হাঁটতে হচ্ছে। এ রাস্তার দূরত্ব কোথাও লিখিত পাইনি। তবে সারাদিনের হাঁটার সময়ের হিসেব করলে প্রথম দুদিন ছাড়া রোজই ২০/২২ কি.মি. হাঁটা হচ্ছে বলে আন্দাজ করা যায়। ৮/৯ ঘণ্টা হাঁটা।

Singo La-র সামনে এসে পড়েছি। Lakong camping ground-এ পৌছবার আগে নদী পেরোতে হয়। নদীর right bank থেকে left bank-এ এলাম। বিশাল ময়দান—এখানেই লাকোং। কিন্তু আমাদের ঘোড়াওয়ালা আমাদের Pass-এর দিকে আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আজকের পথ শুধুই লম্বা। বিশেষ কোন চড়াই নেই। নদীর ধার ধরে সুন্দর পথ—কখনো boulder ডিঙ্গিয়ে, কখনো নদীর ধারে ধারে।

হাঁটতে ভালো লাগে—সৌন্দর্য্য অপূর্ব। পথ চলার আনন্দ পাওয়া যায়। যেখানে camp লাগানো হয়েছে, সেখান থেকে প্রায় এক কি.মি.দূরে পাশের বরফের ঢাল উঠে গেছে। সবাই চাঙ্গা। আগামীকাল Pass পার হব।

ভগবানকে ধন্যবাদ। এতোদিন সুন্দর আবহাওয়ার জন্য। খারাপ আবহাওয়ার সামান্যতম আভাসও পাইনি। বিকেলের দিকে বেশ ক্লান্ত লাগছে। প্রশান্ত চিন্তা করছে camp site পিছিয়ে আনবে কিনা। কিন্তু না, তাতে অসুবিধা হবে। চিন্তা তো কেবল আমাকে নিয়ে, আমি ঠিক ধীরে ধীরে পৌছে যাবো। Camp site-এর layoutটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

□ *শনিবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, সিঙ্গো-লা পেরিয়ে জাঁস্কর সামদো :*

"শুরুতেই একটু আগে বেরিয়ে পড়লাম। আমি, পুলক, সুমন, খোকা। বরফে এসে পুলক ওদের step cutting. traversing করাতে লাগলো। আমি আগে বাড়লাম। Pass-এর প্রথম উঁচু বরফের মাথায় ওঠার আগেই ঘোড়া আমাদের ধরে নিল।

Pass যেমন দেখে আসছি। একটার পর একটা উঁচু ঢাল, শেষ নেই যেন। অবশেষে নামা শুরু হল। নামারও শেষ নেই।

পাশের দক্ষিণ দিকে চলে এসেছি। নদী বইছে দক্ষিণ বাহিনী। ভীষণ ময়লা জল। ঠিক উত্তর দিকের উল্টো। ওদিককার নদীর জল সুন্দর পরিষ্কার ছিল। ভৌগোলিক কারণ। এদিকে হয়তো মাটির ভাগ বেশী, নদীর নাম জানিনা।

হাঁটার আর শেষ নেই। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতে চলেছে। তপন, আমি, পুলক হেঁটেই চলেছি। সঙ্গীদের দেখা নেই। তপন, পুলক অবশ্য আমার জন্যই পেছিয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে হঠাৎ এক জায়গায় আমাদের ঝাণ্ডার নিশানা—আশার আলো—ridge শেষ করে নীচে camp দেখা গেল।

Zanskar Sumdo পৌঁছে গেছি। কখন Ramjack পেরিয়ে এসেছি জানিনা। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। বিশাল ময়দান চিরে Zanskar Sumdo নদী বয়ে চলেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ, তারই বা কি আলো! সপ্তর্ষিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—তার থেকে ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিক ঠিক করা হয়।

আজকের কিচেন বিরাট। দুটো তাঁবু কম খাটানো হয়েছে। কিচেনে ৪ জন ভালোভাবে শোবে। কিচেনে বিরাট আড্ডা। ঠাণ্ডা তেমন নেই। কালকের দিন হাঁটলেই bushead, মনে হচ্ছে homesick হয়ে পড়ছি। এখন মাথায় দিল্লীর টিকিট ১২ই। যেমন করেই হোক ধরতে হবে।

রাতের খাওয়া দাওয়া চমৎকার। আবহাওয়া চমৎকার। সবায়ের স্বাস্থ্য আরো চমৎকার। সুন্দর, সুষ্ঠু প্রোগ্রাম।"

□ *রবিবার, ১০ই সেপ্টেম্বর, জাঁস্কর-সামদো-দারচা :*

"ভোরেই প্রশান্ত বলেছিল—ব্রীজের লোহার তার আর ring-গুলো ব্যবহার করে river crossing পদ্ধতিতে পেরিয়ে যেতে। কেন জানি আমার মনে হল ওতে অনেক হাঙ্গামা—সময় ও লাগবে অনেক বেশী। বললাম নদী পেরিয়ে যাওয়াই ভাল—তাড়াতাড়ি হবে।

রোদ্দুর আসতে দেরী আছে—সাড়ে আটটার আগে নয়। ঐ ঠাণ্ডাতেই কল্যাণ ও আমি নেমে পড়লাম জলে। প্রথম hurdles পেরোলাম—পায়ে প্রচণ্ড কষ্ট, ঠাণ্ডায় মনে হচ্ছে frostbite হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে ভুল করেছি। একটু পরেই আসল স্রোত পার হতে গিয়েছি কল্যাণ যখন ফিরে এলো তখন বুঝলাম সত্যিই ভুল হয়েছে।

নিজে ফিরলাম—সকলকে ফেরালাম। শেষ পর্য্যন্ত সেই তারের সাহায্যে river crossing অযথা দেরী হয়ে গেল, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। ঘোড়া পেরিয়ে গেল মাল নিয়ে। আমাদের প্রতিটি সদস্য ও রুকস্যাক পার হতে অনেক বেলা হয়ে গেল। প্রথম থেকেই এখানে শুরু করলে অনেক সকাল সকাল হোত।

যাক, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। হাঁটা আরম্ভ করতে প্রায় বেলা ১১টা বাজলো। পথের দৃশ্য অন্য দিনের থেকে কিছু কম নয়। শেষ দিন হাঁটা। বুঝতে পারছি পাহাড় শেষ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পথে এক জায়গায় বেহালার ছেলেদের দুর্ঘটনার সম্ভাব্য জায়গায় দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হল।

নদী যেখানে পাথর কেটে বিশাল খাদ তৈরী করে আমাদের বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে এসেছে সেই জায়গাটা, সত্যিই মনে রাখার মত। পাথরের মসৃণতা, খাদের গভীরতা, নদীর জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ার শব্দ—সব মিলিয়ে কেমন যেন ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। মনে থাকবে জায়গাটা।

অবশেষে মোটর পথ। পীচের রাস্তা। তারপর দারচা—bushead।

আমাদের পথ চলা শেষ। এখন যন্ত্রের ওপর নির্ভর। কাল সকালে উঠে আর হাঁটতে হবে না—একথা মনে করে ভালোই লাগছে। শরীর আর বইছে না—বিশ্রাম চাই।"*

* *লেখকের 'সুজনের ডায়েরী' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত*

কোলাহাই

সুজিত চট্টোপাধ্যায়

আজ পয়লা ভাদ্র। শ্রীনগর থেকে পহলগামে ফিরে যাওয়া ইংরেজী সতেরোই আগস্ট। দেখতে দেখতে ষোল সতেরো দিন কেটে গেল কাশ্মীরে। বরষা শেষে শরতে পা দিয়েছি। ঝিলমের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। মালপত্র বোট থেকে নামিয়ে তীরে রাখা হচ্ছে। ভোরের বাসেই রওনা পহলগামে। আকাশ টলটলে নীল। নদীর ধারে চেনার গাছের সোনারঙের পাতা হাওয়ায় কাঁপছে। শরতের গ্লানিহীন দিনের সূচনা।

গোলাম আর তার ছেলে রহমান আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে। এই সাতদিন ওদের গল্পগুজব তদারকিতে আমরা অনেকটা কাছাকাছি হয়েছিলাম। আমরা জেনেছি নোংরা বেশভূষায় এই বিশাল চেহারার লোকগুলো দারিদ্রে জর্জরিত, টাকা পয়সার প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ, দেওয়ার চেয়ে নেয়ার প্রতি বেশী ঝোঁক। তবু ওদের মধ্যে কোথায় একটা নরম দিক লুকনো আছে। একটু সহানুভূতির স্পর্শে যা সোনা হয়ে ওঠে। এরা দোষে গুণে ভালো মন্দে মানুষই। শীতের কামড়ে এরা বুকে মাটির কাঙ্গড়িতে কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে রাখে। বুকে তাই কালো দাগ। মন কালো নয়। তাই তো এরা বিদেশীদের কাছে মার খেয়েছে। কত আক্রমণ কত উত্থান পতনের সঙ্গে এদের ভাগ্য বিপর্যস্ত হয়েছে। কত লাঞ্ছনা অত্যাচার কত পুরুষ ধরে সহ্য করেছে। কখনো মেঘের ফাঁকে সূর্যের আলো উঁকি দিয়েছে। আবার কালো মেঘে কাশ্মীরের আকাশ ঢাকা পড়েছে।

ওদের দুজনের কাছে বিদায় নিই। এগিয়ে যাই।

বাস স্ট্যাণ্ডে প্রেমেন্দুবাবু আর তাঁর স্ত্রী পৌছন।

বাস চলেছে। এ বাস খানাবল অনন্তমার্গ ঘুরে অল্প সময়ের মধ্যে পৌছে যাবে পহলগাম। কোন দর্শনীয় স্থান ঘুরবে না।

খানাবল পেরিয়ে ছুটে চলেছে বাস তীব্র গতিতে। কিছু সময়ের মধ্যে অনন্তমার্গ। তারপরেই লম্বা দৌড় লীডারের তীর ধরে পহলগামের দিকে। ফেনশুভ্র জলস্রোত দেখতে দেখতে মনে হয় চলেছি এক রমণীয় অঞ্চলে।

পহলগাম পৌছই বেলা দশটা। নির্জন লোকশূন্য সমস্ত শহরটা খাঁ খাঁ করছে। প্রথমবার পৌছনোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এখন যেন আরও নীরব। হাওয়ায় শীতল শিহরণ একটু বেশী আগের চেয়ে। বর্ষামুক্ত নীল আকাশ, সূর্য আলোয় ঝলমল চারিদিকের পাইন-চীড় অরণ্য।......

সুধাংশুবাবু বলেন আমায়—আপনি ট্যুরিস্ট অফিসে যান, কোলাহইর সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলুন, আমি পহলগাম হোটেলেই ঘরের ব্যবস্থা করছি। ওখানে দুবার থাকা হয়েছে, তৃতীয়বার ওখানেই থাকবো। এসব হোটেল পছন্দ হচ্ছে না।

প্রেমেন্দুবাবুকে নিয়ে সুধাংশুবাবু চলে যান হোটেলের দিকে। আমি পাশেই ট্যুরিস্ট অফিসে সর্বময় কর্তার সঙ্গে দেখা করি। চিঠিটা দেখাই। চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটার এককোণে এক কলম লিখে দেন। সুমিষ্ট স্বরে বলেন—যান পাশের ঘরে, ওখানে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পাশের ঘরে কেরাণী বসে, কয়েকজন বসে আছে তাকে ঘিরে, বাংলোর জন্য বোঝা গেল। সবাই তারিখ দেখছে কবে খালি থাকবে ঘর। চিঠিটা দেখাই; সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ নিয়ে খাতা খুলে জিজ্ঞাসা করেন—বলুন কদিন থাকবেন বাংলোয়! পাল্টা জবাবে বলি—আপনি প্রোগ্রামটা তৈরী করে দিন, কিভাবে থাকলে ভাল হয়, ঘোড়ার কি ব্যবস্থা, আমাদের সঙ্গে একজন মহিলা আছেন।

ভদ্রলোক বলেন—দেখুন, প্রথমে হাঁটাপথে ডাকবাংলো সাত মাইল। সেখানে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন, দুপুরের খাওয়া ওখানে শেষ করে হাঁটা শুরু করবেন, সাত মাইল এগিয়ে গেলে পরের ডাকবাংলোয় পৌঁছে যাবেন বিকেলে। রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে কোলাহাই গ্লেসিয়ারে যাবেন, বিকেলে ফিরে রাত্রি কাটিয়ে পরের দিন একেবারে আসবেন পহলগামে। সঙ্গে মালপত্রর জন্য দুটো ঘোড়া নিন। মহিলাযাত্রীর জন্য একটি সওয়ারী ঘোড়া। খাবারপত্র সব এখান থেকে নিয়ে যাবেন। চৌকিদারের কাছে কাঠ পাবেন। আমি ঘোড়াওলাকে ডেকে পাঠাচ্ছি বিকেলে দেখা করবে। ঘোড়ার চার্জ বাইরে বোর্ডে লেখা আছে দেখে নেবেন।

অতি অল্পক্ষণেই সব ঠিক হয়ে যায়। নাম রেজিষ্টারে উঠে যায়। কেবলমাত্র লীডার ওয়াট ডাকবাংলোয় দুরাত্রি কাটাবো। মোট তিনদিনেই কোলাহাই ঘুরে আসা যাবে।

হোটেলে এসে দেখি পেছনের ব্লকে দুঘরের একটি স্যুট নেয়া হয়েছে। স্নান করে দুপুরের খাওয়াটা শেষ করি। একটু বিশ্রাম নিই। বিকেলেই তোড়জোড় করতে হবে, আগামীকাল ভোরে রওনা।

বিকেলে ট্যুরিস্ট অফিসে ঘোড়াওলার সঙ্গে দেখা করি। মোট তিনটি ঘোড়া যাবে। সঙ্গে দুজন সহিস, ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা ওরা করে নেবে। সেলাম জানিয়ে ওরা বলে—আগামীকাল ভোর সাতটায় হোটেলের দরজায় ঘোড়া নিয়ে হাজির থাকবে। ঘোড়ার ব্যবস্থা হল এবার জিনিসপত্র কিনতে বের হই, কিছু আটা চাল চিনি। প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে এক এক প্যাকেট চানাচুর কিনি দক্ষিণদেশীয় রেস্তোরা পূর্ণিমা থেকে। কিসমিস কাজু তো আছেই। অমরনাথ যাত্রার সময়ে যা যা খাদ্যদ্রব্য লেগেছিল প্রায় তাই লাগলো, তবে পরিমাণে কম। কিছু আলু কেনা হচ্ছিল এক তরকারীর দোকানে দাঁড়িয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে দুজন তরুণ ভদ্রলোক। মনে হচ্ছিল দক্ষিণ দেশের লোক। হঠাৎ তাঁদের একজন বলে উঠলো পরিস্কার বাংলায়—আপনারা এতো খাবারদাবার কিনছেন, খেতে পারছেন? আমরা তো কিছুই খেতে পারছি না, বিস্কুটের টিন খুললেই গা বমি বমি করে উঠছে। সারা অমরনাথের পথে না খেয়েই কাটিয়েছি। এবার কোলাহাইর জন্য কিনছি তবে খেতে পারবো কি না সন্দেহ।

এঁরা তাহলে বাঙ্গালী! আমরা সবাই ঘুরে ওঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ি। দুজনেই তরুণ, একজনের মুখে চাপদাড়ি, বেশ কৃশকায়। তাঁকে একেবারে মনে হচ্ছিল মাদ্রাজী যুবক। তিনি বললেন—আমার নাম তরুণ সেন, এ আমার বন্ধু দীপক বোস। এ তবু কিছু এখন খেতে পারছে। আমি বমিভাব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন কি হাল হয়েছে আমার।

সুধাংশুবাবু জিজ্ঞেস করেন—পাহাড়ে কি এই প্রথম বেড়াতে এসেছেন মানে হাঁটাপথে কি প্রথম? তরুণবাবু হেসে উত্তর দেন—আমাদের প্রথম হাঁটাপথে এই অমরনাথ ভ্রমণ।

সুধাংশুবাবু বললেন—প্রথমে অনেকের পাহাড়ের উচ্চতায় মাথা ঘোরে, গা বমি বমি করে। যাকে হিল সীকনেস বলে তাই হয়। ওটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠবেন। আপনারা তো কোলাহাই যাচ্ছেন। ও পথে চড়াই উৎরাই বেশী নেই। উচ্চতাজনিত উপসর্গও কম হবে। একটু জোর করে খাবেন, স্বাভাবিক হয়ে যাবে সব।

সকাল সাতটায় ঘোড়াওয়ালারা মালপত্র ঘোড়ার পিঠে তুলে রওনা হল। আমরাও ওদের অনুসরণ করলাম। নীলগঙ্গার পুল পার হয়ে হাইকিং রোডে পড়লাম। এপথ কোলাহাই যাবার পথ। এবারে পথের পাশে লীডারের জলস্রোত রইল। সকালের কমলা রঙের রোদ ছড়িয়ে আছে পাইন-চীড় শিশিরসিক্ত ঘাসে।

পথ চলতে চলতে একটু করে ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছি। এ পথের চড়াই এমনভাবে উঠেছে শরীরে কোন কষ্ট হয় না পথ চলতে, এটা সম্ভব হয়েছে সড়ক নির্মাণ বিভাগের পথ তৈরীর গুণে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাই, পিছন ফিরে তাকাই। দূরে—অনেক নীচে পহলগামের নিবিড় পাইন অরণ্যের শীর্ষভাগ মহাদেবের জটাজাল মনে হচ্ছে। আর ওরি মাঝখানে দুগ্ধশুভ্র লীডারের স্রোতকে মনে হচ্ছে একটি চলমান ফিতে।

সকালে মিষ্টি রোদে বেশ আনন্দেই সবাই হেঁটে চলেছি। পথের একপাশে লীডার অনেক নীচে খাদে বহে যাচ্ছে। আর একপাশে মখমলে হলুদ বর্ণের ঘাসে ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে। এখানে পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, সবটাই ঘাসে ঢাকা নয়, যেমন গুলমার্গে দেখেছি। এ পাহাড়ের শীর্ষভাগে পাইন গাছের জটলা, মনে হয় মাথায় জটা নিয়ে মুনি বসে আছেন ধ্যানগম্ভীর হয়ে।

মিসেস রায় ঘোড়ার পিঠে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন, মালপত্র সমেত ঘোড়া দুটোও আমাদের থেকে দূরে। নির্জন পথ, সোনারোদ ঝলমল চারিদিক। বেশ লাগছে পথ চলতে।

ঘড়ি দেখে হিসেব হল প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটেছি। আর বেশীদূর নয় প্রথম ডাকবাংলোর অবস্থান। সবাই মিলে এক জায়গায় বসে ফ্লাস্ক থেকে কফি খেয়ে নিই। কাজু বাদাম চিবোই। আবার পথ চলতে শুরু করি।

একটা সরু নদী, তীব্র স্রোত—কাচের চেয়েও স্বচ্ছ জল, পাথরের উপর পা ফেলে পার হলাম নদী। এসে পৌছলাম চারিদিক পাহাড়ঘেরা ছোট একটি উপত্যকায়। ঘন কোমল

ঘাসের গালিচা পাতা চারিদিকের পাহাড়। শীর্ষে পাইনের অরণ্য। চারিদিকে এক স্নিগ্ধ রূপ। নদী থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের ঢালু গায়ে বাংলো দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াওয়ালারা দাঁড়িয়ে বাংলোর পাশে। ন' হাজার সাতশো ফিট উচ্চতায় ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে এই আরু ডাকবাংলো।

সবাই বাংলোর টানা চওড়া বারান্দায় বসি। বেশ বড় ঘর দুটো, খাট চেয়ার সব সাজানো। সংলগ্ন বাথরুম। চৌকিদার এসে খোঁজ নেয়, আমরা থাকবো কিনা? যখন শোনে আমরা ঘণ্টাখানেকের পর পরের ডাকবাংলোর দিকে রওনা হবো। তখন বেশ মুষড়ে পড়ে। এখানে রাত্রি কাটালে ওর কিছু বখশিস, ঘরে জমা ডিম বিক্রি, সব মিলিয়ে কিছু উপার্জন হয়।

আমরা ওকে গরম জল আনতে বলি; ওর কাছে ডিম আছে শুনে সবার জন্য ডিমসিদ্ধ করতে বলি, এবং আরো বলি—ফেরার সময় ওর এখানে দুপুরের খাওয়া শেষ করে রওনা হবো পহলগামের দিকে। এসব শুনে হাসি ফুটে ওঠে মুখে। রান্না ঘরে কাঠের জ্বালানিতে একসঙ্গে গরম জল ডিমসিদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

সুধাংশুবাবু বাংলোর পাশে একটা পাইন গাছের নীচে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঘাসে মোড়া জমিতে শুয়ে পড়েন। মুখে পাইপ, গাছের ছায়ায় রোদ আড়াল। দেখলে মনে হয় নরম সোনালী কার্পেটে আরাম করছেন শুয়ে।

প্রেমেন্দুবাবু দিলীপ ওরা উপত্যকার মাঝখানে সরু নদীতে স্নান করতে যায়। গৌরাঙ্গ ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমি পরেশবাবু ঘোড়ার পিঠ থেকে ব্যাগ বার করে খাবারের তোড়জোড় করি। মিসেস রায় কফি বানাতে শুরু করেন। ঘণ্টাখানেক পর এগিয়ে যেতে হবে। আরো সাত মাইল এগোলে পরবর্তী ডাকবাংলোয় পৌছনো যাবে।

গরম কফি রুটি মাখন ডিমসেদ্ধ দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়। কফিতে চুমুক দিতে দিতে সবাই তাকিয়ে দেখি জায়গাটি। সবার ভালো লাগে। চারিদিকে পাহাড়ঘেরা প্রায় সমতল উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে পাহাড়ী নদী প্লাবিত হয়ে লীডারে পড়ছে। দূরে যেদিকে লীডারওয়াটের পথ চড়াইতে উঠে গেছে সেই উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে ঘন অরণ্যের শ্যামলতা। ওই পথের পাশেই দুটি দোকানঘর দেখা যাচ্ছে। একমাত্র লোকালয়।

চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করি, 'এখানে তুমি ছাড়া আর লোক কোথায়? ওই দোকান থেকে কারা জিনিষপত্র কেনে?' ও বলে, 'লীডার ওয়াটের পথে গুজরদের দেখবেন, ওরাই এখানে আসে জিনিষ কিনতে।'

মনে পড়ে, এপথে শুনেছি গুজরদের দেখা যায়, নির্জন পাহাড়ে সংসার পেতে অদ্ভুত জীবনযাত্রা ওদের।

ঘোড়াওলা তাগাদা দেয়। ওদের এগিয়ে যেতে বলি। চৌকিদারকে ডিমের বখশিস মিটিয়ে আমরাও হাঁটা শুরু করি। নরম ঘাসে পা ফেলে ফেলে দোকানঘর দুটোর পাশ দিয়ে চড়াইতে উঠি। বইতে পড়েছি, এ পথে এইটুকুই যা কিছু চড়াই, মাত্র পাঁচশো ফিট

আমাদের দিকে। আমরা পর পর তিনজন, আমি সুধাংশুবাবু গৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়ি। ভালুক নাকি ওটা? না ভালুক নয়। একটি গুজর রমণী। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলে আমাদের মুরগীর ডিম চাই নাকি।

সুধাশুবাবু বললেন—হ্যাঁ ডিম চাই। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে চলে গেল পাহাড়ের এক খাঁজে, সেখানে পাথর দিয়ে সাজানো ঘর। সেখান থেকে বার করে আনলো গোটা কয়েক ডিম।

সুধাংশুবাবু পয়সা দিয়ে ওগুলো কিনে নিলেন। এরা প্রায় এইপথে ভ্রমণকারীদের দেখতে পায়, তাই এইভাবে ব্যবসা করার ঝোঁকটা এদের বেশী।

বেশ শীত করছে। হাফহাতা সোয়েটারের ওপর পুলওভারটা চড়িয়ে নিলাম। দশহাজার ফিট উঁচুতে উঠে এসেছি। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর লীডার পড়লো পাশে। পথের পাশে কলস্বনা লীডার ছুটে চলেছে। লীডারের জল দেখতে পাচ্ছি। কি বিপুল স্রোত, পাথরে সে স্রোত আবর্ত হয়ে কুটি কুটি করে হেসে উঠছে।

এই দেখছি আর চলছি। ঘোড়াওলাদের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে পড়ি। পেছনে প্রেমেন্দুবাবু দিলীপবাবু আছে। কিছুক্ষণ পরে ওরাও পৌঁছয়। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালি, প্যাকেট থেকে চানাচুর বার করে খাই। গরম কফিতে সবাই সজীব হয়ে উঠি। আবার হাঁটা শুরু করি।

অপরাহ্ন হয়ে এসেছে। ঘড়িতে প্রায় চারটে বাজে। চারিদিকে পাহাড়ের চূড়ো থেকে রোদ ঢলে পড়েছে। পথ চলতে চলতে পাইনের জটলার ফাঁক দিয়ে নজর পড়ে—নদীর অপরদিকে সবুজ ঘাসে মোড়া ঢালু ভূমি। একটা বাংলোও দেখা যাচ্ছে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে যাই, দূরে পাইনের ঘন জটলা দেখা যাচ্ছে। কাছে দেখি পথটা ওই ঘন পাইন বনের মধ্যে দিয়ে নদীতে পড়েছে। আমাদের ঘোড়াওলারাও দাঁড়িয়ে আছে পথের মুখে। প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রী ঘোড়া থেকে নেমে পায়চারি করছেন।

ঘোড়াওলারা বলল—বাবু এই নদী পার হতে হবে। ওপারে লীডারওয়াট ডাকবাংলো। নদীতে পুলটায় একসঙ্গে বেশী লোক পার হবেন না, কমজোরি পুল আছে। এই বলে ওরা একে একে ঘোড়া নিয়ে ওপারে চলে যায়। আমরাও একে একে খরস্রোতা লীডারের উপর পাইন লগের তৈরী পুলের মাঝখান দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে পার হই।

ওপারে একটু চড়াইপথে উঠে পৌঁছে যাই লীডারওয়াট। আকাশউঁচু পাহাড়ের সানুদেশে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসে মোড়া বিরাট অধিত্যকা। তারি মাঝখানে একা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ডাকবাংলো।

আরুতে যে রকম বাংলো, এখানেও তাই, একই চেহারা। পাশাপাশি দুটো বড় ঘর, কয়েকটা খাট চেয়ার টেবিল ঘরেতে। বাথরুম ঘরের সংলগ্ন, টানা বারান্দা দুদিকে। পেছনে আলাদা রান্নাঘর। চৌকিদার এসে দাঁড়ায়। ওকে গরম জল চাপাতে বলি। ঘরেতে খাটগুলো একপাশে সরিয়ে বিছানাগুলো পর পর পেতে ফেলি। সারাদিন হেঁটে সবাই ক্লান্ত, বিশ্রামের

প্রয়োজন। ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। চা-খাবার খেয়ে সবার ক্লান্তি দূর হয়েছে। বেরিয়ে আসি ঘর থেকে সবাই। বাংলোর বাইরে এসে দেখছি চারিদিক। ভারি সুন্দর অবস্থান বাংলোটির। ডানদিকে এক খরস্রোতা নদী পেছনের পাহাড় থেকে বেরিয়ে সামনে লীডারে মিশেছে। ডানদিকে নদীর ওপারে খাড়া পাহাড়, পাথর বার করা তার গা ভীষণ আকৃতি নিয়েছে। বাঁদিকে কোলাহাই যাবার পথ যেদিকটায়, সেদিকে উঁচু পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। তবে সে অঞ্চল শ্যামল পাইন-ঘন। আর সামনে ঢালুভূমি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে স্রোতস্বিনী লীডার ছুটে চলেছে নীচের দিকে।

চারিদিকে আকাশ উঁচু পাহাড়, সবুজ ঘাসে ছাওয়া ভূমি, দূরে পাইনের শ্যামনিবিড়তা—নদীর কলস্রোত সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এক অজানা রূপকথার জগতে এসে পৌঁছেছি। এখানে ব্যস্ততা নেই, উত্তেজনা নেই—ধীর শান্ত মুহূর্তগুলো লয় হচ্ছে এক অনাস্বাদিত আবেশে। লীডার ওয়াটের উচ্চতা দশহাজার ফিট। রোদের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়াতে কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পরে আবছা অন্ধকারে পাহাড় দূরের পাইনজটলা কালো হয়ে এলো। কেবল নদীর একটানা গর্জন কানে ভেসে আসছে।

ঘরেতে সবাই বিছানায় আশ্রয় নিই। বড় বড় গোটাচারেক মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই। মৃদু নরম আলোয় ঘরে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মিসেস রায় রান্নাঘর থেকে এসে জানান—আজ রাত্রির জন্য খিচুড়ি। আগামীকালের জন্য পরোটা, অবশ্য পরোটা গ্লেসিয়ারে পৌঁছে ওখানে বসে খাওয়া হবে। ভোরে চা বিস্কুট খেয়ে রওনা।

আমি প্রশ্ন করি—ঘি কোথায় পেলেন? আমার রসদের থলিতে ঘি তো ছিল না।

উনি জানালেন—চৌকিদারের কাছে গুজরদের দেয়া ঘি আছে, ওকে বলেছি যা খরচা হবে তার দাম যাবার সময় দিয়ে যাবো। জানালেন দুধও প্রয়োজন হলে পাওয়া যাবে। উনি আরো জানালেন—কি সুন্দর ক্ষীরের গোল গোল লেচি চৌকীদারের কাছে দেখছেন। আর গুজররা ঘরে বসে টাকা পাবে বলে দুধ দেবে অঢেল।

—বললাম ঠিক আছে,—গ্লেসিয়ার দেখে ফিরে দুধ কিনে পায়েস খাওয়া হবে। আগামী দিনটি আমাদের দীর্ঘভ্রমণসূচীর শেষদিন। কোলাহাই গ্লেসিয়ার দেখে ফিরে এসে ভ্রমণের সমাপ্তি। তাই কালকের দিনটিতে বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সুধাংশুবাবু বলেন—কালকের কথা কাল। আজকে আপনার রসদের থলিতে কি আছে বার করুন।

থলিতে যা খুঁজে পেলাম, তাতে এখন এক কাপ করে টমাটো স্যুপ খাওয়া যেতে পারে। দু প্যাকেট হিমা স্যুপ আছে, এক প্যাকেট ফিরে এসে কালকে লাগবে। বিস্কুট যা আছে সকালে লাগবে। একটা জেলী আছে, কালকে পরোটার সঙ্গে খাওয়া হবে, পরোটার সঙ্গে তরকারী নেওয়া হচ্ছে না। বাকি যা আছে চাল আটা পিঁয়াজ আলু। জানালাম এই স্যুপ প্যাকেটটি এই সন্ধ্যায় বিশেষ খাদ্য হিসেবে দেয়া হ'ল।

কম্বলের তলায় শুয়ে আছি। বেশ আরাম লাগছে সারাদিনের হাঁটার পর। চৌকিদার গরম স্যুপ দিয়ে গেছে, গরম স্যুপের কাপে চুমুক দিচ্ছি। ঘরেতে মোমবাতির আলো স্থির হয়ে জ্বলছে। ঘরের জানালা সব বন্ধ। বাইরে ঘন অন্ধকার। কান পাতলে নদীর একটানা স্রোতগর্জন ভেসে আসছে। সুধাংশুবাবু সবাইকে নিয়ে তাস খেলতে শুরু করেন। কেবল দিলীপ আমার পাশে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে। ও বলে—হিমালয়ের সরল মানুষ সত্যিকারের খাঁটি সন্ন্যাসীদের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে—ওদের সম্বন্ধে বলুন। বললাম—আমার দেখা সন্ন্যাসীদের কথা বলেছি, মানুষদের কথাও বলেছি। এবার আমার পরিচিত এক হিমালয় প্রেমিক গাঙ্গুলী মশায়ের কথা বলি। উনি আজীবন হিমালয় ভ্রমণ করেছেন, দুবার কৈলাস দর্শন করেছেন, বলতে গেলে হিমালয় ওঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন। ওঁর মুখের কথাতেই বলি—আমার এই ঘটনা বিগত ভ্রমণের। বহু পূর্বে গত মহাযুদ্ধের কিছু আগে এক গ্রীষ্মে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণ করছি। একদিন এক কঠিন চড়াই ভেঙ্গে সন্ধ্যার অনতিপূর্বে পৌছলাম এক পাহাড়ী গ্রামে। আমাদের গন্তব্যস্থল এখনো বহুদূর। এদিকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। দূরে শ্যামল বনরাজিতে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে অতএব আর এগোন যুক্তিযুক্ত নয়। এখনি কোথাও আশ্রয় চাই। দূরে একটি বাড়ি চোখে পড়ল। পাহাড়ের ঘর বাড়ি যেমন হয় ওপরে শ্লেট পাথরের ছাদ আর মাটির দেওয়াল। মনে হল একজন পাহাড়ী কৃষকেরই এই বাড়ি। আমরা সেই বাড়ির সামনে দাঁড়তেই একজন প্রৌঢ়া রমণী বেরিয়ে এলো। আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম—একটা ঘর পাওয়া যাবে ? রাত্রিটা কাটাবো সকালে ছেড়ে দেবো। রমণীটি বলল—জরুর মিলেগী লেকিন কিরায়া চাই। একটু আশ্চর্য হলাম তখনকার দিনে যাত্রীদের আশ্রয় দিতে কোন অর্থের বিনিময় হত না। শুধু চটিতে আহার্য সামগ্রীর পরিবর্তে থাকবার স্থান পাওয়া যেত। ভাবলাম—এ বেচারা তো কিছু ব্যবসা করতে পারবে না, তাই যদি কিছু পয়সাকড়ি চায় অন্যায় কিছু নয়। জিজ্ঞেস করলাম কত দিতে হবে? 'দো পয়সা'—দু পয়সা! আমরা সবাই অবাক হলাম। যদিও তখনকার দিনে দু পয়সার মূল্য যথেষ্ট তবু একটি বড় ঘরে জনাকয়েক মানুষ বাস করবো তারা ভাড়া দু পয়সা অসম্ভব সস্তা। আমরা সানন্দে রাজি হয়ে সেই রাত্রি কাটালাম সেই ঘরে। পরদিন সকালে আমরা তৈরী রওনা হবার জন্য। প্রৌঢ়া রমণী এলো, এসেই আমাদের কুশল জিজ্ঞেস করলো। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। কোন অসুবিধে হয়নি তো? আমরা জানালাম অসুবিধে হয়নি নির্বিঘ্নে রাত কেটেছে।

এবার আমি পকেটে একগাদা খুচরো পয়সা থেকে একমুঠো পয়সা তুলে নিলাম—তাতে সিকি আধুলী পয়সা সব আছে, মোট কথা ওকে দুপয়সা দিতে মন চাইছিল না অন্তত: কিছু বেশী নিক এই চাইছিলাম। ওর সামনে হাতের মুঠো খুলে বললাম—এই খুচরো পয়সা থেকে যা খুশী পয়সা তুমি তুলে নাও তোমার ঘর ভাড়ার জন্য।

আজও আমার মনে পড়ছে তার সেই কথা তার সেই আচরণ। সে স্মৃতি এতটুকু ঝাপসা হয়নি। সেই পাহাড়ী সরল প্রৌঢ়া কৃষক রমণী আমার প্রসারিত করতলে একগাদা খুচরো পয়সার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'নেহি নেহি ম্যয় দো পয়সাই লুংগী' এই বলে দুটি আঙ্গুল চিমটের মত করে আমার হাত থেকে দুটি পয়সা তুলে নিল। আমার তখন মনে হল আমি আমার অর্থের জাঁক নিয়ে ওর লোভহীন সত্বার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। এখনও কানে বাজছে তার সেই কথা 'নেহি নেহি ম্যয় দো পয়সাই লুংগী'।

গাঙ্গুলী মশাই অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি সন্ন্যাসী সম্পর্কীয় ঘটনা মনে হচ্ছে তার কথাতেই বলি—এক সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ছে। তখনকার দিনে সন্ন্যাসীরা ছিলেন খুব সহজ সরল। তাঁরা অকপটে তাঁদের অনুভূতির কথা স্বীকার করতেন তাতে মর্যাদা বৃদ্ধি হোক আর না হোক।

তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মাঝামাঝি। আমার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে চলেছি মানস সরোবরের দিকে। কৈলাস পরিক্রমা করবো। আলমোড়া থেকে পদযাত্রা। বেশ কয়েকদিনের হাঁটার পর আমরা পৌছলাম তাওয়া ঘাট। ধারচুলা থেকে লিপু পর্যন্ত কালি নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হত। তাওয়া ঘাটও কালি নদীর ধারে। এখানে দুদিন বিশ্রাম নিচ্ছি, মার শরীর একটু পরিশ্রমে ক্লান্ত। এইখানেই আমাদের একজন মালবাহক এসে খবর দিল—বাবুজি আপনারা একজন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করবেন। উনি পাহাড়ের গুহায় থাকেন। বহুৎ বড়া মহাত্মা। আমাদের দেখ্‌ভাল উনি করেন।

মা সাধু সন্ন্যাসীর কথা শুনলে থাকতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে বলেন—চল দেখে আসি। তা আমরা তো ওই পথেই যাবো। এখন এখানকার পাট তুলে চলা শুরু করি।

তাই করলাম। আমরা এগোলাম। মাল বাহকটি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যাত্রা পথের ধারে এক পাহাড়ের পাকদণ্ডি পথ ধরে বেশ কিছু উপরে উঠে পৌছলাম এক গুহা মুখের সামনে।

চেয়ে দেখলাম গুহার স্বল্প পরিসর জায়গায় একজন দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। চোখ দুটো ধুনীর উপর নিবদ্ধ। আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে চাইলেন। মালবাহকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন একটু তারপর বললেন—আও বৈঠো হিঁয়া বলে সামনে ইশারা করে বসতে বললেন।

মা কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলেন—বাবা আপনার শীত লাগে না। আমাদের তো এখানে এতো ঠাণ্ডা লাগছে দিবারাত্র গরম জামাকাপড় জড়িয়ে আছি। উনি বললেন—মা সবই অভ্যাস। কোন আশ্চর্য ক্ষমতা কিছু এর মধ্যে নেই। যেমন শীতে তোমার সারা শরীরে জামা কাপড়ে আবৃত্ত করে থাক—কিন্তু মুখটা খোলা রাখ। শরীরের এই অংশটায় তেমন শীত লাগে না। কেন না ওই অংশটুকু শীত সহ্য করে সহনীয় হয়ে গেছে। তেমন আমরাও সব সময়ে শরীর অনাবৃত রেখে শীতকে সহনীয় করে নিয়েছি। তাছাড়া রাগ অর্থাৎ ভস্মছাই শরীরকে গরম রাখে।

মা আবার প্রশ্ন করলেন—বাবা আপনি নিশ্চয় ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন? মার কথা শুনে সন্ন্যাসী সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে তুললেন। বললেন—আরে মাতাজি কি বলছেন—ঈশ্বরের মুখ দর্শন কি সহজ ব্যাপার। কত জন্মের সুকৃতি থাকলে তাঁর দর্শন অনুভূতি পাওয়া যায়। আমি শুধু এই নির্জনে যোগ সাধনা করি। বাকি সময় তাঁর নাম জপ করি। যোগে অনেক কিছু ক্ষমতা আসে, তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই এ অভ্যাসগত ক্রিয়া। মা এবার বললেন—বাবা আমরা গৃহীরা কি ভাবে তাঁকে স্মরণ করবো কিসে তাঁর আশীর্বাদ পাবো।

সন্ন্যাসী মার দিকে তাকিয়ে বললেন—মাতাজি খালি তাঁর নামজপ করে যাও। তোমার যা কিছু ভয় ভাবনা চিন্তা তাঁর উপর ছেড়ে দাও। দেখ মা—মানুষ দুবেলা ক্ষিদে পেলে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু সে কি দেখে না জানতে পারে সেই খাদ্য গ্রহণের পর সেই খাদ্যপ্রাণ শরীরের ভিতর কি ভাবে গ্রহণ করে তার থেকে মানুষের রক্ত মাংস মজ্জা তৈরী হচ্ছে। সেই রকম সর্বমঙ্গলময় যিনি আছেন তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উপর সব কিছু অর্পণ করে রাখলে তিনি সর্বদা তোমার অগোচরে তোমার মঙ্গলের চিন্তা করেন। তবে কিছু দুর্ভোগ জীবনে থাকবে হয়তো যা তীব্রভাবে আসতো তাঁর প্রসন্নতায় অতি সামান্যভাবে দেখা দেবে। তাই বলি মাতাজি কিছু জানবার চেষ্টা না করে একাগ্রভাবে সময় পেলে তাঁর নামজপ করে যাও।

সেই সন্ন্যাসীর সেদিনকার ওই সহজ সরল উপদেশ মার অন্তরে স্পর্শ করেছিল। খুব শান্তি নিয়ে আমরা ওখান থেকে কৈলাস মানসের দিকে যাত্রা করি। রাত হয়ে এসেছে সুধাংশুবাবু তাস ফেলে উঠে পড়েন! বলেন—এবার খেয়ে নেওয়া যাক, কাল ভোরে বেরোতে হবে।

কথা হয় বিছানাপত্র যেভাবে আছে তাই থাকবে। গ্লেসিয়ার থেকে ঘুরে এসে বাঁধাছাঁদা হবে। সকালে চা-জল খেয়েই বেরিয়ে যেতে হবে। লীডারওয়াট থেকে লীডার নদীর উৎস কোলাহাই গ্লেসিয়ার আটমাইল পথ। দশ-হাজার ফিটের ওপর আছি, পৌছতে হবে তের হাজারের কিছু বেশী উপরে, অর্থাৎ তিন হাজার ফিট উঠতে হবে। যদিও পথে খুব একটা চড়াই নেই, কেবল উৎসমুখের কিছু দূর থেকে মোরেনের পথ, ভগ্ন শিলাস্তূপে পা রেখে হাঁটতে হবে। শরতের প্রথম এখন, সকালের দিকে আকাশ নীল থাকবে, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ দেখা দিতে পারে। যথাসম্ভব অপরাহ্নের শেষে ফিরে আসতে হবে বাংলোয়।

ঘরের মাঝখানে গরম খিচুড়ি এক ডেকচি রেখে যায় চৌকিদার। এবার সবাই বিছানা ছেড়ে গোল হয়ে বসি, গরম খিচুড়ি খেয়ে আবার বিছানায় আশ্রয়। ঘুমিয়ে পড়ি সবাই। একসময়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সবাই তখন ঘোর নিদ্রায়, বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। ঘন নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে আছে চারিদিক। শুধু অবিশ্রাম গর্জন ভেসে আসছে লীডারের আর বাংলোর পাশে নদীর। মাথার উপর আকাশ নক্ষত্রের দীপ্তিতে ঈষৎ আলোকিত, অনেকক্ষণ ধরে তাকালে দূরদিগন্তে নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোকে পাহাড়ের

কালো চূড়ো দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল পরিচিত জগতের বাইরে অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনার সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছি। ওই দূর নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো, কালো পাহাড়ের চূড়ো, বাংলোর বাইরে কালো অন্ধকার, নদীর একটানা কলধ্বনি সব মিলিয়ে কিসের এক স্পন্দন অনুভব করছি। হৃদয় কি এক চেতনায় ডুবে যেতে চাইছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি নির্জন বারান্দায়, তারপর ঘরে এসে শুয়ে পড়ি।

খুব সকালে বেরিয়ে পড়েছি। তরুণবাবুরা বললেন, আমরা দুজন একটু বেলায় রওনা হবো। ওঁরা ঘোড়ায় যাবেন। আমরা পায়ে হেঁটে, একজন মহিলা ঘোড়ায়। একজন সহিস মিসেস রায়কে ঘোড়ায় চড়িয়ে এগিয়ে গেল। দুটো ঘোড়া একজন সহিস সমস্ত মালপত্র নিয়ে পড়ে রইলো বাংলোয়।

হাতে লাঠি, কারুর কাঁধে ফ্লাস্ক—জলের বোতল এবং প্রত্যেকের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য। সবুজ ঘাসে ভরা ঢালুভূমি পেরিয়ে লীডারের বাঁ পাশ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে চড়াইতে উঠলাম। অল্প চড়াই, তারপর নদী থেকে অনেক উঁচুতে নদীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল পথ এগিয়ে চলল। মাথার উপর আকাশ গাঢ় নীল। দূরে পাইনে ঢাকা পাহাড়শ্রেণী সকালের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

পথ ভয়ানক সরু, ডানদিকে খাদ নেমে লীডারে মিশেছে। দূরে দেখি মিসেস রায় ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছেন। হেঁটে যাচ্ছেন। কিছুদূর যাবার পর এই সরু পথ শেষ হল। একটা ঝরণা পার হতে হল পাথরের উপর পা ফেলে। এক হাতে লাঠি অন্যহাতে জলের বোতল নিয়ে টাল সামলাতে পারলো না দিলীপ, জলে আছাড় খেলো, তাড়াতাড়ি উঠে সামলে নিল। জায়গাটা খুব ঢালু ছিল না তাই রক্ষে।

পথ এবার পাহাড়ের গা থেকে নদীর ধারে চওড়া সমতল ভূমিতে পড়ল। লম্বা লম্বা পাইনগাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঘাসে ঢাকা নদীর তীর থেকে পাহাড়ের গা অবধি। এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাই। এমন সৌন্দর্যময় স্থানে পা থেমে যায়। সামনে ঘাসে ঢাকা পাড় নদীর জলের রেখা সমান্তরাল। লীডার কলনৃত্যে ছুটে চলেছে। তার স্বচ্ছ জল ঘাসেভরা তীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। জলের ধারে ঘাসের কার্পেটে শুয়ে থাকলে নদীর কলধ্বনি সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত শৈলমালা আশেপাশে উন্নত পাইনের শ্যামলশোভা সব মিলিয়ে এক অপরূপ স্বর্গীয় শোভায় চেতনা ডুবে যাবে।

এবার পথ নদীর পাশাপাশি। একপাশে খাড়া আকাশ উঁচু। পাহাড়, আর একপাশে স্রোতস্বিনী লীডার। পথের পাশে পড়লো গুজরদের বাসস্থান।

পাথর দিয়ে সাজানো বড় গুহার মতো করা ঘর। এক গুজর রমণী তার ঘরের সামনে বসে আছে, আর এক রমণী তার চুল বাঁধছে; নিখুঁত সাংসারিক চিত্র। আমাদের দিকে তাকালো, বিশেষ কৌতূহল নেই চোখেমুখে।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর এক জায়গায় পৌছলাম, যেখানে লীডার ঘুরে গেছে

পাহাড়ের বাঁকে, সেখানে পথের পাশে পাহাড় থেকে নেমে আসা এক খরস্রোতা-নদী লীডারে এসে মিশেছে। পথ ও নদীর সঙ্গে ঘুরে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে দূরে।

নদী পার হয়ে এলাম কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি পুলের উপর দিয়ে। সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। এখানে শুনেছি একটি পথ চলে গেছে তারসার-মারসার হ্রদের দিকে। পাহাড়ের শীর্ষে দুটি স্বচ্ছ জলের হ্রদ। ভুল করে সেইদিকে না এগিয়ে যাই।

একটু এগিয়ে গুহার মতো দুটি ঘর চোখে পড়ে। একটি গুজর বালিকা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের সম্মুখে, চোখে তার কৌতূহলের দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করি তাকে, এখান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কোন মহিলাকে দেখেছো যেতে? কোন বাবু টুপী মাথায় হাতে লাঠি?

মেয়েটি ফিক করে হাসে। কোন কথা বলে না। অন্য কেউ নেই আশে পাশে জিজ্ঞেস করবো। হঠাৎ নজরে পড়ে পথের ওপর। সদ্য ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ কাঁকরপূর্ণ পথে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটা শুরু করি।

কিছুক্ষণ যাবার পর দেখি দুজন প্রৌঢ় গুজর এগিয়ে আসছে পথে। তাদের জিজ্ঞেস করি সামনে কাউকে দেখতে পেয়েছ কিনা? ওরা বলে একজন ঘোড়ায় চড়ে মহিলা চলেছেন আর একজন বাবু কিছু দূরে পথেই দাঁড়িয়ে আছেন। মনে পড়ে সুধাংশুবাবুর কাঁধে ফ্লাস্ক আছে। আমরা এক জায়গায় হলে কফি ঢালবেন।

এগিয়ে চলেছি অবিরাম লীডারের স্রোতগর্জন কানে আসছে। কখন দূরে কখন পাশে চলেছে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী। পেছনে ফেলে এসেছি নিবিড় পাইন অরণ্য, ফেলে এসেছি বার্চগাছের জটলার শেষ শ্যামল চিহ্নটুকু। এখন দুপাশের পাহাড় অনাবৃত পাথরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পথ এবার চড়াইতে উঠছে। সম্ভবতঃ বারো হাজার ফিট উঁচুতে উঠে এসেছি। তাই আর কোন গাছপালার চিহ্ন নেই। আকাশছোঁয়া পাহাড় চারিদিক ঘিরে আছে। হারিয়ে গেছি হিমালয়ের গভীর কন্দরে।

আরো এগিয়ে যাই। একটু বাঁক নেয় পথ। তারপরেই চোখের সামনে দেখতে পাই আকাশে মাথা তুলে শুভ্র তুষারকিরীট জ্বল জ্বল করছে। সকালের সূর্যের আলোয় মনে হয় গলানো রজত। চোখ ঝলসে যায় ঠিকরানো দীপ্তিতে। পাহাড়ী পথে চোখের সামনে তুষারমণ্ডিত শিখর না থাকলে কি একটা অভাব অনুভূত হয়। সেটা এবার মিটে গেল। শুভ্র কোলাহাইয়ের তুষারশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে, সকাল থেকে হাঁটা পথশ্রম এক মুহূর্তে ভুলে গেলাম।

বেশ কিছুদূরে এগিয়ে যাই, নতুন এক বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদূর যাবার পর সেই বিস্ময় উন্মোচন হল। দেখতে পাই, পাহাড়ের গা থেকে নদীতীর অবধি ঢালু গায়ে হলুদ রঙের ফুলের ঢল। দূর থেকে মনে হচ্ছে আগুনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে। সুধাংশুবাবু সেই ফুলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।

আমি পৌছলাম ফুলের রাজ্যে। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। এতো ফুল। সতেজ হলুদ

রঙের ফুল সকালের হাওয়ায় দুলছে। পথের পাশে পাহাড়ের গা থেকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি নদীতীর পর্যন্ত ফুলে ফুলে ঢাকা পাহাড়ের এই অংশটুকু। অথচ কিছু পরেই আবার নিরেট পাথর বার করা পাহাড়, পথও নুড়ি পাথরে ভর্তি।

দিলীপ গৌরাঙ্গ পরেশবাবু প্রেমেন্দুবাবু সবাই এসে পড়ে । কফি ঢালা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই ফুলের বনে।

সুধাংশুবাবু বলেন—এবার হাঁটা যাক, সামনে কোলাহাইয়ের বরফ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ওর কাছে পৌছতে এখনো অনেকটা পথ বাকি। এবার বড় বড় পাথরের টুকরোর ওপর দিয়ে হাঁটা। অনেক সময় নেবে এগিয়ে যেতে।

ঘড়িতে সময় দেখা হয়। বেলা নটা বেজে গেছে, দুঘণ্টার বেশী হাঁটা হয়েছে। অর্থাৎ ছমাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখনো দুমাইল পথ হাঁটতে হবে।

এগিয়ে চলি সবাই। সুধাংশুবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান। আমরা ওঁর নাগাল কিছুক্ষণ পরেই হারিয়ে ফেলি। আমিও এগিয়ে যাই। পেছনে গৌরাঙ্গ দিলীপ পরেশবাবু ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ চলার পর সরু পায়ে চলার পথ শেষ হয়। সামনে বড় বড় পাথরের চাঁই অসংলগ্নভাবে ছড়ানো। এবার ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। লাঠিতে ভর দিয়ে কখনো লাফিয়ে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে পা রেখে এগিয়ে চলি।

মনে পড়ে গঙ্গার উৎসমুখ গোমুখের পথেও এইভাবে পাথরে পা রেখে চলতে হয়েছিল। নদীর উৎসমুখ যেখানে, সেখানে পাহাড় প্রায়ই ভাঙ্গে। কখন স্নাউট অর্থাৎ উৎসমুখ হিমগহ্বর জায়গা বদল করে। কখন উৎসের পাশের পাহাড়ে এ্যাভালান্স (তুষার ধস) নামে। তাই বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে থাকে উৎসমুখের কাছাকাছি। এবং একই জায়গায় ক্রমাগত পাহাড় ভেঙ্গে পাথরে পাথরে ধাক্কায় সৃষ্টি হয় টুকরো পাথরের। তাই পাথর ছড়িয়ে থাকে সারা-জায়গা জুড়ে। কোন বাঁধাধরা পথ নেই উৎসমুখে পৌছতে পাথরের জটলায় পথ খুঁজে এগোতে হয়।

সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। পাথর থেকে পাথরে ওঠানামা করছি। পরিশ্রম হচ্ছে শরীরে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে যাই। শীতল হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। চেয়ে থাকি কাছেই কোলাহাইয়ের উন্নত হিমশীতল শিখর রোদে ঝক্‌ঝক্ করছে। পাশে লীডারের স্বচ্ছ বরফগলা জল তীব্রস্রোতে ছুটে চলেছে। নির্মেঘ নীল আকাশ মাথার ওপর।

পেছনে তাকাই গৌরাঙ্গ দিলীপ এগিয়ে এসেছে। পরেশবাবু প্রেমেন্দুবাবুর দেখা নেই। কত পেছনে কে জানে? এগিয়ে যাই। পাথরের জটলায় পথ করে এসে পৌছই নদীর বাঁকে। সেখানে প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রী বসে আছেন একটা বড় পাথরে ভর দিয়ে। সুধাংশুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের আসার পথ চেয়ে।

প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি—ঘোড়া কোথায়? উনি বলেন—ঘোড়াওলা বলছে আর এগোতে পারবে না সামনে পাথরের স্তূপ আরো বেশী। তাই ঘোড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি একসঙ্গে হেঁটে এগোব।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, একপাশে নদী চওড়া খাতে ছুটে চলেছে। আর একপাশে পাহাড়ের কোলে অনেকটা জায়গা ভগ্ন পাথর স্তূপে পরিপূর্ণ। আমাদের ওরই মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে।

সুধাংশুবাবু বলেন—এই পাথরের জটলায় পথ খুঁজে নিজেদের এগোনর চেয়ে কোন গুজরকে পাওয়া গেলে ভাল হত। ওরা ও পথ চেনে। অল্প সময়ে গ্লেসিয়ারের কাছে পৌঁছে দিত। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এখনো সবাই পৌঁছল না যে!

গৌরাঙ্গ দিলীপ এসে যায়। কিন্তু প্রেমেন্দুবাবু পরেশবাবুর দেখা নেই। প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রী বলেন—ওঁর কাঁধের ব্যাগে ভারি ক্যামেরা আছে, হাতে লাঠি নেই পথ চলতে তাই দেরী হচ্ছে। সুধাংশুবাবু বলেন আমি এগিয়ে দেখি ওদের কি হল আপনারা ততক্ষণ এখানে বসে বিশ্রাম নিন, এসে সবাই একসঙ্গে এগোব।

অনেক্ষণ পর সুধাংশুবাবু ফিরে আসেন। একহাতে প্রেমেন্দুবাবুকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসছেন। প্রেমেন্দুবাবুর ক্যামেরা সুধাংশুবাবুর কাঁধে। পাশে পরেশবাবুও আছেন।

ওরা কাছে এসে পৌঁছয়। সুধাংশুবাবু বলেন—না এগোলে এদের দুজনের এখানে পৌঁছতে অনেক বেলা হয়ে যেত। প্রেমেন্দুবাবু তো একেবারে হাঁটতেই পারছেন না পাথরে পা রেখে। তাতে কাঁধে ভারি ক্যামেরা হাতে লাঠি নেই। ওঁর পক্ষে পথচলা আরো মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

পরেশবাবু বলেন—সুধাংশুবাবু না এগোলে আমার পক্ষে প্রেমেন্দুবাবুকে নিয়ে আসা খুব মুস্কিল হত। আশ্চর্য লাগে উনি ভারি ক্যামেরা নিজের কাঁধে নিয়ে তারপর প্রেমেন্দুবাবুকে যে ভাবে টানতে টানতে এই পাথরের রাজ্যে হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন., মনে হয় এই পথে উনি অনেকদিন যাতায়াত করেছেন।

সুধাংশুবাবু থামিয়ে দেন পরেশবাবুর কথা। বলেন—কথাবার্তা বলার সময় অনেক পাবেন, এখন চলুন তো পথ খুঁজে গ্লেসিয়ারে পৌঁছন যাক। জানবেন এই সুন্দর আবহাওয়ার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়।

ওঁর কথায় সবার হুঁশ হয়। উঠে পড়ি সবাই। এগিয়ে চলি সবাই পাথরে পাথরে পা ফেলে। ওরি মাঝে পাথরশূন্য জায়গায় গুজরদের ডেরা পড়ছে। একটি ডেরায় দেখা গেল বার্চ্চগাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া ঘরের পাশে। ঘরটাও পুরো পাথরের নয়, ডালপালা দিয়ে আচ্ছাদন করা। মনে হয় পল্লী বাংলার শান্ত কুটীর। কাঁটাগাছের ঝাড় দিয়ে ঘেরা আঙিনা। দেখা গেল আমাদের ঘোড়াওলা সেই বেড়ার পাশে শুয়ে আছে শরীরে রোদ লাগিয়ে। আমাদের দেখে উঠে বসলো, বলল—ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছি ঘাস খুঁজে খেতে। আপনারা দেরী করবেন না ঘুরে আসতে, দুপুর হয়ে গেলে বৃষ্টি নামতে পারে।

সুধাংশুবাবু ওকে জিজ্ঞেস করেন—তোমার জানা নেই গ্লেসিয়ারে পৌঁছনর পথ! সে বলে—না বাবু, আমরা এই অবধি আসি ঘোড়া নিয়ে, এই ডেরায় বসে চা দুধ খাই। বাবুরা ফিরে এল আবার রওনা হই।

নিজেরাই পথ খুঁজে এগিয়ে চলি। বেশি দূর এগোতে পারা যাচ্ছে না। চারিদিকে অসংখ্য ছোট বড় শিলাখণ্ডে পরিপূর্ণ জায়গাটি। আমার নজরে পড়ে দূরে পাহাড়ের পায়ে চলার পথের রেখা। আমি পাথর ডিঙিয়ে ওই পথের দিকে এগোই। এমন সময় সুধাংশুবাবুর চিৎকার শুনি। উনি আমায় হাত নেড়ে ডাকছেন। কাছে গিয়ে দেখি, উনি একজন বৃদ্ধ গুজরকে জোগাড় করেছেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। চেহারা ও পোষাকে খুবই দরিদ্র, মুখে—বলিরেখার সুস্পষ্ট ছাপ। এই প্রথম একজন অভাবগ্রস্ত রোগজীর্ণ চেহারার গুজরকে দেখলাম।

সুধাংশুবাবু বলেন—এতো বলছে আমাদের এই পাথরের জটলা থেকে পথ দেখিয়ে গ্লেসিয়ারের কাছে পৌঁছে দেবে। লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে সেলাম জানায়। বলে—বাবু এই পাহাড়ে কোন পথ নেই, চলুন আমি আধঘণ্টার মধ্যে আপনাদের গ্লেসিয়ারে পৌঁছে দেবো।

সবাই ওকে অনুসরণ করি। ও আমাদের নিয়ে পাথরের জটলা থেকে সরিয়ে একবারে নদীর ধারে নিয়ে এলো। এখানে অপেক্ষাকৃত কম পাথর। একটু বাঁধের মত মনে হল নদীর ধার। দেখা গেল নদীর ধার বরাবর ছোট ছোট পাথরের স্তূপ সাজানো। বৃদ্ধ গুজরটি ওই স্তূপের পাশ দিয়ে আমাদের নিয়ে হাঁটিয়ে চললো।

গুজরটি হাঁটতে হাঁটতে ওই ছোট পাথর স্তূপের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—বাবুসাব ওগুলো কি জানেন? বলে নিজেই উত্তর দেয়, একমাস আগে একটি পার্টি এসেছিল কোলাহাই পীকে উঠতে । তারা এই পথে গিয়েছিল, চিহ্ন হিসেবে এইভাবে পাথর সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল ফেরবার সময় যাতে অসুবিধে না হয়। আর মালপত্র নিয়ে কুলীরা যাতে এগোতে পারে পথ চিনে।

আমরা এবার পথের সাজানো চিহ্ন পথে স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটতে লাগলাম। পাশে বরফগলা জলের কলতান কানে আসছে। সামনে কোলাহাইর বরফচূড়া আরো কাছে এগিয়ে আসছে। ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা বরফচূড়োয় এক স্নিগ্ধ দ্যুতি ছড়িয়ে আছে।

পৌঁছে যাই তেরো হাজার ফিট উঁচু লীডার নদীর উৎসমুখে। এখানেও স্তূপীকৃত পাথরে বাঁধের মতো হয়ে আছে এক জায়গায়, সেখানে সবাই এসে দাঁড়াই। সামনে দুটো পাহাড়ের খাঁজে কোলাহাইর জমাট হিমবাহ। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক বরফ, চূড়া থেকে নেমে এসেছে দুদিক চওড়া খাঁজে। সূর্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে উপরের দিকের বরফ। নিচের দিকে রোদ পড়েনি মনে হয় নিরেট শ্বেতপাথর জমা হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি সবাই, হিমবাহর ভিতরকার চাপ সৃষ্টিতে বরফ থেকে উৎসধারা বেরিয়ে আসছে। ছুটে চলেছে সেই উৎসধারা প্রবলবেগে নীচের দিকে।

বসে পড়ি সবাই পাথরে ভর দিয়ে। প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রী খাবার বার করেন ঝোলা থেকে। পরোটার সঙ্গে মিষ্টি জেলী। সবাই বলে উঠি—সুধাংশুবাবু আপনার খাবার বার করুন?

উনি নিজের ঝোলা থেকে বার করেন একবাক্স মিষ্টি। উৎকৃষ্ট ক্ষীরের কালাকাঁদ।

পরোটা জেলী খাবার পর ওই মিষ্টি খেয়ে জল খেতে ভারি ভালো লাগে। সবাই মিলে ওঁকে ধন্যবাদ দিই। সবচেয়ে খুশী হয়েছে বৃদ্ধ গুজরটি সবকিছু খেতে পেয়ে শেষে একটি সিগারেট যখন সুধাংশুবাবু বার করে ওর হাতে দেন, তখন ওর মুখখানা ছবি তুলে রাখার মতন। কি আনন্দ কি প্রশান্ত হাসি ওর চোখে-মুখে।

বেশ লাগছে পাথরে ভর দিয়ে বসে থাকতে। সুধাংশুবাবু একটি পাথরে হেলান দিয়েছেন মনে হয় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, উনি পাইপ ধরিয়েছেন। গৌরাঙ্গ পরেশবাবু ছবি তুলতে ব্যস্ত। দিলীপ প্রেমেন্দুবাবু ওঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে বসে আছেন পাথরে।

চেয়ে আছি সবাই সামনে তুষার হিমবাহ, পাশে আকাশ উঁচু শৈল শিখরের দিকে। গুজরটি বলে—বাবু ওই পাহাড়ের চূড়ো দেখছেন, ওখানে বরফ নেই কিন্তু ওইটে কোলাহাই পীক। ওর চূড়োয় একটি দল এসেছিল উঠতে। এই গ্লেসিয়ারের চূড়ো ওর চেয়ে উঁচুতে কম।

মনে হয় ম্যাপেও তাই আছে। গ্লেসিয়ারের পাশেই সতেরো হাজার ফিট উঁচু এক শিখর আছে তবে বরফ নেই চূড়োয়—এ এক বিস্ময়।

অনেক জল বহে গেল হিমবাহ উৎসমুখ থেকে। রোদ এসে পড়েছে আমাদের গায়ে। রোদে এখন আরো ঝক্ ঝক্ করছে হিমবাহ। আমরা সবাই নিশ্চল হয়ে বসে আছি হিমালয়ের এই অপার রূপ-সৌন্দর্যের সামনে।

গুজরটি বলে—এবার সব উঠুন। বেলা হয়ে আসছে এখনই বৃষ্টি নামবে। সুধাংশুবাবু উঠে পড়েন ওর কথায়। উনিও বলেন—উঠুন সবাই আর দেরী করলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে, এতো যখন উজ্জ্বল রোদ তখন নিশ্চয় এর উল্টোদিক আছে। একটু পরেই মেঘ হয়ে বৃষ্টি নামবে।

সবাই উঠে পড়ি। গৌরাঙ্গরা ছবি তোলা শেষ করে পাশে এসে দাঁড়ালো। যাবার আগে সবাই দেখে নিই, কোলাহাই হিমবাহ তার শুভ্রকান্ত রূপ রোদে রজতদীপ্তিতে ঠিকরে উঠছে। ওই জমাট হিম অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসছে নির্মল জলধারা, দুচোখ ভরে দেখে নিই হিমালয়ের গভীর গোপনে এই রূপময় সৌন্দর্য।

হাঁটছি সবাই বৃদ্ধ গুজরকে সামনে রেখে। বেড়াঘেরা সেই গুজরটির ডেরার কাছে যখন এসেছি, তখন বাঁদিকে নদীতে নজর পড়ে সকলের। নদীর হাঁটুজলে দুজন লোক নদী পার হয়ে এদিকে আসছে। আর একটু কাছে আসতে দেখি—একজন তরুণবাবুর বন্ধু দীপকবাবু আর একজন স্থানীয় গুজর।

ওরা দুজনে কাছে এলো। দীপকবাবু বলেন—এই লোকটিকে নিয়ে ওপারে পাহাড়ের চূড়োর কাছ বরাবর একটা লেক দেখতে গিয়েছিলাম। ছোট লেক, জলে বরফ ভাসছে, ওখান থেকে আপনাদের দেখতে পাই। গ্লেসিয়ারের নীচে আপনারা বসেছিলেন।

জিজ্ঞেস করি তরুণবাবু গেলেন না? উনি বলেন—না ওর শরীর ভালো নয়। ওই গুজরদের ডেরায় বসে আছে।

সেই বেড়াঘেরা ডেরায় গিয়ে দেখি তরুণবাবু লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। পাশে গুজরদের দেয়া পেতলের গেলাসে চা, গল্প করছেন গুজরপুরুষদের সঙ্গে। আমাদের দেখে উঠে বসেন, হেসে বলেন—কি সব ঘুরে এলেন গ্লেসিয়ার? আমার আর দেখা হল না। এখান অবধি ঘোড়ায় এসে আর হেঁটে অতদূর যেতে পারলাম না।

দীপকবাবু বলেন—কেন তুই এখনই চল না। আমি উঁচু পাহাড় থেকে গ্লেসিয়ার দেখেছি, কাছে গিয়ে একবার দেখে আসি।

কথাবার্তা হচ্ছে এই ফাঁকে রোদ মিলিয়ে যায়। কুয়াশার পাতলা আবরণ ধীরে ধীরে পাশের পাহাড়কে ঢেলে ফেলছে। ওদের ঘোড়াওলা বলে—আর দেরী করবেন না বাবু। বৃষ্টি নামলে ভিজে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

তরুণবাবু উঠে পড়েন। বলেন—দীপক তুই তো দেখেছিস—ব্যাস তাহলেই হবে, আমি ই পথে আসতে যা সৌন্দর্য দেখলাম তাই কি কম!

ওরা দুজনে ঘোড়ায় চেপে বসে। প্রেমেন্দুবাবুর স্ত্রীও ঘোড়ায় ওঠেন। তিনটি ঘোড়া আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে। আমরাও পিছনে হাঁটতে শুরু করি।

*লেখকের 'কোলাহাই' ও 'অমরনাথ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
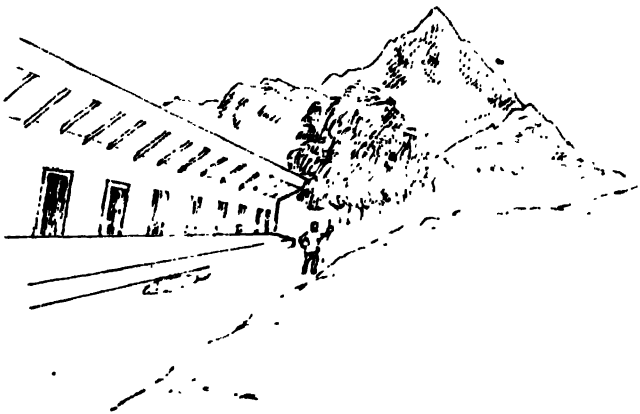
নীলকণ্ঠ অভিযানে (২১,৬৪০')

সুনীল চৌধুরী

নারায়ণ পর্বতের কোলে লক্ষ্মীবন। ভূর্জ আর জুনিপার ঝোপের সবুজ সমতল। লক্ষ্মীবন নামেই। বনের কোনো দেখা নেই। মাঝে মধ্যে দু-একটি ভূর্জ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তবে জুনিপার ঝোপ—যার উচ্চতা বড় জোর দু আড়াই ফুট—লক্ষ্মীবনকে সবুজ করে রেখেছে। এই অর্থে বন বললে কিছু বলার নেই। হয়ত অনাদি কাল আগে সত্যি এখানে ভূর্জ গাছের গভীর অরণ্য ছিল। আর সেই অরণ্যে দেবী লক্ষ্মী বসবাস করে গেছেন। তাই জায়গাটির নাম হয়েছে লক্ষ্মীবন।

বদরীনারায়ণের পাণ্ডা পূজারীরা পুরাণের বহু গল্প করেন। গল্প বদরীক্ষেত্র আর কৈলাস ক্ষেত্র নিয়ে। নারায়ণ আর মহেশ সেই সব গল্পের নায়ক। বদরীক্ষেত্র আগে কৈলাসক্ষেত্র ছিল। মহেশকে তাড়িয়ে নারায়ণ দখল করেন বদরীক্ষেত্র। সেই পাণ্ডাদের কথায় পুরাণের মতে—সৃষ্টির কোন্ এক আদি কালে বদরীনারায়ণের খোঁজে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী এসেছিলেন এ পথে। নারায়ণ তখন মহাদেবের সাধের কৈলাসক্ষেত্র বেদখল করার মতলবে অপেক্ষা করে আছেন এ অঞ্চলেই। সুদীর্ঘ তপশ্চর্যায় নারায়ণের দেহ তখন স্থবির। বাহ্যজ্ঞান নেই। দেবী লক্ষ্মী নারায়ণের খোঁজে এসে ক্লান্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। তাই এই সমতল লক্ষ্মীবন নামে প্রসিদ্ধ। যাই হোক্, অনেক খোঁজার পর নারায়ণের দর্শন পান লক্ষ্মী। নারায়ণকে তুষার আর রোদ থেকে আড়াল করার জন্য দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং বদরী অর্থাৎ কুলগাছের রূপ নিয়ে ছায়া দান করেছিলেন। তারপর নারায়ণ পর্বতের ওপারে অলকানন্দা নদীর তীরে সৃষ্ট হল বদরীক্ষেত্র নারায়ণের আবাস।

সেই পৌরাণিক লক্ষ্মীবনে আমি কাঁপছি থরথর করে! চোখের সামনে দেখছি নীলকণ্ঠের প্রলয় নাচন। অতবড় পর্বতটা চুরচুর হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে নিচে—সতোপন্থ হিমবাহে। নারায়ণের বিশাল দেহে জেগেছে কম্পন—নারায়ণও ভেঙ্গে পড়ছে। বড় বড় পাথর ছিটকে আসছে আমার দিকে। দৌড় শুরু করলাম। পাথরগুলোও ছুটছে আমার সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে আছাড় খেলাম। পাথরগুলো আমার চারপাশ দিয়ে বুলেটের মতো ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা পাথর আমার পায়ে লাগতে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আর অমনি ঘুম ভেঙে গেল আচমকা।

—সাব, ওঠো! পাথর পড়ছে।

শিব সিংয়ের উৎকণ্ঠিত ডাকে স্লিপিং ব্যাগশুদ্ধ ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তাঁবুর জিপ খোলা। হামা দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে গিয়ে আছাড় খেলাম। বালিশের খোলের মতো স্লিপিং ব্যাগে আমার পা থেকে মুখ পর্যন্ত আবদ্ধ। শিব সিং ত্বরিৎ হাতে স্লিপিং ব্যাগের জিপ টেনে খুলে দিতেই মুক্তি। উঠে দাঁড়ালাম।

নিকষকালো অন্ধকার। আকাশের হালকা আলো লক্ষ্মীবনের ঘন অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি।

সামনেই কিছু একটা ঘটছে। দুড়দাড় আওয়াজ হচ্ছে। পাথর ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ছে। কোথা থেকে যে পাথর পড়ছে দেখতে পাচ্ছি না!

আমি কি এখনো স্বপ্ন দেখছি?

কোথায় নীলকণ্ঠ! কোথায় নারায়ণ পর্বত। এই লক্ষ্মীবন থেকে ওদের কাউকেই দেখা যায় না। নারায়ণ পর্বতের আকাশছোঁয়া সুদীর্ঘ গিরিশিরায় ঢাকা পড়েছে নারায়ণ আর নীলকণ্ঠ পর্বত।

চোখ কচলে তাকালাম সামনের দিকে। একরাশ কালো অন্ধকার আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করল। একটানা আওয়াজের ড্রাম বাজছে চারদিকে।

—সাব, ওদিকের পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ো। পাথরগুলো এদিকেই আসছে। একটা তাঁবু জখম হয়েছে।

শিব সিংয়ের কথায় আমার সম্বিত ফিরল। অন্ধকারেই স্পষ্ট দেখলাম, আমার তাঁবুর একদিক ঝুলে পড়েছে। পায়েও সামান্য ব্যথা অনুভব করলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় তা হলে সত্যিই একটা পাথর আমার পায়ে এসে পড়েছে। ফলে তাঁবু ভেঙ্গেছে আর সেইসঙ্গে ঘুমটাও।

হঠাৎ আমার সহযাত্রী সুভাষ বিশ্বাসের কথা মনে পড়ল। গত দু'তিন দিন আমরা তিনটি প্রাণী পড়ে আছি নির্জন লক্ষ্মীবনের মূল শিবিরে। তিনজনে তিনটি তাঁবুতে থাকি। সুভাষ, আমি আর শিব সিং। আমাদের তিনটি তাঁবুর মাঝখানে মেসটেন্ট। ওখানে অভিযানের সব মালপত্র ডাঁই করে রাখা আছে। যেদিকে পাথর পড়ছে, সেদিকেই সুভাষের তাঁবু। সুভাষ কোথায়? ওর গলা তো শুনতে পাচ্ছি না। তবে কি সুভাষ...না, আর ভাবতে পারছি না!

শিব সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, সুভাষ সাহাব কাঁহা হ্যায়?

—সাব পাথর কা উস্‌পার হ্যায়। আপ চলিয়ে জলদি।

শিব সিং আমার হাত ধরে অন্ধকারে টানতে টানতে নিয়ে এলো বড়সড় একটা পাথরের আড়ালে।

—চোট লাগেনি তো?

সুভাষের প্রশ্নে আশ্বস্ত হলাম। পাথরের আড়ালে একটা কম্বল-মুড়ি দিয়ে বসে আছে সুভাষ।

—না তেমন কিছু নয়। আমার তাঁবুটা ভেঙ্গেছে। তোমার?

—আমি পাথর পড়ার আওয়াজ শুনেই বেরিয়ে এসেছি তাঁবু থেকে। আমারটা তো একেবারে নারায়ণ পর্বতের রিফিউজ গালির মুখে। সুজিতকে বলেছিলাম এখানে ক্যাম্প না করার জন্যে। গালি দিয়ে যখন তখন পাথর গড়াতে পারে। তা আমার কথা কানেই নিল না।

পর্বতের উপরাঞ্চলের তুষার, বরফ, পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক নানা কারণে নেমে আসে নিচের দিকে। এই নামার কাজটি হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। ফলে পাহাড়ের গায়ে গলি-পথ তৈরি হয়ে যায়। এবং সেখান থেকে পর্বতের যাবতীয় তুষার, বরফ, পাথর গড়িয়ে আসে। পাহাড়-পর্বতের এই গলিপথ ধরে পর্বত শিখরে আরোহণ করেন অনেকে। অবশ্য আরোহণ করার পূর্বে ভালভাবে পথের বর্তমান অবস্থা দেখে নেওয়া হয়। যদি এই গলি বা গালি-পথে পাথর না গড়ায় তবেই আরোহণ করা হয়।

খুব বেঁচে গেছ!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম সুভাষকে।

এবারের অভিযানটাই অদ্ভুত। নীলকণ্ঠের মতো কঠিন আর কঠোর পর্বতে এমন অগোছালোভাবে আসার কল্পনা আমরা ছাড়া আর কেউ কখনো করেছে বলে শুনিনি। সদস্যদের মধ্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে মাত্র দুজনের। অর্থাৎ হিমালয়ের কঠিন চেহারা আমাদের আটজনের মধ্যে মাত্র দুজন দেখেছে। বাকি ছজনই প্রায় আনকোরা। অভিযাত্রীদলে ডাক্তার সদস্য নেই—নেই প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিংবা পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম্। মান্ধাতার আমলের বৃটিশ পর্বত-অভিযাত্রীদের ব্যবহৃত কিছু নড়বড়ে তাঁবু, দড়ি, স্লিপিং ব্যাগ আর আইস অ্যাক্স সম্বল করে নীলকণ্ঠের মতো দুরন্ত পর্বতে এসেছি একবুক স্বপ্ন নিয়ে—নীলকণ্ঠ আমাদের করুণা করবেন, আমাদের অনুমতি দেবেন তাঁর শুভ্র শীর্ষে আরোহণের সুদূর প্রত্যাশাকে।

কলকাতায় বসে পাহাড়-চড়ার স্বপ্ন দেখা যায়। কনট্যুর ম্যাপে চোখ বোলালে মনে হয় এইতো, আরোহণ আর তেমন কঠিন কই? কিন্তু পাহাড়ে এসে যখন ম্যাপের দেখা পথের দিকে তাকাই, তখন হৃৎকম্প হয়। কলমের এক আঁচড়ে যা আঁকা যায় তা একলাফে পার হওয়া যায় না।

নীলকণ্ঠ নামটি যেমন মিষ্টি, পর্বতটি তেমন সুখকর নয়। নীলকণ্ঠ মহাদেবের মতোই নীলকণ্ঠ পর্বতের বুকে জমে আছে হলাহল। মাঝে মাঝেই তাই নীলকণ্ঠ সারা হিমালয় জাগিয়ে হিমানী-সম্প্রপাত ঘটায়। হিমানী-সম্প্রপাত অর্থাৎ অ্যাভালান্স। হাজার হাজার টন বরফ কঠিন পর্বতের মাথা থেকে বুক থেকে খসে নেমে আসে নিচে প্রচণ্ড গতিতে আকাশ কাঁপিয়ে। সেই তুষার স্তূপের মুখে পড়লে মানুষ তো কোন ছার, বড় বড় পাথরও দেশলায়ের খোলের মতো ভেসে যায়। এটাই নীলকণ্ঠের হলাহল।

সব জেনেশুনেই এসেছি।

নীলকণ্ঠ বহুকাল কাউকেই তার শুভ্রঅঙ্গনে প্রবেশ করতে দেয়নি। স্মাইথের মতো জগৎ-বিখ্যাত পর্বতারোহীকেও ফিরিয়ে দিয়েছে। এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহী বিখ্যাত পর্বতারোহী হিলারীও ফিরে গেছেন নীলকণ্ঠে পরাজিত হয়ে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা হয় না। তবু আমরা এসেছি নীলকণ্ঠের কঠিন কঠোর রূপের আকর্ষণে। সামর্থ্য আমাদের সীমিত, কিন্তু মনোবল হিমালয়-প্রমাণ।

নিজেদের কথা ভাবতে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে কলকাতার কথা। অভিযানে আসার আগে সংগঠন পর্যায়ে অর্থ-সাজসরঞ্জামের জন্য দলনেতা সুজিত বসুর

বিনিদ্র রাত্রি যাপন। অসংখ্য চিঠির তর্জমা আর টাইপ করেছি নেতার সঙ্গে রাতের পর রাত। ছুটেছি কলকাতার সর্বত্র। কখনো অর্থের জন্য, কখনো সাজসরঞ্জামের জন্য। কিছু পাওয়া গেল আবার অনেক কিছু মিলল না। পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব করতে বসে দলের টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসর রবি ড্যাং মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, এ-ভাবে নীলকণ্ঠের মতো টাফ্ চড়তে যাওয়া বোকামী। কিন্তু তখন আর কে শুনছে বিশেষজ্ঞের কথা। হিমালয় ডাক দিয়েছে। নীলকণ্ঠের ডাকে আমরা সব ভুলেছি। যাত্রার আয়োজন যদিও বা হল—দল হয়ে গেল ছোট আর দুর্বল। কয়েকজন ভাল পর্বতারোহীর অংশ গ্রহণের কথা ছিল। শেষ সময় তারা গেল পিছিয়ে। সুজিত কিন্তু একরোখা। ডাক্তার না মেলায় দলের অনেকেই চিন্তিত—চিন্তিত বন্ধুবান্ধব মহলও। তবু মনের জোরের কাছে সব ভাবনা, সব বাধা দূর হয়ে গেল।

আমরা কলকাতা থেকে যাত্রা করলাম ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ দুন এক্সপ্রেসে।

দুদিন দুরাত ট্রেনে কাটিয়ে হরিদ্বার। তার পর হৃষিকেশ। সেখান থেকে বাসে যোশীমঠ। যোশীমঠে একটা একটা করে মোট ছ-দিন বসে থাকতে হল মালবাহক আর ঘোড়ার অভাবে। দিল্লীর এক মহিলা অভিযাত্রীদল যাচ্ছিলেন মৃগথুনী (২২,৪৯০ ফুট) পর্বত আরোহণে। দলের নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী জয়েস ডানসেথ। ওঁরা আমাদের আগে এসে আশপাশের যত নেপালী আর গাড়োয়ালী মালবাহক ছিল প্রায় সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন। যা দু-চারজন মালবাহক পড়ে আছে যোশীমঠে তারা একেবারেই অকেজো। না আছে ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা, না আছে সাহস। ফলে ঘোড়া আর খচ্চর জোগাড় করার ধান্দায় রইলাম আমরা। পরে শুনেছি, শ্রীমতী ডানসেথের মহিলা পর্বতারোহী দল অক্টোবরের দশ এবং বারো তারিখে মৃগথুনী পর্বত আরোহণ করে।

এ কদিন আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ। এর আগে যোশীমঠে এমন একটানা বৃষ্টি আর দেখিনি কখনো। শেষে সেপ্টেম্বরের ছাব্বিশে সকালে একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি থামায় ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলে দিয়ে যোশীমঠ থেকে বদরীনারায়ণের পথে যাত্রা করি।

যোশীমঠ থেকে বদরীনারায়ণ প্রায় উনিশ মাইল পথ—পায়ে হাঁটা। অলকানন্দা নদীর ধার দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই। পথের পাশে পাশে চওড়া বাস-পথ তৈরি হচ্ছে। চীন-ভারত সীমান্ত লড়াই-এর পর থেকেই দুর্গম হিমালয়ে মোটর বাস-পথ তৈরির হিড়িক লেগে গেছে। পথে জাংলা চটিতে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন বদরীনারায়ণ (১০,২৫০ ফুট) পৌঁছাই বিকালে। (বর্তমানে বদরীনারায়ণ পর্যন্ত বাস চলাচল করে।)

বদরীনারায়ণ এক বিশাল সমতল উপত্যকায় অবস্থিত। এর এক দিকে নর পর্বত আর একদিকে নারায়ণ পর্বত। উপত্যকার সবুজ অঙ্গন বেয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে অলকানন্দা নদী। নদীর এ-পারে দু'একটা আশ্রম আর রেস্ট হাউস ছাড়া কোনো বসতি নেই। একটা নীল জলের ছোট্ট হ্রদ আছে এখানে। এই হ্রদে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের পর জন্মকুণ্ডলী বিসর্জন দিয়ে যাওয়া নিয়ম। এ-পারে সদ্য নির্মিত বিড়লা বিশ্রামগৃহে উঠেছি আমরা।

অলকানন্দার ওপারে বদরীনারায়ণের বিশাল মন্দির। মন্দিরের আশেপাশে পাণ্ডাদের ঘরবাড়ি আর ধর্মশালা। মন্দিরের নিচে ব্রহ্মকুণ্ড উষ্ণ প্রস্রবণ। কথিত আছে ব্রহ্মা এখানে একটা পাথরে বসে সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তপস্যা কালে তাঁর গায়ের ঘাম থেকে এই গরমজলের কুণ্ডের উৎপত্তি। উষ্ণকুণ্ডে স্নান করে সুদীর্ঘ পথের ক্লান্তি দূর করে তীর্থযাত্রীরা।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ।

বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ আর কুয়াশা জমে থাকায় দূরের পর্বত শৃঙ্গগুলো নজরে পড়ে নি। বদরীনারায়ণ মন্দিরের পিছনেই নীলকণ্ঠ পর্বত মেঘের আড়ালে আবৃত। সন্ধ্যা উৎরে যাওয়ার পর হঠাৎ মেঘ সরে গেল। পূর্ণ চন্দ্রের আলোয় দেখলাম মহামহিম নীলকণ্ঠকে। চাঁদের মিষ্টি আলো মেখে নীলকণ্ঠ আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীলকণ্ঠের মসৃণ দেহ থেকে যেন হিমানী গড়িয়ে পড়ছে। অপূর্ব দৃশ্য। নীলকণ্ঠ আমাদের আহ্বান করছে যেন তার শুভ্র অঙ্গনে আসার জন্য। উত্তেজনা বোধ করলাম।

হায়, তখন কি জানতাম নীলকণ্ঠ মোহজাল বিস্তার করে ডাকছে আমাদের ধ্বংস করার জন্য। নীলকণ্ঠের ভয়ংকর মূর্তি দেখব তা ভাবিনি একবারও।

আঠাশে সেপ্টেম্বর ভোরে উঠে মূল শিবিরে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হলাম। আমাদের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীরা ডঃ সুবোধচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বদরীনারায়ণ থেকে অলকানন্দা নদীর উৎসমুখের পথে যাত্রা করল সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। ওরা বদরীনারায়ণে সপ্তাহখানেক আগেই এসেছে। এবং দুর্যোগের মধ্যে নানা কাজ শেষ করেছে। ডঃ বসুর সঙ্গীদের বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র' ওরা আমাদের অভিযানেরই আর একটি অঙ্গ।

সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে সকাল নটা নাগাদ আমরা মানা গ্রামের পথে যাত্রা শুরু করলাম।

দলে আমাদের অভিযাত্রীর সংখ্যা মোট আটজন। এঁরা হলেন দলনেতা সুজিত বসু, সহনেতা আলোক সেন, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বসু, বুদ্ধদেব মজুমদার, সরোজ পাল, সুভাষ বিশ্বাস এবং লেখক স্বয়ং। সরোজ আর সুভাষ বৈজ্ঞানিক সদস্য। বুদ্ধদেব ফটোগ্রাফার। এ ছাড়াও মোট পাঁচজন শেরপা আনা হয়েছে দার্জিলিং থেকে। এভারেস্ট আরোহী তেনজিং নোরগে শেরপাদের মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। ওরা হল টাইগার আজীবা, টোপগে, শেরিং লাকপা, লাকপা সুংরে ও তাসী।

অলকানন্দার ওপর পুল পার হয়ে আমরা বদরীনারায়ণ মন্দিরের সামনে এসে জমায়েত হলাম। বদরীনারায়ণের কৃপা ছাড়া দেবাদিদেব মহাদেবের করুণা পাওয়া যাবে না। দর্শন করলাম বদরীবিশাল। প্রার্থনা জানালাম, যেন সাফল্য লাভ করতে পারি। সবাই যেন সুস্থ দেহে ফিরে আসতে পারি জয়ের মালা গলায় পরে। মন্দিরের পাশ দিয়ে আলুক্ষেতের ধারে ধারে মেঠো পথ ধরে মানা গ্রামের দিকে চললাম। বদরীনারায়ণ থেকেই প্রকৃত অভিযান শুরু হল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা মানা গ্রামে পৌছে গেলাম।

মানা গ্রাম এ-অঞ্চলের সর্বশেষ ভারতীয় জনপদ। তার পরই গহন দুর্গম হিমালয়।

মানা গ্রামের অনেক মানুষ আমাদের অভিযানে মালবাহকের কাজ করছে। তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘুরলাম। আলুরদম আর চা দিয়ে আপ্যায়ন করল আমাদের। এখানে আলু চাষই প্রধান। দামও খুব কম।

অলকানন্দা নদী এখানেই বাঁক নিয়েছে। গ্রামের নিচে অলকানন্দায় সরস্বতী নদী এসে মিলেছে। সরস্বতী নদীর ওপর পাথরের তৈরি ন্যাচারাল পুল। নাম তার ভীমপুল। কথিত আছে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার সময় মধ্যমপাণ্ডব ভীম বড় বড় পাথর ফেলে পুল তৈরি করে সরস্বতী নদী পার হয়েছিলেন। পাথরের পুলের নিচে সরস্বতী নদীর উত্তাল-উচ্ছল ধারা। মানা পাসের ওপারে তিব্বতে সরস্বতীর জন্ম।

ভীমপুল পার হয়েই বিশাল উপত্যকা। দুপাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। মাঝখানের সবুজ প্রান্তর ভেদ করে বইছে অলকানন্দা নদী। নদীর দু'পারেই পথের সরু রেখা দেখা যাচ্ছে। এ-পারের পথ গেছে বসুধারা জলপ্রপাত পর্যন্ত। তারপর অলকানন্দা নদীর ধার বরাবর এগিয়ে আমাদের বাঁ দিকে যেতে হবে।

নদীর ওপার দিয়েও পথ লক্ষ্মীবন পর্যন্ত রয়েছে। ওপারে মাতা মন্দির দেখা যাচ্ছে। ছোট্ট সাদা মন্দির। মন্দিরটি নর ও নারায়ণের মায়ের। মনের কোনো কামনা করে মাতা মন্দিরের দেওয়ালে ঢিল বেঁধে এলে অথবা পতাকা উড়িয়ে এলে মনের সেই কামনা পূর্ণ হয় বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস। দেশ-বিদেশের বহু নারী-পুরুষ মানসিক করে যায় মাতাদেবীর কাছে।

মাতা মন্দির পর্যন্ত বেশ ভাল পথ আছে। যাত্রার সময় তীর্থযাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে তাই সরকার এ পথটুকু নিজেই দেখাশোনা করেন। মাতা মন্দিরের পর সাধারণ যাত্রীদের দর্শনীয় কিছুই নেই। তাই কোনো পথও নেই। যে পথ আছে তা ভেড়া চরানো রাখাল আর কাঠকুটো ঘাস সংগ্রহকারী মানুষের পায়ে চলার রেখা মাত্র। ওই পথ ধরে আমরাও যেতে পারতাম। এতে পথের দূরত্ব অনেকটা কমত। কিন্তু মালবাহী ঘোড়া ওপথে যেতে পারে না। এ-কারণেই নদীর এ-পার দিয়ে ঘুর পথে মূল শিবিরের দিকে চলেছি।

এতক্ষণ প্রায় সমতল পথে হেঁটে মানা গ্রাম পর্যন্ত এসেছি। ভীমপুল পার হয়েই পথ উঠতে থাকে চড়াই। ধীরে ধীরে অলকানন্দা নদী সরে যায়—নেবে যায় নিচে। আমরা উঠতে থাকি। মানা গ্রামের অনেক মেয়ে-পুরুষ বিদায় জানাবার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল। ভীমপুল পার হবার পর তারা একে একে বিদায় নিয়ে ফিরে গেছে গ্রামে। ওরা আমাদের মালবাহকদের আত্মীয়স্বজন। অভিযানের পথ কঠিন, কাজও খুব বিপদের, তাই আত্মীয়-বন্ধুরা বিদায় জানাতে আসে, প্রার্থনা করে নির্বিঘ্ন যাত্রার।

মালবাহক আর ঘোড়াঅলারা মালপত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে। নেতা সুজিত, আপা আর বুদ্ধদেব শেরপাদের নিয়ে অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। কোথায় আজকের শিবির স্থাপন হবে সে জায়গা দেখতে। ওদের সঙ্গে গেছে মানা গ্রামের প্রধান নেতার সিং।

নেতার সিংয়ের খুব নাম ডাক। স্মাইথের সঙ্গে নীলকণ্ঠ পর্বতে মালবাহকের কাজ করেছে। এ-অঞ্চলের দুর্গম পথঘাট সবই ওর চেনা ; এজন্যই নেতার সিং বৃদ্ধ হলেও সুজিত ওকে পথ প্রদর্শক আর পোর্টার মেট হিসেবে দলে নিয়েছে।

নানা দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে চলেছি। শেষে মালবাহকদের নিয়ে সুভাষ আর আমি চলেছি। সুভাষ স্বল্পভাষী। কিন্তু ওর সাবজেক্ট থাকলে এবং উৎসাহী শ্রোতা পেলে কথার ঝুড়ি উপুড় করে দিতে কার্পণ্য করে না। পথ চলতে চলতে হিমবাহের চরিত্র, নদীর উৎপত্তি এবং পাহাড়-পর্বতের গঠন নিয়ে আলোচনা করছিল। ভূগোলের কৃতি ছাত্র ছিল। এম-এস্‌সি পাশ করে ম্যাপ তৈরি করার এক বিখ্যাত সংগঠনে সংযুক্ত আছে। ডঃ সুবোধচন্দ্র বসুর ছাত্র। এ অভিযানে ওর যোগদান সেই কারণেই। দলের সঙ্গে থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করবে বলে এসেছে অভিযানে।

ভীমপুল থেকে বসুধারা প্রপাতের দূরত্ব মাত্র দু'মাইল। আমরা বসুধারার কাছাকাছি আসতে নিচে সবুজ ঘাসের এক সমতলে দেখলাম ঘোড়াঅলা আর মালবাহকরা জমায়েত হয়েছে।

নিচে নেমে এসে ওদের সঙ্গে মিলিত হলাম। ঘোড়াঅলারা জানাল এখানেই ওরা মালপত্র নামিয়ে ফিরে যাবে। কারণ এর পর ঘোড়ার চলার পথ আর নেই। সুজিত ওদের নির্দেশ দিয়ে গেছে মালপত্র এখানে নামাতে।

সুজিতের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাইনি। বলেওনি কিছু আগে। তাই ঘোড়াঅলাদের আটকে রাখলাম সুজিতের নির্দেশের জন্য। এখানে মালপত্র নামালে লক্ষ্মীবনের মূল শিবিরে তা নিয়ে যাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া হাতে এখনো অনেক সময় আছে। এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

আধঘণ্টা বাদে অলকানন্দা নদীর দিক থেকে একজন শেরপা সুজিতের ছোট্ট একটা চিঠি নিয়ে এলো। চিঠিটা আমাকে লেখা। নির্দেশ আছে এখানেই ডামপিং ক্যাম্প করার। অলকানন্দা নদীর ওপর কাঠের সেতু বানিয়ে ওপারে পারাপারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মালবাহকদের কাছে জানলাম জায়গাটির নাম নাগিন। এখানে মানা গ্রামের মার্চা মেয়েরা শীত পড়ার আগে সূর্যস্নান করতে আসে। হিমালয়ের উঁচু জায়গায় প্রবল শীত। তাই সমতলের মতো এখানকার মানুষ বারোমাস স্নান এবং জামা-কাপড় কাচে না। বছরে একটা সময় বিশেষ করে আশ্বিন-কার্তিক মাসে এরা জামা-কাপড়, ঘরদোর সব সাফ্‌সুফ্‌ করে। বছরে একবারই স্নান করে গায়ে সাবান মেখে। তারপর রোদ পোয়ানোর পালা। মেয়েরা এই নাগিনের সমতলে খোলা গায়ে রোদ পোয়ায়। তারপর শীত আসার মুখে নেমে আসে নিচের কোনো জায়গায়, যেখানে বরফ কম পড়ে।

নাগিনের সবুজ প্রান্তরে বড় বড় মেস টেন্ট খাটান হল। মেস টেন্টে দশজন মালপত্র নিয়ে আরামে শুতে পারে। মেস টেন্ট ছাড়াও গোটাকতক রংবেরঙের হাই অল্টিটিউড তাঁবু লাগান হল। এ-তাঁবুগুলি উঁচু পর্বতে বরফের ওপর দু'জন আরামে থাকতে পারে। তুষারপাত বা ঝড় হলেও তাঁবুর কোনো ক্ষতি হয় না। এ-তাঁবুতে কিন্তু বৃষ্টি হলে জল চুইয়ে পড়ে। একটা কিচেন অর্থাৎ রান্নাঘরও বানানো হল ত্রিপল খাটিয়ে।

নাগিনের ক্যাম্পে থাকলাম মোট তিন দিন। এই তিন দিনে অলকানন্দা নদীর ওপর কাঠের সেতু তৈরি করে মালবাহক দিয়ে সমস্ত মালপত্র লক্ষ্মীবন মূলশিবিরে পাঠান হল।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে ডঃ সুবোধ বসু এবং তার ছাত্রদল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে বদরীনারায়ণের পথে ফিরে গেলেন। ওঁদের প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওই দিন রাত্রে মানা গ্রামের এক মালবাহককে নিয়ে দলের সহনেতা আলোক সেন ও সমর বন্দ্যোপাধ্যায় যোশীমঠ থেকে নাগিন ক্যাম্পে এসে পৌছল। ওরা যোশীমঠে অপেক্ষা করছিল রবি আর বলদেবের জন্য। কলকাতা থেকে ওষুধপত্র, প্রেসার কুকার ইত্যাদি নিয়ে বলদেব আর রবির আসার কথা ছিল। কথা ছিল একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসার। কিন্তু কেউই আসেনি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে। সমর ও আলো অপেক্ষা করে শেষে চলে এসেছে। শেষ দিনে নাগিনে আমরা সবাই সমবেত হয়ে নাগিন ক্যাম্প তুলে নিয়ে লক্ষ্মীবন মূলশিবিরের পথে যাত্রা করলাম সকালে।

বসুধারাকে পিছনে ফেলে সোজা নেমে এলাম অলকানন্দা নদীর ধারে। নদীর তীরে বড় বড় পাথর। পাথরের পর পাথর ডিঙ্গিয়ে এক জায়গায় দেখলাম বড় বড় গাছ ডালপালা আর মাটি ফেলে সাময়িক সেতু তৈরি করেছে আমাদের সদস্য শেরপা আর মালবাহকরা। নামেই সেতু। পা দিলে কাঁপে থর-থর করে। ব্রিজের মাঝ বরাবর এসে দেখলাম ঠেকো দেওয়া গাছ আমার দেহের ভারে ভীষণ ভাবে নিচের দিকে নুয়ে পড়েছে। সেতু থেকে নদীর জলের দূরত্ব প্রায় পনেরো-বিশ ফুট। খাড়াই দুটি বিশাল পাথরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। সুতীব্র গতি অলকানন্দার। একটানা গমগম শব্দ হচ্ছে পাথরের দেওয়ালের ওপর জলস্রোত আছড়ে পড়ার জন্য। এদিকের নদীর গভীরতা কম কিন্তু জলে স্রোত অসম্ভব। আর এ কারণেই পায়ে হেঁটে নদী পার না হয়ে সেতু বানানো হয়েছে। নড়বড়ে এই সেতু ভেঙ্গে ওই জলে পড়লে স্রোতের টানে ভেসে যাব। ওখানে নির্ঘাত মৃত্যু। খুব ভয় হচ্ছে। কিন্তু মনে সাহস আনতে হচ্ছে। ভয় পেলে তো আর এ-নদী পার হতে পারব না। আর তা হলে নীলকণ্ঠ অভিযানের সব স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মনে সাহস এনে ধীরে ধীরে নড়বড়ে সেতুটা পার হয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললাম।

নদীর এ-পারে দাঁড়িয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল বসুধারা প্রপাত। বদরীনারায়ণ থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল পথ। ওপারে বসুধারার নিচে তিন দিন কাটিয়েও বসুধারার এমন চমৎকার দৃশ্য দেখিনি। অন্ততঃ তিন-চারশ' ফুট ওপর থেকে আছড়ে পড়ছে নিচে। অত ওপর থেকে জলধারা আছড়ে পড়ার জন্য নিচে সূক্ষ্ম জলকণা ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছে। এপার থেকেও একটানা ঝর-ঝর শব্দ ভেসে আসছে।

যে পাহাড়ের মাথা থেকে বসুধারা প্রপাত নেমেছে সেই পাহাড়ের শীর্ষে আছে আটটি জলধারা। ধারাগুলির নাম—ধ্রুব, ধার, সোমা, অনিল, অনল, প্রদ্যুৎ, প্রভাস ও প্রত্যুষ। মহর্ষি নারদ বসুধারার নিকটে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন।

একে একে সবাই ভয়াবহ কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে অলকানন্দা নদী পার হয়ে এপারে এসে পৌঁছবার পর আমরা লক্ষ্মীবন মূল-শিবিরের দিকে যাত্রা করলাম।

এ-পারেও পথ বলে কিছু নেই। নারায়ণ পর্বতের ঢালু গা বেয়ে পাথর আর পাহাড়ের ধ্বস পার হয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

শীতকালে নারায়ণ পর্বতের গায়ের জমা বরফ গলে এ পথেই নেমে আসে হিমবাহ আকারে। সারা শীতকালটাই হিমবাহের বরফ জমাট বেঁধে থাকে। গরম পড়লে সেই বরফ গলে জল হয়ে নেমে যায় অলকানন্দায়—ফেলে যায় পাথর আর বালুকারাশি। সেই পাথর আর বালুর পথ বড় পলকা। সামান্য পায়ের চাপ এবং শরীরের ভার সহ্য করতে পারে না। গড়িয়ে আসে সব সুদ্ধ। ফলে বার বার পতনের আশংকা। পড়লে হাত-পা ছড়ে রক্ত ঝরে। আর যদি পাথর-বালু ভারসাম্য হারিয়ে গড়াতে শুরু করে তাহলে অলকানন্দার গভীর খাদে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তেমন কিছু চড়াই-উৎরাই না থাকলেও পথে অজস্র বাধা আছে। আর সে জন্যই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। তাছাড়া সবার পিঠে রুকস্যাক। রুকস্যাকে কম করেও আধমণ মালপত্র বইতে হচ্ছে। মালবাহকরা বইছে প্রায় একমণ মাল।

প্রায় মাইল চারেক পথ অতিক্রম করে লক্ষ্মীবনে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল পাঁচ ঘণ্টা।

লক্ষ্মীবন জায়গাটি বড় সুন্দর। এর উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। চারদিকের বিশাল পর্বতের মধ্যে অলকানন্দা নদীর তীরে এক টুকরো সবুজ ঘাসের গালচে পাতা সমতল। সবুজ ঘাসের ওপর নানা রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। আছে নানা আকারের নানা রঙের পাথর। সরু সরু জলের ধারা সমতলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে অলকানন্দায় পড়ছে। আর আছে ঘন সবুজ মাথা ঝাঁকড়া জুনিপার গাছ—এদেশীয় মানুষ বলে ধূপ গাছ। আগুনে পুড়লে জুনিপার থেকে মিষ্টি ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। পূজা-পার্বণে তাই ওরা জুনিপারের শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে ধূপ হিসেবে ব্যবহার করে। জুনিপার ছাড়াও আছে কিছু ভূর্জবৃক্ষ।

ভূর্জবৃক্ষের ছালে আগের দিনে লেখা হত। প্রাচীন পুঁথি সবই ভূর্জবৃক্ষের ছালে লেখা। গাছের গায়ে পরতের পর পরত ছাল জড়ান থাকে। আমাদের অনেকেই এই ছাল সংগ্রহ করল চিঠি লেখার জন্য।

লক্ষ্মীবনের সবুজ সমতলে একটা মেস তাঁবু ছ'টা হাই অল্টিটিউড তাঁবু লাগানো হয়েছে। বড় একটা পাথরের আড়ালে বানানো হয়েছে কিচেন! অভিযানের খাদ্যদ্রব্য সবই কিচেনে রাখা হয়েছে। সদস্য, শেরপা এবং মালবাহকদের খাবার ওই কিচেনেই তৈরি হয়। বড় তাঁবুতে থাকছে আমাদের মালবাহকেরা এবং ছোট তাঁবুতে দু'জন করে সদস্য। শেরপারাও ছোট তাঁবুতে থাকছে।

লক্ষ্মীবনে পৌঁছেই জানলাম দলনেতা সুজিত সমরকে নিয়ে আজ সকালেই এগিয়ে গেছে অগ্রবর্তী মূল শিবিরের স্থান নির্বাচন করতে। একজন শেরপা আর একজন মালবাহককে রেখে গেছে খাবার তৈরি করার জন্য।

আমরা লক্ষ্মীবনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে লেমন বার্লি ওয়াটার দিয়ে গেল শেরপা তাসি। এবং তার খানিক বাদেই প্লেটে ভরা বিস্কুট আর গরম চা।......

চায়ের কথা মনে পড়তেই কাঁপুনি ধরল। বাস্তবে ফিরে এলাম। অনেকক্ষণ হিমশীতল লক্ষ্মীবনের খোলা আকাশের নিচে সুভাষ আর আমি একটা পাথরের আড়ালে বসে আছি। আশপাশের পাহাড়-পর্বত থেকে তখনো এক নাগাড়ে পাথর পড়ছে। হিমানীসম্প্রপাতের বিকট গুরুগম্ভীর শব্দে মুখরিত হয়ে আছে লক্ষ্মীবনের শান্ত প্রকৃতি। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় শীতের কথা মনে ছিল না। এখন শরীরে কাঁপুনি ধরছে।

—সুভাষ, বড্ড শীত করছে। একটু চা পেলে ভাল হত।

আমার কথায় সুভাষ নড়ে-চড়ে বসে বলল, আমারও কাঁপুনি ধরেছে। শিব সিংটা কোথায় গেল? ওকে বললে একটু চা পাওয়া যেতে পারে।

—রাত আর কত বাকি আছে?

সুভাষ রেডিয়াম ডায়াল লাগানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সাড়ে তিনটে বাজে। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আলো ফুটবে আকাশে।

—কিন্তু এই এক ঘণ্টায় ঠাণ্ডায় যে জমে বরফ হয়ে যাব।

—হাত-পায়ের মুভমেন্ট কর। তাহলে ঠাণ্ডায় জমবে না।

—কিচেন তো এই পাথরের ওপাশে। চলো কিচেনে গিয়ে বসি। এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা।

—পাথর গড়ানো শেষ হয়নি এখনো। যদি কিচেনে পাথর ছুটে আসে?

হাসলাম সুভাষের কথায়। বললাম, কপালে মৃত্যু থাকলে এই পাথরেও ফাটল ধরবে এবং আমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে এ ঠাণ্ডা যে আরো মারাত্মক।

সুভাষও হাসল। বলল, তা ঠিক। পাথর বৃষ্টির হাত থেকে যেভাবে বেঁচেছি তাতে মনে হয় আমাদের মৃত্যু নেই। চলো, কিচেনেই যাই। শিব সিং ওখানে না থাকলে আমরা নিজেরা চা-কফি বানিয়ে নিতে পারব।

সুভাষ আর আমি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। চারদিকে তখনো পাথর বৃষ্টি হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু পাথর গড়ানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দুজনে সন্তর্পণে কিচেনে ঢুকে দেখি শিব সিং জনতা স্টোভে কেতলি বসিয়ে কফি তৈরি করছে।

আধসেরি কলায়ের মগে গরম গরম কফি নিয়ে স্টোভের চারদিকে বসে শরীরের হারিয়ে যাওয়া উত্তাপ ফিরে পেলাম।*

লেখকের 'নীলকণ্ঠের ডাকে' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

কেদারনাথ

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

আশ্চর্য দেশ। প্রত্যুষের আলো পৃথিবীকে স্পর্শ করবার আগেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। যাত্রার জন্যে আমরা যখন তৈরি হয়ে নিলুম, আকাশ তখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। বিগত দিনের কোন ক্লান্তি নেই, নতুন উদ্যমে মন যাত্রার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

স্বাতি বলল : মন্দাকিনীতে স্নান করা কি সত্যিই অসম্ভব?

আমি বললুম : হার্ট ফেল করার সম্ভাবনা আছে।

তবে আমরা গৌরীকুণ্ডেই স্নান করে যাব।

স্বাতির অসুবিধাই যে সব চেয়ে বেশি, তা আমি জানি। তাই প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই বলল : তোমার কোনও ভাবনা নেই।

দেখলুম যে গত রাত্রির স্নান করার কাপড় গামছা তার সঙ্গেই ছিল। নিজে শাড়ি পরে বেরিয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার পোশাক আছে পাট করা। সেই চায়ের দোকানটায় উনুনে জল বসানো আছে, একটু দাঁড়ালেই হয়তো চা পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বাতি বলল : আজ আর ওদিকে তাকিয়ো না।

হালদার মশাই বললেন : ঠিক বলেছ মা, দেহের ক্ষুধা ভুলতে পারলে মন পবিত্র হয়।

গরম জলের কুণ্ডের কাছে পৌঁছে হালদার মশাই বললেন : তুমি আগে স্নান করে এসো, তার পরে আমরা যাব।

স্বাতি তার ব্যাগটি আমার হাতে দিয়ে এগিয়ে গেল। গতকালও আমি তার ব্যাগ এমনি করে সামলে ছিলুম।

হালদার মশাই একবার আকাশের দিকে তাকালেন, আর একবার চারি ধারের ঘর বাড়ির দিকে। পথঘাট নির্জন। যারা জেগেছে, তারা ব্যস্ত আছে নিজ নিজ কাজে। কুণ্ডের চত্বরেও এখন লোকজন নেই। হালদার মশাই এবারে আমার দিকে চেয়ে বললেন : আপনাকে প্রথম দেখেছিলুম রামেশ্বরে, তাই না?

বললুম : না। গোদাবরী স্টেশনে আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছিলেন। তার পরে দেখা হয়েছে রামেশ্বরে।

হালদার মশাই বললেন : রামেশ্বরের কথাটাই মনে আছে। আপনারা দুজনে সারা রাত বাইরে ছিলেন, আর গোঁসাইজীরা ভেবে অস্থির। আর আপনারও বলিহারি সাহস দেখেছিলুম।

তাঁর সেদিনের কথাগুলি আমার মনে আছে। চাপা গলায় বলেছিলেন, বাঘের মুখে যাচ্ছেন অবলীলাক্রমে, প্রাণের মায়া নেই এতটুকু! আমার মনে হয়েছিল যে বাঘের কানেও

বোধ হয় তাঁর সেই গর্জন পৌঁছেছিল। তার পরে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় ছিলেন রাত্তিরে? তাঁর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে নোংরা দাঁতের পাটিও আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আর সেই অভদ্র ইঙ্গিত শুনে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর ঐ খোঁচা দাড়িওলা ফুলো গালে একটা চড় কষে দিই।

সেদিন আরও অনেক ইতর অভদ্র ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ছেলেমানুষি করে নিজের ইহকালটি ঝরঝরে করলেন! অমন পয়সাওয়ালা মামা, কোথায় আখের গুছোবেন, তা নয় সুন্দর মুখ দেখেই সব ভুললেন! পরামর্শ দিয়েছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎটা আগে গুছিয়ে নিন। সঙ্গতি থাকলে মেয়ে অনেক জুটবে বাঙলা দেশে। আমি ঘুমের ভান করলে আরও কদর্য ইঙ্গিত করেছিলেন, সারা রাত্তির রাসলীলা করছেন কেষ্ট ঠাকুর, ঘুমের আর দোষ কী!

স্বাতির মা বাবার ভয়ের কারণ জেনেছিলুম পরে। স্বাতির বাবা বলেছিলেন, ধর্মশালায় কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে দেখলুম। ধর্মের নামে অধর্ম করে হাত পাকিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া মন্ত্রের নামে নিন্দে ছড়ায়, আর ধর্মসভায় পরচর্চা করে। দেশে ফিরে যা দুর্যোগ আসবে, তাই ভেবেই মরে যাচ্ছেন তোমার মামী। এ দেশে মুখরোচক মিথ্যে তো কেউ যাচাই করে দেখে না!

সেই হালদার মশাই আজ আমাদের সঙ্গে কেদারনাথে চলেছেন। আমি এই ভদ্রলোকের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখি নি, কিন্তু স্বাতি তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। কেন দিচ্ছে তা আজও আমাকে বলে নি।

হঠাৎ তার গলা শুনতে পেলুমঃ একি হালদার মশাই! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, স্নান করে আসুন।

তার দিকে ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। স্নান সেরে স্ল্যাক্‌স্ পরেই সে এসেছে। গায়ে সেই উলের কার্ডিগান। তার ভিজে শাড়ি গামছা একজন ঘোড়াওয়ালার হাতে দিয়ে বলল ঃ তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

আর দেরি না করে আমরাও তাড়াতাড়ি স্নান করে এলুম। তার পরে ভিজে কাপড় গামছা ঘোড়াওয়ালার হাতে গছিয়ে 'জয় কেদার' বলে যাত্রা করলুম। একটা দোকানের চাতালে বোঝা নামিয়ে বাহাদুর অপেক্ষা করছিল। সেও উঠে পড়ল।

খানিকটা এগিয়েই গৌরীকুণ্ডের সীমানা শেষ হল। ঘোড়াওয়ালারা বলল ঃ এইবারে ঘোড়ায় উঠুন। এখান থেকে শুধুই চড়াই।

তাদের সাহায্য নিয়েই আমরা ঘোড়ায় উঠলুম। দেখলুম যে এখানে আরও অনেক ঘোড়া আছে। এ পর্যন্ত পথ যারা হেঁটে এসেছে, তাদেরও অনেকেই এখানে ঘোড়া নিচ্ছে। মাঝ পথে রামবাড়ায় ঘোড়া নেবে আরও অনেকে। কাণ্ডি নামে এক রকমের ঝুড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। ঝুড়ির এক ধারটা কাটা। হাল্কা বুড়োবুড়ি বা বাচ্চারা তাতে পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। আর একজন লোক সেই ঝুড়িটি পিঠে নিয়ে চলে। এ পথে কাণ্ডিওয়ালাও অনেক আছে। দুঃসাধ্য চড়াই ভাঙতে তারা সাহায্য করে।

আবার যখন পারে না, তখন পিঠের মানুষকে নামিয়ে দিয়ে একটুখানি হাঁটবার জন্যেও অনুরোধ করে। কিন্তু ডাণ্ডিবাহক চার বা ছ জন। যেমন ওজনের মানুষ, ততগুলি বাহক। কিন্তু চারজনেই বইতে হয়। দুজন পালা করে কাঁধ বদল করে। ডাণ্ডি হল কাঠের ডিঙি নৌকার মতো। এক দিকে হেলান দেবার ব্যবস্থা, অন্য দিকে পা ছড়িয়ে বসার জায়গা। বাহকের কাঁধের বাঁকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলোনো। তারা জোরে জোরে খানিকটা পথ চলে, তার পর ডাণ্ডি পথে নামিয়ে বিশ্রাম করে খানিকক্ষণ। চটি দেখলে চটির সামনে দাঁড়ায়, যাত্রীকে চা দিয়ে নিজেরাও খায়। গৌরীকুণ্ডেও দেখলুম খানকয়েক ডাণ্ডি যাত্রীর অপেক্ষায় আছে।

১১৭৫৩ ফুট উঁচুতে কেদারনাথ। এখানে থেকে শুধুই চড়াই, কিন্তু যাত্রীরা নির্ভয়। অনেকেই পায়ে হেঁটে চলেছে বীরের মতো লাঠি ঠুকে ঠুকে। পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডি দেখলেই উঠে পড়ছে তাই দিয়ে। পথ তাতে সংক্ষেপ হচ্ছে। ন মাইল পথ নাকি সাত মাইল হবে। কিন্তু কষ্ট করতে হবে একটু বেশি।

ঘড়ি দেখে পাহাড়ের সময় চলে না, আলো দেখে সময়ের হিসেব। আকাশ ফর্সা হলেই কাজের শুরু, আর যাত্রার শুরু তারও আগে। রৌদ্র প্রখর হলে পথ চলতে কষ্ট হয়, বেলা বাড়লে ঝড় বাদলের ভয়। কাল গৌরীকুণ্ডে পৌঁছবার আগে একবার জলে ভিজবার ভয় হয়েছিল। আকাশে মেঘ দেখেছিলুম, দু এক ফোঁটা জলও পড়েছিল। আমরা একটা আশ্রয়ের অন্বেষণ করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হয় নি। পথে ভিজতে হয় নি আমাদের। ঘোড়াওয়ালারা বলেছিল, এ কেদারনাথেরই কৃপা।

এখন আমরা পথের উপরে রোদ দেখছি, কোথাও দেখছি অরণ্যের ছায়া। কোথাও বা মন্দাকিনীকে দেখছি ঝর্ণার মতো।

এক সময়ে আমরা রামবাড়া চটি পৌঁছে গেলুম। খুব শীতল স্থান। বুঝতে পারলুম যে চার-মাইল পথ আমরা উপরে উঠে এসেছি। কেদারনাথে রাত্রিবাস করতে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা থাকেন এখানে। ভোর বেলায় বেরিয়ে কেদার দর্শন করে ফিরে আসেন বিকেল বেলায়। বিকেল বেলায় ঝড় বৃষ্টি এখানে লেগেই থাকে। পাহাড়ে তাই সকালে চলাই নিরাপদ।

হালদার মশাইকে আর দেখতে পাচ্ছি না। তিনি পিছিয়ে পড়েছেন, না পাকদণ্ডি দিয়ে আরও উপরে উঠে গেছেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমরা রামবাড়ার চটিতে আর থামলুম না চায়ের তৃষ্ণা এখন আর নেই, এখন শুধু কেদারনাথে পৌঁছবার বাসনা।

খানিকটা এগিয়ে আমি একজন বিশালবপু প্রৌঢ়কে দেখলুম ঘোড়ার পিঠে। খুব ধীরে ধীরে চলেছেন। আমাকে কাছাকাছি পৌঁছতে দেখে ফিরে দেখলেন। এক হাতে লাগাম ধরেছেন, আর হাতে শক্ত করে চেপে আছেন ঘোড়ার জিন। মুখে বললেন ঃ জয় রামজী কি!

আমি বললুম ঃ জয় কেদার!

চলতে চলতে পরিচয় হল। উত্তরপ্রদেশের বিজনোরে তাঁর ভুরার ব্যবসা। ভুরা মানে

দেশী চিনি বা গুড়ের চিনি। কেদারনাথ দর্শনে একা চলেছেন। আরও খানিকটা এগিয়ে আর একজন যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর গায়ে খদ্দরের কোট, সাদা ধবধব করছে, তিনিও ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। গুজরাতের ধনী ব্যবসায়ী তিনি, লোহার কারখানা আছে বম্বের নিকটে। সঙ্গে তাঁর পরিবার আছে। পিছনে আটখানা ডাণ্ডিতে তাঁরা আসছেন।

সহসা সামনের দিক থেকেও যাত্রীদের নেমে আসতে দেখলুম। খানিকটা শুকনো চেহারা, কিন্তু মুখে অদ্ভুত প্রসন্নতা। আমাদের উদ্যম দেখে তাঁরা উৎসাহ দিলেন, জয় কেদার!

আমাদের গলা খানিকটা শুকিয়ে উঠেছে। তবু উত্তর দিলুমঃ জয় কেদার!

একজন মহিলাকে স্বাতি জিজ্ঞাসা করলঃ কেমন দেখলেন?

মহিলা তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেনঃ চমৎকার।

সত্যিই চমৎকার এই যাত্রার পথ। কোথাও বরফের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি একটা ঝর্ণা পাহাড়ের গায়ে বরফ হয়ে জমে আছে। আরও গরম না পড়লে সেই ঝর্ণা জল হয়ে নিচে নামবে না। এই রকমের বরফের ঝর্ণা পেরিয়ে এগোতে হচ্ছে। পথের উপর থেকে বরফ সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। হাত দিয়ে মুঠো ভরে নেওয়া যায় সেই চিনির মতো বরফ, দলা পাকিয়ে খেলা করা যায় বলের মতো। এমন দৃশ্যের তুলনা আমরা আর কোথাও দেখি নি।

স্বাতি বললঃ এ পথে না এলে জীবনে এ সব দেখা হত না।

আর নিজের চোখে না দেখলে এ সৌন্দর্য কল্পনা করা যায় না।

রামবাড়ার পরে চড়াই যেন আরও কঠিন। ঘোড়ার পদক্ষেপ আরও মন্থর হয়েছে, পা টিপে টিপে চলছে ঘোড়া। ওধার থেকে অন্য ঘোড়া এলে পাহাড়ের দিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। খুব অভ্যস্ত এরা, লাগাম ধরে টানাটানি আমাদের করতে হচ্ছে না।

একটা চড়াই এর মাথায় উঠে আমার ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল। কী হল?

পিছনে ফিরে দেখলুম যে ঘোড়াওয়ালা নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলছেঃ দেবদেখনি।

মানে, কেদারনাথের প্রথম দর্শন এইখানে।

স্বাতি এই কথা শুনতে পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেল। তার পর ঘোড়াওয়ালার সাহায্য নিয়ে নেমে পড়ল পথের উপরে। এগিয়ে এসে বললঃ তুমিও নামো। এই পথটুকু আমরা হেঁটে যাব।

এই নাকি রীতি। তীর্থের পথে হেঁটেই যেতে হয়। অন্তত মন্দির দেখবার পরে হেঁটে এগোনোই উচিত। স্বাতি এসে আমার পাশে দাঁড়াল। দু জনে এক সঙ্গে দেখলুম কেদারনাথের মন্দির। দেবদেখনি থেকে উঁচু নিচু পথ অনেকটা ঘুরে ছোট একটা পুল পেরিয়ে ঢুকছে কেদারনাথের লোকালয়ে। তারই শেষ প্রান্তে এই মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছি। তার পিছনে বরফে আচ্ছন্ন পাহাড়। এই পাহাড় যেন মন্দিরের পিছন থেকে উপরে উঠে গেছে। আমাদের ঘোড়াওয়ালারা পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলঃ জয় কেদার!

আমরাও বললুমঃ জয় কেদার!

তার পরে এগিয়ে চললুম। আকাশের সূর্য তখনও মাথার উপরে ওঠে নি। কিন্তু প্রসন্ন রৌদ্রে ঝকঝক করছে চারি দিক। এই আলো বরফের উপরে পড়ে রূপোর পাহাড় বলে মনে হচ্ছে। এই মাইলখানেক পথ এগিয়ে গেলেই আমরা কেদারনাথের দর্শন পাব।

স্বাতি বলল ঃ শুধু এই মন্দির নিয়েই কি কেদারনাথ?

বললুম ঃ মন্দিরের জন্যেই সব। ঘরবাড়ি ধর্মশালা রেস্ট হাউস দোকান পাট পাণ্ডাদের আস্তানা যা দেখতে পাচ্ছি, সবই এই মন্দিরের জন্যে।

আর কিছু দেখবার নেই?

সামনে শীর্ণ ধারার মন্দাকিনী দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড বেগে বয়ে আসছে। কিন্তু স্বাতির প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি। বললুমঃ মন্দাকিনী ছাড়া কাছে আর কিছু নেই। তার জন্যে দূরে যেতে হবে।

স্বাতি সেই কথা জানবার জন্যে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম ঃ মন্দিরের কাছে আছে উদককুণ্ড আর পাহাড়ের গায়ে ভৈরবের মন্দির।

আর—

আর আছে দুটি সরোবর—চোরাবারি তাল আর বাসুকি তাল।

স্বাতি বলল ঃ এ সব কত দূরে জানো?

বললুম ঃ বই পড়া বিদ্যে। মন্দিরের পিছনে মন্দাকিনী পার হয়ে যেতে হয়। পাথরের উপরে কাঠ ফেলে পুল তৈরি হয়েছে। তার পরে বরফের পাহাড়ের দিকে উঠতে হয় বরফের পাহাড়ের কোলে হ্রদ। বোধ হয় কোনও হিমবাহের সঙ্গে যুক্ত। এরই এক ধার থেকে মন্দাকিনীর জন্ম। মহাত্মাজীর অস্থি বিসর্জনের পরে চোরাবারি তালের নাম হয়েছে গান্ধী সরোবর। এক দিনেই যাতায়াত করা যায়। সকালে বেরিয়ে স্বচ্ছন্দে ফেরা যায় বিকেল বেলায়।

আর বাসুকি তাল?

চোখের সামনে তখন আমরা কাঠের সেতুটি দেখতে পাচ্ছি। আর বাঁ হাতে একটি সরু পায়ে চলার পথ পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে। পিছনের ঘোড়াওয়ালাকে আমি জিজ্ঞাস করলুম ঃ এ পথ কোথায় গেছে?

উত্তর পেলুম যে এই হল বাসুকি তালের পথ। কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম বলে খুব কম যাত্রীই সেখানে যায়। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে সেখানে গেলে আনন্দে মন ভরে যায়। পাহাড়ে ঘেরা নীল জলের হ্রদ, মাইল দেড়েক লম্বা আর চওড়া এক মাইলেরও বেশী। শুধু পাহাড় আর বরফ, চিহ্ন নেই গাছপালার। এই হ্রদেই জন্ম হয়েছে বাসুকি গঙ্গার, সোমপ্রয়াগে তার সোম নাম। মন্দাকিনীর সঙ্গে তার মিলন।

আর একটি অপরূপ ফুল দেখা যায় এই পথের ধারে। ব্রহ্মকমল। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কেদারনাথের পূজো হয় এই ফুলে। পাথরের আশেপাশে ছোট ছোট গাছে এই ফুল ফোটে। ব্যানার মতো লম্বা পাতার গাছ। মাটি থেকে একটি ডাঁটা বেরোয় তিন চার হাত লম্বা তারই মাথায় বড় বড় সাদা ফুল। দু হাতের মুঠো ভরে ধরতে হয়। যেমন সুন্দর, তেমনি

তার সৌরভ। বাতাস আকুল হয়ে থাকে তার তীব্র গন্ধে। এ ফুল ফোটার সময় এখনও হয় নি, পাণ্ডারা যাত্রীদের নির্মাল্য দেয় শুকনো ব্রহ্মকমলের। আর খরচ দিয়ে গেলে ব্রহ্মকমলের পূজো দেয় তাদের কল্যাণের জন্যে।

তার পরেই আমরা মন্দাকিনীর পুলের উপরে পৌঁছে গেলুম। কাঠের ছোট পুল। বাঁধানো ঘাট। তার পরেই কেদারনাথের লোকালয়। পাথরের পথের দুধারে পাথরের ঘর বাড়ি। কোন কোনটি দোতলা, একতলাই বেশি। মূল পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে মন্দিরের সিঁড়িতে। সেখানে পৌঁছে স্বাতি আমার দিকে তাকাল। বলল ঃ জানো, স্বপ্নে আমি এই মন্দিরটিই দেখেছিলাম।

বললুম ঃ স্বপ্ন তোমার সার্থক হয়েছে।

মন্দিরের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু আমরা মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করলুম না। হালদার মশাইকে খুঁজলুম পিছন ফিরে। তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি। কিন্তু আমাদের পাণ্ডা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন ঃ আসুন, আপনাদের পুজোর ব্যবস্থা করি।

বলে সামনের এক দোকানে টেনে আনলেন। পূজার উপকরণ বিক্রি হয় এখানে- শুকনো ফুল বেলপাতা, শুকনো ফল ও মিষ্টি। দোকানদার রেকাবিতে করে সাজিয়ে পাণ্ডার হাতে দিল।

স্বাতি বলল ঃ দাম?

দাম পরে দিলেও চলবে। আসুন আমার সঙ্গে।

আমরা জুতো মোজা খুলে কলের জলে হাত ধুয়ে নিলুম। কয়েকটি ধাপ উপরে উঠেই রেলিঙ দিয়ে ঘেরা মন্দিরের চত্বর। সামনে পাথরের নন্দী। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

স্বাতি হতাশ হয়ে তাকাল পাণ্ডার দিকে। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ ভোগের জন্যে বন্ধ হয়েছে, এখনই দরজা খোলা হবে।

চারিদিক ঘুরে আমরা মন্দির দেখলুম। পাথরের মন্দির। সামনেটা চালার মতো, তার পরে শিখর গর্ভগৃহের উপরে। সামান্য কারুকার্য, কিন্তু গম্ভীর ভাবে পূর্ণ। পিছনেই তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী। এক ধারে মন্দির কমিটির অফিস, অন্য ধারে তাদের রেস্ট হাউস। খানিকটা তফাতে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আরও কিছু নির্মাণ করা হবে বলে বোধ হল।

পাণ্ডা বললেন ঃ গরিবের বাড়িতেই থাকবেন তো!

তার পরেই বললেন ঃ বাড়ি আমার নয়, আমার উপরে রক্ষণাবেক্ষণের ভার।

স্বাতি বলল ঃ এই রেস্ট হাউসে জায়গা পেলে অন্য কোথাও যাব না।

এখানে জায়গা পাওয়া যাবে।

বলে তিনি অফিসে ঢুকে ব্যবস্থা করে এলেন।

ঠিক এই সময়েই মন্দিরের দরজা খুলে গেল। পাণ্ডা বললেন ঃ আসুন।

তিনি আমাদের পূজা করালেন যত্ন করে। বাইরে গণেশের পূজা শেষ করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলুম। আশ্চর্য হলুম শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ দেখে। কালো এক শিলাখণ্ডই কেদারনাথ। কোনও আকার নেই, কোনও সজ্জা নেই, বিরাট এক পাথরকে আমরা পূজা করলুম। ধূপ দীপ জ্বেলে পাথরের গায়ে ঘি মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে প্রাণ ভরে দেখে দুহাতে দেবতাকে আলিঙ্গন করলুম। এখানে কোনও দ্বাররক্ষী নেই, নিকটে যেতে বারণ করে না কেউ, স্পর্শ করার অধিকার আছে সকলের। আরও অনেক যাত্রী এসেছেন ভিতরে। কেউ মন্ত্র পড়ছেন, কেউ ধ্যান করছেন, কেউবা চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছেন পাথরের দেবতাকে। কী আনন্দ, কী তৃপ্তি, কী অপূর্ব শিহরণ জাগে মনে।

বাহিরে কেউ ঘণ্টা বাজাল, তার প্রতিধ্বনি এল ভিতরে। ব্যোম ব্যোম শব্দ করলেন একজন, আর একজন বুঝি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। না, কষ্টের কান্না এ নয়, এ কান্না আনন্দের। জীবন সার্থক হয়েছে তাঁর, তাই প্রকাশ করলেন কেঁদে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আবছায়া অন্ধকারে তার দু চোখেও আমি জল দেখলুম। আমার কণ্ঠস্বরও তখন ভারি হয়ে এসেছে, আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

মন্দিরের বাহিরে বেরিয়ে হালদার মশাইকে দেখতে পেলুম। মন্দিরের সিঁড়ির ধাপেই তিনি বসে পড়েছেন। খানিকটা তফাতে অপেক্ষা করছে বাহাদুর। স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল ঃ এই যে হালদার মশাই!

হালদার মশাই ফিরে তাকালেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। মনে হল, অভিমানে থমথম করছে তাঁর মুখ।

আমি বললুম ঃ আসুন, পুজো করবেন না!

পাণ্ডাকে স্বাতি বলল ঃ হালদার মশাইকে পুজো করিয়ে দিন।

বলে মন্দির কমিটির অফিসে খোঁজ নিয়ে রেস্ট হাউসে ডেকে নিয়ে গেল বাহাদুরকে। ফিরে এসে পথের ধারের একটা খাবারের দোকানে ঢুকল।

কী পাওয়া যাবে?

পুরি আর আলুর তরকারি।

ভাত ডাল?

দোকানদার হেসে বলল ঃ ভাত ডাল এখানে সেদ্ধ হয় না। এখানকার আগুনে অত আঁচ নেই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ ঘোড়াওয়ালারা তাহলে খিচুড়ি খাবে কেমন করে?

সে ওরাই জানে।

তাহলে আমরা পুরি তরকারিই খাব।

দেখা গেল যে আলু সেদ্ধ করা আছে, তারই ঝোল হবে। আর কাঠের আগুনে ভাজা হবে পুরি। হালদার মশাই পুজো করে ফিরে এলে আমরা এক সঙ্গে খাব।

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে তাঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করি নি বলেই তাঁর অভিমান হয়েছে। এই দেশের নানা জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। রামেশ্বরের পরে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের পথে, দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প হতে পারত, কিন্তু সে রকমের কিছু করেছেন বলে শুনি নি।

অথচ জো রায়ের সঙ্গে স্বাতির বিয়ের সম্বন্ধটা বোধ হয় তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। পুরীর সমুদ্রবেলায় যখন দেখা হয়েছিল, তখন আমাকে বলেছিলেন, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়েই যদি রোজগার হয় তো ও কাজ কেন করব! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না! যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়! ইচ্ছে করলে এই কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ, কথা তো জানি!

তার পরে বলেছিলেন, এবারে এই ধর্মই তো করে এলুম। কিন্তু যার পয়সায় এলুম, তার নাম আমি কিছুতেই বলব না।

স্বাতির বিয়ে ভেঙে দেবার গল্পটাও বলেছিলেন।—জো রায় যে পাত্র খারাপ অঘোর গোস্বামীর কাছে সে কথা বলা চলে না। জো রায়ের কাছে টাকা নিয়ে তীর্থস্থানে শপথ করেছিলেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছে মেয়ের কথা বলতে হল। মেয়ে ভাল, কিন্তু—

এক গাল হেসে আমাকে বলেছিলেন, এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না। তার পরে দুই বুড়োয় কী কথা হল জানি না। গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম, বিয়ে ভেঙে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, খাঁটি খবর তো?

হালদার মশাই তার নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বলেছিলেন, বললুম তো, কার পয়সায় এসেছি তা কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি কিনা!

বুঝতে আমার কিছুই বাকি ছিল না। হালদার মশাইকে সেদিন সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রের মতো সুন্দর।

আজ তাঁকে কেদারনাথ পাহাড়ে দেখছি। ঐ তো, কেদারনাথের পুজো শেষ করে তিনি এই দিকেই আসছেন। কিন্তু তাঁর মুখখানা থমথম করছে কেন!

স্বাতি উঠে এগিয়ে গেল তাঁকে ডেকে আনতে। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দুজনের কথা হল খানিকক্ষণ। তার পরে বড় বড় পা ফেলে দুজনেই মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। পাণ্ডাও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

বেশিক্ষণ নয়, অল্পক্ষণ পরেই তাঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু হালদার মশায়ের পরিবর্তনটা বেশ লক্ষ্য করবার মতো। আনন্দে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরে সেই সজীবতা। উচ্চকণ্ঠে বলছেন ঃ তোমাদের সারাক্ষণ তাড়া। একটুখানি অপেক্ষা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!

স্বাতি কোন উত্তর না দিয়ে হাসছিল অল্প অল্প। আমার কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করলুম ঃ ব্যাপার কী?

উত্তর দিলেন হালদার মশাই, বললেন ঃ ভোর বেলায় একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, তারই খেসারত দিতে হল।

খেসারত!

তাছাড়া আর কী! গঙ্গোত্রীর জল এনেছিলুম খানিকটা। আমার মাকে দেখে ইচ্ছা হয়েছিল যে এই জল মায়ের হাতে দেব কেদারনাথের মাথায় চড়াবার জন্যে।

স্বাতি বলল ঃ খুব ছেলেমানুষ আপনি!

চেয়ে দেখলুম স্বাতির দৃষ্টি তখন ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

পাণ্ডা বললেন ঃ আসুন, ফলাহারী বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।

ফলাহারী বাবা!

পাণ্ডা বললেন ঃ ঐ তো, সামনের কুঠিয়ার সামনে এখন বসে আছেন।

পথের অন্য ধারে তাঁর দোতলা কুঠিয়া। একজন ছোটখাট মানুষ বাইরের রোদে বসে আছেন। আশেপাশে দু চারজন যাত্রী। পাণ্ডা বললেন ঃ বাবা এখানে বিশ পঁচিশ বছর আছেন। শীতের সময়েও এইখানে থাকেন। যখন একতলা কুঠিয়ায় থাকতেন, তখন একবার বরফে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাঁর কুঠিয়া। গৌরীকুণ্ড থেকে লোকজন এসে বরফ সরিয়ে তাঁকে তারা উদ্ধার করে। সেইবারেই এই কুঠিয়াকে দোতলা করে দিয়েছে তাঁর ভক্তরা।

তাঁর কাছে যেতে যেতে স্বাতি বলল ঃ ফলাহারী বাবা নাম কেন হল?

পাণ্ডা বলল ঃ আর তো কিছু খান না। শুধু শুকনো ফল খেয়েই থাকেন।

বৃদ্ধ সাধু, আশ্চর্য সরল মানুষ। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ, গায়ে একখানা কম্বল। সামনে একটা ধুনি জ্বলছে। শিশুর মতো হাসেন, প্রণামের উত্তর দেন আশীর্বাদ করে। সবাই তাঁর আপনজন।

বছর কয়েক পরে তাঁর কথা আবার শুনেছি। যে বছরে যাত্রীরা ফলাহারী বাবাকে দেখতে পায় নি। তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর বদলে তারা হোটেল হিমলোক দেখে এসেছে।

কেদারনাথ সত্যিই হিমলোক। যে পাহাড়ের পাদদেশে এই মন্দির, তার উচ্চতা ২২৭৭০ ফুট। কেদারশৃঙ্গের উল্টো দিকেই গঙ্গোত্রী গোমুখ, কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। শোনা যায়, উলঙ্গ সাধুরা মাঝে মাঝে এই পাহাড় ডিঙিয়ে চলে আসেন। শুধু হাতে, শুধু পায়ে। আশ্চর্য দক্ষতা তাঁদের।

বদ্রীনাথের দূরত্ব এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল। পুরাকালের যাত্রীরা শোনা যায় এই বরফের উপর দিয়েই যাতায়াত করতেন। এখনকার মতো ঘুরে উখীমঠ চামোলি হয়ে যেতেন না।

মহাভারতের যুগে পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। এই পথেই স্বর্গারোহণের চেষ্টা করেছিলেন। দ্রৌপদী এই কষ্ট স্বীকার করতে পারেন নি, সকলের আগে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। তার পর একে একে সহদেব নকুল অর্জুন ও ভীম। একমাত্র যুধিষ্ঠিরই পৌঁছতে পেরেছিলেন তাঁর লক্ষ্যে।

এ যুগের যাত্রীরা এ পথে যায় না। এ পথ অতিক্রমের দুঃসাহস নেই তাদের। এখন এই সব পথে যাতায়াত করে তরুণ অভিযাত্রী দল। তারা ছবি তোলে, বই লেখে। সেই সব পড়ে আমরা অনেক নতুন কথা জানি, আনন্দ পাই আরও বেশি।

দুপুরের আহারে বসে হালদার মশাই বললেন ঃ এই মন্দিরটি কার তৈরি গোপালবাবু?

স্বাতি হেসে বলল ঃ ঠিক লোককেই ধরেছেন।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম ঃ ভীমের তৈরি।

ভীম!

বললুম ঃ হ্যাঁ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম।

সত্যি!

সত্যি বৈকি। মহিষের রূপ ধারণ করে পাতাল প্রবেশ করছেন দেখে ভীমই তো তাঁকে জাপটে ধরে উপরে আটকে রাখলেন। শিবের সেই পশ্চাৎভাগই তো পাথর হয়ে আছে। তার ওপরে মন্দির করবে কে? এই সব পাথর আনার শক্তি আছে কার?

হালদার মশাই বললেন ঃ ঠিকই বলেছেন।

স্বাতি বলল ঃ আপনাকে ঠকাচ্ছে হালদার মশাই। অত দিনের পুরনো মন্দির কি আজও টিকে থাকতে পারে!

হালদার মশাই গম্ভীর ভাবে বললেন ঃ এই স্বর্গরাজ্যে সবই সম্ভব।

বললুম ঃ তাহলে আর একজন মানুষের নাম জেনে রাখুন। তাঁর নাম হল শঙ্কর। পাঁচ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ মত জয় করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন ভারতের সর্বত্র। তার পরে বত্রিশ বছর বয়সে এই অঞ্চলে এসে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছিলেন। আজ এত দিন পরে আমরা এখানে তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি।

খেতে খেতেই হালদার মশাই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বললেন ঃ শঙ্করাচার্য কী বলেছিল বলতে পারেন?

বলেছিলেন, এক কোটি বইএ যা লেখা আছে, তা আমি আধখানা শ্লোকে বলব। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

হালদার মশাই নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকালেন

বললুম ঃ শঙ্করাচার্য বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন।

মানে?

এর মানে তো বলতে পারব না হালদার মশাই, এ হল অনুভব করবার কথা। তপস্যায়

বলুন, ধ্যানে বলুন, সাধনায় বলুন—মহামানবেরাই শুধু এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেন। আর পণ্ডিতরা মারামারি করেন এর অর্থ নিয়ে।

হালদার মশাই আর কোন কথা বললেন না।

সারা দিন ঘুরে বেড়াবার পরে ক্লান্ত হয়ে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। কয়েকখানা লেপ দিয়ে গিয়েছিলেন পাণ্ডা। খাটের উপরে নরম বিছানা, তার উপরে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে বেশ আরাম হয়েছিল। বাহিরে বেরিয়ে চা খেতে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। সন্ধ্যা বেলায় স্বাতি আরতি দেখতে যাবে। ব্যবস্থা হয়েছিল, পাণ্ডা এসে ডেকে নিয়ে যাবেন। আমি নিশ্চিন্ত, আমার কোনও কাজ নেই।

ঠিক এই সময়ে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। আর চমকে লাফিয়ে উঠল স্বাতি। বলল ঃ চল চল, তৈরি হয়ে নাও শিগগির। হালদার মশাই, ও হালদার মশাই।

কিন্তু পাশের ঘর থেকে কোনও উত্তর এল না।

আমরা জামা কাপড় পরেই শুয়েছিলুম। উঠে মাথায় গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে নিলুম। পাণ্ডাও এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হালদার মশাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাশের ঘরে তাঁর বিছানা শূন্য। তিনি বোধ হয় আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘরের বাহিরে বেরিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। জ্যোৎস্নায় চারি দিক উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আর মাথার উপরে ঝির ঝির করে কি যেন পড়ছে। স্বাতি বলল ঃ এ কী পড়ছে?

পাণ্ডা হেসে বললেন ঃ বরফ।

এ তো পেঁজা তুলোর মতো নয়!

এ যে সরু চিনির দানার মতো মনে হচ্ছে!

পাণ্ডা বললেন ঃ দু রকমেরই বরফ পড়ে। এই বরফে ঠাণ্ডা বেশি। কাল সকালে দেখবেন, মাটির উপরে বরফ জমে আছে। মুঠো করে গোলা করতে পারবেন। আর বরফের যে সব বড় বড় তাল দেখেছেন, তা আরও বড় হয়ে থাকবে।

পাণ্ডার সঙ্গে স্বাতি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু আমি ভিতরে ঢুকতে পারলুম না। বাহিরের এই সুন্দর পৃথিবী আমার পা দুখানা আড়ষ্ট করে দিল। মন্দিরের বাহিরের চত্বরে আমি থমকে দাঁড়ালুম।

এখন আমার আশেপাশে কেউ নেই, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কাছে। তবে খানিকটা তফাতে খাবার দোকান দুটো এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। যাত্রীদের অনেকে এখন চায়ের সঙ্গে গরম পকৌড়া খাচ্ছেন। কিন্তু হালদার মশাইকে আমি তাঁদের মধ্যেও দেখতে পেলুম না। তবে কি তিনি মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছেন আরতি দেখতে!

ফলাহারী বাবার কুঠিয়ার দিকে আমি তাকালুম। না, তিনি এখন বাহিরে নেই। এখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কুঠিয়ার মধ্যে ধুনির সামনে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। পৃথিবীর সঙ্গে এখন আর তাঁর সম্পর্ক নেই, তিনি এখন অন্য জগতে বিরাজ করছেন। যে জগতের

ন্যে আমাদের পরিচয় নেই, হবেও না কোন দিন। সে জগতের রূপ চোখ মেলে দেখতে হয় না, তার রূপ দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে।

আমি এবারে অন্য দিকে তাকালুম। সে দিকে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি উন্মুক্ত আকাশের নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এ কী! তার নিচে যে একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি! গায়ে কম্বল ও মাথায় চাদর জড়িয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। খানিকটা এগিয়ে গেলুম আমি। না, ভুল হয় নি আমার! হালদার মশাইকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। কিন্তু তাঁকে যে আমি এই ভাবে বসে থাকতে দেখব, এ আমার স্বপ্নের ও অতীত ছিল। দিনের বেলায় তিনি আমার কাছে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই কথা বুদ্ধি দিয়ে বিচারের নয়, এ উপলব্ধির জিনিস, তপস্যায় এই বিশ্বাস জন্মে। হালদার মশাই কি আজ তাঁর সমস্ত চেতনা দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করতে চাইছেন!

আমি আবার ফিরে এলুম মন্দিরের দরজার সামনে। কিন্তু বন্ধ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে আমার মন রাজী হল না। ভিতরে এখন আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, ডমরুর মতো ধ্বনি ভেসে আসছে বাহিরে। ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় শিবকে সাজিয়েছেন রাজ বেশে, ফুলের মালা পরিয়েছেন। ধূপে ও ধুনার গন্ধে ভরে গেছে মন্দিরের গর্ভগৃহ। বেদপাঠ হচ্ছে, মন্ত্র পড়ছেন পূজারী, আর ভক্তরা দাঁড়িয়ে আছেন করজোড়ে।

কিন্তু আমি কেন ভিতরে ঢুকতে পারছি না! এই উন্মুক্ত পৃথিবীর আকর্ষণ কি আরও বেশি নয়! এ কি মানুষের পৃথিবী, না দেবতার! মানুষের পৃথিবী তো এ রকম নয়!

মাথার উপরে যে বরফ পড়ছিল, আমি তা ভুলে গিয়েছিলুম। শীতের কথা আমার মনে ছিল না। নিজের কথাও না। মন্দিরের কথাও আমি বুঝি ভুলে গিয়েছিলুম। আমার মন যে অন্য জগতে চলে গিয়েছিল, আমি তা জানতে পারি নি। সে এক স্বপ্নের জগৎ। ... জগতে পৃথিবী আরতি করছে বিশ্বদেবতার। আমি তাঁকে প্রণাম করলুম।*

*লেখকের 'রম্যাণি বীক্ষ্য' (হিমালয় পর্ব) থেকে সংগৃহীত

ভিলাঙ্গনার পথে

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা ঠিক করেছিলুম সকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে হাঁটা শুরু করবো। না হলে বিকেলের মধ্যে গাংগি পৌছানো শক্ত হবে। দূরত্ব এখান থেকে ২২ কিলোমিটার। কিন্তু ১০ কিলোমিটার পরে ৬ কিলোমিটারের একটা সাংঘাতিক চড়াই আছে। 'রি'-এর চড়াই নামে প্রসিদ্ধ। তাছাড়া এদিকে হাঁটা-পথ সম্পর্কে তথ্য বা বর্ণনা যা সংগ্রহ করেছি তা পর্যাপ্ত নয়। তাই একটা অনিশ্চয়তাকে পোষণ করেই তো চলতে হবে। সুতরাং চলার হিসেবটা যতটা সম্ভব ঠিক রাখা চাই।

কিন্তু ভোরে বেরোনো আমাদের হয়ে উঠলো না। খেয়েদেয়ে বেরোতে নটা বেজে গেলো। মাস্টারজী সকালেই আমাদের বাংলোয় এসে হাজির হয়েছিলেন। আজ তাঁকে অনেক সুস্থ মনে হলো। জ্বর তো কালকেই কমে গিয়েছিল, আজ একেবারে ছেড়ে গেছে। হিমালয়ের লোক অসুখ-বিসুখকে সত্যিই বিশেষ আমল দেয় না। উনি আমাদের এগিয়ে দিলেন প্রায় এক মাইল। তারপর বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

রাস্তা প্রথমটা খেতের মধ্যে দিয়ে। তারপর অগভীর বন, এলোমেলো পাথর, অল্প চড়াই-উৎরাই। কিছুটা রাস্তা সত্যি মনোরম। আমরা পকেটে কিছু কাজু বাদাম আর লজেন্স্ ভরে নিয়েছি। গ্লুকোজের প্যাকেটও সঙ্গে আছে। চড়াইয়ের পথে এগুলো মাঝে-মাঝে দরকার লাগে।

প্রথম ১০ কিলোমিটার আসতে মোটেই কষ্ট হলো না। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল কুলিদের নিয়ে। এ-সব রাস্তায় ওরা কখনো এগিয়ে থাকে, কখনো পিছিয়ে। তার জন্যে দুশ্চিন্তা নেই। ওরা বিশ্বাসী। যাত্রীদের কখনো বিপদে ফেলে না।

কিন্তু আমাদের কুলিরা বার বার এতো পিছিয়ে পড়ছে কেন? ওদের জন্যে আমাদেরও বার বার অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ পথ অনেক জায়গায় চেনা যাচ্ছে না। ওদের সাহায্য ছাড়া চলা মুশকিল। সুতরাং চলায় দেরি হতে লাগলো।

'রি'-এর চড়াইটা ভেঙে যখন ওপরে পৌছলুম তখন চারটে বাজে। ওখানে পৌছে আবার কুলিদের জন্যে অধীর প্রতীক্ষা। গাংগি আজ পৌছানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এখনো হাতে যেটুকু বেলা আছে কুলিরা এসে পড়লে তাতে সূর্যাস্তের আগে হয়তো পৌছানো যায়।

কিন্তু ওরা যে ভাবিয়ে তুললো। এমন অহেতুক দেরি তো ওরা করে না! আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলুম তবু কারোর দেখা নেই।

এদিকে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। পড়ন্ত রোদে সোনালী রং ধরে গেছে। এ-সব জায়গায় রোদ চলে গেলেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। ঘুটটু থেকে আমরা তো অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। চারিদিকে জঙ্গল আর পাথর। কাছে বা দূরে কোনো গ্রামের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। এখন কী করা যায়?

তিন জনে একটা বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আলোচনা করছি এমন সময় বেশ কিছুটা নিচে একটা কুলিকে দেখা গেল। ধড়ে প্রাণ এলো। যাক্ ওরা তাহলে আছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কুলিটা উঠে এসে যা বললে তাতে আমরা আবার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লুম। বললে—'সাব্, ঘুট্টু সে জিস্ কুলি কে গাংগি তক্ যানে কি বাৎ থী উয়ো রাস্তে মে সামান্ ছোড় কর্ ভাগ গ্যয়া।'

—'ভাগ্ গ্যয়া!' আমরা তিনজনেই এক সঙ্গে আঁতকে উঠলুম। হিমালয়ের এদিকে-সেদিকে আগে যেটুকু ঘুরেছি তাতে অন্য নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে বটে কিন্তু কোনো কুলিকে আমি তো কখনো জিনিস ফেলে পালাতে দেখি নি। বিশ্বাসভঙ্গ ওরা করে না এবং খুব পরিশ্রমী।

কিন্তু এ-লোকটা হঠাৎ পালালো কেন? পালানোর তো কথা ছিল না। আর যখন পালালোই মাল নিয়েই পালাতে পারতো। আমি তাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম—'কিঁউ ভাগা?' কুলিটা উত্তরে যা বললে তাতে বোঝা গেল লোকটার শরীর ভালো ছিল না। টাকার লোভে গাংগি পর্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু কিছুটা চড়াই ভেঙে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে। তাই মাল ফেলে পালিয়েছে। আর নাথু সিং সেগুলো পাহারা দিচ্ছে। নাথু আমাদের আর একটা কুলির নাম। আর যে এখন ওপরে উঠে এসেছে সে হলো রণজিৎ সিং।

বিমল আর দিলীপ বেশ ঘাবড়ে গেছে দেখলুম। ঘাবড়াবারই কথা। দিলীপ জিজ্ঞেস করলে—'এখন উপায় কী, দাদা।'

—'তাই তো ভাবছি'। এদিকে ভাববারও বেশি সময় নেই। সমস্যাটা রণজিতের সামনেই তুলে ধরলুম—'উস্ নে তো হামে বড়ী মুসিবৎ মে ডাল দিয়া; অব্ ক্যা কিয়া যায় তুম বাতাও।'

ও বললে এখন এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় আছে। ও আবার নিচে গিয়ে মালগুলো নিয়ে আসবে। তখন নাথুও সঙ্গে আসবে। আমরা ওকে তাই করতে বললুম। ও সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গেলো। ওদের আসতে আসতে তো অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে; ততক্ষণ এখানেই আমাদের অবস্থান—এই জনশূন্য পাহাড়ী জঙ্গলে, এই ঠাণ্ডায়। তারপর রাত্তিরের মতো মাথা গোঁজার একটু জায়গা? আছে কি কোথাও?

ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন নাথু আর রণজিৎ মাল নিয়ে ওপরে উঠে এলো তখন অন্ধকার আমাদের জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে। ভাবনারা তো আগেই অ্যাটাক্ করেছে। এখন করি কি! যাই কোথায়! মহা ভুল হয়ে গেছে টেন্ট্ না এনে। মনে করেছিলুম বেশি দূরে তো যাচ্ছি না; একটা ছোট ট্রেকিং এর প্রোগ্রাম। তা ছাড়া খবর মতো রাত্তিরে থাকার কথা ছিল প্রথমে দুটো প্রাইমারি স্কুলের বাড়িতে, তারপরে পাহাড়ের গুহায়। জানা গিয়েছিল এদিকে দু-একটা গুহা আছে যেখানে চলার পথে রাত কাটানো যায়। উত্তরপ্রদেশ সরকারের একজন পদস্থ অফিসারের মতে—যিনি এদিকে অনেক ঘুরেছেন—গুহাগুলো comfortable. এ-ধরণের গুহা হিমালয়ের অন্যত্রও আছে। তবু টেন্ট্ সঙ্গে নিয়েই বেরোতুম। তাড়াতাড়িতে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। এখন তার অভাববোধ মনটাকে রীতিমতো কামড়াচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাসা-সঙ্গীত। বিমলকেও বেশি সাধনা করতে হয় না। কিন্তু আমার চোখের পাতারা সহজে বন্ধ হতে চায় না।

ওদিকে গান শুরু হয়েছে। দ্বৈত-সঙ্গীত। একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে নাথু আর রণজিৎ বিড়ি টানছে আর গান গাইছে। মাঝখানে একটা মোটা গাছের ডাল জ্বলছে। সারারাত জ্বলবে। শুধু ঠাণ্ডা তাড়ানোর জন্যে নয়, জীবজন্তুকেও।

পর দিন সকালে উঠেই রুটি-তরকারি তৈরি করা হলো। এবং তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরেই আমরা রওনা হলুম।

রাস্তাটা সত্যিই অপূর্ব। কখনো বড় বড় গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। কখনো ভিলাঙ্গনাকে ডান পাশে রেখে। এলোমেলো শিথিল পাথরের ওপর দিয়ে চড়াই-উৎরাইও আছে। তেমন কষ্টকর নয়। পাহাড়ী লোকজনদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। এখন ফসল তোলার সময়। ওরা কেউ চলেছে খেতে, আবার কেউ-বা ভেড়া বা গরু-মোষ নিয়ে চলেছে পাহাড়ের গায়ে চরাতে। ওরা আশপাশের গ্রামের লোক।

শুধু ঘোড়া বা ভেড়া নয়, পাহাড়ী গরু-মোষও খাদের দিকের এমন-সব বিপজ্জনক ঢালু জায়গায় ওঠা-নামা করে যা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আর ওদের মতো এ দেশের লোকেরাও। ছেলেমেয়ে বাচ্চা-বুড়ো যে কেউ হোক অবলীলাক্রমে খাদের পথে নেমে যেতে পারে, আবার তেমনি সহজেই উঠে আসে। ভারী বোঝা নিয়েও। এতে আমরা আশ্চর্য হতে পারি, কিন্তু ওদের কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষ জীবনকে গড়ে তোলে এবং অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়।

দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলুম গাংগিতে। গ্রামটা নেহাৎ ছোট নয়। গ্রামে ঢোকার আগেই রাস্তার পাশে একটা ছোট মন্দির আছে। শিবের বলেই মনে হলো।

গ্রাম-প্রধান শ্রীগেয়্না সিং-কে খুঁজে পেতে দেরি হলো না। একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে তাকে ডাকতে গেলো। আমরা একটা উঁচু চাতালের ওপর উঠে দাঁড়ালুম। তার দু-পাশে কোণাকুণি খানকয়েক বাড়ি। দোতলায় ঘর, আর নিচে ফসল রাখার ব্যবস্থা। কয়েকজন যুবতী কিসের—যেন শুকনো ফসল লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ঝাড়ছে। পরণে ঘাগ্‌রা, গায়ে ঢিলে ব্লাউজ ধরনের জামার ওপর ছোট ফতুয়া। কারো কারো মাথায় পাগড়ি। কিন্তু সকলেরই কোমরে মোটা করে কাপড় জড়ানো। গায়ের রং সকলেরই ফর্সা। সকলেই স্বাস্থ্যবতী। দু-একজনকে রীতিমতো সুন্দরীও বলা যায়।

একটু দূরেই কয়েক ফুট নিচুতে আর একটা চাতালের ওপর বসে একটা বলিষ্ঠ লোক উঁচু থেকে কী-যেন টাঙ্গিয়ে কী-যেন করছে। একটি ছেলেকে প্রশ্ন করে জানলুম ও কম্বল বুনছে। এমন বোনার পদ্ধতি আমি কোথাও দেখি নি। ছোট একটা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে লোকটা নিপুণ হাতে সটাসট মাকু চালাচ্ছে। খানিকটা বোনা হলে সেটাকে টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে, বা লোকটা কিছুটা পেছনে সরে যাচ্ছে।

চাতালটার পিছনের দিক থেকে একটা ঝরণা বহে যাচ্ছে। তার ও-পাশে আরো কয়েকখানা দোতলা বাড়ি। দোতলা মানে ঐ আগের মতোই। নিচে ফসল আর গরু-মোষ। ওপরে মানুষ। মাত্র কয়েকখানা পাথরের সিঁড়ি ভাঙলেই ঘর।

তিনজন পরদেশীকে ঘিরে এতক্ষণে একটা ছোট ভিড় জমেছে। ঔৎসুক্য আর জিজ্ঞাসা ওদের চোখে-মুখে। দু-একজন এক-আধটা প্রশ্নও করছে। ভাষা হিন্দী নয়, গাড়োয়ালী। ভালো করে না বুঝলেও আমরা উত্তর দিতে চেষ্টা করছি। এমন সময়ে সেই লোকটির সঙ্গে প্রধানজীর আবির্ভাব।

দোহারা গড়ন। আধাবয়েসী। চেহারায় কোনো ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই। অন্যদের মতোই সাধারণ পোশাক। শুধু গায়ে একটা ফুল-কাটা জ্যাকেট যা অন্যদের নেই।

টেহরি থেকে ওঁর নামে যে-চিঠিটা এনেছি সেটা ওঁর হাতে দিতে গিয়েই মনে পড়লো পত্রদাতা বলেছিলেন উনি লেখাপড়া মোটেই জানেন না। তাই হাতে দেবার আগে চিঠিটা পড়ে দিলুম। উনি আমাদের নমস্কার করে স্বাগত জানালেন।

এর মধ্যেই আমাদের বসার জন্যে চাতালের সামনের দিকে দুটো কম্বল বিছানো হয়েছিল। এখন আর একটা পরিস্কার সতরঞ্চি এলো। তার ওপর বসে আমরা প্রধানজীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলুম।

ভিলাঙ উপত্যকার এই দিকটায় পাহাড়ী লোকেদের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, হিন্দীতে এরা কথা বলে কম। কেউ-কেউ আবার হিন্দী বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। বিশেষ করে মেয়েরা। তারা বেশির ভাগই আঞ্চলিক গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলে। হিন্দীর সঙ্গে গাড়োয়ালীর ভাষাগত একটা সম্পর্ক থাকলেও এটা পৃথক পাহাড়ী ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকরা হিমালয়ের পাহাড়ী ভাষাগুলোকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—পূর্ব পাহাড়ী, মধ্য পাহাড়ী, এবং পশ্চিম পাহাড়ী। পূর্ব পাহাড়ীর মধ্যে নেপালী, গোর্খালী প্রভৃতি ভাষা, মধ্য পাহাড়ী হলো কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের ভাষা এবং পশ্চিম পাহাড়ী প্রচলিত হিমাচল প্রদেশে। হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় ১৬লক্ষ লোক কুমায়ুনী এবং গাড়োয়ালী ভাষা ব্যবহার করে। গাড়োয়ালীর আবার ৯টি উপভাষা আছে। হিন্দীর সঙ্গে গাড়োয়ালীর অনেক মিল থাকলেও সহজে বোঝা যায় না।

প্রধানজী অবশ্য পড়তে না পারলেও পরিস্কার হিন্দী বলেন। উনি এখান থেকে আমাদের জন্যে একজন কুলি-কাম্-গাইড্ ঠিক করে দিলেন। এই সময় লোক পাওয়া খুব মুশকিল। সবাই ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত। তবু একজনকে যে পাওয়া গেল আমাদের ভাগ্য।

প্রধানজীর কাছ থেকে এই অঞ্চলের নানা রকম খবর পাওয়া গেল। এই গ্রামে ৩২টি পরিবারের বাস। লোকসংখ্যা দু'শ'র কিছু বেশি। সব পরিবারের অল্পবিস্তর জমিজমা আছে। আছে গরু-মহিষ। দু-একটা পরিবারের কিছু ভেড়াও আছে। খেতের সঙ্গেই এদের প্রধান সম্পর্ক। একমাত্রও বলা যেতে পারে। কম্বল, চ্যাটাই, ঝুড়ি ইত্যাদি এরা তৈরী করে থাকে। এদের কম্বল এক অসাধারণ বস্তু। বেশ মোটা এবং খসখসে। ঠাণ্ডার সাধ্য নেই তার

ভেতরে ঢোকে, গায়ে লেগেই ফিরে যায়। এমন কি জলেও সহজে ভেজে না। অনেকে এই কম্বল কেটেই সরু ঘেরের পাজামা ও জোব্‌বা তৈরি করে। ঠাণ্ডায় কোথাও বসতে হলে পা-দুটো গুটিয়ে জামার মধ্যে টেনে নেয়। আবার কেউ-কেউ পশম দিয়ে খুব মোটা একটা ফালি বানিয়ে তাই দিয়ে তৈরি করে জুতো, অর্থাৎ জুতোর ওপরের অংশটা; নিচের চামড়ার শোল্‌টা শুধু আনিয়ে নেয়। কেউ-বা সেটাও তৈরি করে নেয় চামড়া কেটে। এ-জুতোও এক বিচিত্র বস্তু। কাউকে গরু দান করার আগে যদি তার ওপর ব্যবহার করার দরকার হয় তাহলে এই জুতোই উত্তম।

এখানকার পাহাড়ী জীবন বেশ কঠিন। অবশ্য পাহাড়ে জীবন আর কোথায় সহজ। পাথরের সঙ্গে পাহাড়ী লোকেরা একটা আত্মীয়তা গড়ে তোলে। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত থাকে-থাকে সাজানো চত্বরে ফসলের খেত। সমতল ভূমি খুব কম। ও-সব খেত দূর থেকে দেখতে চমৎকার, ছবির মতো। কিন্তু ওখানে চাষ করা চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে সেচের জলের ব্যবস্থা করা এক মস্ত সমস্যা। কোথাও ঝরণার ধারাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কোথাও জল সঞ্চয় করে রেখে, কোথাও-বা অন্য উপায়ে এ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়। মূলত নির্ভর করতে হয় প্রকৃতির ওপরেই। কোথায়-যেন পড়েছিলুম টেহরি-গাড়োয়ালে চাষ-আবাদের ব্যাপারে ১০৪ একর জমির উপর শতকরা ৯১.২ জন মানুষ নির্ভরশীল। গাড়োয়ালের অন্যত্র—বিশেষ করে বাসপথ যে-সব জায়গায় পৌঁছেচে— পাহাড়ী জীবনযাত্রার কিছুটা উন্নতি এখন চোখে পড়ে। কিন্তু এই গাংগি গ্রামের মতো বহু গ্রাম এখনো এ-সব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে যেখানে কর্মের বা জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো প্রসারতা আসে নি। কোথাও-কোথাও কিছুটা সমতল ভূমির ঝোপঝাড় পুড়িয়ে সেখানেও চাষ করা হয়। এই ধরনের আবাদকে আগে বলতো 'কাটিল'। এখনো কোনো কোনো জায়গায় বলা হয়। প্রধান শস্য ধান আর গম। এপ্রিল মাসে ধান বোনা হয়, কাটা হয় সেপ্টেম্বরে। তার পরেই খেতে পড়ে গমের বীজ। কাটা হয় মার্চ-এপ্রিলে। ভিলাঙ্ উপত্যকার এ-সব অঞ্চলের পাহাড়ী চালের চেহারা দেখলে ভাতের ওপর ভক্তি চটে যায়। অসামান্য রূপগুণের আধার দেরাদুন রাইসের কথা ভাবলে এ-চালের ভাত মুখে তোলা যায় না। তবে শুনলুম রূপ এর যেমনি হোক, গুণ আছে; খেতেও নাকি খারাপ নয়।

ডালও জন্মায় কয়েক রকম। আর আনাজের মধ্যে আলু পিঁয়াজ ও কুমড়ো ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তবে হলুদ আদা আর লঙ্কা প্রচুর হয়। শুকনো লঙ্কা যে এরা কী পরিমাণ খেতে পারে দেখলে তাক লেগে যায়। পাকা লঙ্কার গুঁড়ো সবতাতে। হরিদ্বার-হৃষীকেশেই তো দেখা যায় অনেক হোটেলে নুন দানির সঙ্গেই থাকে পাকা লঙ্কার গুঁড়ো-ভরতি লঙ্কাদানি। এমন লঙ্কাখোর জাত কি দুনিয়ার আর আছে? জানি না। চীনেরা শুনেছি খুব লঙ্কা খায়। তবে ওরা কাঁচালঙ্কাই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু এরা এত পাকালঙ্কা খেয়ে হজম করে কি করে? রোগ ধরে না? কী জানি। পাহাড়ের ঠাণ্ডা দেশে অবশ্য সর্বত্রই পাকালঙ্কা খাওয়ার রেওয়াজ।

হরিদ্বার-হৃষীকেশ ছাড়িয়ে ওপরে উঠলেই দেখা যায় মাছ-মাংস সর্বত্রই চলে, অবশ্য কয়েকটি তীর্থক্ষেত্র ছাড়া। হরিদ্বার, বিশেষ করে হৃষীকেশে দেখেছি আমিষ-সংক্রান্ত নিষেধ না মানার একটা প্রবণতা ইদানিং দেখা দিয়েছে। কিছু দূর থেকে মাংস বা ডিম এনে বাড়িতে খাওয়া শুরু হয়েছে। অবশ্য হোটেল-রেস্তোরাঁয় এখনো পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, গঙ্গায় যে বড় বড় মাছ দেখা যেতো কোন্ মন্ত্রের টানে তারা অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। আজকাল গঙ্গায় ওদের খুব কমই চোখে পড়ে। শুনেছি বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় বাজারে ওদের নাকি এখন দারুণ চাহিদা।

হিমালয়ে মাছ সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আশেপাশে তাল-টাল থাকলে (তাল=বড় জলাশয়) তবেই মাছ সুলভ হয়। কোনো কোনো তালে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

গাড়োয়ালে দু'ধরণের ছাগল দেখা যায়। এক ধরনের ছাগল সমতল ভূমির ছাগলের মতোই দেখতে— কোনো তফাৎ নেই। সাধারণত মানুষের পেটে যাবার জন্যেই এরা জন্মায়, বড় হয়। কিন্তু আর এক ধরনের ছাগলের—যাদের ভুটিয়া ছাগল বলে—এখানকার ছাগল-সমাজে খুব ইজ্জৎ। গা-ভরতি বড় বড় লোম, লম্বা-চওড়া গ্যাঁট্রা-গোঁট্রা চেহারা, ভারিক্কি মেজাজ। গত জন্মে যেন সব রাজা-উজির ছিল, এ-জন্মে ছাগল হয়েছে। এদের বেশি দেখা যায় পশ্চিম হিমালয়ের কাংড়া উপত্যকায়। এই ভিলাঙ্ উপত্যকাতেও কিছু আছে।

বন্য জন্তুর মধ্যে গাড়োয়ালের পাহাড়ী জঙ্গলে বড় চিতা, ভাল্লুক, সাপ, কাঁকড়া বিছে, হরিণ, চামরী গাই এ-সব অনেক আছে। এদিকেও জঙ্গলে ভাল্লুক তো যথেষ্ট। চিতা বাঘও দেখা যায়। মনে পড়লো রুদ্র প্রয়াগের সেই চিতা বাঘটার কথা যাকে মারতে জিম্ করবেট্‌কে কী পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল। হরিণের মধ্যে বড় বড় শিং-ওয়ালা সম্বর অনেক আছে। কোনো অঞ্চলে এদের বলে'জরাও'। তবে এদের সংখ্যা নাকি কমে আসছে। প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর আগে গোমুখের পথে ভূজবাসার কাছে এদের অনেক দেখেছিলুম। ভিলাঙ্ উপত্যকায় 'জরাও' বেশি নেই। চিতল হরিণ অবশ্য প্রচুর। ইদানীং পাথর ফাটানো, রাস্তা তৈরি আর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে এই সব পশু সব জায়গা থেকেই পালাতে শুরু করেছে, খুঁজে নিচ্ছে অন্য কোনো নতুন অরণ্যের আস্তানা। মানুষের সভ্যতার আলোকে ওরা সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

প্রধানজীর সঙ্গে আমাদের নানা রকম কথা হচ্ছে এমন সময় একটি লোক এসে ওঁকে কী-যেন বললে। প্রধানজী আমাদের বললেন—'চলিয়ে, খানা তৈয়ার।'

লক্ষ্য করেছিলুম আমাদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে উনি কোথায়-যেন উঠে গিয়েছিলেন। এখন বোঝা গেল আমাদের খাবার তৈরির ব্যবস্থা করতে। আমরা যে আজ ওঁর অতিথি এ-কথা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলুম কুলিরাই কোথাও হয়তো আমাদের জন্যে রান্না চাপিয়েছে। হলে খবর দেবে। এখন জানা গেলো ব্যবস্থা অন্যত্র।

ঝরণার জলে হাত মুখ ধুয়ে আমরা প্রধানজীর বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। পাথরের বেশ উঁচু কয়েকটা ধাপ উঠতেই সরু বারান্দা। সেখান থেকে সামনের চাতালটা পুরো দেখা যায়। বারান্দার পাশেই ঘর। পাশাপাশি দুখানা। আমরা বারান্দায় বিছানো কম্বলের ওপর বসলুম।

একটু পরেই খানা এলো। তিনটে পিতলের পরাতে একরাশ আলুর তরকারি, আর একটা বেতের চুবড়িতে খানকুড়ি রুটি। রুটিগুলোর কী গতর! বাড়িতে আমরা যে-রুটি খাই তার চার-পাঁচ খানার সমান এদের একখানা। যিনি এই রুটি-তরকারি আমাদের জন্যে তৈরি করেছেন এবং এই মুহূর্তে আমাদের সামনে এনে রাখলেন তিনি স্বয়ং প্রধান-গিন্নি। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং রীতিমতো ফরসা। দুই গালে গোলাপী আভা, অথচ 'রুজ' মাখেন নি; ঠোঁট দুটি রক্তাভ, অথচ 'লিপ্‌স্টিক' লাগান নি। পরনে ঘাগ্‌রা। গায়ে কালো রঙের মোটা গরম কাপড়ের একটা ঢলঢলে পাঞ্জাবী-জাতীয় জামা। খানিকটা লাল লম্বা কাপড় কোমরে ফের্ দিয়ে জড়ানো। মাথার চুল অযত্নে এলোমেলো, যদিও একটা বেণী রচনা করে তাদের শাসন করার চেষ্টা হয়েছিল। প্রধানজী পরিচয় দিতেই হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। আমরা প্রতি-নমস্কার জানিয়ে খেতে শুরু করলুম। লঙ্কাগোলা আলুর তরকারি যেন অমৃত মনে হলো।

উনি ঘরের ভেতর চলে যেতেই প্রধানজী বললেন—'দেখুন, আমার এই বৌ বড় ভাল মেয়ে। খুব কাজের। আমার আরো এক বৌ আছে। সে এখন খেতে কাজ করছে। কিন্তু কথা কি জানেন—সব থেকেও কিছু নেই।' প্রধানজীর বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝলুম না। হঠাৎ এই বিচিত্র অভাববোধ ওঁকে পেয়ে বসলো কেন? কিসের অভাব? আমরা কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। ওঁর দৃষ্টি তখন দূরে পাহাড়ের গায়ে আটকে আছে। উনি কিছু দেখছেন না। ওঁর দৃষ্টিতে কেমন-যেন একটা শূন্যতা, একটা বিষাদ মাখানো।

আমি প্রশ্ন করলুম—'ক্যা বাৎ হ্যায় প্রধানজী?'

উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'দেখুন, যে সংসারে ছেলেপুলে নেই সে কি সংসার। আমার তো দু-দুটো বৌ; কিন্তু জানেন একটাও সন্তান নেই। কত ওষুধ-বিষুধ করেছি, দেওতার কাছে পূজো দিয়েছি, মানত করেছি—কিন্তু সব ব্যর্থ। আর এ শুধু আমার একার দুর্ভাগ্য নয়। এখানকার অনেক পরিবারেই বৌদের বাচ্চা-কাচ্চা হয় না। আপনারা তো অনেক পড়ালিখা করেছেন, বলতে পারেন এর কারণ কি?'

'আপনারা' বললেও উনি প্রশ্নটা আমার দিকে তাকিয়েই করেছেন। সুতরাং এবারে আমাকে রীতিমতো ফ্যাসাদে পড়তে হলো। আমি ডাক্তার নই। আর এ-সব ব্যাপারে আমার জ্ঞানও ছিটেফোঁটা। কী বলবো! চুপচাপ রুটি চিবোতে লাগলুম।

বিমল হঠাৎ আমাকে বললে—'দেখুন দাদা, প্রধানজী যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা একটা আইসোলেটেড্ কেস্ নয়। অনেক পরিবারেই ঘটছে। একটা সাধারণ লক্ষণ। আমার মনে হয় কি জানেন? পাহাড়ী মেয়েরা তো দারুণ পরিশ্রম করে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়েও বেশি। এর ফলে ওদের কারো কারো মধ্যে হয়তো সন্তানধারণের ক্ষমতাটা হারিয়ে যায়।'

আমি জানতে চাইলুম—'পরিশ্রম কি সমতলের গ্রামের মেয়েরা কম করে? কই তাদের ক্ষেত্রে তো এমন অক্ষমতার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না? সন্তানধারণ-সামর্থ অন্য কারণে হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরিশ্রম কি করে তার কারণ হয়?'

আলুর তরকারিটা বিমলের বোধ হয় বেশ ঝাল লাগছিল। ঘটি থেকে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে বললে—'হাঁ ঠিক কথা। সমতলের গ্রামের মেয়েরা খুব পরিশ্রম করে। কিন্তু সে-পরিশ্রম আর হিমালয়ের এই মেয়েদের পরিশ্রম ঠিক এক ধরনের কি? রীতিমতো চড়াই-উৎরাই-এর রাস্তায় এক মণ দেড় মণ বোঝা নিয়ে এদের হামেশাই ওঠা-নামা করতে হয়। মনে হয় এর ফলেই একটা কিছু গণ্ডগোল কারো কারো মধ্যে দেখা দেয়।'

এ-ব্যাপারে বিমলের জ্ঞানের দৌড় কতটা আমার জানা নেই। তবে ওর কথাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কী জানি এটা একটা কারণ হতেও পারে।

প্রধানজী আমাদের আলোচনা শুনছিলেন। বুঝছিলেন না বটে তবে ওঁর মুখে উৎসুকতা চক্ চক্ করছিল। ওঁর প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের কি ধারণা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিতে উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—'ইয়ে ক্যায়সে হো সক্তা হ্যায়?

ক্যায়সে তা আমরা কী করে বলবো। এতো আমাদের স্রেফ্ ধারণা।

প্রধানজীর কাছ থেকে জানা গেল পলিয়েনড্রি বা স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ প্রথা এখানে নেই। এখানে পুরুষরাই একাধিক বিবাহ করে থাকে প্রধানত বংশরক্ষার তাগিদে।

পাশ থেকে দিলীপ এবার প্রশ্ন করলো—'আচ্ছা দাদা, শুনেছিলুম হিমালয়ের কোথায়-যেন পলিয়েন্ড্রি এখনো চালু আছে, বলতে পারেন?'

—'পারি। তবে একেবারে হালের কথা বলতে পারবো না। হিমাচল প্রদেশের জৌন্সর বাবার, জৌন্সর রাওয়া এবং মাহাসু বিশেষ করে এই তিনটি অঞ্চলে পলিয়েন্ড্রি এখনো কোনো কোনো পরিবারে থাকতে পারে। আগে তো এ-সব অঞ্চলে বিয়ের ব্যাপারে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। একটি স্ত্রীর একাধিক স্বামী তো অনেক পরিবারেই থাকতো। তা ছাড়া টাকা দিয়ে বৌ কেনার প্রথাও ছিল।'

—'তাই নাকি? কি রকম?' এবারে প্রশ্নকর্তা বিমল। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। থালাগুলো দেয়ালের দিকে সরিয়ে রেখে আরাম করে গুটিয়ে বসেছি। বাইরে এখনো ঝলমলে রোদ্দুর।

বললুম—'অবিবাহিত বা বিবাহিত অল্পবয়েসী মেয়ের জন্যে দশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হতো। বিবাহ বিচ্ছেদের পর অনেক সময় সে-মেয়ের দর দুশ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত উঠতো। আর সে যদি সন্তানের জননী হতো তাহলে তো কথাই নেই, বেশ মোটা টাকা পেতো। অনেক ক্ষেত্রে তিন-চারটে স্বামী থাকলেও বৌ-এর প্রধান মুশকিল হতো ঘরে-বাইরে নানা কাজের ঝক্কি-ঝামেলা নিয়ে। কারণ পুরুষরা একটু গেঁতো। প্রায় সব কাজই বৌদের করতে হতো। এখনো হয়। তবে ও-সব সামাজিক রীতিনীতি আগের দিনের। ইদানীং পাহাড়ী যুবকদের মধ্যেও নতুন সমাজচেতনা এসেছে। পাহাড়ী-সমাজও বদলাচ্ছে।'

বসে না থেকে আমরা এবার বেরিয়ে পড়লুম। গ্রামটা একটু ঘুরে দেখতে হবে। পথে

আলাপ হলো এখানকার একজন বন-রক্ষীর সঙ্গে। লোকটা এদিকেই আসছিল। আমাদের দেখে প্রশ্ন করলে—'আপ্‌লোক আজ আয়ে হেঁ? খাট্‌লিং যাইয়েগা?'

—'জী হাঁ।' বিমল উত্তর দিল।

বোঝা গেলো কারো কাছ থেকে আমাদের আগমন-বার্তা ও আগেই পেয়েছে। লোকটি বেশ ভদ্র। এখানে আছে কয়েক বছর। কাজ শুধু মাঝে মাঝে বন্দুক ঘাড়ে করে এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়ানো। অথচ বনরক্ষী হিসেবে ওর একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। এদিকের জঙ্গলে অনেক 'জড়িবুটি' পাওয়া যায়—হরেক রকম পাহাড়ী লতাপাতা, ফলমূল, শিকড়বাকড়। অনেক ওষুধের এগুলোই মূল উপাদান। চারদিকে প্রচুর ছড়িয়ে আছে। অত্যন্ত মূল্যবান। জানলে তবে চেনা যায়, চিনলে তবে পাওয়া যায়। প্রকৃতির গুপ্তধন।

আমরা সমতলের লোকেরা চিরকাল আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়েই হিমালয়কে দেখে এসেছি। হিমালয়ে সাধু-মহাত্মারা বাস করেন, হিমালয়ে দুর্গম তীর্থপর্যটনে জীবন ধন্য হয়, মন পবিত্র হয়। তাই দীর্ঘকাল ধরে হিমালয়ে আমাদের তীর্থযাত্রা। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সাধনক্ষেত্র, নানা বিগ্রহ ও মন্দির হিমালয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আছে শিখদের তীর্থক্ষেত্র এবং ইস্‌লাম ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয়ও। তাই এতকাল আমরা হিমালয়কে দেবভূমি ও ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান বলেই জেনে এসেছি। নিশ্চয়ই এই জানার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনার ক্ষেত্রে হিমালয়ের দান অপরিসীম। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনকে ঋদ্ধিমান করার জন্যে হিমালয় তার বুকে যে অসীম ঐশ্বর্য ধরে রেখেছে সে-দিকে আমরা বিশেষ তাকাই নি। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী থেকেও হিমালয়ের এই ঐশ্বর্যের কথা অনেক জানা যায়। শিবের কথাই ধরা যাক। তিনি যে শুধু মহাদেব তাই নয়—মহাযোগী, মহাজ্ঞানী। এই অবৈদিক দেবতার আর একটি নাম বৈদ্যনাথ—অর্থাৎ বৈদ্যদের মধ্যে প্রধান—সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার। হিমালয়ের এই সব গাছ-গাছড়ার অসীম মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারলে বোঝা যাবে মহাদেব কীভাবে ডাক্তারী করতেন। এ-ব্যাপারে দেখেছি কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসী খুব ওয়াকিবহাল, আর কিছু পাহাড়ী লোকও। একজন স্বামীজীর কথা পড়েছি যাঁকে একবার একটা ভাল্লুকে আক্রমণ করে। তিনি কোনো মতে তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে কুটিরে ফিরে যান। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। কুটিরে ছিল নানা গাছের ছাল, মূল, পাতা ইত্যাদি। তাঁর নির্দেশে সেগুলি থেকে কিছু কিছু নিয়ে, কী-সব হিসেব করে গঙ্গাজল দিয়ে বেটে ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগানো হয়; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রক্তঝরা বন্ধ হয়। এই প্রলেপ অ্যান্‌টিসেপ্‌টিক হিসেবেও কাজ করে এবং ক্ষতস্থানগুলোর বেদনা সারিয়ে পরের দিনই স্বামীজীকে চাঙ্গা করে তোলে। যে-ফুলের গন্ধে লোকের মাথা ঘোরে বা লোকে অজ্ঞান হয়ে যায় সেই ফুলের বাগানের মধ্যেই তার অ্যান্‌টিডোট্‌ আছে। এক ধরনের ছোট ছোট গাছ আছে হিমালয়ের দশ-বারো হাজার ফুট উচ্চতায় অনেক দেখেছি যেগুলোর কচি কচি সবুজ পাতা একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিয়ে ধরলেই জ্বলে যায়। এক ধরনের গাছের পাতা আছে

যেগুলো শুকনো করে চায়ের জলের সঙ্গে একটু ফুটিয়ে নিলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও শরীর কিছুটা গরম রাখা যায়। এমনতর কত কী যে হিমালয়ে আছে কেউ তার হিসেব রাখে না। শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত যোগী এবং জ্ঞানী-গুণী তাঁদের কারো-কারো এ-সব খবর বা তত্ত্ব কিছু-কিছু জানা আছে।

অবশ্য কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশেও সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় হিমালয়ে বিভিন্ন গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এই-সব 'জড়িবুটি' নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। যে বনরক্ষীর সঙ্গে আমাদের এখন আলাপ হলো তার অন্যতম দায়িত্ব জঙ্গল পাহারা দেওয়া, দেখা যাতে বাইরের লোকজন এই জঙ্গলে এসে লতাপাতা, শিকড়-বাকড় চালান দিতে বা এগুলোর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।*

*লেখকের 'হিমালয়ের পথে ভিলাঙ্গনা ও পাঁওয়ালি কাস্থা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
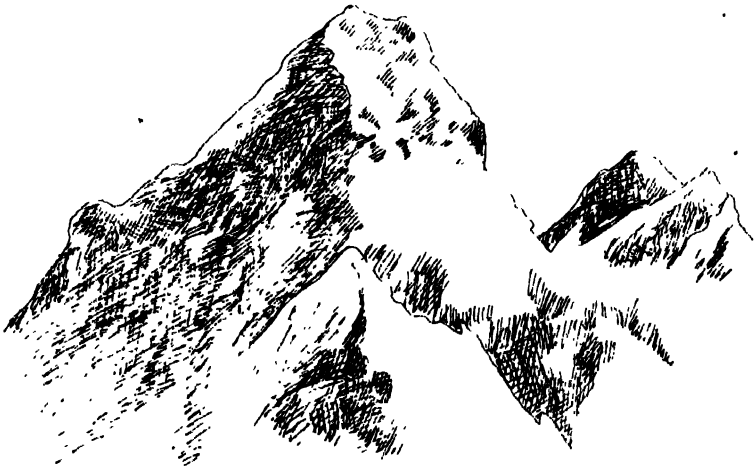
হিমালয়ের পথপঞ্জি

তারকনাথ ভট্টাচার্য

➢ অমরনাথ

শিবালয় হিমালয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের স্বয়ম্ভূ তুষারলিঙ্গ অমরনাথ। হাওড়া থেকে ৩০৭৩ হিমগিরি এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ থেকে ৩১৫১ জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে জম্মু ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে বাসে শহরে যেতে হবে।

বিকেল বেলায় জম্মু দর্শন করে নিন। জম্মু নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। রামচন্দ্রের অনুচর জাম্বুবান ছিলেন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তারই চেষ্টায় এই শহরের পত্তন হয়। তাই তার নাম অনুসারে নাম হয়েছে জম্মু। এখানকার রঘুনাথজীর মন্দির উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় মন্দির মণ্ডলী। মহারাজ গুলাব সিংয়ের হাতে শুরু, শেষ করেন পুত্র রণবীর। এর প্রাঙ্গনে অনেক মন্দির থাকলেও মূল মন্দির রামের। জয়পুর পাথরের তৈরী রাম, লক্ষ্ণণ ও সীতা। শহর থেকে ৪ কিমি দূরে তাওয়াই নদীর তীরে অবস্থিত ৩০০০ বছর আগে তৈরী ডোগরা রাজা বাহুলোচনের দুর্গ। বাগ-ই-বাহু। এই দুর্গে ২০০ বছরের প্রাচীন কালী মূর্তি আছে। আর আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাসের বাগান।

পরের দিন বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে পহেলগাঁও। দূরত্ব ২৮৭ কিমি। সময় লাগে প্রায় ১২ ঘন্টা। ৭৫০০ ফুট উচ্চতায় কাশ্মীর উপত্যকার সুন্দর পাহাড়ী শহর পহেলগাঁও। এর বুক চিরে বয়ে গেছে লীডার নদী। পহেলগাঁও থেকে অমরনাথের গুহা ৪৮ কিমি। পহেলগাঁও থেকেই অমরনাথের ছড়িযাত্রা শুরু। প্রবাদ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তক্ষককে অমরনাথ দর্শনে পাঠান সঙ্গে একটি দণ্ড বা ছড়ি দিয়ে। দণ্ড থাকলে পথে বিপদ হবে না। দণ্ড যাচ্ছে আজও প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায়। একটি রূপো দিয়ে বাঁধান লাঠিকে নিয়ে সাধুরা যাত্রা করেন। ধর্মার্থ সঙ্ঘের মোহান্ত নেতৃত্ব দেন এই মিছিলের। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অমরনাথে যাত্রী গেলেও গুরু পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত বেশী যাত্রী যায় অমরনাথে।

অমরনাথের একটা পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। একদিন পার্বতীকে একা দেখে নারদ বললেন, আপনার স্বামীর গলায় যে মুণ্ডমালা আছে সেগুলি কার জানেন? পার্বতী বললেন, না। নারদ বললেন, আপনার বিভিন্ন জন্মের পর মৃত্যু হলে আপনার মুণ্ডগুলি দিয়ে শিব মালা তৈরী করে পরেন। শিব অমর হলেও আপনি অমর নন। তখন পার্বতী শিবকে ধরলেন তাকে অমর করে দিতে হবে। শিব রাজি হলেন। হিমগিরির এই প্রত্যন্ত প্রদেশে পার্বতী এলেন শিবের সাথে অমর কাহিনী শুনে অমরত্ব লাভ করতে কারণ নিরালায় একান্ত গোপনে এ কাহিনী শুনতে হবে। বসার জায়গা না পেয়ে মহাদেব ত্রিশূলের সাহায্যে একটি গুহা সৃষ্টি করলেন। এটাই অমরনাথ গুহা। শিব শুরু করলেন অমর কাহিনী।

শিব পার্বতীকে বলে রেখেছিলেন তিনি যেন ঘুমিয়ে না পড়েন। এবং মাঝে মাঝে যেন হুঁ হাঁ শব্দ করেন। কিছুক্ষণ বাদে পার্বতী গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। এদিকে গুহার এক কোণে একটি পায়রা এই অমর কাহিনী শুনছিল। উপায় না দেখে সে হুঁ হাঁ শব্দ করতে লাগল। শিব কাহিনী বলে চললেন। কাহিনী শেষ হল। শিব দেখলেন পার্বতী ঘুমে অচেতন। শিব ধ্যানে জানতে পারলেন এতক্ষণ পায়রাটি হুঁ হাঁ করছিল। তখন শিব ত্রিশূল নিয়ে পায়রাকে মারতে গেলেন। পায়রা উড়ে গিয়ে তর্পণরত মহর্ষি ব্যাসদেবের পত্নীর কোলে গিয়ে বসল। মহাদেব পায়রাকে মারতে পারলেন না। পায়রা অমর কাহিনী শুনেছে অতএব সেও অমর হয়ে গিয়েছে। ব্যাসদেবের পত্নীর গর্ভে ঐ পায়রা জন্ম নিল। এই পায়রাই ব্যাসদেব পুত্র শুকদেব। আর অমর গুহায় শিব তুষারলিঙ্গ রূপে থেকে গেলেন।

পহেলগাঁও থেকে ১৬ কিমি দূরে ৯০০০ ফুট উচ্চতায় নীলগঙ্গার ধারে চন্দনবাড়ি। পহেলগাঁও থেকে হেঁটে এলে সময় লাগে ৩ ঘন্টা। এছাড়া জিপে বা ট্যাক্সিতেও আসা যায়। চন্দনবাড়িতে বরফের ব্রীজ আছে। পরদিন চন্দনবাড়ি থেকে হাঁটা শুরু। প্রথমে পড়বে ১১২০০ ফুট উচ্চতায় পিসুটপ। এই পথে সবচেয়ে কষ্টকর চড়াই। পিসুটপে উঠতে ১ ঘন্টার বেশী সময় লাগে। এরপর শেষ নাগ। চন্দনবাড়ি থেকে দূরত্ব ১৩ কিমি। সবুজরঙের জলে সাদা বরফের চাঁই ভেসে থাকে। এখানকার আরেকটি নাম বায়ুযান বা ওয়াবযান। এখানে সব সময় হিমশীতল বায়ু বয়ে যায়। এখানকার উচ্চতা ১২২০০ ফুট। পরদিন যাত্রা শুরু করে ৪ কিমি দূরে মহাগুনাস শীর্ষ পার হতে হয়। উচ্চতা ১৪৫০০ ফুট। সারা বছর বরফে ঢাকা আর বাতাসের ভীষণ প্রকোপ। এরপর উৎরাই। আরও ৮ কিমি দূরে পঞ্চতরণী। উচ্চতা ১২,৫০০ ফুট। পাঁচটি নদী এখানে মিলিত হয়েছে। পরদিন পঞ্চতরণী থেকে রওনা দিয়ে ৬ কিমি দূরে অমরনাথ গুহা। হিমবাহ পার হয়ে অমরগঙ্গার জল মাথায় দিয়ে ২৫০টি সিঁড়ি ভেঙ্গে অমরনাথ গুহায় পৌঁছাতে হয়। গুহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১৫০ ফুট আর উচ্চতায় ৪০ ফুট। অমরনাথের উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। গুহার মধ্যে অমরনাথের স্বয়ম্ভূ তুষার লিঙ্গ। সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা আছে। তাতে একটি ডমরু বাঁধা। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিবলিঙ্গেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। শিবলিঙ্গ ছাড়া আরও দুটি বরফের স্তূপ আছে—গণেশ ও পার্বতী। গুহার ছাদ থেকে অনবরত জল পড়ছে টপটপ করে। অমরনাথে মুসলমানদেরও সমান অধিকার কারণ একজন মুসলমান মেষপালক এই গুহা আবিস্কার করেছিল। নবম শতাব্দীতে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য এই মহাতীর্থে এসেছিলেন। ১৮৯৮ সালে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

এখন জম্মু এবং কাশ্মীর সরকার অমরনাথ যাত্রার আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। তাদের কাছে টাকা জমা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করলে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ দর্শন করে পহেলগাঁও ফিরে আসা পর্যন্ত থাকা খাওয়ার দায়িত্ব পর্যটন দপ্তরের।

এছাড়া জম্মুতে এবং পহেলগাঁওতে হোটেল ও ধর্মশালা আছে। পহেলগাঁও থেকে বাসে কাশ্মীরের যে কোন জায়গায় যাওয়া যায়।..

➤ চাম্বা-ডালহৌসি-খাজিয়ার-ভারমোর

রাজকীয় হিমরেখা আর রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য নিয়ে চাম্বা উপত্যকা। ভ্যালি অফ মিল্ক অ্যান্ড হানি। ১.১ ডিগ্রি থেকে ৩৯ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা ওঠানামা করে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এখানে সফর করা উচিত। তবে ছয় ঋতুতে বিভিন্ন সাজে সেজে ওঠে এই অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকা। শিয়ালদহ থেকে ৩১৫১ আপ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে পাঠানকোট অথবা ৩০৭৩ আপ হিমগিরি এক্সপ্রেস ধরে চাক্কি ব্যাঙ্কে নামতে হবে। চাক্কি ব্যাঙ্ক থেকে সামান্য দূরে পাঠানকোট। এখান থেকে সব বাস ছাড়ছে।

পাঠানকোট থেকে বাসে সাড়ে চার ঘন্টায় ১২০ কিমি পথ পার হয়ে ৩০০০ ফুট উঁচুতে চাম্বা। বাস, ট্যাক্সি এবং জিপ যায়। দুধ আর মধুর উপত্যকা চাম্বা উচ্ছল ইরাবতীর কোলে তার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। সবুজ হিমালয়ের পটভূমিতে এখানকার মন্দিরগুলিকে মনে হয় কারুকার্যের এক একটি যাদুঘর। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির, ১০ম শতাব্দীতে তৈরী। রাধাকৃষ্ণ, শিব, গৌরীশঙ্কর, লক্ষ্মী-দামোদর, চামুণ্ডা মন্দিরগুলিও বিখ্যাত। ইরাবতীর ওপারে ওরড়ি শিবমন্দির। ১০ম শতকে রাজা সহিল বর্মার রূপবতী কন্যা চম্পাবতীর নামে জায়গার নাম হয় চাম্বা। শহরের মাঝখানে বিশাল ময়দান চৌগান।

চাম্বা থেকে বাসে ৭০০০ ফুট উঁচুতে ডালহৌসি। পাঁচটি পাহাড় ঘেরা ছবির মত শহর। যেন শিলাপটে আঁকা। প্রশান্ত আবহাওয়া, উজ্জ্বল রোদের মাতামাতি। তুলনাহীন শৈলশহর ডালহৌসি ওক, পাইনের অরণ্যে ঘেরা ধৌলাধার আর পীরপাঞ্জালের মধ্যে এর উপস্থিতি। উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে চন্দ্রভাগা, বিপাশা এবং ইরাবতী পঞ্চনদের তিন প্রতীক। শহর থেকে ৪ কিমি দূরে সাতধারা। সাতটি নল দিয়ে জল পড়ছে। বিশ্বাস এই জলে রোগ সারে। এখান থেকে আরও ১ কিমি দূরে পঞ্চপুলা জলপ্রপাত। পাশে ভগৎ সিংহের কাকা অজিত সিংহের শহিদ স্তম্ভ। এছাড়া আছে জানদ্রি ঘাট। পাইন গাছে ঘেরা পূর্বের চাম্বা রাজাদের রাজবাড়ি। ১০ কিমি দূরে সবুজ উপত্যকার মধ্যে ডাইনকুণ্ড। এর কিছুদূরে দেবী পয়েন্ট। এখান থেকে শহর এবং তুষার শৃঙ্গের দৃশ্য দেখায় সুন্দর। আর একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা অপরূপ জায়গা কালাটোপ।

ডালহৌসি থেকে ২২ কিমি দূরে খাজিয়ার। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা—মাঝখানে একটি হ্রদ। চারিদিক ঘন সবুজ, হালকা সবুজ আর সবুজে সবুজ। দর্শনার্থী এবং দার্শনিক উভয়েই বলেন এ অঞ্চলের সেরা জায়গা। ঘন দেওদার আর পাইন বনে ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা এক বিশাল প্রান্তর। চারিদিক থেকে ঢালু হয়ে মাঝখানে সৃষ্টি করছে এক মায়াময় সবুজ হ্রদের। হ্রদের জলে ভাসে ঘাস-গুল্মের দ্বীপ। হাওয়ার দোলায় এই দ্বীপ ভেসে বেড়ায় হ্রদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। তার তীরে খাজিয়ানাগের মন্দির। চারিদিক তুষার শৃঙ্গের ঝিকিমিকির মাঝে সোনালী চূড়ার মন্দির।

এরপর ভারমোর। গেটওয়ে অফ মণিমহেশ। এখান থেকে মণিমহেশ ৩৫ কিমি। ৭০০০ ফুট উচ্চতায় ভারমোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। পাইন, দেবদারু আর চিরগাছের সবুজ অরণ্যলোক ভারমোরকে দেবলোকের সৌন্দর্য দিয়েছে। ভারমোর প্রাচীন চাম্বা

রাজ্যের রাজধানী ছিল। গ্রামের কেন্দ্র চৌরাশি। এখানে ছোটবড় ৮৪টি মন্দির আছে। এর মধ্যে মণিমহেশ, হরিহর, গণেশ, নরসিংহদেব, লক্ষণাদেবী ও ব্রাহ্মণী দেবীর মন্দির বিখ্যাত। এখানে আছে মণিমহেশের শীতকালীন মন্দির এবং ২৫ মন ওজনের বিশাল ধাতু নির্মিত নন্দী মূর্তি। ভারমোরে মেষপালক গদ্দী উপজাতির বাস।
সবজায়গায় ধর্মশালা, নামীদামী হোটেল, PWD রেষ্ট হাউস আছে।

➤ ইয়ুমথাং ঃ সিকিমের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস

ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস বললে আমরা বুঝি বদ্রীনাথের পথে গোবিন্দঘাট ছাড়িয়ে ভুইন্দার উপত্যকা। কিন্তু সিকিমেও ফুলের উপত্যকা আছে। এর অবস্থান ইয়ুমথাং-এ।
অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাজানো সিকিমের অধিকাংশ অঞ্চল পর্যটকদের স্বর্গ। কিন্তু দুর্গম পথঘাট, সীমান্ত এলাকার প্রতি সরকারি উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। পশ্চিম এবং উত্তর সিকিম সম্বন্ধে পর্যটকরা এখন কিছু জানতে পেরেছেন। ইয়ুমথাং উত্তর সিকিমে, গ্যাংটক থেকে যাত্রা শুরু করে ফোদং, মংগন, সিংঘিক, লাচুং হয়ে ফুলের উপত্যকা ইয়ুমথাংয়ে যাত্রা শেষ।
শিয়ালদহ থেকে ৩১৪৩ দার্জিলিং মেল, ৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বা হাওড়া থেকে ৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেসে নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছে রিক্সা বা অটোতে তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড। এর উল্টোদিকে সিকিম সরকারের বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে ১ ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ছে। এছাড়া জিপ এবং মারুতিও যাচ্ছে গ্যাংটক। গ্যাংটক থেকে যেতে হবে ইয়ুমথাং। পর্যটকদের উচিত হবে সিকিম সরকারের ব্যবস্থাপক সফরে সিকিম দেখে নেওয়া। তবে যাত্রীবাসে সিংঘিক পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যায়। আবার গ্যাংটক থেকে মংগন হয়ে সিংঘিক পর্যন্ত সরকারি বাস যায়। সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্টের মিনিবাস সকালে ও দুপুরে গ্যাংটক থেকে সিংঘিক যায়।
গ্যাংটক—সিংঘিক বাসপথে পড়ে ফোদং গুম্ফা, তিঙ্গছাম। এরপর মংগন। দূরত্ব ৬৫ কিমি, সারা রাস্তা সঙ্গে সঙ্গে যায় তিস্তা। মংগনের উচ্চতা ৩৯৫০ ফুট। কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং সিনিয়লচু শৃঙ্গ এখান থেকে ভাল দেখা যায়। মংগন থেকে সিংঘিক ৪ কিমি। সিংঘিক—এর পর যাত্রীবাস, মিনিবাস কিছুই যায় না। একমাত্র কনডাকটেড ট্যুরে যাওয়া যায়। সৌন্দর্যের স্বর্গ ইয়ুমথাং যেহেতু সীমান্ত এলাকায় তাই ইনারলাইন পারমিট লাগে। সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র ইত্যাদি রাখতে হবে পারমিশানের জন্য।
গ্যাংটক থেকে ১৩৫ কিমি দূরে ইয়ুমথাং। সিংঘিক থেকে কিছুটা এগিয়ে চুংথাং। মিলিটারী আস্তানা। এখান থেকে দুটি রাস্তা দুটি দিকে চলে গেছে। একটি লাচেনের দিকে অন্যটি লাচুং হয়ে ইয়ুমথাং। চুংথাং থেকে লাচুং পর্যন্ত সঙ্গ দেয় লাচুং চু নদী। লাচুংয়ে রাত্রিবাস 'অ্যালপাইন রিট্রিট'এ। লাচুং থেকে ২০ কিমি দূরে ইয়ুমথাং।
ইয়ুমথাংয়ের ৬ কিমি আগে ৯০০০ ফুট উঁচুতে ইয়াকসে লগহাট। এখান থেকে শুরু রডোডেনড্রন-এর অরণ্য। আশেপাশে হিমবাহ।

এরপর লাচুং চু নদীর ওপর সেতু পার হয়ে ইয়ুমথাং উপত্যকা। উচ্চতা ১২০০০ ফুট। উপত্যকায় বিচিত্র বর্ণের ঘাস। পাথরের গায়ে রং-বেরঙের ফুল। দূর থেকে মনে হয় গালিচা পাতা। মে মাসে যখন এখানে ফুলের মেলা বসে তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন হোলি খেলেছে। সামনে বয়ে চলেছে লাচুং চু নদী। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। পাহাড়ের মাথায় তুষার শুভ্র মুকুট।

ইয়ুমথাংয়ে থাকার জন্য বনবিভাগের বাংলো আছে। কিন্তু বিছানা, খাবার, কেরোসিন সব নিচের থেকে নিতে হবে। ইয়ুমথাং থেকে আরও ২৩ কিমি এগিয়ে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

➤ নৈনীতাল—রাণীক্ষেত—আলমোড়া—কৌসানি

কুমায়ুন হিমালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া, কৌসানি। উজ্জ্বল নীল আকাশ, সুদীর্ঘ বনভূমি, গভীর সবুজ প্রসারিত হ্রদ।

হাওড়া থেকে ৩০১৯ আপ বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেসে কাঠগোদাম অথবা হাওড়া থেকে অন্য ট্রেনে লক্ষ্ণৌ এসে রাত ৯-২০তে নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরে পরদিন সকালে কাঠগোদাম পৌঁছান। কাঠগোদাম থেকে বাস, জিপ বা ট্যাক্সিতে চেপে নৈনীতাল।

নৈনীতালের উচ্চতা ৬৩৬০ ফুট। স্থানীয় দেবী নয়নার নাম থেকে জায়গাটির নাম হয়েছে নৈনীতাল। তাল মানে হ্রদ। নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ এর বিশাল হ্রদ। হ্রদের চারপাশে শহরটি গড়ে উঠেছে। নৌকা করে হ্রদটি ঘোরা যায়। হ্রদের উপরের অংশ মল্লিতাল, নীচের অংশ তল্লিতাল। এখানকার দর্শনীয় নয়না বা চীনা পীক (৮৫৬৮′) থেকে নৈনীতালের চমৎকার দৃশ্য এবং হিমালয়ের কয়েকটি তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যায়। লারিয়া কাঁটা (৮১৪৪′), স্নো ভিউ (৭৪৫০′), ক্যামেলস ব্যাক (৮০৬৫′), মানমন্দির, মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন, রোপওয়ে, নয়নাদেবীর মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়। এছাড়া রোপওয়ে চড়ে ওঠা স্নো ভিউ পাহাড়ে। সেখানে দূরবীণে চোখ রেখে বরফ মোড়া হিমালয় দর্শন। কিংবা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে চায়না পীক বা রোদে পিঠ রেখে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখা। লেকের কোণে নৈনী দেবীর মন্দির। পাশে ভুটিয়া মার্কেট। দুদিনে পায়ে হেঁটে দেখে নেওয়া যাবে এই শহর। নৈনীতাল থেকে কনডাকটেড ট্যুরে ভাওয়ালি, ভীমতাল, সাততাল, নৌকুচিয়াতাল, হনুমানগড়ি মন্দির দেখে আসা যায়।

নৈনীতাল থেকে বাসে বা কনডাকটেড ট্যুরে রাণীক্ষেত (৬০০০′)। দূরত্ব ৫৯ কিমি। রাণীক্ষেতকে পাহাড়ের রাণী বলা যায়। পাইন, ওক, সিডার বৃক্ষের গভীর বনানী শোভিত রাণীক্ষেত থেকে হিমালয়ের তুষারমৌলি শৃঙ্গের শোভা অপরূপ। নির্মেঘ আকাশে ২০০ মাইল বিস্তৃত হিমালয়ের অসংখ্য সুউচ্চ তুষারাবৃত পর্বত শিখর দেখা যায়। সকালের প্রথম সূর্যের স্বর্ণাভা যখন পূর্ব আকাশে সোনা ছড়ায় তখন সর্বপ্রথম চোখের সামনে ভেসে ওঠে সর্বোচ্চ পর্বতশিখর নন্দাদেবী। তারপর একে একে দেখা যাবে ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, হাতিপর্বত ও গৌরী পর্বত। এছাড়া দেখা যাবে মানা পিক ও কামেট। এছাড়া

দেখবেন চৌবাটিয়া ফলের বাগান, কালিকা মন্দির, মনকামনেশ্বর মন্দির, ঝুলা দেবী মন্দির প্রভৃতি।

রাণীক্ষেত থেকে বাসে আলমোড়া। দূরত্ব ৫০ কিমি। ৫৪০০ ফুট উচ্চতায় আলমোড়া কুমায়ুনের প্রাচীন রাজধানী। তিন মাইল দীর্ঘ গিরিশিরার ওপর আলমোড়ার অবস্থান। এর চৌহদ্দিতে বানারীদেবী, কাসারদেবী, শাহিদেবী ও কাটারমল গিরিশ্রেণী অবস্থিত। আলমোড়ায় আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অকৃপণ বিস্তার তার হ্রদ, শাল-পাইনের অরণ্য, গিরিচূড়া, নদীর স্রোতে। ব্রাইট এন্ড কর্ণার থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তুষারাবৃত হিমালয়ের অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

আলমোড়া থেকে ৫২ কিমি দূরত্বে কৌসানি। বাস যাচ্ছে। ৬২৯৪′ উঁচুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রূপবতী কৌসানি। এখান থেকে তুষারাবৃত হিমালয়ের আরও বেশি বিশালত্ব দর্শনীয়। কৌসানির গান্ধী আশ্রম বা অনাশক্তি আশ্রমের চাতালে ভিউ পয়েন্ট করা আছে। সেখান থেকে দেখা যায় সকালের সূর্যোদয় আর হিমালয়ের বিখ্যাত তুষারময় শৃঙ্গগুলি—চৌখাম্বা, কামেট, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, ত্রিশূল ইষ্ট, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুল্লি প্রভৃতি। যেন শিলাময় সমুদ্রের ঢেউ। সন্ধ্যা নামতেই অন্ধকারে ঢেকে যায় সমস্ত এলাকা। তখন গরুড় উপত্যকার আলোগুলিকে মনে হয় যেন অসংখ্য জোনাকী পোকা। কৌসানিতে অনাশক্তি আশ্রম ছাড়া দেখবেন সুমিত্রা নন্দন পন্থ স্মৃতি সংগ্রহশালা, সোমেশ্বর মন্দির, কস্তুরবা গান্ধী আশ্রম প্রভৃতি। এখান থেকে ১৯ কিমি দূরে গোমতীর তীরে ত্রয়োদশ শতকের বৈজনাথ শিবের মন্দির।

নৈনীতাল, আলমোড়া, রাণীক্ষেত, কৌসানি সর্বত্র হোটেল আছে। এছাড়া আছে হলিডে হোম এবং ধর্মশালা। কৌসানির অনাশক্তি আশ্রমে ঘর পাওয়া যায়। বুকিং-ম্যানেজার, অনাশক্তি যোগ আশ্রম কৌসানি—২৬৩৬৩৯।

➢ পিণ্ডারী

কুমায়ুন-হিমালয়ের নন্দাকোট ও নন্দাখাত পাহাড়ের পাদদেশে পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার বা পিণ্ডারী হিমাবহ। যাঁরা পর্বতারোহী নন তাঁরাও অনায়াসে এই হিমবাহ দর্শন করে হিমালয়ের অন্তরলোকের পরিচয় নিয়ে আসতে পারেন। যাওয়ার পথ সেই কাঠগোদাম থেকে কৌসানি, গরুড় উপত্যকা ও বৈজনাথ মন্দির ছাড়িয়ে ভারারি—বাস পথের প্রান্তসীমা। এরপর জিপে বা মোটরে সোং। সেখান থেকে হাঁটা শুরু।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। মকাই, রামদানার চাষে লাল হয়ে থাকে মাঠ। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখা যায় উপত্যকার মাঝে লোহারক্ষেত বাংলো। একটা শীর্ণ নদী পার হয়ে লোহারক্ষেত বাংলো ৫৭০০ ফুট উচ্চতায়। বাংলোর চারিদিকে যেন সবুজ ভেলভেটে মোড়া। পাশ দিয়ে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে নির্ঝরিণীর জলধারা।

পরদিন যাত্রা শুরু ঢাকুরির দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় চড়াই। পথের ডানদিকে বিশাল খাদ। দুর্গম দুরূহ চড়াই। খালি বিশ্রাম করতে, বসে পড়তে ইচ্ছে করে। চারিদিকে গভীর বন,

পাখীর গান। এক সময় কষ্ট শেষ হয়। গাছের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। এরপর ৯৪০০ ফুট উচ্চতায় ঢাকুরি গিরিবর্ত্ম। দূরে নন্দাকোট, নন্দাদেবী, পাঁওয়ালিদ্বার প্রভৃতি। এরপর উৎরাই বেয়ে ঢাকুরি বাংলো। যেন সবুজ উঠানের মাঝে ফুল ফুটে আছে। মনে হচ্ছে শ্যামল শাড়ীর বুকে ফুল তোলা নক্সা। এখানে অল্প বিশ্রামের পর খাতির দিকে রওনা। বনের মধ্যে দিয়ে পথ। মেঘের জটাজালের মধ্যে চিকচিক করে হিমবন্তের হিমানী শিখর। ৭২৫০ ফুট উচ্চতায় খাতির বাংলো।

পরের দিন ভোরবেলা হাঁটা শুরু। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নদী পার হয়ে দোয়েলির বাংলো। দোয়েলি থেকে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটি কাফনি হিমবাহের দিকে অন্যটি পিণ্ডারী হিমবাহের দিকে। দোয়েলির বাংলোতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার হাঁটা শুরু। তারপর ফুরকিয়া। এখানকার বাংলোয় রাতের বিশ্রাম।

পরের দিন ভোর বেলা হাঁটা শুরু। সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের শিখরে শিখরে। এক সময় দেখা যায় পিণ্ডার নদী নেমে আসছে পাহাড়ের কোল থেকে। কি রূপ। বাঁদিকে বিশাল খাদ। সামনে দেখা যায় পাহাড়, শুভ্র উজ্জ্বল সাদা। যেন মহাদেবের চরণতল। এখান থেকে পিণ্ডারী নামছে। জননী বসুন্ধরাকে শস্য শ্যামলা করতে। ১২৫০০ ফুট উচ্চতায় পিণ্ডারীর জিরো পয়েন্ট। সামনে বিশাল খাদ। তার উপরে ডানদিকে নন্দাকোট ও ছাঙ্গুছ। বাঁদিকে পাঁওয়ালি ও নন্দাখাত। মাঝে বালজৌরী। নন্দাখাত ও নন্দাকোট-এর মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পিণ্ডারী হিমবাহ। সাড়ে তিন কিমি এর ব্যাপ্তি। সোনালী সূর্যকিরণে ভাস্বর হয়ে উঠেছে গিরিরাজ। মনে হয় যেন তপোমগ্ন সন্ন্যাসী। ধ্যান মৌনী মহাদেবের জটাজালে সোনালী কিরণ ঝিলমিল করে। আর এর মাঝে দেবতার শুভ্র দেহ থেকে নেমে আসছে এক ধবল রেখা। পিণ্ডারী হিমবাহ। দেখা যায় ট্রেলস্ পাস, পিণ্ডার হিমবাহ ও পিণ্ডার গঙ্গার স্নাউট পয়েন্ট।

থাকার জন্য লোহারক্ষেত, ঢাকুরি, খাতি, দোয়েলি ও ফুরকিয়াতে PWD, KMVN বাংলো। গ্রামের বাড়িতেও থাকা যায়। পিণ্ডারী জিরো পয়েন্টে রাত কাটালে তাঁবু সঙ্গে নিতে হবে।

➤ কাফনি হিমবাহ

হাওড়া থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে পিণ্ডারী যাওয়ার পথে দোয়েলি পর্যন্ত একই পথ। দোয়েলি থেকে পথ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি পথ পিণ্ডারীর দিকে অন্যটি কাফনি হিমবাহের দিকে। দোয়েলি থেকে ১২ কিমি। যাতায়াতে ২৪ কিমি। পথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। খাড়া চড়াই। কোন পথ রেখা নেই। সঙ্গে তাঁবু না নিলে রাত কাটানো যাবে না। কাফনি থেকে নন্দাকোট শৃঙ্গ আরও কাছে। কাফনি উৎসের কাছে একটা হেলানো পাথরের গুহা আছে। এখানে রাত কাটানো যেতে পারে। ১২৬৬৫ ফুট উচ্চতায় কাফনি হিমবাহ। পিণ্ডারী হিমবাহ দেখে দোয়েলি এসে এরপর কাফনি হিমবাহ দেখে লোহারক্ষেত হয়ে ফিরে আসা যায়।

➢ রূপকুণ্ড

রহস্যে ও কিংবদন্তীতে ভরা রূপকুণ্ড গাড়োয়াল-কুমায়ুনের একটি 'মোরেনপন্ড' গ্রাবরেখা-কুণ্ড, রূপকুণ্ড একটি ডিম্বাকার হ্রদ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নন্দাদেবীর উৎসবে যোগদানকারী তীর্থযাত্রীদের একটি দলের মৃত্যু ঘটেছিল। তাদের মৃতদেহ ৬-৭ শ বছর ধরে পড়ে আছে রূপকুণ্ডের তীরে। রূপকুণ্ড রহস্য আবিস্কারের জন্য বহু বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রীদল রূপকুণ্ডে আসছেন বহু বছর ধরে।

ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ এবং চনোনিয়াকোট পর্বতমালার সংযোগস্থলে রূপকুণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ বড় সুন্দর। রূপকুণ্ড থেকে আরো ৩০০ ফুট ওপরে জিউনারগলি গিরিবর্ত্ম। গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নিচে শিলাসমুদ্র হিমবাহ। হিমবাহটি প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ। এর এক পাশে ত্রিশূলের গিরিগাত্র আর একপাশে চনোনিয়াকোট পর্বতগাত্র। এই হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে নন্দাকিনী নদী।

বদ্রীনাথ পথের নন্দপ্রয়াগের নন্দাকিনী নদী পার হয়ে উত্তর দিকে বেশ কিছু পথ গেলে সমতল সবুজ জমিতে হোমকুন্ড। এখানে একটি পাথরের ওপর বসে দেবী নন্দা মহাদেবের কাছে কৈলাসে আশ্রয় পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন বলে কথিত। মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য তিনি হোম করেন এখানে। তাই এই জায়গার নাম হোমকুন্ড। এটির অপর নাম ত্রিশূলী তীর্থ। ১২ বছর অন্তর বড় নন্দাযাত্রা এখানে আসে নন্দাদেবীর কৈলাস যাত্রার স্মারক হিসাবে। হোমকুন্ড থেকে আরো ৩-৪ মাইল ওপর হোমকুন্ড গলির পথে তুষারাবৃত একটি হ্রদ আছে। কেউ কেউ বলেন ওটি নাকি আসল হোমকুন্ড।

হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ধরে কাঠগোদাম বা হলদোয়ানি। সেখান থেকে বাসে গোয়ালদাম। গোয়ালদাম থেকে জিপে দেবল। এখান থেকে হাঁটা শুরু।

দেবল থেকে হেঁটে প্রথমদিন মান্দোলি (৭৬০০´)। চায়ের দোকান আছে। এখান থেকে নিচে বগড়িগড়ে কোয়েল নদী পার হয়ে টানা চড়াই। পরদিন এ অঞ্চলের শেষ গ্রাম ওয়ান (৮০০০´)। এখানে লোহাজং গিরিবর্ত্ম পার হতে হবে। লোহাজং-এ চায়ের দোকান ও নন্দা দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরে রয়েছে একটি বিরাট ঘণ্টা। ৩য় দিনে বৈদিনী বুগিয়াল (১২,৫০০´)। বুগিয়াল মানে উচ্চ হিমালয়ের চারণভূমি। গ্রীষ্মকালে ভেড়াওয়ালারা যেখানে ভেড়াদের চড়াতে নিয়ে আসে। এখান থেকে হাঁটা পথে প্রথমে অল্প চড়াই তারপর উৎরাই। পার হতে হবে নীলগঙ্গা। বৈদিনী বুগিয়ালে একটি ছোট হ্রদ আছে। পাশে আছে দুর্গামূর্তি। এখান থেকে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গের দৃশ্য ভারি সুন্দর। পরদিন বগুয়াবাসা (১৪,৬০০´)। দূরত্ব প্রায় ১৮ কিমি। পথে পড়বে পাথরনাচুনী এবং কৈলু বিনায়ক। তীর্থক্ষেত্রের দ্বারপাল গণেশ। এখান থেকে ৫ কিমি দূরে ১৬,৭০০ ফুট উচ্চতায় রূপকুণ্ড। পথে পড়বে রাণীকা সুলেড়া।

চনোনিয়াকোট পাহাড়ে এই রূপকুণ্ড। সারা বছরই বরফে ছাওয়া। পাহাড়চূড়া চক্রাকারে প্রহরায় রত। পাশে দাঁড়িয়ে ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টি। ওদের নিশ্বাস যেন ঢেউ তোলে হ্রদের জলে। প্রতি ১২ বছর অন্তর যে উৎসব হয় সেই উৎসবের মিছিল চলে নন্দপ্রয়াগ ছাড়িয়ে কর্ণপ্রয়াগের কাছে নৌটি গ্রামে। রূপোর পাল্কিতে সোনার নন্দাদেবীর মূর্তি।

সঙ্গে তাঁবু এবং খাবার নিতে হবে। জ্বালানি, কুলি এবং অন্যান্য জিনিস সবই পাবেন গোয়ালদামে।

➢ অচেনা কুমায়ুন

কুমায়ুন বিখ্যাত তার রোমাঞ্চকর সৌন্দর্যের জন্য। চৌখাম্বা থেকে পঞ্চচুল্লির পাগল করা অসামান্য রূপ যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন মনে হয় সার্থক এ মানব জনম। সেই কুমায়ুনের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অচেনা সৌন্দর্য নিকেতন এর পরিচয়।

শীতলাক্ষেত

হাওড়া থেকে কাঠগোদাম এক্সপ্রেসে হলদোয়ানিতে নেমে বাসে আলমোড়ার পথে প্রায় ৩৬ কিমি. দূরে কুমায়ুনের নতুন পর্যটন কেন্দ্র শীতলাক্ষেত। মাঝে কাঠপুরিয়া নামে এক জায়গায় চা পানের বিরতি। এখান থেকে শীতলাক্ষেত ১০ কিমি। নির্জনতা আর সৌন্দর্যে মনে হয় স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। চারিদিকে ফুল ফলের বাগান আর আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে প্রায় ৬৫০০′ উঁচুতে কুমায়ুনের নতুন আবিষ্কার শীতলাক্ষেত। রয়েছে চারিদিক গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশে রেষ্ট হাউস। যারা নির্জনতা ভালবাসেন তাঁদের জন্য আদর্শ এই হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে তৈরি সুন্দর বাংলোটি। এত নির্জন যে সামান্য আওয়াজেও অনেকসময় চমক লাগে। সন্ধ্যার পর চোখে পড়বে দিগন্ত জুড়ে পাহাড়চূড়ার আভাস। যেদিকে চাইবেন চোখ আটকে যাবে। বহুদূরে যেন হাজার আলোর রোশনাই। ওগুলো আলমোড়া শহরের আলো। পরদিন সকালবেলা সূর্যোদয়ের আলোয় চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠবে ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুল্লি। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাবে তুষার মুকুটের রঙ। এরপর দিগন্ত জুড়ে শুধু রূপোলি আলো। শীতলাক্ষেত্রের হিমাদ্রির মায়াময় সৌন্দর্যের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ছবি হয়ে থাকবে।

বিনসার

আলমোড়া থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বিনসার। তবে এখানে যাবার সরাসরি কোনো বাস নেই। কাপরাঘানস পর্যন্ত বাস যায়। তারপর প্রায় ১০ কিমি চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। ওক, পাইন, দেবদারু আর রডোডেনড্রন গাছের মধ্যে দিয়ে পথ। উচ্চতা ৭৯৬০′। বড় বড় গাছ ডালপালা মেলে অভ্যর্থনা জানায় পর্যটকদের। এখানকার রেস্ট হাউসটি সবুজের রাজ্য। যেন পাহাড়ের গায়ে সবুজের মাঝে একটি নির্জন দ্বীপ। এই ফুলে ফলে ভরা বাগানে বসে নীরবে উপভোগ করা যায় তুষার চূড়ার চির নতুন সৌন্দর্য। সূর্যাস্তের মোহিনী আলোয় এদের রূপ যেন ফেটে পড়ে। বিনসারের নির্জন পথে চলতে চলতে দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে প্রকৃতির মণি-মাণিক্য। বিনসার একসময় ছিল কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের রাজধানী। সেই সময়ের মন্দির এখনও আছে। বনপথ ধরে ২ কিমি. মতো হেঁটে গেলে জিরো পয়েন্ট। এখান থেকে নন্দাদেবী, ত্রিশূল, চৌখাম্বা, নন্দাকোটের চূড়ায় সূর্যাস্তের রঙবাহার যেন যাদুর দেশে নিয়ে যায়।

বাগেশ্বর

বিনসার থেকে আলমোড়া হয়ে বাসে বাগেশ্বর। সরযূ এবং গোমতী নদীর সঙ্গমে সবুজে ছাওয়া প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। অনেকে বাগেশ্বরকে বলে কুমায়ুনের এলাহাবাদ। প্রবাদ আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেব এখানে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাতারাতি এই শহর গড়ে ওঠে। সরযূর তীরে একটা প্রাচীন শিব মন্দির আছে। নদীর কলতান বহু দূর থেকেও শোনা যায়। ভোরবেলায় কুমায়ুন মন্ডলের ট্যুরিষ্ট বাংলোর বারান্দা থেকে বরফের মুকুটপরা চূড়ার সারি দেখা যায়। এই বাগেশ্বর থেকেই ভারারি, লোহারক্ষেত হয়ে পথ গেছে পিণ্ডারী গ্লোসিয়ারে।

[এখানে সরকারি বাংলো এবং হোটেল আছে।]

চৌকোরি

বাগেশ্বর থেকে জিপে চৌকোরি। সরযূর পুল পার হয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। প্রায় আড়াই ঘন্টা পর ৬৬৯৪′ উচ্চতায় চৌকোরি। যে দিকে চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে মাঝে নাম না জানা পাখির ডাক। অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ। রাস্তার মোড়ে পুলিশ চৌকির উল্টোদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে চা বাগান শুরু। সোজা এগিয়ে গেলে একটা টিলা। এখান থেকে সমস্ত এলাকাটা দেখা যায়। সামনে অভ্রভেদী হিমালয়। মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

চৌকোরির ভোর অসাধারণ। দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের বরফ সাদা চূড়াগুলি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। বাঁয়ে নন্দাঘুণ্টি, ত্রিশূল, নন্দাকোট, নন্দাদেবী। আর সোজাসুজি পঞ্চচুল্লি। চোখের নিমেষে ত্রিশূলের মাথায় কে যেন গলানো সোনা ঢেলে দেয়। ক্রমশঃ রাঙা হয়ে ওঠে ত্রিশূলের তিনটি শৃঙ্গ। এরপর নন্দাঘুণ্টি আর নন্দাকোট রাঙা হয়।

পরদিন বাসে কোটমনিয়ায় নেমে প্রায় ঘন্টা খানেক হেঁটে কস্তুরী ফার্ম। উঁচু জালে ঘেরা কস্তুরী ফার্ম বা মাস্ক ডিয়ার রিসার্চ সেন্টার। কস্তুরী মৃগরা 'ত্রিপাতিয়া' নামে এক শ্রেণীর গাছের পাতা খায়। কস্তুরী মৃগের প্রধান আকর্ষণ তাদের নাভি। অ্যানাসথেসিয়া করে পুরুষ মৃগের নাভি অপারেশন করে ভালোভাবে প্যাক করে দ্রুত দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই নাভি দিয়ে তৈরি হয় জীবনদায়ী ওষুধ।

পাতাল ভুবনেশ্বর

চৌকোরির ৩৮ কিমি দূরে পাতাল ভুবনেশ্বর। মহাদেবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। চৌকোরি থেকে পিথোরগড়গামী বাসে গুপ্তরী। এরপর প্রায় ৮ কিমি হাঁটা পথ। চৌকোরি থেকে জিপ ভাড়া করেও সরাসরি পাতাল ভুবনেশ্বর যাওয়া যায়। পাণ্ডবেরা বনবাসের সময় নাকি এখানে এসেছিলেন। প্রায় আড়াই ফুট চওড়া গুহাপথে চলতে হবে কখনও প্রায় শুয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা লাফিয়ে। সঙ্কীর্ণ গুহা পথে প্রায় ১০০ ফুট নামতে হয়। প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে স্ট্যালেকটাইট ও স্ট্যালেগমাইট দিয়ে গুহার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুদের বহু দেবদেবীর মূর্তি।

পাতাল ভুবনেশ্বর থেকে আরও ১৪ কিমি এগিয়ে ৫৩০০ ফুট উচ্চতায় ত্রিপুরাদেবী। প্রায় অনাবিস্কৃত এই জায়গাটির সুনাম তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার জন্য। পিথোরাগড় জেলার এই ছোট্ট গ্রামটি গড়ে উঠেছে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে। ৪০০ বছরের বেশি পুরানো এই মন্দিরে এখনও রোজ পূজা হয়। মন্দিরের নামেই গ্রামের নাম।

সব জায়গাতেই হোটেল এবং বাংলো আছে।

➤ মায়াবতী

ঘন বনে ঘেরা শান্ত নিভৃতির অন্তরালে তপোভূমি মায়াবতী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও সাধনার পীঠ। একদিন সুইজারল্যান্ডে, আল্পস পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতে হিমালয়ের কোলে এমন একটি সুন্দর ও নিরিবিলি জায়গা পেলে ভাল হত। সেদিন ইংরাজ জেভিয়ার দম্পতি কথাটি শুনেছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে ছেলের মত ভালবাসতেন। তাই তাঁরা ভারতে এসে অনেক খুঁজে ভারত-নেপাল সীমান্তে, কুমায়ুন অঞ্চলের একটি চা বাগিচা কেনেন। পাহাড়ী জঙ্গল, ১০০ একরেরও বেশি জমি । প্রায় ৬৫০০ ফুট উঁচুতে। চারিদিকে পাহাড় আর শ্যামল অরণ্য। দেবদারু, পাইন ওক ছাড়াও নানা গাছপালা এবং যোজন যোজন জুড়ে রক্ত রাঙা রডোডেনড্রনের বিশাল বনভূমি। আর উত্তরে হিমালয়ের তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গ। ৫ মাইল দূরে লোকালয়। স্থানীয় লোকেরা জায়গাটিকে বলত 'মাঈপেট' অর্থাৎ মায়ের পীঠ। জায়গাটি স্বামীজির খুবই পছন্দ হল। তিনি নতুন নাম দিলেন মায়াবতী। ১৮৯৯ সালের ১৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম'। এ আশ্রমে কোন মন্দির বা বিগ্রহ নেই। আনুষ্ঠানিক পূজা, আরতি নেই। শুধু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, আত্মার শুদ্ধি, ধ্যান ও বেদ পাঠ।

হাওড়া থেকে ট্রেনে লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ থেকে নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরে পিলভিট পৌঁছে আবার ট্রেন ধরে টনকপুর। এছাড়া বেরিলি জংশনে নেমে পিলভিট এসেও টনকপুর আসা যায়। নিকটতম রেল স্টেশন টনকপুর । টনকপুর থেকে বাসে লোহাঘাট ৯১ কিমি। বাসে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লাগে। আলমোড়া থেকে ১১৮ কিমি। এছাড়া দিল্লী, বেরিলি, পিলভিট, পিথোরাগড়, রানীক্ষেত, আলমোড়া থেকেও বাস যাচ্ছে। লোহাঘাট থেকে ৯ কিমি মায়াবতী। জিপ যাচ্ছে। হেঁটেও যাওয়া যায় পাকদণ্ডী পথে।

লোহাঘাট থেকে জিপে যাত্রা শুরু। লোকালয় ক্রমশঃ আড়ালে চলে যায়। পাহাড়ের গা ঘুরে ঘুরে চড়াই পথে জিপ উঠতে থাকে। রডোডেনড্রনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। এক ধরনের পাইনের রং পদ্ম পাতার মত সবুজ। ঘন সবুজ দেবদারু আর ওক গাছ। আকাশ ঝকমকে নীল। গাছপালার ভিতর দিয়ে আশ্রমের মূল বাড়িটি দেখা যায়। ছবির মত সুন্দর। যেন সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ এক অয়েল পেন্টিং।

কিছুটা দূরে 'স্বরূপানন্দ পয়েন্ট' হাঁটা পথে। কাঠের খাঁচার মধ্যে একটি বাঁধানো বেদী। মায়াবতী মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী স্বরূপানন্দজী এই বেদীতে বসে ধ্যান করতেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখবেন ঝকঝকে সোনালী সকাল। পরিষ্কার আকাশ।

মায়াবতীর অন্যতম আকর্ষণ হিমালয়ের হিমতুষার শৃঙ্গগুলি। এখানকার উচ্চতম পয়েন্ট 'ধরমগড়'। পাহাড়ের অন্য দিকে আশ্রমের গোশালা। বড় বড় অস্ট্রেলিয়ান গরু এবং হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। কিছুদূরে আপেল, ন্যাসপাতি, মুসম্বি, কাজু, স্কোয়াস, ভুট্টা, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি ফল ও সবজির বাগান। একটু এগিয়ে বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত মায়াবতীর ছোট হ্রদটি।

শান্ত ও সুন্দর মায়াবতী আশ্রমে সারাদিন পাখির কলগানে মুখরিত। নানা রঙের জানা-অজানা পাখি। সবুজ বনানী আর রঙিন ফুলে-ফলে সদাই প্রজাপতি আর মৌমাছির মেলা। মনে হয় স্বর্গ বলে যদি সত্যি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা এখানে—স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য মায়াবতী আশ্রমে।

▶ দেরাদুন-মুসৌরি

দেরাদুন

শিবালিক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে গঙ্গা ও যমুনা বিধৌত উর্বর দুন উপত্যকা নিয়ে যুগে যুগে যুদ্ধ হয়েছে। উপত্যকার মধ্যমণি শহর দেরাদুন রেল ও মোটরপথের বড় টার্মিনাল। দেরাদুন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপূর্ব শহর। কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৫২৪ কিমি। উচ্চতা ২১০০ ফুট। হাওড়া থেকে ৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস ধরে সরাসরি দেরাদুন যাওয়া যায়। ২০০০ সাল থেকে আরেকটি সুপারফাস্ট ট্রেন হয়েছে।

সহস্রধারা ঃ দেরাদুন থেকে ১৪ কিমি। সহস্রধারার ঝরনার জলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক আছে। স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। মোটর বা বাসে যাওয়া যায়।

রবার্স কেভ বা গুচ্ছু পানি ঃ ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবস্থিত। ষ্টেশন থেকে ৯ কিমি। এখানে কখনো জল দেখা যায় আবার কখনও জল অদৃশ্য হয়ে যায়। বাস যাচ্ছে।

ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঃ দেরাদুন থেকে ৫ কিমি দূরে চক্রাতা রোডের ওপর অবস্থিত। এখানে ভারতের বনসম্পদ নিয়ে গবেষণা হয়। সঙ্গে একটি মিউজিয়াম আছে। এর পাশে মিলিটারি আকাদেমি।

টপকেশ্বর মহাদেব ঃ ঘড়িঘর থেকে ৫ কিমি দূরে গুহার মধ্যে টপকেশ্বর মহাদেব। বাসে গরহি পর্যন্ত গিয়ে কিছুটা পথ হাঁটতে হয়। এছাড়া মোটরেও যাওয়া যায়। শিবরাত্রিতে প্রতি বছর মেলা বসে।

দেরাদুন জেলা সদর। রাত্রিবাসের অসুবিধে নেই। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাংলো, বহু ছোট-বড় হোটেল, ভাল ভাল ধর্মশালা ও প্রচুর হলিডে-হোম আছে।

মুসৌরি

১৮২৭ সালে ইংরাজ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইয়াং দেরাদুন থেকে মাত্র ৩৫ কিমি দূরে মুসৌরি আবিষ্কার করেন। এখন মুসৌরি হিমালয়ের একটি আধুনিক শৈলশহর। প্রায় ৬৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত মুসৌরি সৌন্দর্যে রমণীয় আর আবহাওয়ায় বরণীয়।

মুসৌরির দু'টি অংশ। দু'জায়গাতেই বাস স্ট্যাণ্ড আছে। উত্তরে লাইব্রেরী বাস স্ট্যান্ড এবং দক্ষিণে পিকচার প্যালেস বাস স্ট্যান্ড। দু জায়গাতেই হোটেল এবং ধর্মশালা আছে। শহরে ট্যাক্সি, রিক্সা চলে।

হরিদ্বার গেটওয়ে অব গাড়োয়াল হলেও আসল যাত্রা শুরু হৃষিকেশ থেকে। চার তুষার তীর্থের অধিকাংশ বাস ছাড়ে এখান থেকে। আগের দিন বাসের টিকিট কেটে রাখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে প্রথম বাস ধরার।
এখানে বহু ধর্মশালা আছে। হোটেলও আছে প্রচুর।

কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

হৃষিকেশ থেকে বাস পথে কেদারনাথ ২২৬ কিমি আর বদ্রীনাথ ২৯৪ কিমি। হৃষিকেশ থেকে পথ প্রথমে গঙ্গা এবং পরে অলকানন্দার তীরে তীরে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত গেছে। কেদারনাথ এবং বদ্রীনারায়ণের যাত্রীরা রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত একই পথে আসবে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের পথ আলাদা হয়ে গেছে। অলকানন্দা ছেড়ে তখন মন্দাকিনীর তীরপথ ধরতে হবে। আর অলকানন্দার সঙ্গে যেতে হবে বদ্রীনাথের জন্য।
হৃষিকেশ থেকে প্রথমে পড়বে দেবপ্রয়াগ। ৬৯ কিমি দূরে ১,৭০০ ফুট উঁচুতে। এখানে, অলকানন্দার সঙ্গে ভাগীরথীর মিলন হয়েছে। সঙ্গমের কাছে মহাদেব ও রামচন্দ্রের মন্দির আছে। এখানে স্নান ও পিণ্ডদানরীতি। ধর্মশালা এবং হোটেল আছে। দেবপ্রয়াগ থেকে ২টি পথ দুদিকে গেছে। একটি ভাগীরথীর তীরে তীরে টিহরী হয়ে ধরাসু। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথ।
দ্বিতীয় পথ অলকানন্দার তীরে তীরে শ্রীনগর হয়ে রুদ্রপ্রয়াগ। শ্রীনগরের দূরত্ব হৃষিকেশ থেকে ১০৬ কিমি এবং দেবপ্রয়াগ থেকে ৩৭ কিমি। উচ্চতা ১৭০৬ ফুট। এখানে আছে মহাদেব ও বিষ্ণু মন্দির।
শ্রীনগর থেকে ৩৭ কিমি দূরে রুদ্রপ্রয়াগ। উচ্চতা ২০০০ ফুট। এখানে কেদারনাথের মন্দাকিনী এসে বদ্রীনাথের অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখান থেকে একটি পথ গেছে কেদারনাথে। আর অন্য পথটি গেছে বদ্রীনাথে। রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমের কাছে রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির। প্রবাদ গয়া রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে ব্রহ্মরাক্ষস যোনিপ্রাপ্ত দু'লক্ষ ব্রাহ্মণ এই সঙ্গমে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সঙ্গমে স্নান ও দানে পুণ্য হয়। এখানে হোটেল এবং ধর্মশালা আছে।

কেদারনাথ

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অগস্ত্যমুনি, কুণ্ডচটি, গুপ্তকাশী, নালা, সীতাপুর, শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড থেকে হাঁটাপথে কেদারনাথে যেতে হয়। গৌরীকুণ্ড থেকে ৪ কিমি দূরে জঙ্গলটি। জঙ্গলটি থেকে ৪ কিমি দূরে রামওয়াড়া চটি। রামওয়াড়া থেকে ৬ কিমি দূরে কেদারনাথ। এর মাঝামাঝি দূরত্বে গরুড় চটি। গরুড় চটি পার হতেই মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। পথে সর্বত্র চা, পকৌড়া এবং অন্যান্য খাবার জিনিস পাওয়া যায়। কেদারনাথ পর্বতের দক্ষিণে কেদারনাথ মন্দির (১১,৭৫০ ফুট) ও উপত্যকা। মন্দিরের ভেতরে মহিষের পশ্চাৎদেশরূপী মহাদেবের শিলাময় মূর্তি। এখানে কয়েকটি কুণ্ড আছে। মন্দিরের পিছনে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের মঠ দর্শনীয়। কেদারনাথ থেকে ৮ কিমি দূরে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় বাসুকীতাল। এখান থেকে বাসুকী নদীর উৎপত্তি।
এখানে হোটেল ও ধর্মশালা আছে।

বদ্রীনাথ

কেদারনাথ থেকে গৌরীকুণ্ড নেমে বাসে করে বদ্রীনাথ। বাসে রুদ্রপ্রয়াগে এসে অলকানন্দার দক্ষিণ তীর ধরে পথ চলে গেছে কর্ণপ্রয়াগে (২৬০০ ফুট)। কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডার নদী বা কর্ণগঙ্গা অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। এখানে উমা এবং কর্ণের মন্দির আছে। এখানে কর্ণ সূর্যদেবের বর এবং কবচ-কুণ্ডল লাভ করেছিলেন।

তারপরে নন্দপ্রয়াগ ৩০০০ ফুট উচ্চতায়। এখানে অলকানন্দার সঙ্গে নন্দাকিনী নদী মিলিত হয়েছে। এখানে রাজা নন্দ, গোপালজী এবং রমাপতির মন্দির আছে, হোটেল ও ধর্মশালা আছে।

নন্দপ্রয়াগ থেকে ৩১৫০ ফুট উচ্চতায় চামোলি। এখানেও ধর্মশালা এবং হোটেল আছে। এখান থেকে যোশীমঠ (৬১৫০ ফুট)। যোশীমঠ শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম। এখানে নৃসিংহবদরী, দুর্গামন্দির, রামসীতা মন্দির আছে। এখান থেকে বদ্রীনাথ, নন্দনকানন, হেমকুণ্ড, নিতিপাস প্রভৃতি দিকে যাওয়া যায়।

অলকানন্দা উপত্যকার পশ্চিম ও পূর্ব তীর জুড়ে বদ্রীক্ষেত্র। নদীর বাঁদিকে বাসস্ট্যান্ড আর ডানদিকে বদ্রীনাথের মন্দির। মন্দিরের ভেতরে নারায়ণের মূর্তি। মূল মন্দিরের চারিদিকে আছে দেবী লক্ষ্মীর মন্দির, গরুড় মন্দির প্রভৃতি। মন্দিরের বাঁদিকে ধর্মশিলা এবং ডানদিকে ক্ষেত্রপাল মন্দির। এখানে আছে উষ্ণ প্রস্রবণ। আছে মার্কণ্ডেয় শিলা। ঋষি মার্কণ্ডেয় এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন। অলকানন্দার তীর থেকে মন্দিরের চারদিকে ৫টি শিলা আছে। এগুলিকে বলে নৃসিংহশিলা, বরাহ শিলা, নারদ শিলা, গরুড় শিলা, মার্কণ্ডেয় শিলা। বদ্রীনাথের পিছনে নারায়ণ পর্বত এবং পাশে বিখ্যাত নীলকণ্ঠ পর্বত। এখান থেকে মানাগ্রাম, ব্যাসগুহা, বসুধারা জল প্রপাত যাওয়ার রাস্তা আছে। বদ্রীনাথ থেকে যাওয়া যায় অলকানন্দার উৎস শতোপন্থ হিমবাহে। দুর্গম পথ। দূরত্ব প্রায় ১৫ কিমি।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের বাকি দুইধাম হল গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী। হৃষীকেশ থেকে বাসে প্রথমে চলুন গঙ্গোত্রী। ধরাসু, উত্তরকাশী, গাঙনানী, লঙ্কা, ভৈরবঘাঁটি হয়ে। এরপর বাসে উত্তরকাশী এসে যমুনোত্রী চলুন।

হৃষিকেশ থেকে বাসে প্রথমে ধরাসু। ১২০ কিমি দূরত্বে এবং উচ্চতা ৩৪৪০ ফুট। গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী পথের সঙ্গম এখান থেকে ২৮ কিমি। উচ্চতা ৩৬৪০ ফুট। এখন জেলাসদর। এখানে বিশ্বনাথ, কালী, রুদ্র, অন্নপূর্ণা ও পরশুরামের মন্দির আছে। আর আছে 'নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনীয়ারিং'। এরপর গাঙনানী। এখানে একটি উষ্ণকুণ্ড আছে। তারপরে হরশিল। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। আপেলের চাষ হয়। কিছু দূরে মুখীমঠ। এখানে গঙ্গাদেবীর মূর্তি আছে। শীতকালে গঙ্গোত্রীর মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে এখানে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়।

গঙ্গোত্রী

হরিদ্বার/হৃষিকেশ থেকে বাস এসে থামবে গঙ্গোত্রীতে। গঙ্গার ডানদিকের তীরে ভগবতী গঙ্গার বিরাট স্বর্ণমন্দির। মন্দিরে গঙ্গাদেবীর পাথরের মূর্তি আছে। পাশে যমুনাদেবী, সরস্বতী, ভগীরথ ও শ্রীশঙ্করাচার্যের মূর্তি। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করেন জয়পুরের রাজা অমর সিং থাপা। পাশে ভগীরথ শিলা। এই শিলার ওপর ভগীরথ তপস্যা করার পর সাগররাজার ৬০ হাজার পুত্র মুক্তি পেয়েছিলেন। এখানে ধর্মশালা, ডাকবাংলো এবং হোটেল আছে।

গঙ্গোত্রী থেকে ১৯ কিমি দূরে ১২,৭৭০ ফুট উচ্চতায় গোমুখ। গঙ্গোত্রী থেকে পথটি অরণ্যময়। চীর, ভূর্জ, দেবদারু আর রডোডেনড্রনের গাছ দুধারে। গঙ্গোত্রী থেকে ১০ কিমি দূরে ১১,৮৩০ ফুট উচ্চতায় চীরবাসা। এর ৬ কিমি দূরে ১২,৪৪০ ফুট উচ্চতায় ভূজবাসা। ভুজবাসা থেকে ৩ কিমি দূরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের স্নাউট অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উৎসমুখ। ২৪ কিমি দীর্ঘ এবং ২ থেকে ৪ কিমি প্রশস্ত গঙ্গোত্রী হিমবাহের প্রান্তদেশ। গাড়োয়ালের বৃহত্তম হিমবাহ। এই হিমবাহের গ্লেসিয়ার পয়েন্ট বা স্নাউট তথা নাসিকা হচ্ছে গোমুখ। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে ভাগীরথী, কেদারনাথ, শিবালিঙ্গ প্রভৃতি হিমালয়ের কয়েকটি বিখ্যাত শৃঙ্গ। ভুজবাসা এবং চীরবাসায় খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা আছে। তবে এপথে খাবার সঙ্গে আনা ভাল।

গোমুখ থেকে আরও পশ্চিম দিকে প্রায় ৫ কিমি দূরে ১৪২০০ ফুট উচ্চতায় তপোবন। একটি চমৎকার সবুজ সমতলভূমি। সাধু সন্তের তপোভূমি তপোবন।

যমুনোত্রী

গঙ্গোত্রী থেকে বাসে উত্তরকাশী। উত্তরকাশীতে থেকে পরদিন বাস ধরে হনুমানচটি। তবে রাস্তা খারাপ থাকলে স্যানাচটি পর্যন্ত বাস যায়। হনুমানচটি থেকে ১৩ কিমি দূরে যমুনোত্রী। যমুনা দেবীর মন্দির। এখানে অসংখ্য কুণ্ড আছে। এগুলি তপকুণ্ড। প্রধান প্রস্রবণটির নাম সূর্যকুণ্ড। যাত্রীরা এই কুণ্ডে পূজা অর্চনা করে। সূর্যকুণ্ডই যমুনোত্রীর মুখ্য তীর্থ। এটিকে যমুনাদেবীর মুখারবিন্দ বলা হয়। তপ্তকুণ্ডে চাল ডাল ইত্যাদি অল্প সময়ে সুসিদ্ধ হয়ে যায়। এখান থেকে প্রায় ৭ কিমি উত্তরে বন্দরপুঞ্চ পর্বতের সানুদেশে থেকে তিনটি জলধারা এসে এখানে মিলিত হয়ে যমুনা নামে খ্যাত হয়েছে। এখানে হোটেল এবং ধর্মশালা আছে।

➤ ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস্ বা নন্দনকানন এবং হেমকুণ্ড সাহিব

১৯৩১ সালে কামেট শৃঙ্গ (২৫,৪৪৭′) আরোহণ করে ফিরছিলেন ফ্রাঙ্ক স্মাইথ। হঠাৎ শুরু হল প্রবল তুষারঝড়। পথ এবং অন্য সঙ্গীরা হারিয়ে গেল। একা একা ঘুরতে ঘুরতে হাজির হন এক বিরাট ফুলের বাগানে এক অজানা উপত্যকায়।। তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। ১২—১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় প্রায় ৭ কিমি বিস্তৃত কুসুমাস্তীর্ণ উপত্যকা। কিন্তু মুগ্ধ স্মাইথ সেবারে অপেক্ষা করতে পারলেন না। দেশে চলে গেলেন। ফিরে এলেন ছ' বছর বাদে ১৯৩৭ সালে। শিবির স্থাপন করে প্রায় আড়াই শ' প্রজাতি ফুল সংগ্রহ করলেন।

অবশেষে দেশে ফিরে বই লিখলেন—ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস। এই নামেই পরিচিত হল এই জায়গাটি। বাংলায় নন্দনকানন। এখানে যাওয়ার সময় জুলাই থেকে আগস্ট মাস। বদ্রীনাথ বা যোশীমঠ থেকে বাসে গোবিন্দঘাট নেমে হেঁটে ঘাংঘারিয়া (১০,০০০ ফুট)। ঘাংঘারিয়া থেকে নন্দনকানন প্রায় ৪ কিমি। ভূন্দর নদীর ধার দিয়ে ১.৫ কিমি পথ এগিয়ে গেলে পথের ধারে নদীর দু'পারে ফুলের মেলা। বিস্তীর্ণ প্রান্তর কেবল ফুলে ফুলে ভরা। এই উপত্যকার প্রান্তে হাতি, ঘোড়া ও রতবন এবং নীলগিরি পর্বত পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নন্দনকাননের উচ্চতা ১৩,০০০ ফুট।

গুরু গোবিন্দ সিং হিমালয়ের গহনে এক হ্রদের তীরে বসে অনেকদিন উপাসনা করেছিলেন। সেই হ্রদের চারদিক সাতটি তুষার শিখর। সপ্তশৃঙ্গের (১৭০০০') ছায়া ভাসে হ্রদের জলে। অনেক পথ পরিক্রমার পর মোহন সিং নামে এক ভক্ত ঐ হ্রদের সন্ধান পান যা আজ হেমকুণ্ড সাহিব নামে পরিচিত। ভক্ত শিখদের দানে প্রায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় এই হ্রদের তীরে গড়ে উঠেছে বিরাট গুরুদ্বার। এটি হিন্দুদের কাছেও পূণ্যস্থান।

ঘাংঘারিয়া থেকে লোকপাল হেমকুণ্ড সাহিবে যেতে হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ উঠেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকেই হেমকুণ্ড দেখা যায়। সুন্দর হ্রদ। ঘাংঘারিয়া থেকে হেমকুণ্ডের দূরত্ব ৫.৫ কিমি। এই পথেও ব্রহ্মকমল, হেমকমল, ফেনকমল সহ প্রচুর উচ্চ হিমালয়ের ফুল পাওয়া যায়। হ্রদের পরিধি প্রায় এক মাইল এবং বিস্তৃতি আধ মাইল। হ্রদটি গোলাকার। নীলচে জলধারা তির তির করে কাঁপে হালকা বাতাসে। হ্রদ সংলগ্ন সমস্ত অঞ্চলটির নাম লোকপাল। হেমকুণ্ডের তীরে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মৃতি বিজড়িত মন্দির গুরুদ্বার। ভেতরে গুরু গোবিন্দ সিংয়ের মূর্তি এবং গ্রন্থসাহেব আছে। গুরুদ্বার সংলগ্ন ধর্মশালা। ধর্মশালার সামনে হ্রদের কাছে লোকপাল মন্দির। মন্দিরে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণের ধ্যানরত মূর্তি। তিনি হেমকুণ্ডের তীরে অনেক দিন তপস্যা করেছিলেন। এখান থেকে লক্ষ্মণ গঙ্গার উৎপত্তি।

➤ সান্দাকফু-ফালুট

দার্জিলিং অঞ্চলের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর পদযাত্রা সান্দাকফু ও ফালুট। এই অঞ্চলকে পদযাত্রীদের স্বর্গলোকও বলা চলে। সারা পথে ম্যাগনোলিয়া, রডোডেনড্রন, পাইন ও দেবদারুর সারি, অসংখ্য ফুল আর পাখি, ঝরণা ও নদী। এবং দেখা মেলে হিমালয়ের বিচিত্র মানুষদের। পথের ধারে মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য গ্রাম পাওয়া যাবে। এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ বহু বিশ্ববিখ্যাত পর্বত শিখরের অপরূপ বিচিত্র রূপের ঝলকানি মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। স্থানে স্থানে অবশ্য স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ। পচা পাতার কাদায় জংলী পাহাড়ীপথ। তবে তারপরেই আবার পাহাড়ী ঝোরা, সবুজ উপত্যকা, ঝরণা, বনফুল আর ঝলমলে শিখরমালা পথের ক্লান্তি হরণ করে। হিমালয়ের সৌন্দর্য আর বিশালত্বের মহিমা চোখ আর হৃদয় জুড়িয়ে দেয়।

কলকাতা থেকে ট্রেন অথবা বাসে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড। সেখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে দার্জিলিং। দার্জিলিং থেকে বাস বা জিপে সুখিয়াপোখরি হয়ে মানেভঞ্জন অথবা বাস বা জিপে মিরিক হয়ে সুখিয়াপোখরি পৌঁছে জিপ বদল করে মানেভঞ্জন। মানেভঞ্জন থেকে হাঁটা শুরু। ১১ কিমি হেঁটে টংলু। যাওয়ার পথে দুটি জায়গা পড়বে চিত্রে আর মেঘমা। চায়ের দোকান আছে। মানেভঞ্জন এর উচ্চতা প্রায় ৭০০০ ফুট আর টংলুর উচ্চতা ১০০০০ ফুট। টংলু থেকে ১৫ কিমি হেঁটে কালপোখরি (৯৫০০ ফুট)। যাওয়ার পথে পড়বে জৌবাড়ি এবং গৈরিবাস (৮৫০০ ফুট)। জৌবাড়িতে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে গৈরিবাসে রাতের বিশ্রাম করতে পারেন অথবা কালপোখরিতে রাতের বিশ্রাম। কালপোখরিতে রাতের বিশ্রাম করে পরদিন ৬ কিমি হেঁটে সান্দাকফু। হাঁটাপথে পার হয়ে আসবেন বিবেকভঞ্জন। সান্দাকফুর উচ্চতা ১১,৯২৮ ফুট।

মাউন্ট এভারেস্ট এবং তার শিখরসাথীদের দেখা পাওয়ার জন্য সান্দাকফুর আকর্ষণ অদ্বিতীয়। নীল আকাশের নিচে অসংখ্য শিখর পরিবৃত মাউন্ট এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,২০৮´)। ডাইনে প্রাসাদ প্রহরীর মতো পানডিম (২২০১০´), পাশে যেন তারই দোসর সিমভো (২২,৩৬০´), তাদের পরেই যেন তুষার শৃঙ্গগুলির টানা প্রসারে বিঘ্নঘটিয়ে 'জুমনো গ্যাপ'। সেখান থেকে তুষারস্তর ধাপে ধাপে উঠে গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরে। সামনে ছোট্ট ঢেউয়ের মতো কাবরু ডোম (২৪,০৬২´)। পাশে অল্পবিত্ত পারিষদের মতো রাটোং (২২০০০´) এবং কাপটোং (২২,১৬২´)। বাঁয়ে কুম্ভকর্ণ (২৫,২৯৪´)। মাউন্ট এভারেস্টকে ঘিরে হিমালয়ের অন্যান্য শিখরগুলি হলো চোমোলনজো (২৫,৬৪০´)। মাকালু (২৭,৭৯০´), এভারেস্ট নিজে (২৯,০২৮´), লোৎসে (২৫,৭২৪´), নুপৎসে (২৫,৭২৬´), চামলাঙ (২৪,০০৬´) প্রভৃতি। এপ্রিল-মে মাসে হিমালয়ের ফুল সান্দাকফুকে সাজিয়ে তোলে। সান্দাকফু থেকে ২৩ কিমি দূরে ফালুট। উচ্চতা প্রায় ১১০০০ ফুট। পথে পড়ে একটি উপত্যকা—দি লষ্ট ভ্যালি। এখান থেকে রিমবিক, গোর্কে হয়ে দার্জিলিং ফিরে আসা যায়। থাকার জন্য সব জায়গাতে ট্রেকার্স হাট এবং প্রাইভেট লজ আছে। DGCH-এরও বাংলো আছে।

★ ★ ★

➤ উল্লেখযোগ্য গিরিপথ

উত্তরপ্রদেশ ঃ থাগ লা, নিতি ও লিপুলেখ

হিমাচল ঃ বরলাচা লা, সিপকি লা, রোটাং

জম্মু ও কাশ্মীর ঃ বানিহাল, বুর্জিলা, জোজিলা, কারাকোরাম

সিকিম ঃ নাথু লা, জেলেপ লা।

➢ হিমালয়ের কয়েকটি জনপ্রিয় তীর্থ

উত্তরপ্রদেশ ঃ পূর্ণাগিরি, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, হেমকুণ্ড সাহিব, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর, ত্রিযুগীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী

হিমাচল প্রদেশ ঃ মণিকরণ, ত্রিলোকনাথ, বৈজনাথ, মণিমহেশ

জম্মু ও কাশ্মীর ঃ বৈষ্ণোদেবী, অমরনাথ

নেপাল ঃ পশুপতিনাথ, লুম্বিনী, মুক্তিনাথ,

➢ হিমালয়ের মানুষ

হিমালয়ে বাস করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, এঁরা সবাই হিমালয়ের সন্তান হলেও বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির বংশধর। ভিন্ন তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি ও সামাজিক নিয়ম। তাহলেও এঁদের মধ্যে প্রচুর মিল। উচ্চ-হিমালয়ের অধিবাসীরা সবাই গরমে এবং শীতে ওঠা-নামা করেন।

গুর্জর—এঁদের সাধারণত কাশ্মীরেই দেখা যায়।

গদ্দী—এঁদের দেখা যায় কুলু উপত্যকায় এবং ধৌলধার ও পীরপাঞ্জালের উপত্যকায়।

কিন্নর—এঁরা বসবাস করেন হিমাচলের সাংলা, কল্পা, বাসপা উপত্যকায়।

যাধ—এই অধিবাসীরা থাকেন যাধ গঙ্গা এবং জাহ্নবী বেসিনে। এখানে নিলাং গ্রামে এঁদের বাস। এঁদের সঙ্গে কিছু ভোটও বাস করেন।

মারচিয়াস—অলকানন্দা উপত্যকার মানা গ্রামে এঁরা বাস করেন। এঁরা শীতে যোশীমঠ এবং চামোলিতে নেমে আসেন।

অ্যানওয়াল—এই অধিবাসীরা পিণ্ডারী উপত্যকায় থাকেন। পিণ্ডারী, রূপকুণ্ড, সুন্দরডুঙ্গা প্রভৃতি জায়গায় যাঁরা ট্রেকিং করতে যান এই আনওয়ালরা তাঁদের মালবাহকের কাজ করেন।

জোহরি—মিলাম উপত্যকায় থাকেন।

➢ হিমালয়ের কয়েকটি হ্রদ

উত্তরপ্রদেশ ঃ নৈনীতাল, ভীমতাল, নওকুচিয়াতাল, সাততাল, বাসুকিতাল, দেওরিয়াতাল, ডোডিতাল, চোরাবাড়িতাল, হেমকুণ্ড, রূপকুণ্ড।

কাশ্মীর ঃ ডাল, উলার, নাগিন।

সিকিম ঃ ছাঙ্গু, গ্রীনহ্রদ, গুরুডংমার, মেনমোচা, খেচিপেড়ি, লক্ষ্মীপোখারি, রামলক্ষ্মণ।

নেপাল ঃ ফিউয়াতাল, সূরযকুণ্ড, রক্তকুণ্ড, গোঁসাইকুণ্ড, দুধকুণ্ড, নাগকুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড।

➢ কয়েকটি পরিচিত প্রস্রবণ

প্রস্রবণ দু'ধরনের হয়—উষ্ণ এবং শীতল।

দেরাদুন উপত্যকায় সহস্রধারা শীতল প্রস্রবণ।

আর উষ্ণ প্রস্রবণ আছে—উত্তরপ্রদেশে ঃ গাংনানী, গৌরীকুণ্ড, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী প্রভৃতি। হিমাচল প্রদেশে ঃ বশিষ্টকুণ্ড, মণিকরণ, তপ্তপানি প্রভৃতি। কাশ্মীরে ঃ ভেরীনাগ, অনন্তনাগ, বৈষ্ণোদেবী প্রভৃতিতে। আর নেপালের মুক্তিনাথে।

➢ কয়েকটি পরিচিত হিমবাহ

উচ্চ-হিমালয়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য বৃষ্টির বদলে তুষারপাত হয়। এই তুষারের কিছু অংশ সূর্যের তাপে গলে যায় এবং বাকি অংশ পর্বতের গায়ে জমে থাকে। তুষারপাতের পরিমাণ যদি তুষার গলার পরিমাণের থেকে বেশি হয় তাহলে সারাবছর সেখানে বরফ জমে থাকে। যে উচ্চতায় এই তুষার জমে তাকে বলে হিমরেখা বা Snow linc.

হিমরেখার ওপরে মোট তুষার গলনের পরিমাণ যেহেতু বার্ষিক তুষারপাতের চেয়ে কম সেজন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত তুষার জমে সৃষ্ট হয় তুষারক্ষেত্র। তুষারক্ষেত্রের তুষার পাহাড়ের গা বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে থাকে নিচের দিকে। এই তুষার স্রোতকে বলে তুষার নদী বা হিমবাহ। এই হিমবাহগুলি—

উত্তরপ্রদেশ ঃ গঙ্গোত্রী, পিণ্ডার, চৌখাম্বা, চতুরঙ্গী, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, নীলাম্বর, মিলাম, সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ প্রভৃতি।

কাশ্মীর ঃ সিয়াচেন, হিসপার, বিয়াফো, বালতোরা, বাতুরা, রিমো, গাসের ব্রুম প্রভৃতি।

সিকিম ঃ জেমু

নেপাল ঃ লোৎসে, ল্যাংটাং, নুপৎসে প্রভৃতি হিমবাহ।

➢ সময় নির্ণয়

কলকাতায় যখন ১২টা তখন ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম ১১টা ৩৬ মি. ২৪ সে.। এই সময় অন্যান্য স্থানের সময়—

স্থান		স্থানীয় সময়
		ঘ. মি. সে.
কাঠমাণ্ডু	—	১১-৪৭-৩৬
কাশ্মীর	—	১১-০৫-৩৬
দার্জিলিং	—	১১-৫৯-৩৬
নৈনীতাল	—	১১-২৪-০৩
শ্রীনগর	—	১১-০৫-৩৬
সিমলা	—	১১-১৫-১২

➢ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রা

		জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি
শ্রীনগর	কম	-২	-১	৩	৭	১১	১৪	১৮	১৮	১২	৫	-০	-২
	বেশি	৫	৭	১৪	১৯	২৪	২৯	৩১	৩০	২৮	২২	১৫	১০
	বৃষ্টিপাত	৭৪	৭১	৯১	৯৪	৬১	৩৫	৫৮	৬০	৩৮	৩০	১০	৩৩
কাঠমাণ্ডু	কম	১	৩	৭	১১	১৪	১৯	২০	২০	১৮	১৩	৬	১
	বেশি	১৮	২০	২৪	২৭	২৯	২৯	২৭	২৮	২৭	২৬	২২	১৯
	বৃষ্টিপাত	১৬	২৬	৩১	৬২	৬৯	২৮৫	৩১৮	৩৬০	৩৬৫	৬৩	১৩	৩
সিমলা	কম	-১	৩	৭	১১	১৫	১৬	১৫	১৫	১৪	১১	৭	২
	বেশি	৮	১০	১৪	১৯	২৩	২৪	২১	২০	২০	১৮	১৫	১০
	বৃষ্টিপাত	৬৫	৪৮	৫৭	৩৮	৫৪	১৪৮	৪১৫	৩৮৫	১৯৫	৪৫	৭	২৪
দার্জিলিং	কম	১	৩	৮	১১	১৪	১৪	১৪	১৫	১৫	১২	৭	৩
	বেশি	৮	১১	১৫	১৮	১৯	১৯	২০	২০	২০	১৮	১৫	১১
	বৃষ্টিপাত	২২	২৭	৫২	১০৭	১৮৫	৫২২	৭১৪	৫৭২	৪১৬	১১৬	১৪	৫

(১) হিমালয়ের পাদদেশে ও ঢালু অঞ্চলের ঘন, চিরসবুজ বনভূমিকে তরাই বা ডুয়ার্স বলে। এর গড় উচ্চতা ১৩০-৩০০ মিটারের মধ্যে। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১৫°-৪৪° সেন্টিগ্রেড ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৪০-২৫০ সে.মি। শাল, শিশু, বাঁশ, বেত, তাল প্রভৃতি ছোট বড় গাছ এবং লতাগুল্ম এখানে দেখা যায়। এছাড়া এখানে বড় বড় ঘাসও দেখা যায়। এই বনভূমিতে গণ্ডার, বুনো মোষ, হাতী, বাঘ, হরিণ প্রভৃতি বাস করে।
(২) দ্বিতীয় পর্বে ৯১৫ থেকে ২২৪০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ী অঞ্চল পাইন গাছে ভর্তি। এছাড়া এখানে জন্মায় বাঁশ, রোহিনী ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১০°-২১° সেন্টিগ্রেড এবং বৃষ্টিপাত ৯৪-১৩০ সে. মি.। এখানে বাস করে ফেজান্ট, গোরেল, টাকিন, ক্যাটারিয়ার প্রভৃতি জন্তু।
(৩) ১৫২৫ থেকে ৩৬৫৮ মিটার উচ্চতায় শুষ্ক ও আর্দ্র নিরক্ষীয় অরণ্যভূমি এর অর্ন্তগত। এই বনাঞ্চল কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৫°-১৮° সেন্টিগ্রেড এবং বৃষ্টিপাত ৭৫-৮৫ সে. মি। বিভিন্ন উচ্চতায় জন্মায় কনিফার, ওক এবং গুল্ম জাতীয় গাছ। পূর্ব হিমালয়ের আর্দ্র নিরক্ষীয় বন চির সবুজ। রোডোডেনড্রন আরবোরিয়াম, কুয়েরকাস, ভাইবারনাম প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ। এখানে বাস করে মারখর, থরসিরু. হাঙ্গুল, কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি জন্তু।
(৪) ২৮৯৫ থেকে ৩৮১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলটি ছোট ছোট কণিফার, হিমালয়ের বার্চ, রোডোডেনড্রনের ঝোপ, বেটুলা প্রভৃতি গাছে ভরা এবং উপরে ঘন জঙ্গল উদ্ভিদ ও ঘাসে ভরা অঞ্চল। বছরের অধিকাংশ সময় এখানে তুষারপাত হয়। এই অঞ্চলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের জীবজন্তু দেখা যায়। যেমন স্নো লেপার্ড, পার্বত্য কালো ভালুক, চমরীগাই প্রভৃতি।

➢ পর্যটক প্রিয় শৈলাবাস

শৈলাবাস	উচ্চতা	কোন রাজ্যে
দার্জিলিং	২১৩৪ মি.	পশ্চিমবঙ্গ
মিরিক	১৮০০ মি.	পশ্চিমবঙ্গ
কার্শিয়াং	১৪৫৮ মি.	পশ্চিমবঙ্গ
কালিম্পং	১২৫০ মি.	পশ্চিমবঙ্গ
গ্যাংটক	১৮৫০ মি.	সিকিম
কাঠমাণ্ডু	১৪০০ মি.	নেপাল
নৈনীতাল	১৯৩৮ মি.	উত্তর প্রদেশ
আলমোড়া	১৬৪৬ মি.	উত্তর প্রদেশ
রাণীক্ষেত	১৮২৯ মি.	উত্তর প্রদেশ
কৌসানি	১৮৯০ মি.	উত্তর প্রদেশ
মুসৌরি	২০০৫ মি.	উত্তর প্রদেশ
সিমলা	২২০০ মি.	হিমাচল প্রদেশ
মানালি	১৯২৮ মি.	হিমাচল প্রদেশ
ধরমশালা	১২৫০ মি.	হিমাচল প্রদেশ
ডালহৌসি	২০৩৯ মি.	হিমাচল প্রদেশ
শ্রীনগর	১৭৬৮ মি.	জম্মু ও কাশ্মীর
পহেলগাঁও	২১৩০ মি.	জম্মু ও কাশ্মীর
সোনামার্গ	২৭৪০ মি.	জম্মু ও কাশ্মীর
গুলমার্গ	২৭৩০ মি.	জম্মু ও কাশ্মীর